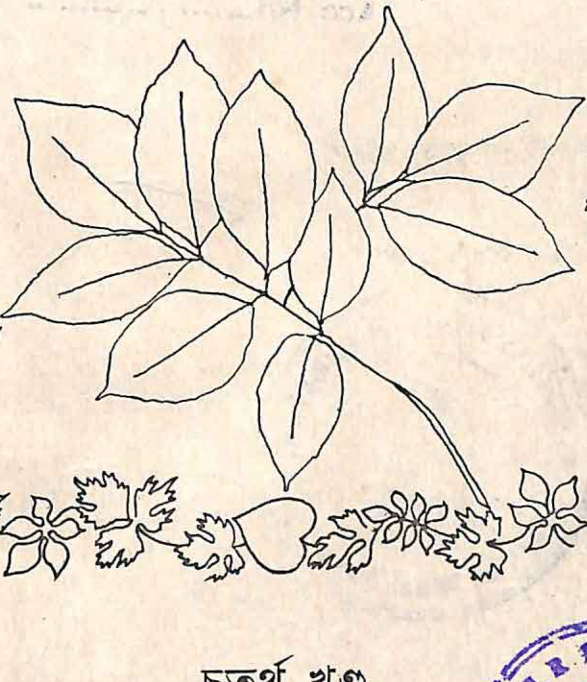
চিরঞ্জীব বনৌষধি

চিরঞ্জীব বনৌষধি

আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য



চতুর্থ খণ্ড

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড · কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

অলংকরণ : বিপুল গুহ

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৮৭

মূল্য : ২৫·০০

উৎসর্গ

আয়ুর্বেদের একক ভৈষজ্য-পরিচয়ে
যিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য দৃষ্টিতে
সেতুবন্ধের মত—
সেই প্রখ্যাত ভিষগাচার্য
বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয়ের
উদ্দেশে অঞ্জলি তর্পণ

গ্রন্থকার

এই গ্রন্থের মহনীয় বৈদিক তথ্যের সংযোজনায় ও সংহিতা সূত্রের
সৌকর্য্যে আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ বেদজ্ঞপণ্ডিত অধ্যাপক
আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, শাস্ত্রী
কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ,
ন্যায়শাস্ত্রীজীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-
প্রীতির অভিজ্ঞান
অর্পণ করি।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য মহাশয়ের "চিরঞ্জীব বনৌষধি" গ্রন্থখানি ইতিমধ্যেই বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সাদরে গৃহীত হইয়াছে, এবং গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদানের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। এ পর্যন্ত ইহার তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, এক্ষণে চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশিত হইতেছে।

বর্তমান সময়ে বাংলা সাহিত্যে আপাতরম্য গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতার বিপুল প্রচার ও সমাদর, ইহার মধ্যে আমাদের প্রাচীন ভারতের বনৌষধি বিজ্ঞানের সুবিশাল ও বিচিত্র ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক বিবরণমূলক এই জাতীয় গ্রন্থ যে সুধীজনের কাছে সমাদৃত হইবে এবং এ ধরনের গ্রন্থ রচনায় যে কেহ ব্রতী হইবেন—উভয়ই বিস্ময়কর।

চতুর্ব্যূহ চিকিৎসাশাস্ত্রের যে চারিটি বিভাগ প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণ ব্যবস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ভৈষজ্য অন্যতম। শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির আরোগ্য সম্পাদনের জন্য ভৈষজ্য প্রয়োগের আবশ্যকতা এবং এই বিশাল বিশ্বের অগণিত তরু-লতা-ওষধি-বনস্পতি-গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ্ হইতে এই ভৈষজ্যের উপাদান সংগৃহীত হইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতের বৈদ্যকশাস্ত্র প্রণেতৃগণ তাঁহাদের আশ্চর্যকর মনীষা, সর্বতঃ প্রসারিণী দৃষ্টি ও অধ্যবসায়ের বলে উদ্ভিদ্‌জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের আকৃতিগত ও গুণগত উভয়বিধ বৈশিষ্ট্যই এত নিপুণ ও নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, বর্তমানকালের চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও তাহা পরম বিস্ময়কর কীর্তি বলিয়া অবশ্যই প্রতিভাত হইবে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের নিকট বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে একই অখণ্ড অদ্বৈত সত্তার বিরামহীন লীলা ও বিবর্তন প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধ

হইয়াছিল, তাই মনুষ্যজীবনকে যেমন তাঁহারা ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সহকারে চর্চা ও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, অনুরূপভাবেই উদ্ভিদ্ ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিচিত্র প্রপঞ্চও তাঁহাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমাদের মনে পড়িবে উপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি, যেখানে অগ্নি, জল, বনস্পতি ওষধি সমন্বিত বিশ্বভুবনের মধ্যে তুল্যভাবে বিরাজমান এক পরম দেবতার উদ্দেশে ঋষি তাঁহার বন্দনা উচ্চারণ করিয়াছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

মানুষের মত উদ্ভিদেরও চেতনা আছে, সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে; কিন্তু তমোগুণের আবরণের দ্বারা তাহার স্ফুরণ রুদ্ধ হইয়া থাকে। মনুসংহিতায় সেইজন্য বলা হইয়াছে—

"তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥"

মানুষ প্রভৃতি সচেতন প্রাণি-জগতের সহিত উদ্ভিদ্ জগতের এই অন্তগূঢ় সাদৃশ্য-বশতঃ ইহারা পরস্পরের উপকারক হইয়া থাকে। ব্রণ-বিরোপণের জন্য ইঙ্গুদীর তৈল ব্যবহার করা হয়, শরীরের উত্তাপ-প্রশমনের জন্য উশীরানুলেপন প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মানবসমাজে যেমন নবজাতক শিশুর নামকরণ হইয়া থাকে, প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদের নামকরণ পদ্ধতিও কত বিচিত্র; কত অনুরাগ, আত্মীয়তা, প্রীতিই না সেই নামকরণের ভিতর দিয়া সূচিত হইয়া থাকে!

আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য মহাশয় উদ্ভিদের নামকরণের পদ্ধতি সম্বন্ধে যে শ্লোকগুলি তাঁহার গ্রন্থে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অনুধাবন-যোগ্য। আর নামগুলিই বা কত শ্রুতিমধুর, অর্থব্যঞ্জক! কোবিদার, করবীরক, শতপুষ্পা, নক্তমাল, কিরাততিক্তা, মদয়ন্তিকা, শোভাঞ্জন, উপোদকী, পুনর্নবা, কর্ণিকার—নাম-করণের মধ্য দিয়াই প্রাচীন ভারতের সুরুচি, শালীনতা, বিশ্বৈক্যানুভূতি যেন প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার তাঁহার সুদীর্ঘ গবেষণা, শাস্ত্রচর্চা ও আয়ুর্বেদের প্রয়োগিক অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত পরিণত প্রজ্ঞার সাহায্যে আরোগ্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ওষধি ব্যবহারের যে ধারা-বাহিক ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন, তাহা যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনি প্রাঞ্জল, সরস ও সুখপাঠ্য। ইহাতে শুধু বৈদ্যকশাস্ত্রের প্রামাণ্যগ্রন্থ ও তদুপরি গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থেরই যে সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহাই নহে, বৈদিক সাহিত্যের সুবিশাল ভাণ্ডারও তিনি তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, পরবর্তী যুগের সংস্কৃত কাব্য ও নাট্য সাহিত্য, অমরসিংহাদি প্রণীত সুবিশাল কোষ-সাহিত্য তাঁহার গবেষণার উপকরণ জোগাইয়াছে। কখনও ওষধির নামকরণ ও বিচিত্র বিবর্তন বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক যেমন পৌরাণিক আখ্যায়িকার দ্বারস্থ হইয়াছেন, সেই-রূপ উহার ব্যুৎপত্তির জন্য ব্যাকরণেরও শরণাপন্ন হইয়াছেন; আবার লৌকিক কিংবদন্তীও তাঁহার নিকট উপেক্ষণীয় নয়। একই সঙ্গে প্রতিটি বনৌষধির বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি 'বৈদ্যকের নথি', 'নব্যের সমীক্ষা' এবং 'লোকায়তিক ব্যবহার'ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং অন্তে আধুনিক রসায়নবিজ্ঞানসম্মত পরিভাষায় উহার গঠন এবং বীর্যসত্তাও

নির্দেশ করিয়াছেন। ফলে তাঁহার এই গ্রন্থটি শুধুই আরোগ্যলাভার্থী গৃহস্থবর্গের নিকটেই যে কেবল উপাদেয় হইবে তাহা নহে, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদেরও বহু জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের সমাধান যেমন তাঁহার আহৃত তথ্য সম্ভারের সাহায্যে সম্ভব হইবে, সেইরূপ বর্তমানের নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত উদ্ভিদ্ ও রসায়ন বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাঁহারা নিরত, তাঁহারাও এই বিশাল গ্রন্থ হইতে অনেক অজ্ঞাত তথ্য বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়।

রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে বিশল্যকরণী, সন্ধানকরণী, সবর্ণকরণী ও সঞ্জীবনকরণী নামক যে চারিটি মহৌষধির উল্লেখ আছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শালাক্যতন্ত্রের যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার দ্বারা অস্থি-সংযোজন ও আধুনিক প্লাষ্টিক সার্জারি বিদ্যায় প্রাচীন ভারতীয় ভিষক্‌সম্প্রদায়ের পারদর্শিতার কথা আমরা জানিতে পারি।

এইরূপ বহু অজ্ঞাত তথ্য, কিংবদন্তী, লোকপ্রবাদ প্রভৃতি বিচিত্র উপাদানের সমাবেশের ফলে "চিরঞ্জীব বনৌষধি" গ্রন্থখানি শুধু প্রাচীন ভারতীয় বনৌষধি বিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে যে একটি অভিনব সংযোজন তাহাই নহে; পরন্তু সুপ্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতির যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতীয় লোকসংস্কৃতির আলোচনায় নূতন আলোকপাত করিতে পারে এমন বহু তথ্যও এই গ্রন্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে; যাহার ফলে ইহা শুধুই দৈনন্দিন ব্যাধির সহজসাধ্য চিকিৎসার সহায়ক, গৃহস্থগণের পক্ষে অপরিহার্য একখানি সংকলন গ্রন্থ না হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনুশীলনরত শিক্ষার্থী ও গবেষকগণের নিকট একটি মূল্যবান সংগ্রহ ও আকরগ্রন্থের মর্যাদাও লাভ করিবে।

অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা
২৯-৩-৮০

চতুর্থ খণ্ডের অভ্যুদয়ে
নান্দীমুখ

স্তস্তিবাচন ক'রতে ব'সে দু'টি চোখে অশ্রু এসেছে। একটিতে আনন্দাশ্রু, আর একটিতে বিষাদাশ্রু। চিরঞ্জীব বনৌষধির পূর্বেকার তিন খণ্ড রবীন্দ্র পুরস্কারের (বৈজ্ঞানিক বিভাগে) উপযোগী ব'লে বিদ্বৎ সমাজে স্বীকৃতি পেলো। আর জনসাধারণের মাধ্যমে এটি যে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক এটাও প্রতিধ্বনিত হ'লো।

আর বিষাদাশ্রু এইজন্য বইছে যে, আমার স্বশ্রেণীর যাঁরা, তাঁদের কাছে আমার এ গ্রন্থ এখনও ব্রাত্য।

তবুও নিবেদন, আজ অন্যান্য চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বনৌষধি গ্রন্থটি যে খুবই ঔৎসুক্য সৃষ্টি ক'রেছে, তা এই পরিণত বয়সেও বিনিদ্র রজনী যাপন ক'রে ভারতীয় সংস্কৃতির জনকদের যে অসাধারণ কৃতকর্ম সেটাই সকলের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা ক'রে থাকি।

প্রতি খণ্ডের পরিশিষ্টাংশে আয়ুর্বেদের বৈশিষ্ট্য যে কি, তারও এক একটি অধ্যায় পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। সেই ঔপনিবেশিক আদর্শেই এই চতুর্থ খণ্ডের বৈশিষ্ট্য থাকছে "রোগ লক্ষণ ও তার অশুভ সংকেত"। সেটার প্রতিপাদ্য বিষয় হ'লো, রোগ হ'লেই তা দুরারোগ্য নয়, আবার যথাযথ চিকিৎসা না হ'লে, বা ভুল চিকিৎসা হ'লে সেই রোগটাই যে অশুভ সংকেত এনে দেয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এটির সংযোজন।

তাছাড়া এবার অন্যান্য সম্প্রদায়ের চিকিৎসকবৃন্দের সুবিধার জন্য ওই

রোগগুলির পাশ্চাত্য নামও যথাসম্ভব সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হ'লো। এই অধ্যায়টিতে যদিও পরিসর স্বল্প, তা'হলেও বিষয়বস্তুর নিবিড়তায় সেগুলিও এ খণ্ডের অন্যতম আকর্ষণ।

সর্বশেষে নিবেদন এই যে, ভারতের বনৌষধিসম্ভার অনন্ত, সবের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে এবং তাদের গুণপনা জানিয়ে যেতে পারবো ব'লে মনে হয় না, তবে আজীবন এ ব্রত পালন করার সংকল্প মনে মনে পোষণ করি, কিন্তু সময় তো সীমিত, অন্ধকার আসবেই। সুতরাং এখনই পরবর্তী অধ্যায়ের আসন্ন প্রতিশ্রুতি নিরর্থক হ'তেও তো পারে!

পরিশেষে তাঁদের সহযোগিতা স্মরণ ক'রছি, যাঁরা এই খণ্ডের ভেষজগুলির সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠু রূপ দেওয়ার জন্য বিশেষ সাহায্য ক'রেছেন—তাঁদের মধ্যে ডঃ এস আর দাস, এম, এস-সি, পি-এইচ, ডি, দেখেছেন বোটানির অংশটি। ডঃ শিবব্রত মুখোপাধ্যায় এম, এস-সি, পি-এইচ, ডি, সংকলন ক'রেছেন Chemical Composition অংশটি এবং তাঁকে সাহায্য ক'রেছেন ধ্রুবজ্যোতি রায়, এম, এস-সি। ডাঃ চিন্ময় ভট্টাচার্য, এম, এ, বেদান্ততীর্থ, এম, বি, বি, এস, (কলি), এল, টি, এম, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী এবং অধ্যাপক নিমাই রায়, এম, এ, এস, এফ, আয়ুর্বেদ-তীর্থ—এ'রা দুজন পরিশিষ্টাংশের রোগাবলীর পাশ্চাত্য নামাংশ সংকলনে বিশেষ সাহায্য ক'রেছেন। পরম স্নেহভাজন রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বি, এস-সি, আয়ুর্বেদতীর্থ পাণ্ডুলিপি রচনায় বিশেষ সাহায্য ক'রেছেন—শুধু তাই নয়, এই গ্রন্থের নব্যের সমীক্ষায় অংশটি তাঁরই অনূদিত।

এছাড়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, শ্রীসুধেন্দুকুমার গুহ ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়কে—এ'রা দু'জনে ধৈর্য সহকারে এই খণ্ডের প্রুফ্ সংশোধন ক'রে এটিকে নির্ভুল করার জন্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

আর একটি কথা, শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধিকর্তার আনুকূল্যে কয়েকটি দুর্লভ ভেষজের ছবি এই গ্রন্থে সন্নিবেশ ক'রতে পেরেছি।

বিনীত—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

যমানী [যোয়ান]

খুড়ো ব'লেছিলো—কিন্তু সেটা মহাভারতের কথা কিনা জানি না, তবে "যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে" অর্থাৎ যা ভারতে নেই অর্থাৎ মহাভারতে নেই তা ভারতে অর্থাৎ ভারতবর্ষে নেই।

আচ্ছা মহাভারতেই তো আছে যে, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গযাত্রার সময় কুকুরকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই কি সত্যি? আচ্ছা, খুড়োই তো আবার ব'লেছিলো—রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী ক'রে যেতে পারেননি; কাল ক'রবো কাল ক'রবো ক'রে সব হারালেন; তার আগেই রাম তাঁকে শেষ ক'রেছিলেন।

এদিকে দেখা যায়, মহাভারতের ৩।৩১৩।১১৭ শ্লোকে ধর্মের পুত্রস্বরূপ যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ানো হ'য়েছিলো যে, ধর্মের তত্ত্ব গুহায় প্রবেশ করে আছে।

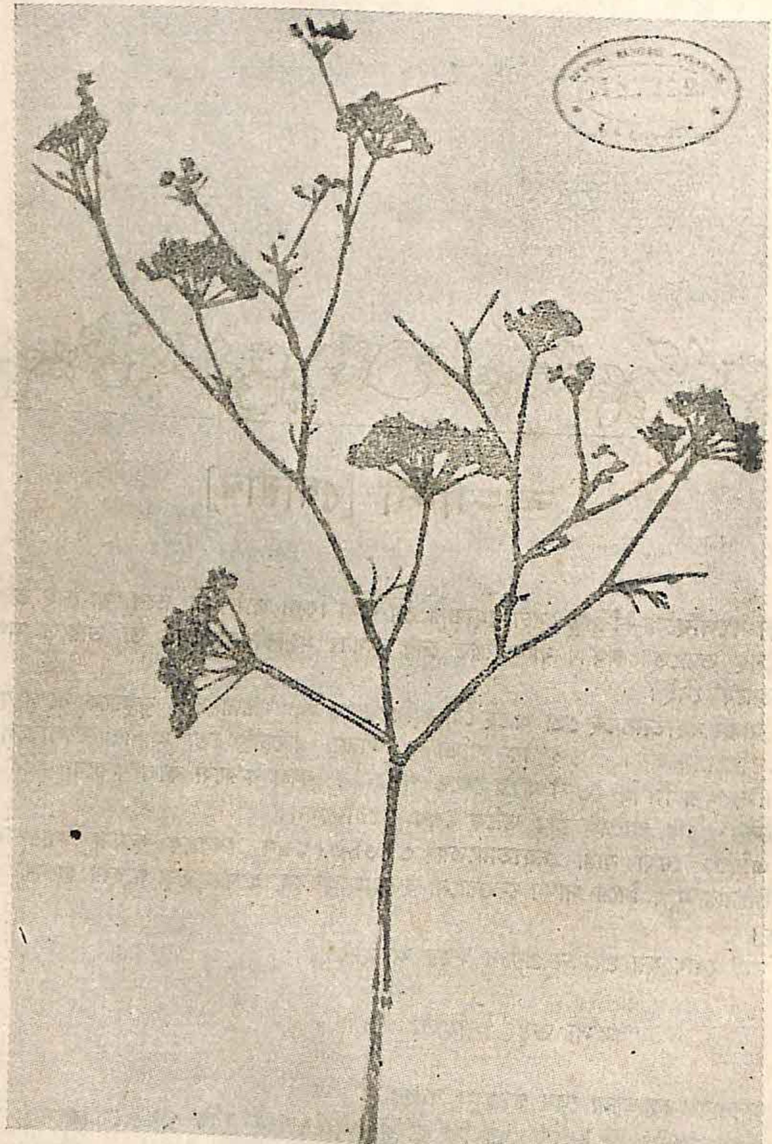
তাই বোধ হয় প্রাচীন প্রবচন হ'য়ে আছে—

"ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"

অতএব "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"

এখন দেখছি কি স্বর্গ আর কি যমের বাড়ী—সবই হাঁটা পথ; সেইজন্যেই বোধ হয় আস্তিক্য মতের ডান্ডা নিয়ে নাস্তিক্য মতবাদকে ভেঙ্গে-মুষড়ে দিয়ে ঐতিহাসিকরা ব'লে থাকেন—কাজাকীস্তানের অঞ্চল বিশেষ যেখানে, সেইখানেও আর্য-বসবাসকারী ভূমি ছিল, সেইটাই সে যুগের স্বর্গভূমি। সেইসব অঞ্চলের রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই ট্রেন্‌ড্ কুকুরকে সঙ্গে নেওয়া নয়তো? প্রত্ন ঐতিহাসিকরা নাকি বলেন, এ'রা

নাকি নাগা না হয় তিব্বতী ছিলেন, তাহ'লে ট্রেন্‌ড্‌ কুকুর তাঁদের সঙ্গে থাকা তো স্বাভাবিক। আর স্বর্গ শব্দের অর্থই তো সুখভূমি। (তিব্বতী ভাষায় লাসা মানে স্বর্গ)
থাক ও কথা—এখন মহাভারতকে বগল দাবায় রেখে এগিয়ে যাই।



Trachyspermum ammi (যমানী)

এখন আমাদের সাংসারিক মহাভারতের কথা বলি—লোকে যে বলে, "যম জামাই ভাগ্না, তিন না হয় আপনা।" আচ্ছা ধ'রলাম যম না হয় সর্বনেশে, তাহ'লে জামাইও

কি যমের দলে? এই প্রশ্ন পণ্ডিতের খপ্পরে প'ড়ে যেই যাওয়া, অমনি বেরিয়ে এলো—

"জামাতা জঠরো জায়া জাতবেদা জলাশয়াঃ।
পূর্যৎস্বপি ন পূর্য্যন্তে 'জ' কারাঃ পঞ্চ দূর্ভগাঃ॥"

অর্থাৎ জামাই, জঠর, জায়া (পত্নী), জলাশয় ও জাতবেদ (অগ্নি ও ব্রাহ্মণের নাম) —এই পাঁচটি 'জ'কারাদি স্বরূপের স্বভাবই এমনি যে, যতই দাও পূর্ণ হয় না। কিন্তু এ সব সম্পর্ক তো আমাতেও বর্তেছে। তবুও বলি আপন পর বোধ করবার সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার ক'রবে কে?

এখন লোকমহাভারত সরিয়ে যদি বৈদিক যুগে চ'লে যাই তা'হলে বোধ হয় এতটা তুলো ধুনতে হয় না, সেখানে বলা আছে—"নিয়মো যমঃ" নিয়ম বা শৃঙ্খলা যদি দিক, দেশ, কাল ও মনে থাকে তবেই যম। তাই বোধ হয় তেমনি একটা সংজ্ঞা মাত্রকে পরবর্তীকালে এত ভয়ঙ্কর রূপ দিয়ে যমের আসল তত্ত্বকে গুহায় প্রবেশ করানো হ'য়েছিলো সেই পুরোহিততন্ত্রের যুগে।

যাক—এতক্ষণ পুরোহিততন্ত্রের ভূতজটা যমের ভয় কেটে গেল। এখন দেখছি, যমের আসল রূপটার বোধ হ'লে এবং তাকে মেনে চ'ললে বোধ হয় দেশটা এতটা উৎসন্নে যেতো না।

এইবার আর একটি প্রসঙ্গ এসে মনে দানা বাঁধছে। আচ্ছা, বৈদিকদের দেওয়া নাম তো যমুনা, তাহ'লে এই যম শব্দকে কি সামনে রেখে তার এই নামকরণ?

সত্যিই তো, দিক, দেশ, কাল এবং ভূপ্রকৃতির আকার প্রকারের জন্যেই কোথাও বা যুক্ত কোথাও বা মুক্ত, কোথাও স্বনামে কোথাও বা বেনামে নদীটি প্রবাহিত। এ সংবাদটি কিন্তু ঋক্‌বেদের ৭।১৮।১৯ সূক্তের।

এইবার যমকে নিয়েই যমানী কথাটার উৎপত্তি কিনা দেখা যাক।

বেদে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাইতে দেখা যাচ্ছে, কোন সময় ভূতিকা, কখনও বা অজগন্ধা, কখনও বা অজমোদা বন যমানী, আবার পরবর্তীকালে এও দেখা যায় পারসীক যমানী বলে একটি প্রকারভেদও আছে।

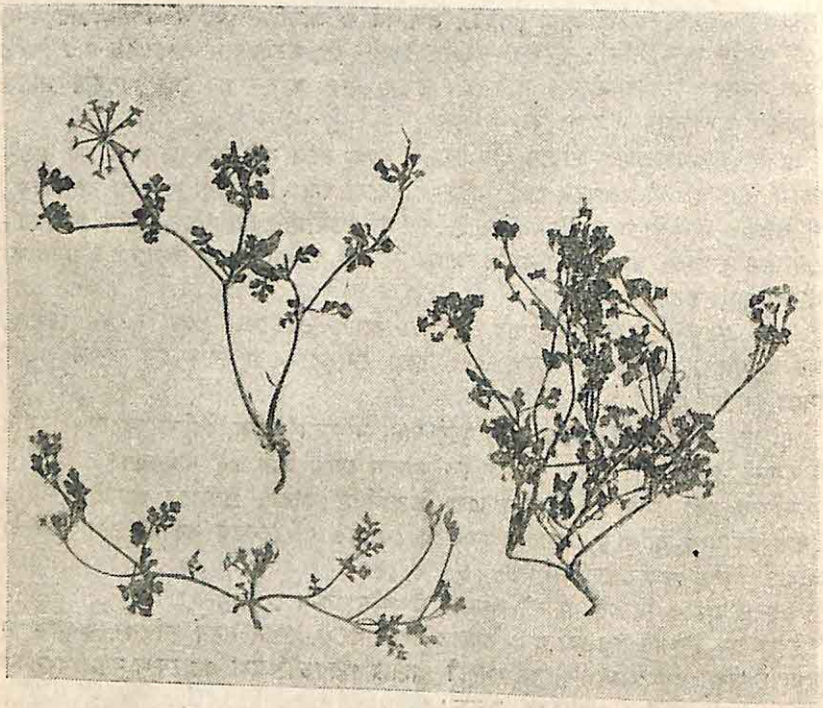
সেই ইঙ্গিতকে উপজীব্য ক'রেও পরবর্তী সংহিতাকারগণ শুধু স্পষ্ট ক'রেই নয়, সরস ক'রেও বলেছেন। তবে যমানীত্রয় এই কথাটা বৈদিক, এখন এই পারসীক যমানী, একে আপন করি কি ক'রে? তাকে তো বলা হ'য়েছে—খোরাসান (পারস্য দেশ) থেকে আসে, তাই তার নাম পারসীক যমানী।

আবার জট পাকালো এইখানে; আচ্ছা, আপনিই বলুন না, ১০০ বৎসর পরে বনগাঁয়ের ধারেই হয়তো ভারতের পূর্ব সীমানা শেষ হ'য়ে যাবে; ফরিদপুর, ঢাকা তখন কিরকম ঠেকবে? যেমন দুর্যোধনের মায়ের বাপের বাড়ী ছিল গান্ধার (বর্তমান কান্দাহার, আফগানিস্তানে) আর বিদুরের পত্নী ছিলেন পারসীকা (পারস্যের মেয়ে), তাহ'লে পারসীক যমানী যে বৃহত্তর জম্বুদেশের নয়—ওটা বহির্ভারতীয়, এটা বলা কি উচিত হবে? যাহোক, এইবার বৈদিক তথ্যে কি পাওয়া যায় দেখা যাক্।

যন্তাসি যমনা ভূতী মোদা ধ্রুবাসি ধরুণা।
কৃষ্যৈ ত্বাক্ষেমায় ত্বা রয্যৈ পোষায় ত্বা॥
(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প—১১।১২৭।২২)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

যমনা ত্রয়ং উপলভ্য ভিষক্ বদতি—ত্বং যন্তাসি, বীর্য্যত্বাৎ ত্বংভূতী কৃষ্যৈ মোদাচ ধরুণা=ধারকাসি, যদাত্বং ভূতিঃ তদা মোদা তৃপ্তিধারকা, ধ্রুবাসি=সততং ক্ষেমায়=পরিপালনায়, রয্যৈ=বীর্য্য বর্ধনায় পোষায় চ ত্ব বয়ামিত।



Seseli indicum (বন যমানী)

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—যমনে! তোমাকে পেয়ে ভিষ্‌ক বলেন, তুমি তোমার বীর্যের দ্বারা সংযমন কর, কৃষির জন্য ভূতী, অগ্নিসমা ধারকা হও, তখন তুমি মোদা, অর্থাৎ আনন্দদায়িনী। সর্বদা তুমি পালয়িত্রী, বীর্য বর্ধন কর এবং পোষণ কর, তোমাকে আমরা সেবা করি।

বেদের এই তথ্যের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি—যমই যমনা, যমী এবং যমুনা; অর্থাৎ ক্ষেত্র ভেদে কখনও দেহ, কখনও জল ও কখনও ভেষজ রূপে যমই নিয়ম রক্ষা ক'রে চ'লেছেন। দিক, দেশ, কাল ও মনে যমই আমাদিকে শৃঙ্খলা করার নির্দেশ দেন। বিশৃঙ্খল হ'লেই নিঃশেষ। আবার যমী ও যমুনা এবং যমনা এরাও ক্ষেত্রভেদে, দেহ ভেদে জল ও ভেষজ ভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করে।

বৈদ্যকের নথি

প্রবীণ চরক সংহিতায় যমনা বা যমানিকা অথবা যমানী এই তিনটি ক্ষেত্রে তিনটি প্রসঙ্গ তুলে দেখানো হ'য়েছে। চরক সূত্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় গুচ্ছে—

'তগরাগুরু ধন্যাক শৃঙ্গবের ভূতীক বচা'

প্রভৃতি স্থলে ভূতীক শব্দটি যমনা বা যমানীকে বুঝিয়ে বলা হয়েছে, এই ভূতীকটি শীত প্রশমন ক্ষেত্রে ব্যবহার ক'রতে হবে (এটি পঞ্চাশত মহাকষায়ের অন্যতম)।

সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানের ৩৭ অধ্যায়ে এই ভূতীক বা যমানীকে দেহবলের হ্রাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উপদেশ। এই শব্দটি যম ধাতুর সঙ্গে অন্ এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ এবং ইক্ প্রত্যয়ের যোগে সাধন ক'রে বলা হ'য়েছে—সংযমন করে যে, সেই যমানী—ভূতীকা; এই ভূতী বা ভূতিকাও নিয়ন্ত্রণ অর্থ প্রকাশ করে। আবার ঐ চরকেরই সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ের ১৪৭ শ্লোকে অজগন্ধা ব'লে যেটিকে বলা হ'য়েছে, সেটি ত্রিদোষের উৎক্লেশক অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফের বিকৃতি দূর করে। ঐখানেই ১৪৩ শ্লোকে যমনা বা যমানী নামে যেটিকে উদ্ধৃত করা হ'য়েছে, সেটির টীকাকার তার পরিভাষায় ভূতী বা ভূতিক ব'লেছেন। এইটিই বর্তমানে বনযোয়ান বা বনযমানী নামে পরিচিত এবং সেটি শুদ্ধ পিত্তেরই উৎক্লেশক। ফারসী ভাষায় একে ফোকান্দী বলা হয়।

তাছাড়া বাগ্‌ভটের চিকিৎসাস্থানের ১৫ অধ্যায়ে এবং উত্তরতন্ত্রের ২২ অধ্যায়ে এই অজগন্ধা বা বনযোয়ান পিত্তরোগ দূরীকরণে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া আছে।

এছাড়া চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে ১৭৩ গুচ্ছে শিরোবিরেচনের ক্ষেত্রে অজমোদা নামে ঐ যোয়ানেরই আর একটি ভেদকে ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন। টীকাকার চক্রপাণি (ইনি বাঙ্গালী ছিলেন; একাদশ খৃষ্টাব্দে) ব'লেছেন—বঙ্গে "রাঁধুনীত্যাখ্যা" অর্থাৎ এটি রাঁধুনী বলে আখ্যাত।

এভিন্ন সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়েও অজমোদার প্রচলিত নাম রাঁধুনী।

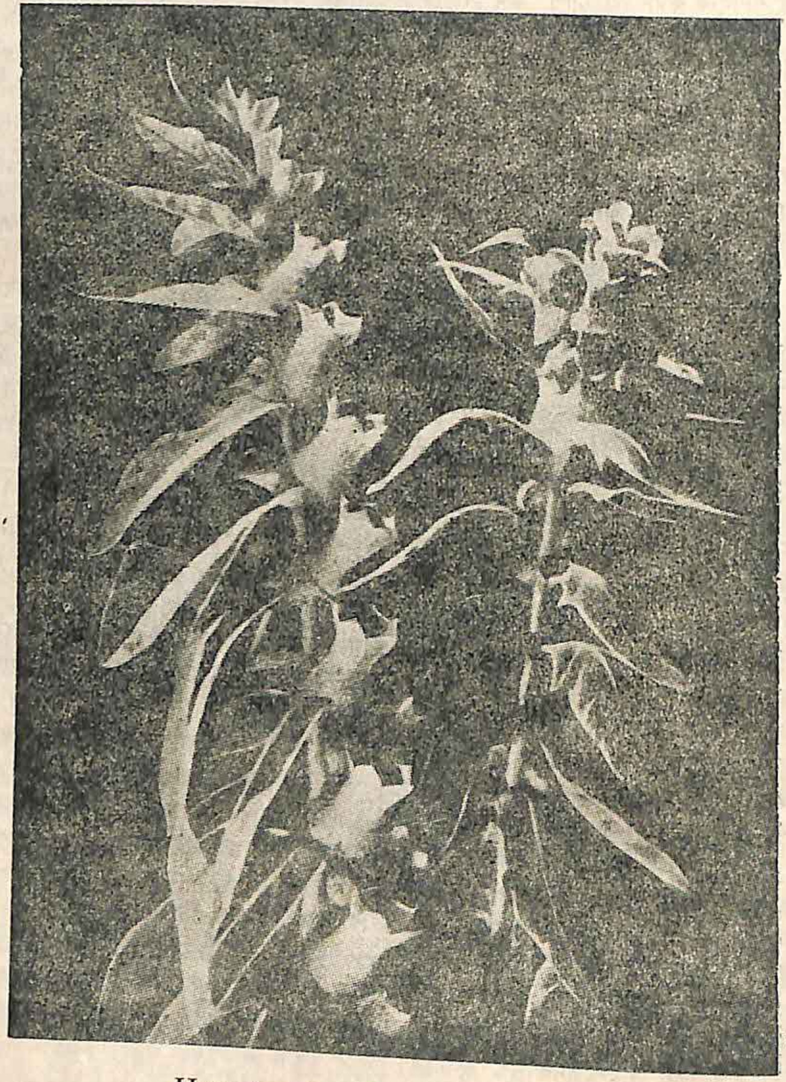
অতএব বৈদিক সূক্তের ইঙ্গিতে তিনটি প্রকারকেই কৃষিকর্ষণে উন্নত ধরনের যমনা বা যমানী, সহজ যমানী, অজমোদা; আর অজমোদা নামে যেটি সেটিও পুষ্টিদায়িকা ব'লে ধারণা করা যায়।

প্রতি যমানীকেই যেমন প্রাচীন সংহিতাকারগণ ব্যবহার ক'রে তাদের ক্ষেত্র নির্বাচন ক'রেছেন, তেমনি সংগ্রহকারগণের মধ্যেও দেখা যায়। চরকের সূত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ে অজমোদা নামে ভেষজটিকে দীপনীয় ব'লেই বর্ণনা করা হ'য়েছে। এই দীপনীয় শব্দটি সুশ্রুত সংহিতায় বিধৃত, অর্থাৎ এটি একটি সংজ্ঞা। যার অর্থ অগ্নিগুণ-ভূয়িষ্ঠ দ্রব্যই আগ্নেয়, আর সেই আগ্নেয় দ্রব্যই দীপনীয়। আরও স্পষ্ট হ'লো—আয়ুর্বেদের মধ্যে সুশ্রুত সংহিতায়—বিরেচন, বমন, সংশমন, সাংগ্রাহিক, দীপন, লেখন ও বৃংহণ—এই সাত প্রকারে ঔষধগুলির কর্ম নিরূপণ করা হয়, যেকোন দ্রব্যই এই সাত প্রকার কার্যকারিতার মধ্যে থাকে, তাদের মধ্যে দীপন কর্ম যে করে তারই নাম দীপনীয় ভেষজ। এই ভেষজে অগ্নিগুণ বাহুল্য থাকে। এমন দ্রব্যের মধ্যে পিপুল, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, ভেলা প্রভৃতি। তাদের মধ্যে যমানীও একটি—এই আগ্নেয় বা দীপনীয় ভেষজটির মধ্যে অজমোদা। এতে বায়ু ও অগ্নিশক্তি প্রধানভাবে থাকে, তার ফলে পিত্তবর্ধক। বেশী দিন ধ'রে এদের ব্যবহার ভাল নয়। তবে আমরসের বিকারে তৎপর কাজ করে। এ তথ্য সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪১ অধ্যায়ে।

আর চরকে এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য না থাকলেও অজমোদা বা যোয়ান যে দীপনীয়—এই সংক্ষেপোক্তি করা আছে, তাছাড়া চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে যমানীকে শিরোবিরেচন দ্রব্যেরও অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। এছাড়া চক্রদত্ত সংগ্রহে ও হারীতেও যমানীর প্রয়োগ ক্ষেত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

একটি জায়গায় যমানী সম্পর্কে চরক ও সুশ্রুতের মতভেদ দেখা যায়—সূত্রস্থানের

২৭ অধ্যায়ে যোয়ান সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই ভেষজটি হৃদ্য রুচিকারক এবং পিত্তের উৎক্লেশক। সুশ্রুতে যোয়ানের কথা স্পষ্টতঃ না বললেও আগ্নেয় দ্রব্যের গণে একে এনে পিত্তের বর্ধক ব'লেই গণ্য করা হ'য়েছে। তবে উভয় মতের সামঞ্জস্যবিধানে এই যুক্তি দেওয়া যায় যে, যোয়ান অপক্ক অবস্থায় পিত্তবর্ধক, কিন্তু সকলেই নয়; যার নাম ভূস্তক বা বন যোয়ান, সেটির সম্পর্কে উৎক্লেশক—এটি নিশ্চয়।



Hyoscyamus niger (পারসীক যমানী)

নব্যের সমীক্ষায়

১। যোয়ান উত্তেজক, পাচক, বায়ুনাশক, বলকারক, আক্ষেপ নিবারক, পচন নিবারক ও উষ্ণগুণ সম্পন্ন। ইহা ক্লিন্ন কদর্য ক্ষতের দুর্গন্ধও নাশ করে। যোয়ান আধ্মান (পেট

ফাঁপা), আধ্মান জনিত শূল, অগ্নিমান্দ্য ও অতিসারে ব্যবহৃত হয়। যোয়ানের ক্বাথ সেবনে আমদোষ দূর হয়। আমবাতের ফোলা ও যন্ত্রণায় যোয়ানের প্রলেপ হিতকর। যোয়ানের পুটলী গরম ক'রে শ্বাস ও কাস রোগে বক্ষদেশে এবং কলেরা রোগীর শীতলাবস্থায় হাত-পায়ে ও মূর্চ্ছায় স্বেদ দিলে উপকার দেখা যায়। অন্যান্য কষায়দ্রব্য সহযোগে গলক্ষতেও যোয়ানের ব্যবহার আছে।

২। যমানীর তৈল মালিশ আমবাতের বেদনার পক্ষে হিতকর। যোয়ানের উদ্বায়ী তেল উদরশূলে ও আধ্মানজনিত শূলে সেব্য।

৩। ইহা পশু চিকিৎসকগণ গরু ও ঘোড়ার বিবিধ ব্যাধিতে ব্যবহার করেন।

পরিচিতি

ভারতবর্ষের সর্বত্র অল্প-বিস্তর এই ক্ষুপজাতীয় গাছটির চাষ হয়ে থাকে। গাছ সাধারণতঃ ২/৩ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে ওঠে। গাছগুলি দেখতে প্রায় ধনে গাছের মত, সাদা রঙের ফুলগুলি ছত্রাকারে হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে যোয়ানের দানা মাঠে ছড়ানো হয়, পৌষ-মাঘ নাগাদ ফুল ও তৎপরে ফল হয়, বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে এর বেশি বিশেষ পরিচিতির কোন প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না।

পাশ্চাত্যমতে এটি সম্ভবতঃ ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দ নাগাত মিশর থেকে ইউরোপে এসেছিল এবং ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে (সম্ভবতঃ) লন্ডনে প্রথম ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। এ তথ্যটি পরিবেশিত হয়েছে Economic Products of India (watts) গ্রন্থখানিতে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ভুল তথ্যটি পাশ্চাত্য সংগ্রহকর্তারা কিভাবে পরিবেশন করলেন? এই যোয়ান আয়ুর্বেদে বহুকাল ধ'রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেই বেদের যুগ থেকে।

এটিকে বাংলায় যোয়ান, জোয়ান; হিন্দীতে অজোয়ান এবং সংস্কৃতে যমানী বলে। এর বোটানিক্যাল নাম Trachyspermum ammi Linn., ফ্যামিলী Umbelliferae, পূর্বে এটির নাম ছিল Carum Copticum Benth.

ব্যবহার্য অংশ—ফল।

লোকায়তিক যোগ

যোয়ান রসবহ স্রোতে প্রধানতঃ উপকার সাধন করে, তথাপি রসবহ স্রোত বা অন্যান্য স্রোতে যে বায়ু-পিত্ত-কফ ধাতুগত হ'য়ে আছে অর্থাৎ ক্রিয়ার সঞ্চালন, আগ্নেয় শক্তি এবং পুষ্টিকরত্ব, এরই নাম বায়ু পিত্ত কফ তো। পিত্ত হ'চ্ছে আগ্নেয় শক্তি। যোয়ান কাঁচা অবস্থায় কিন্তু পিত্তবর্ধক, এটা চরক এবং সুশ্রুত উভয়ের মত। এইজন্য যোয়ান ব্যবহার করার পূর্বে একটু ভেজে নিতে হয়। এ ভাজা যেন বেশী ভাজা না হয়, অল্প একটু নেড়ে, যাকে বলে চান্‌কে নিতে হয়, নইলে পিত্তবর্ধক হওয়ার জন্য আমাশয়ে গিয়ে উৎক্লেশ, যাকে বলে বমন ভাব সৃষ্টি করে। আমাশয় হ'লে ক্লেদক শ্লেষ্মার স্থান। কিন্তু ভাজা যোয়ানে তা করে না; তাই লোকায়তিক যোগগুলিতে সর্বদা ভাজা যোয়ান ব্যবহারের বিধি। সাধারণ মাত্রা ১ গ্রাম থেকে ২ গ্রাম পর্যন্ত হ'লেও ৫০০ মিলিগ্রাম প্রথমে ব্যবহার করাই ভাল।

১। **অর্শরোগে**— যে অর্শে দীর্ঘদিন থেকে রক্ত প'ড়ছে, সে রক্ত অন্তর্বলি থেকেই আসুক আর বহির্বলি থেকেই আসুক, এক্ষেত্রে ভাজা যোয়ান আধ গ্রাম ও

ভাজা কালজীরে আধ গ্রাম মাত্রায় একসঙ্গে মিশিয়ে এবেলা ওবেলা দু'বার জলসহ খেতে হবে (এই দুটিকে পৃথক পৃথক গুঁড়ো করে নিয়ে মিশিয়ে রেখে দিতে পারা যায়, তা থেকে এক মাত্রার মত নিলেও চ'লবে)। এর দ্বারা রক্তপড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে অধিকন্তু ঐ অর্শের বলিটা চুপসে যাবে।

২। **শীতপিত্ত রোগে—** বায়ু ও কফের বিকারে পিত্তের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে সর্ব শরীরে ফুস্‌কুড়ি দেখা দেবে এবং সেখানে বোল্‌তা ভীমরুলে হুল ফুটালে অথবা কাঠপিঁপড়ে কামড়ালে যেমন ফুলে ওঠে, সেই রকম ফুলে যায়। সেটা চুলকোয়, অনেক সময় তার সঙ্গে অল্প জ্বরও হয়, অবশ্য সব ক্ষেত্রে যে জ্বর হবেই এমন কথা নেই। এই চুলকানোটার প্রকৃতি দেখা যায় যে, পায়ের তলা না হয় হাত-পায়ের আঙ্গুলের ডগায় এর উপদ্রবটা বেশী; খুব ঘস্‌ঘস্‌ ক'রে চুলকোতে ইচ্ছে করে। এক্ষেত্রে বিশেষ উপকার লক্ষ্য করা যাবে—পুরনো আখের (ইক্ষু) গুড়ের সঙ্গে একটু যোয়ান বাটা মিশিয়ে দিনে ২/৩ বার খেতে হবে। একদিনেই চুলকণা, ফুলো সবই ক'মে যাবে। তারপর ২/৩ দিন একবার ক'রে খেতে হয়। তবে দাস্ত পরিস্কার রাখাটা এক্ষেত্রে বিশেষ দরকার আর চাপা অম্বল (অম্ল) যেন না হয়।

৩। **কোষ্ঠগত ক্রিমি রোগে—** যাঁদের মাঝে মাঝে উকি ওঠে অর্থাৎ গলা বেয়ে ওঠে, মুখ দিয়ে নুন (লবণ) জল ওঠা; বা বমি ভাব হওয়া, বিশেষ ক'রে শিশু বা বালকদের এই ঝঞ্ঝাট এসে যায়। এক্ষেত্রে বাসি জলের সঙ্গে অর্থাৎ পূর্বদিন ধরা জলের সঙ্গে যোয়ান বাটা গুলে খাইয়ে দিলে ২/৪ দিন পর থেকে মলদ্বার চুলকোয় না এবং উকি তোলা বা বমনভাব হওয়া এবং গলা বেয়ে নুনজল ওঠা সব বন্ধ হ'য়ে যায়। এই যোয়ান বনযোয়ান ব্যবহার করাই শ্রেয়।

৪। **দম্‌কা দাস্তে—** দেখা যায় দুই/এক বার দাস্ত হওয়ার পর বমিও আরম্ভ হয়েছে, এমন অবস্থা যেন কলেরার উপক্রম; এক্ষেত্রে ২ গ্রাম যোয়ান বেটে বরফের জলে গুলে, সেটাকে ছেঁকে ঐ জলটা সারাদিনে ৩/৪ বার খাওয়ালে এই দাস্ত ও বমি দুটিই সামলে দেবে।

৫। **উদাবর্ত রোগে—** খুব আওয়াজ ক'রে এঁদের ঢেকুর ওঠে, আবার কিছু খেলেটেলে ক'মে যায়। এই রোগে ভাজা যোয়ানকে গুঁড়ো ক'রে কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে গুঁড়োগুলি জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে সেই যোয়ানের গুঁড়ো মিশ্রিত জলকে নেড়ে নিয়ে অল্প অল্প ক'রে দিনের মধ্যে ৩/৪ বারে খেতে হবে। এর দ্বারা কয়েকদিনের মধ্যে এটির উপশম হবে; তবে ২/৩ সপ্তাহ ব্যবহার ক'রলে নিরাময় হ'তে দেখা গিয়েছে। তবে একটা ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যে, বিবাহিত যুবতী মেয়েদের, যাঁদের সন্তানাদি হয়নি অথবা একটি হ'য়েছে, তাঁদের কিন্তু যোয়ান খাওয়ানোটা (লোক পরম্পরায় জানা) নিষেধ করা হ'য়েছে।

৬। **পেট ফাঁপায়—** পেট ফাঁপা অনেক কারণেই হয়, পাকাশয়ে অগ্নিবল কমে গেলে হয়, আমাশয়ে কুটিল বায়ু প্রবেশ ক'রে আমযুক্ত হ'লেও হয়। এক্ষেত্রে যোয়ান বাটা জল খেলে পেট ফাঁপাটা ক'মে যায়।

৭। **অজীর্ণজনিত পেটের ব্যথায়—** অজীর্ণজনিত পেটে ব্যথার কারণ হ'চ্ছে—রসটা পক্বাশয়ে এসে সেটা পরিপাক হ'চ্ছে না, এমতাবস্থায় লোভ বশতঃই হোক আর অনিচ্ছা সত্ত্বেই হোক, পুনরায় খাওয়া, তখন অগ্নিবল কম থাকায় সে আর হজম হয় না, তখন মন্দ মন্দ কুন্‌কুনে ব্যথা—তার মানে আমগত বায়ু আবদ্ধ হ'য়ে গেছে, আবৃত বায়ুর সঞ্চরণশালিতা নষ্ট হ'য়ে গেছে; যাকে বলা যায় আমরস কর্তৃক বায়ু অবরুদ্ধ

হ'য়েছে, এক্ষেত্রে যোয়ানবাটা জলে গুলে তাকে ছেঁকে (অথবা না ছেঁকেও) খেলে বায়ুটা ক'মে যাবে, আর এটা ক'মে গেলে ব্যথাটাও ক'মে যাবে।

৮। **মূত্র রোধে—** মূত্র রোধ এক কারণে হয় না তো, মূত্রের গ্রন্থি (Prostate gland) স্ফীত হ'লেও মূত্ররোধ, আবার অর্শের বলি শক্ত হ'লেও মূত্র রোধ, অর্থাৎ গুহ্যস্থানের শোথে অপানবায়ু যখন আবদ্ধ হয় প্রায় ক্ষেত্রেই এই মূত্ররোধের হেতু থাকে। অনেকক্ষণ চেপে ব'সে থাকলেও মূত্ররোধ, কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে মূত্ররোধ হয় না, তার মানে হ'চ্ছে—আমাদের গুহ্যস্থানে যে অপানবায়ু চলে সেটা রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। সেই ক্ষেত্রে যোয়ান বাটা খেলে মূত্রের বেগ আসবে।

৯। **মূর্চ্ছা রোগে—** এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদ আলোচনা করা হ'য়েছে। সেই ক্ষেত্রে নিত্য যোয়ান বাটা (পরিমাণ মত) খাওয়ালে ও রোগটা আর আক্রমণ করে না। এমন কি ওই রোগের আক্রমণের সময়ে যদি কোন রকমে ওই যোয়ান বাটা জলে গুলে, সেটাকে ছেঁকে ঐ জলটা খাওয়ানো যায়, তা'হলে ওটা দূর হয়।

১০। **পুরাতন কাসিতে—** এর সঙ্গে চট্‌চটে শ্লেষ্মা মাঝে মাঝে অল্প অল্প ওঠে, সেক্ষেত্রে ভাজা যোয়ান গরম জলে বেটে অল্প অল্প ক'রে যদি বার বার খাওয়ানো যায়, (অন্ততঃ এক/দেড় ঘণ্টা অন্তর) তাহ'লে ওই চট্‌চটে শ্লেষ্মাটা ক'মে যাবে, এবং কাসিটাও ক'মে যাবে। তবে এটা দেখা গেছে এই চট্‌চটে শ্বেষ্মাটা এলার্জিজনিত কাসি হ'লে তবেই এটা হ'য়ে থাকে।

১১। **বমিতে—** যে বমি বিষজন্য হয় অর্থাৎ আরশোলা খাওয়া, মাছি খাওয়া, ইঁদুরের নাদি (বিষ্ঠা) মুখে গিয়ে বমি হওয়া অথবা কোন অতৃপ্তির কারণে বমি হ'তে থাকলে অল্প ভাজা যোয়ান বেটে জলে গুলে খাওয়ালে বমি বন্ধ হ'য়ে যাবে।

১২। **ঘুম পাড়াতে—** হাতের কাছে কোন কিছু নেই অথচ ঘুম হয় না বা হ'তে চায় না, একথা পূর্বেই বলা হ'য়েছে যে, রসবহ স্রোত, এর মূল তো হৃদয়ে, যদি কোন প্রকারে তাতে অগ্নিবল কম থাকে, বায়ু অত্যন্ত কুপিত হ'য়ে ব্যাকুল হয় অথবা বায়ু যদি অন্য কারণে ব্যাকুল হয় তার জন্যও অগ্নিবল ক'মে যায়, তখনও ঘুম আসে না। সে সময় আহারের পর যোয়ান বাটার জল কয়েকদিন খাওয়ার অভ্যাস ক'রতে হয়, শরীরে বায়ুর ব্যাকুলতা কমে যাবে এবং ঘুমও আসবে।

১৩। **রজঃ কৃচ্ছ্রতায়—** মাসিক হ'লেও অল্প হয় এবং ঝির্‌ঝির্ ক'রে হয়, থেমে গিয়ে আবার হয়তো কয়েকদিন বাদে দেখা গেল, এইরকম অবস্থায় যোয়ান বাটা খেলে, ভাল হয়ে যাবে। যাঁদের অল্প মাসিক হয়, তার সঙ্গে কটিতে (কোমরে) এক ধরনের কুনকুনুনি ব্যথা এবং জননেন্দ্রিয়ের মূলেও একটি যন্ত্রণা থাকে, (অবশ্য যাঁদের ঋতুস্রাব প্রচুর পরিমাণে হয় তাঁদের যন্ত্রণা পৃথক ধরনের। এক্ষেত্রে যোয়ান বাটা জলে গুলে খেলে ব্যথা বেদনা ক'মে যাবে, মাসিকটাও বিকাশ হবে তবে এটা গরম-জলের সঙ্গে খেতে হবে।

বাহ্য ব্যবহার

১৪। **যে কোন পচা ঘায়ে—** যোয়ান বাটার প্রলেপ কিংবা যোয়ান চূর্ণ ঐ ঘায়ে ছড়িয়ে দিলেই চ'লবে। এটাতে ঘায়ের পচনটা প্রথমেই বন্ধ হবে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ঘায়ে কোন কীটের জন্ম হবে না।

১৫। আর একটি কথা, এই যোয়ান সম্পর্কে হারীত সংহিতায় বলা হ'য়েছে—দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত প'ড়তে থাকলে যোয়ান বেটে দাঁতের গোড়ায় খানিকক্ষণ লাগিয়ে

রাখতে হবে, তারপর **১০/১৫ মিনিট বাদ** যোয়ানের ক্বাথ ক'রে ঐ ক্বাথ দিয়ে গরগরা (gargle) ক'রতে হবে। আর তাতেও যদি রক্তপড়া বন্ধ না হয় তাহ'লে যোয়ান বাটা ক্ষণিকক্ষণের জন্য লাগিয়ে রাখতে হবে।

১৬। গলশুণ্ডিকা রোগে— একে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ লেরিনজাইটিস্ ব'লে থাকেন। আর সাধারণে ব'লে থাকেন আল্‌জিভ বেড়েছে। আয়ুর্বেদ মতে এটি শ্লেষ্মা ও রক্তবিকার জন্যে জন্ম নেয়, ওটা তালুমূলেই হয়। এটা কিন্তু উপেক্ষা করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে যোয়ান বেটে গুলি পাকিয়ে মুখে রাখতে ব'লেছেন, তাতে আল্‌জিভ বৃদ্ধিজনিত যে খুস্‌খুসুনি কাসি হয়, অর্থাৎ আল্‌জিভটা বেড়ে গেলে ওখানকার বায়ুটা স্বাভাবিক থাকে না বলেই কাসি হ'তে থাকে (অবশ্য এ কাসির কারণ বায়ুটা সরল না থাকা জনিত) উপরিউক্ত মুষ্টিযোগটি ক'রলে গলরোগটির উপশম হয়।

যমানী লেখার শেষে মনে মনে বেদসূক্তকে গিলিত চর্বণ ক'রতে ক'রতে ভাবছি, এ যেন বৈদ্যের ত্রিশঙ্কু অবস্থা হ'য়ে গেল। যখন হাল্কা রসে ভাবি তখন দেখছি, "বীর্য্যের দ্বারা তুমি সংযমন করো", এ কি রকম হ'লো? আবার দেখছি "তুমি অগ্নিসমা ধারকা হও" তাহ'লে তুমি কি বায়ুকে ছেড়ে দাও? না টেনে ধরো?

বৈদ্য এখন তোমায় বুঝতে না পেরে যমের দোসর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাই না লোকে ঠাট্টা করে বলে—

বৈদ্যরাজ! নমস্তুভ্যং যমজ্যেষ্ঠ সহোদরঃ।
যমঃ সংহরতি প্রাণান্ ত্বং তু প্রাণান্ ধনানিচ॥

এটির অর্থ হ'চ্ছে—ওহে বৈদ্যরাজ! তোমায় নমস্কার, কারণ মর্ত্যলোকে তুমি যমের সহোদর। যম শুধু প্রাণটুকুই নিয়ে যান, আর তুমি প্রাণ তো নাওই, সঙ্গে ধনও নাও। যা যমেও পারে না। খুড়ো কিন্তু বলতো—সব শেয়ালেরই এক ডাক।

CHEMICAL COMPOSITION

Trachyspermum roxburghianum

1. Essential oil :— (a) d-limonene, (b) ∝-terpinene, (c) dipentene, (d) d-linalool, (e) terpeneol, (f) dl-piperitone (g) thymoquinol, (h) thymol, (i) ketonic acid.

Seseli indicum W & A

Neutral unsaturated lactone 1.3%; furocoumarin 0.6%; Essential oil 2.5% (β-cyclolavendulic, d-limonene, seselin, bergaptene, iso-valeric acid and selinene); fatty acids 20% (palmitic, petroselinic, oleic, linoleic, and resin acids); unsaponin matter 18.5%; and ses-quiterpenes and its alcohol.

Hyoscyamus niger Linn.

Analysis of roots, leaves, flowering tops and seeds :— Alkaloids (henbane, hyoscyamine, hyoscine, tropine, scopolin, atropine,

scopolamine and hyoscypikrin). Analysis of seeds :— Fatty acids 2.6% (myristic, palmitic, stearic, oleic and linoleic); unsaponifiable matter (Phytosterol); gum 6.2% and resins. In leaves and flowering tops :— A bitter glycoside (hyoscypicrin, choline, mucilage and albumin).

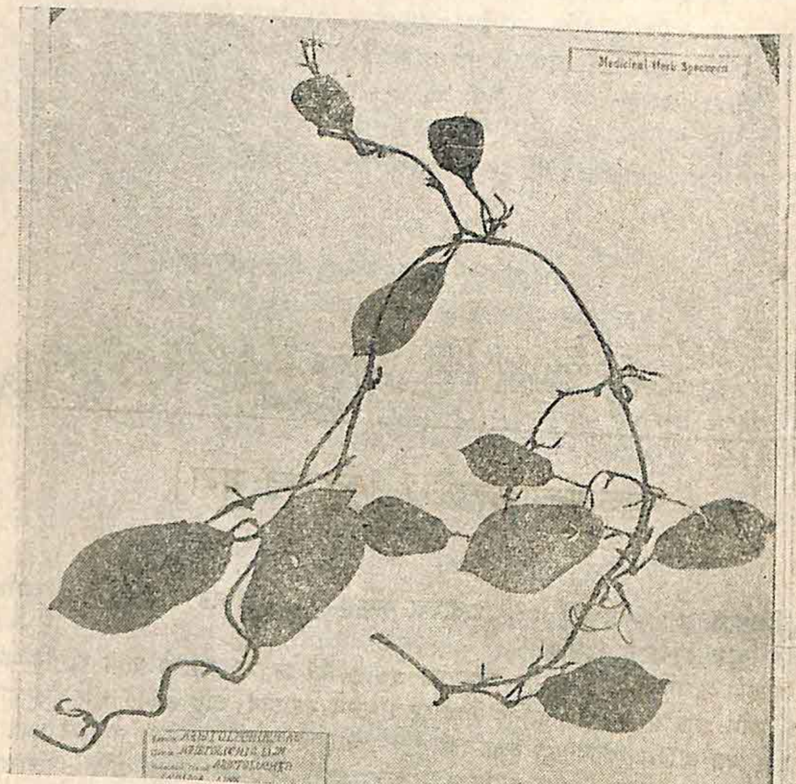
রুদ্রজটা [ঈশের মূল]

ক্ষেত্র বিশেষে লোক-শাসানী কথা, "তোমার বাবার বিয়ে দেখিয়ে দেবো", আজ আমি "বাবার বিয়ে দেখাতে বসেছি"—

আচ্ছা, আপনিও তো জানেন আমাদের ৩৩ কোটি দেবতা, তাঁদের মধ্যে আবার সব থেকে যিনি প্রাচীন তাঁর পৌরাণিক নাম দেবাদিদেব মহাদেব, তাঁর একটি পরিচিত নাম শিব। এঁদের জীবন আচরণকে বলা হয় লীলা, তাকেই অবলম্বন ক'রে সংস্কৃত ভাষায় কত কাব্য-কাহিনী রচনা করা হ'য়েছে, আবার তাকে অনুসরণ ক'রে প্রতি প্রদেশের প্রধান প্রধান প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত কাব্যই দেশীয় কাব্য। তার উৎস আমাদের দুটি প্রধান মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত, এবং সেই সংকলনকালের হয়তো বা সমসাময়িক কিংবা পরেই বা হবে অষ্টাদশ পুরাণ। আর এক স্তরে ভাগবত। এটাও তো আমরা দেখতে পাই যে, এক এক জন কবি এক এক রসে ডুবে মূলগ্রন্থের বক্তব্যকে রঙের উপর রসান চড়িয়ে আখ্যান সৃষ্টি ক'রেছেন। সেইসব বিষয়কে রূপক সৃষ্টি করে সব দেবদেবীর লীলা প্রচার করা হ'য়েছে। উপরিউক্ত গাছটির গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে শিবপুরাণের একটি কাহিনীকে টানতে হ'চ্ছে। সেটা হ'লো উমার সঙ্গে শিবের বিয়ে।

তখনকার যুগের একটা টেক্‌নিক্‌ই ছিল, বিশেষ বিশেষ গুণান্বিত ভেষজের গুণবর্ণনাটা রূপকচ্ছলে লেখা। শিবপুরাণোক্ত মূল সংস্কৃত থেকে বাংলা সাহিত্যের চলিত আমলের কবি ভারতচন্দ্রের কলমে (ইনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন) গিরিকন্যা উমার সাথে শিবের বিয়ের ঘটনাটা যেটা লেখা হ'য়েছে, তাঁর "অন্নদামঙ্গল কাব্যে" সেটা হ'লো—

এরূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা।
স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা॥
কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে।
নারদেরে কহিলা কোন্দল লাগাইতে॥



এদিকে গারুড়ী বৈদ্যে ইঙ্গিত দেখাইতে।
ঈশের মূল দিয়া কহেন সাপ খেদাইতে॥
বরের সম্মুখে মাত্র মেনকা আইলা।
পলাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা॥
ঈশের মূল হাতে বৈদ্য উত্তরিল গিয়া।
মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া॥

বাঘছাল খসিয়া উলঙ্গ হইল হর।
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর॥
মেনকা দেখিয়া চেয়ে জামাই লেংগটা
প্রদীপ নিবায়ে দেয় টানিয়া ঘোমটা॥
দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়
শিব ভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়॥
(এর পর আরও অনেক আছে)।

যাক, উপরিউক্ত কাব্য গাথাটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলার ভাষা কাব্যের গোড়ার দিকের অবস্থাটা কি ছিল। আর দেখতে পাচ্ছি "রুদ্রজটা" মূল যাকে ঈশ্বরীমূল বলা হয়, যার দেশপ্রচলিত নাম "ঈশের মূল", তার দ্বারা সাপকে বশীভূত করা যে যায়, সেটাই একটা উপাখ্যানের মাধ্যমে প্রচার করা; উদ্দেশ্য এটা জনমনে গেঁথেও থাকবে।

তাহ'লে ঘটনাটা দাঁড়ালো এই যে—গিরিকন্যা উমার সঙ্গে শিবের বিবাহের সময় উমার মা মেনকা এয়োদের সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী আচার ক'রতে গিয়ে দেখতে পান—কোমরে বাঘছাল জড়ানো, আর তার কোমরবন্দ্ (বেল্ট) হ'লো সাপ, তাই দেখে আঁতকে উঠে ভয়ে সেখান থেকে সব এয়ো পালাতে গেলে গারুড়ী বৈদ্য (এখনকার কালের সাপের রোঝা বা ওঝা) এসে ঈশের মূল, যার সংস্কৃত নাম রুদ্রজটা, বরণডালায় রাখাতে সাপগুলি সড়্‌সড়্ করে কোমর থেকে নেমে যেতেই বাঘছালটা খ'সে প'ড়ে গেল। বর উলঙ্গ দেখেই এয়োরা ঘোমটা টেনে দিলেন। প্রবাদ—সেই থেকেই নাকি নারীর ঘোমটার প্রচলন হ'লো। তাই কি বাংলায় সনাতনী পদ্ধতিতে বিয়েতে সিঁথিতে সিন্দুর পরানোর পর ঘোমটা দেওয়ার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান করার বিধানটা পুরোহিততন্ত্রের বিধান?

বক্তব্যে রূপক যাই থাক, তার বাস্তবটা কি? এটা অনুশীলন করার জন্য আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তার অনুমতি নিয়ে সাপের কেয়ার টেকারকে (Care taker) সঙ্গে ক'রে নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, এর মূলের গন্ধে সাপ মাথা উঁচু ক'রতে চায় না, এমনকি এই লতাগাছের পাতা রগড়ালে তার গন্ধ বাতাসে ব্যাপ্ত হ'য়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাপের অনুভূতি হয়, তাই তাদের ফনা আর তুলতে চায় না, সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে; তাই দেশগাঁয়ে সাপ বাড়িতে না ঢোকে তারই প্রতিরোধক হিসেবে ঈশের মূলের গাছ বাড়ির বেড়ার ধারে লাগিয়ে রাখে আর যারা সাপ ধরে আমরা তাদের বলি "বেদে", সংস্কৃতে বলা হয় অহিতুণ্ডিক। এরা ঈশের মূল সঙ্গে রাখে—এইরূপ প্রচার, তবে তারা কোন কথা বলতে চায় না।

বৈদ্যকের নথি

আমাদের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ চরক বা সুশ্রুতে এই নামে কোন ভেষজের উল্লেখ দেখা যায় না, অন্য নামে সেটা উল্লেখিত হয়েছে কিনা সেটা বলা মুশকিল। তবে ১৫দশ শতকে সংকলিত রাজনিঘণ্টুতে (এটি কাশ্মীরবাসী নরহরি রচিত) ঈশ্বরী নামের উল্লেখ—এবং এর পর্যায় নাম আরও ১৭টি দেওয়া হ'য়েছে। সেই শ্লোকটি হ'লো—

রৌদ্রীজটা রুদ্রজটা চ রুদ্রা
সৌম্যা সুগন্ধা সুহতা ঘনাচ।
স্যাদীশ্বরী রুদ্রলতা সুপত্রা
সুগন্ধপত্রা সুরভিঃ শিবাহ্বা॥

পত্রবল্লী জটাবল্লী রুদ্রাণী নেত্রপুষ্করা
মহাজটা জটারুদ্রা নাম্না বিংশতিরীরিতা॥
জটা কটুরসা শ্বাস কাস হৃদ্‌রোগ নাশিনী।
ভূতবিদ্রাবিনী চৈব রক্ষসাঞ্চ নিবর্হিনী॥

(গুড়ুচ্যাদিবর্গ)

এটির অনুবাদ হ'লো—রৌদ্রী, রুদ্রজটা, রুদ্রা, জটা, সৌম্যা, সুগন্ধা, সুহতা, ঘনা, রুদ্রলতা, সুপত্রা, সুগন্ধপত্রা, সুরভিঃ, শিবা, পত্রবল্লী, জটাবল্লী, রুদ্রাণী, নেত্রপুষ্করা, মহাজটা ও জটারুদ্রা।

এইভাবে নামপর্যায়গুলির মধ্যে বাংলাভাষায় এবং হিন্দীতে ঈশের মূল, ঈশেন মূল এই দুটি নাম লোকপ্রচলিত, আর তেলেগু, তামিল, মালায়ালামের ভাষায় প্রায় সম নাম, এর সঙ্গে আরও উল্লেখিত যে—এই ভেষজটি শ্বাস-কাসে এবং হৃদরোগে ব্যবহার্য। বলা হ'য়েছে এটি ব্যক্তরস হিসেবে তিক্ত সম্পন্না অর্থাৎ বায়বীয় শক্তি এবং আকাশীয় শক্তি সম্পন্ন। আর একটু অনুশীলন ক'রলে পাওয়া যায়, যেহেতু শীত ঋতুতেই আকাশীয় ও আগ্নেয় শক্তির বৃদ্ধি হয়, সেইহেতু বলা যায় এই ভেষজটি রুক্ষ শীত এবং লঘুগুণ সম্পন্ন; অতএব স্বভাবতই ইন্দ্রিয় উত্তেজক, এবং কফবিকার দূর করে। আর দোষ সৃষ্টি করে, ধাতু শক্তির লেখন ক'রে, যার ফলে শরীরকে কৃশ করে। অবশ্য সেটা বেশী ব্যবহার ক'রলে, যেহেতু আকাশীয় ও আগ্নেয় শক্তিটি ওর স্বাভাবিক, তার ফলে এই ভেষজটিকে মূত্র সংগ্রহণীয় অর্থাৎ সোমরোগের ক্ষেত্রে বা বহুমূত্র রোগে একে খুব নিরাপদেই ব্যবহার করা চলে। এই দৃষ্টিতে ঈশের মূল গবেষণার যোগ্য।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণ—ইহা তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট, শক্তিদায়ক, বলকারক, গর্ভনাশক ও বিষহারক। মূল ঝাঁঝালো ও তিক্তরসযুক্ত, বলকারক, রজোনিঃসারক, ত্রিদোষের প্রশমক ও বমনকারক।

ঔষধার্থ প্রয়োগ— এর পাতার রস সাপের কামড়ে বিষ নাশার্থ ব্যবহৃত হয়।

বীজ—শুকনো কাসে, প্রদাহে, পিত্তবিকৃতিতে, গাঁটের ব্যথায় ও বিরেচনের ক্ষেত্রে প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

মূল—আয়ুর্বেদ মতে শিশুদের পেটের রোগে হিতকর। এভিন্ন উক্ত মূল কোন কোন প্রদেশে বাতব্যাধিতে ও গর্ভনাশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তামিলদেশের চিকিৎসকেরা এর মূল চূর্ণ মধুসহ পেষণপূর্বক ম্যালেরিয়া জ্বরে ও শ্বিত্ররোগে সেবনের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। এতে উক্ত রোগের প্রশমন হয়ে থাকে।

পরিচিতি

লতানে গুল্ম, এরা মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে বাড়ে, বেড়া বা গাছে যে ওঠে না তা নয়। কাণ্ডের গোড়া খুব শক্ত। পাতার অগ্রভাগ সরু কিন্তু মাঝখানটায় একটু চাপা। বোঁটা ⅓—½ ইঞ্চি লম্বা ও বাঁকা। পুষ্পনলের গঠন অনেকটা শাবলের মত, অগ্রভাগ বক্র ও ঈষৎ ধূসর বর্ণ। ফুল ১ ইঞ্চি লম্বা ও সবুজ বর্ণের, বীজকোষ গোলাকার কিন্তু খাঁজ কাটা। বীজ চ্যাপ্টা ত্রিকোণাকার ও পক্ষযুক্ত। সাধারণতঃ বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। এই লতগাছটি ভারতের সব অঞ্চলেই অল্প-বিস্তর

পাওয়া যায়। এর সংস্কৃত নাম রুদ্রজটা, বাংলা ও হিন্দীতে ঈশের মূল নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Aristolochia indica Linn. ফ্যামিলি Aristolochiaceae.

ব্যবহার্য অংশ—পাতা ও মূল।

লোকায়তিক যোগ

এটি প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ এবং রক্তবহ স্রোতে।

১। **কম্পজ্বরে—** এটা অনেক কারণে হ'তে পারে—যেমন ম্যালেরিয়া জ্বরে, ফাইলেরিয়ায়, প্রচণ্ড রোদ (রৌদ্র) থেকে এসে ঠাণ্ডা জলে স্নান, হঠাৎ কোন কারণে অতিসার হ'য়েছে, অথচ তার নিবৃত্তি হয়নি, সেই অবস্থায় ঠাণ্ডা জলে স্নান, ঠাণ্ডা লাগানো, আবার দীর্ঘদিন ভুগতে থাকলে অথবা বৃদ্ধ বয়সে কিম্বা যেকোন বয়সে রক্তের জোর ক'মে গেলে যদি হঠাৎ ঠাণ্ডা জল গায়ে পায়ে লাগে তাতেও কাঁপুনি আসে, এভিন্ন অত্যধিক ক্রোধে মাথায় রক্তের চাপ হওয়া, এইসব কারণেও কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে থাকে। এক্ষেত্রে ৫০০ মিলিগ্রাম ঈশের মূল চূর্ণ আধ কাপ গরম জলে ভিজিয়ে ২ ঘণ্টা বাদ সেটাকে ছেঁকে ওই জলটা সকালের দিকে একবার এবং বৈকালের দিকেও আর একবার খেলে ওই কম্পজ্বরের শান্তি হয়। প্রথম দুই/একদিন ওই জলটাকে দু'বারে খেতে হবে, তারপর ওই মাত্রায় দু'বার খাওয়া চলে।

২। **অজীর্ণ দোষে—** সে যে কোন প্রকারেরই হোক না, পেটের ব্যথায় ৫০০ মিলিগ্রাম মূল চূর্ণ অল্প গরম জল সহ খেলে ব্যথাটার উপশম হবে। আর কয়েকদিন এটা ব্যবহার ক'রে অজীর্ণদোষের শান্তি হবে।

৩। **প্রবল সর্দিতে** (শিশুদের)— যেক্ষেত্রে জ্বর নেই অথচ নাক বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, শ্বাসকষ্ট হ'চ্ছে, পায়খানা ক'রছে না, যা খাওয়ানো হ'চ্ছে সবই বমি ক'রে ফেলছে, সেক্ষেত্রে এর পাতার রস ২/৩ ফোঁটা একটু দুধের সঙ্গে খাওয়ালে বমি ক'রে ওটাকে তুলে দেয়। এই মাত্রায় ৪/৫ ঘণ্টা বাদ আরও একবার দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হ'লো—পূর্ব পূর্ব আচার্যগণ এটা ব্যবহার ক'রতেন, তবে তাঁদের বহু অভিজ্ঞতায় বয়েস হিসেবে মাত্রা ঠিক ক'রে দিতেন' শুধু তাই নয়, শিশুর বলাবলও বিবেচনা ক'রে এটা প্রয়োগ করার ব্যবস্থা দিতেন, সুতরাং কোন চিকিৎসকের নির্দেশ না পেলে শিশুর ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করা সমীচীন হবে না।

৪। **উদরাময়ে** (শিশুদের)— অনেক ক্ষেত্রে দাঁত ওঠার পূর্বে এদের পেটের দোষ হয়, কারও কারও জ্বরও হয়, পিচকারি দিয়ে পায়খানা ক'রতে থাকে, এর ফলে চোখ মুখ ব'সে যায়, সেই সময় মূল চূর্ণ ৫০ থেকে ১০০ মিলিগ্রাম জলসহ সকালে ও বৈকালে দুবার খাওয়াতে হবে। এইভাবে ২/৩ দিন খাওয়ালে ওই অসুবিধেটা আর থাকবে না।

৫। **হাঁপানিতে—** এ রোগের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে এ রোগ সম্পর্কে বহুবার বলা হ'য়েছে। এই রোগে কিছুদিন ভুগতে ভুগতে এর সঙ্গে আসে হৃদ্‌রোগ। এ আর যেতে চায় না তখন দুটোকেই সামলাতে হয়, এক্ষেত্রে ঈশের মূল চূর্ণ ২৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় জলসহ খেলে হাঁপের টানটা কমে যায়। মূল না থাকলে পাতা চূর্ণ দিলেও উপকার হয়। তবে এটা বলে রাখি, যে রোগ জন্মসূত্রে এসেছে তাকে কি আর হটানো যাবে? উপশম হবে, ভালও থাকবেন কিন্তু নির্মূল হ'য়ে সারে কি? অবশ্য এখনও পর্যন্ত একে শাসন করা যায়নি।

৬। **সর্পাঘাতে—** রুদ্রজটার পাতা ও মূল বেটে দষ্টস্থানে প্রলেপ দেওয়ার রেওয়া আছে, এই পর্যন্ত ব'লতে পারি।

রুদ্রজটা লেখা শেষ হ'লো—

সবই লিখলাম শিবপুরাণের কাহিনীকে সামনে রেখে।

আচ্ছা, আপনি পৌরাণিক যুগের এই সিদ্ধি আর গাঁজার ক'ল্কে ফেলে রে আর একটু এগিয়ে যান, দেখবেন শিব তখন জড়বস্তুতে পরিব্যাপ্ত হ'য়েছেন, আর সতীও সমস্ত গতিশীলা প্রকৃতিতে এগিয়ে চ'লেছেন, সবেরই অন্তরে শিব আর জাগতি বিবর্তনে শক্তির উদ্ভব।

তাহ'লে এই রুদ্রজটা শিবের বিয়েতে এনে আমাদের মত গাঁজাখোরকে কি বোঝানো হয়নি?

সকলেই যখন নেশায় বুঁদ হ'য়ে আছি তখন কে কাকে দ্যাখে, তাই তো আমরা বস্তুর উপাসক।

CHEMICAL COMPOSITION

Aristolochia indica

1. Aristolochin (Alkaloid). 2. Isoaristolochic acid (a yellow bitter principle). 3. Allantoin. 4. Essential oil 0.5% composed of (a) Sesquiterpenoid compounds. (b) Camphor.

জাতিফল [জায়ফল]

জাতিফলকে নিয়ে কিছু আলোচনা ক'রতে ব'সেই মনে প'ড়ে গেল ফেলে-আসা সমাজের এক শ্রাদ্ধবাসরে পণ্ডিত সভার লড়াই—

বহুদিন থেকেই তো পুরোহিততন্ত্র আমাদের সমাজকে শাসন ক'রে আসছে, আর তারই বিধানে প্রেতের অক্ষয় স্বর্গলাভের জন্য শ্রাদ্ধবাসরে পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে বিদায় দেওয়া (মান্য দক্ষিণা) একটা বিশেষ অনুষ্ঠান; সেই হিসেবেই নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা। সেটা অবশ্য আজও যে হয় না তা নয়, তবে তখনকার মত এখন আর পণ্ডিতী সভা হয় না।

ব'লছি কি, সেই সভায় বিদ্বান পণ্ডিত মহাশয়রা যেমন আসতেন, আবার গাঁয়ের আধা-পণ্ডিতরাও যে নিমন্ত্রণ পেতেন না তা নয় (ওটা অধ্যক্ষের অনুগ্রহেই)। তখনকার সেই বিদায়ের নিমন্ত্রণের সভায় ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতির একটা বিষয় নিয়ে কূটতর্কের অবতারণা করার রেওয়াজ ছিল। উদ্দেশ্য হ'লো, নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করা, অতএব গৌণ হয়ে থাকতে কে কাকে ঠেকাতে পারে। সেই রকম একটা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পণ্ডিত বিদায়ের সভায় ঝড় উঠেছিলো এই "জাতিফলকে" কেন্দ্র ক'রে।

পঞ্জিকার মহাবিষুব সংক্রান্তির বুড়োর মত চেহারার গেঁয়ো পণ্ডিত রামধন তর্ক-চঞ্চু একটা শেলাক আওড়ে ব'ললেন—

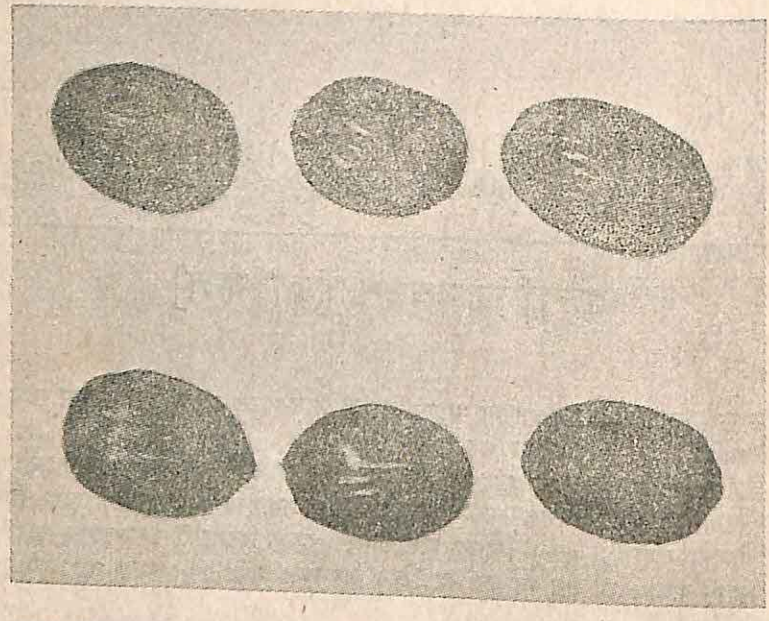
তিলং চ সর্ষপং চৈব উভৌহি তৈল কারণম্।
শ্রাদ্ধে তিলস্য দরকারং সর্ষপো নো কি কারণে?

তারই সমগোত্রীয় (বিদ্যায়) আর একজন উত্তর দিয়ে তাকে খণ্ডন ক'রলেন—

"ঢোলকশ্চৈব ঢাকশ্চ উভৌহি বাদ্য কারণম্।
বিবাহে ঢোল দরকারং ঢাকো নাস্তি যে কারণে॥"

আসল কথা, এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় হ'লো, তিল থেকেও তেল হয়, আর সরষে থেকেও হয়, উভয়েরই তো তেল আছে, কিন্তু শ্রাদ্ধে তিলের প্রয়োজন কিন্তু স'রষে কেন নয়?

আর দ্বিতীয় শ্লোকে তিনি যে খণ্ডন ক'রেছেন, তার অর্থ হ'লো, ঢোল এবং ঢাক দুই-ই তো বাদ্যযন্ত্র, কিন্তু বিয়েতে ঢোলের দরকার হয়; কিন্তু ঢাকের তো দরকার হয় না এটা যে কারণে; এখানেও তাই।



এখন কথা হ'লো, এসব সভায় সংস্কৃতেই উত্তর-প্রত্যুত্তর হ'তো, সুতরাং শুদ্ধ হোক আর অশুদ্ধই হোক, তাতে অনুস্বরের বহর লাগাতেই হ'তো।

এটা পূর্বেই ব'লেছি যে, পাঁচফুলের সাজির মত পণ্ডিত বিদায়ের আসর; এখানে যেমন গোলাপ যূঁইও আছে, আবার পলাশ শিমুলও আছে, তাই এবার গোলাপ যূঁই-এর মত একজনের মুখ থেকে বেরুলো—

দ্বিজো বিপ্রঃ দ্বিজঃপক্ষী দ্বিজোদন্তশ্চ চন্দ্রমা।
তথা জাতির্ভবেৎ ভিন্না ফলে সর্পে চ ব্রাহ্মণে॥

তখন তিনি ব'ললেন, কোথাও রূঢ়ি অর্থ, কোথাও বা প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে অর্থ বের ক'রে নিতে হয়, তাইতো একই দ্বিজ শব্দ, তার অর্থ বিপ্রও হয়; যেহেতু উপনয়ন সংস্কারের পরই ব্রাহ্মণকে দ্বিজ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হ'য়ে থাকে। সেই রকম পক্ষীও; যেহেতু একবার ডিম, তারপর তার বাচ্চা। কেন? দাঁত, একবার প'ড়ে তারপর

তো উঠে থাকে, তাই তো দাঁতও দ্বিজ; আর আপাতঃ দৃষ্টিতে অমাবস্যা পূর্ণিমায় চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধি হয় ব'লেই না চাঁদকেও দ্বিজ আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে।

এমনি ভাবেই জাতি শব্দটিকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যোগ ক'রলে তার অর্থ হবে, যিনি তপস্যা করেন না, বিদ্যালাভও হয়নি, অথচ উপনয়নাদি সংস্কার মাত্র হ'য়েছে, তিনি হবেন জাতিব্রাহ্মণ। আর ঐ জাতি শব্দটি ফলের সঙ্গে যোগ ক'রলে বুঝতে হবে অন্য ফলের আকার প্রকারের সঙ্গে এর মিল নেই।

পণ্ডিত সভায় জাতিফলের এক্তিয়ার এই পর্যন্ত।

ভৈষজ্য দৃষ্টিতে জাতিফল

দেখা যাচ্ছে চরক সংহিতার সূত্রস্থানের পঞ্চম অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকের টীকায় চক্রপাণি দত্ত মন্তব্য ক'রেছেন—

"আবরণ ভেদাৎ অবস্থাত্রয়ং দধৎ জাতিফলং কোষশ্চাপি জৈত্রীতি আবরণভেদঃ ততো গর্ভকোষস্থ ফলং ইতি জাতি ফলং।"

অর্থাৎ এই জাতিফলটি তিনটি স্তর ভেদেই অবস্থান করে, তার একটি আবরণের নাম কোষ। যার প্রচলিত নাম জৈত্রী, এর পরবর্তী অবস্থাটিই গর্ভগত হ'য়ে থাকে ব'লেই এর নাম জাতিফল। আরও স্পষ্ট এই যে—

"একাকার বৃদ্ধিজনন সমর্থে জাতিঃ"

অর্থাৎ আবরণ ও ফলবত্তা যদি একাকার হ'য়ে থাকে তবেই তখন নাম হয় জাতি।

এই ফলটির আবরণ এমন যে, এর কোথায় ফল আছে তা বোঝা যায় না। যেমন সর্প, এর গায়ে এমন খোলস থাকে যে ঠিক বোঝাই যায় না, সাপের আসল দেহ কোথায়, তাই সর্পেও জাতি শব্দের প্রয়োগ, অর্থাৎ জাতসাপ। ভয়ঙ্কর বিষধর সাপেরই খোলস ছাড়ে, তাই তাকে বলা হ'য়েছে জাত সাপ।

সুপ্রাচীনকাল থেকে চরকে এটি সন্নিবেশিত; এভিন্ন সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের ২০৯ শ্লোকে বলা হ'য়েছে—

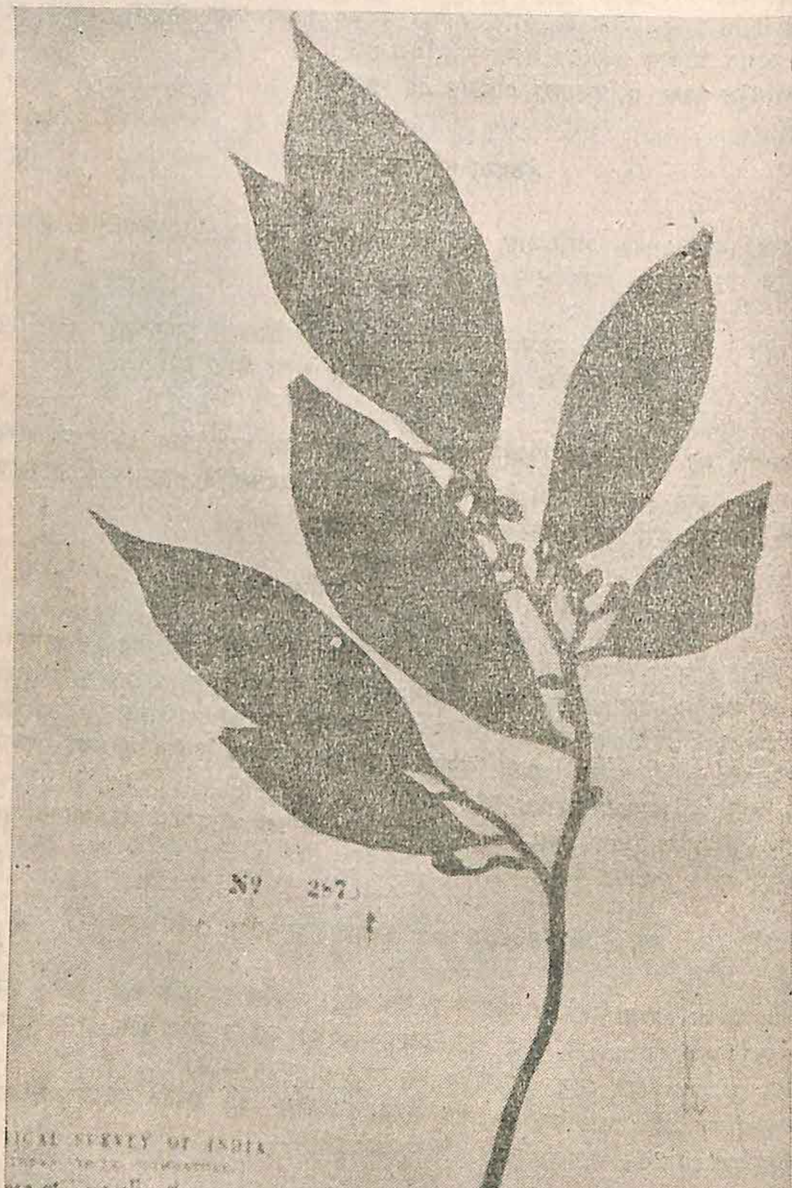
তিক্তং কটু কফঘ্নং লঘু তৃষ্ণাঘ্নং মুখক্লেদ দৌর্গন্ধ্যঘ্নঞ্চ

অর্থাৎ জাতিফল তিক্ত ও কটুরস সম্পন্ন, তবে কফবিকার দূর করে, কিন্তু লঘু গুণ, আর তৃষ্ণা রোগ দূর করে, আর বাহ্য ব্যবহারে মুখের ক্লেদ এবং পিত্ত-শ্লেষ্মা বিকারে যে মুখগহ্বরে ক্লেদ ও দুর্গন্ধ হয় সেটা অপহরণ করে।

সুশ্রুতের টীকাতেও ডল্বন ব্যাখ্যা ক'রে ব'লেছেন, এই ফলটি আবরণসহ যুক্ত হ'য়ে থাকার জন্য এর নাম জাতিফল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে—

"যৎ সশব্দং স্নিগ্ধং তদেব শস্যতে।
যৎ শব্দহীনং রুক্ষাঙ্গং তৎ লঘুকং অপি ন শস্যতে, তৎ
নিন্দিতমেব।"

অর্থাৎ আবরণের মধ্যে থেকেও যেটি নাড়লে শব্দ হয়, যার (যে ফলের) গা স্নিগ্ধ চিক্কণ সেইটি প্রশস্ত। আর যেটি নাড়লে শব্দ হয় না, গা-টা রূক্ষ, সেটা লঘুগুণ হ'লেও রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য নয়।



সুশ্রুতের টীকাকার ও চরকের টীকাকারের ব্যাখ্যায় আমরা বুঝতে পারি এর নাম জাতিফল কেন, এবং দ্রব্যের রস ও গুণবত্তায় ভৈষজ্য হিসেবেই বা ব্যবহার ক'রলে তার বৈশিষ্ট্য কোথায় কোথায় উপলব্ধ হয়।

পরবর্তী নিঘণ্টুকারগণ এবং বিদগ্ধ বৈদ্যবৃন্দের অভিমত, এই জাতিফল বা জায়ফলের দ্বারা রোগ দূরীকরণের যে কয়টি ক্ষেত্র তা রসবহ স্রোতেই প্রধান। সেইজন্য রসবহ স্রোতে বায়ু বিকার প্রাপ্ত হ'লে অন্নে অভিলাষ যেমন হয় না, তেমনি অনাহারে থাকলেও অরুচি দূর হয় না, মুখের বিরসতাও ঘটে, আবার অবসাদ, অগ্নিমান্দ্য তন্দ্রা প্রভৃতি আপনা-আপনি আসে। উপরিউক্ত উপসর্গগুলি রসবহস্রোতে বায়ুবিকার-জনিত। এইসব ক্ষেত্রে জাতিফলের মাত্রামত ব্যবহারের দ্বারা এই পীড়াদায়ক অবস্থাটি দূর করার যোগ্যতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। সেইজন্য উদরাধ্মানের (পেটফাঁপার) ক্ষেত্রে এটি বিশেষ উপযোগী। তাই শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"সাটোপং অত্যুগ্রং চ রুজং আধ্মাতং উদরং বাতনিরোধজম্"

অর্থাৎ সেই রসবহ স্রোতের বায়ুবিকার যখন উদরে হয়, তখন পেটে যন্ত্রণাও হয়, তখন ফুট্‌ফাট্ (ভুট্‌ভাট্) শব্দও করে (একেই সংস্কৃত ভাষায় আটোপ্ বলা হয়) এই ক্ষেত্র ঘ'টলে জায়ফল সেখানে দ্রুত নিজ শক্তি প্রকাশ ক'রে সে উপদ্রবটা দূর করে।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে যে, রসবহ স্রোতে বায়ুবিকারটার কারণ কি? তার উত্তরে এটাকে সহজ সরল ভাবে বোঝাতে গেলে এইটাই ব'লতে হয়, আহারের পরিপাকের সঙ্গে সঙ্গেই সেই আহার্য রসটিতে মাধুর্য (মধুর রস) সৃষ্টি হয়, সেইটি আমাদের কফধাতুর পোষক হয়। আর আহার্য রসে যদি অম্লের প্রাধান্য হ'য়ে থাকে, তাতে হয় পিত্তধাতু।

তারপর ঐ রস পক্কাশয়ে দ্রুত উপনীত হয়, তখন তাতে যদি কটুরসের প্রাধান্য থাকে, তখনই বায়ুর প্রাধান্য আসে। অতএব যাঁরা রসবিচার না ক'রে লবণ ও ঝালের মাত্রা বাড়িয়ে আহার্য গ্রহণ করেন, তাঁদেরই বেশী হয় উদরাধ্মানের পীড়া বা পেট ফাঁপা রোগ। এটা প্রথম প্রথম সামান্য আকারেই সঞ্চিত হ'তে হ'তে ক্রমেই তা স্থায়ী ব্যাধিতে পরিণত হয়; তারই পরিণামে অগ্নিমান্দ্য তো আসেই সেটা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে যেকোন কঠিন রোগ আসাটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

যাঁরা এসব বাছ-বিচার ক'রে চলেন না তাঁদের এসব অসুবিধে আসাটাই স্বাভাবিক, আবার তাকে সামলাতে একটু ক্ষার বা লবণ ঘটিত (alkaline or salted) ঔষধ খাওয়া আরম্ভ করেন, এটাতে অবশ্য কিছুদিন উপশমও হবে, কিন্তু কিছুদিন বাদে সুরু হবে গলা-বুক জ্বালা। এটা হ'তে হ'তে এসে যাবে অম্লপিত্ত রোগ, তারপর অম্লশূল, আবার কারো বা গ্রহণীরোগ (chronic Diarrhoea & Dyspepsia)।

নব্যের সমীক্ষায়

১। ইউরোপীয়গণ বলেন—জায়ফল উত্তেজক, পাচক এবং অতিমাত্রায় সেবনে মাদকতা আসে। ১০—২০ গ্রেণ মাত্রায় (১৫ গ্রেণ=১ গ্রাম) ইহা একপ্রকার অতিসারে (Atonic diarrhoea), উদরশূলে ও বদহজমে এবং কলেরা রোগীর তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। নানাবিধ ঔষধের সহযোগী ও মসলা হিসাবে এর প্রভূত ব্যবহার দেখা যায়।

২। কোন কোন চিকিৎসক বলেন—জায়ফল ঘষে লাগালে মাথার যন্ত্রণা সারে

এবং চোখের চারদিকে লাগালে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। জায়ফল ঘষা লাগালে বিভিন্ন গ্রন্থি বৃদ্ধি ও কর্ণমূলপ্রদাহ কমে যায়। জায়ফলের চূর্ণ দাঁতের যন্ত্রণা কমায়।

৩। জায়ফলের তৈল আমবাত, পক্ষাঘাত ও বাতের যন্ত্রণায় ব্যবহৃত হয়।

৪। আরবীয়গণ বলেন—ইহা যকৃদ্দোষনাশক, বলকারক ও কামোদ্দীপক। ইহা যকৃত ও প্লীহার ক্রিয়াবরোধে ব্যবহৃত হয়।

৫। হাকিমী বৈদ্যগণ বলেন—ইহা মূত্রকারক, স্তন্যজনক, উত্তেজক, নিদ্রাজনক, হজমকারক, বলকারক ও কামোদ্দীপক। কলেরার ন্যায় অতিসারে, যকৃৎ ও প্লীহার রোগে, মাথার যন্ত্রণায়, পক্ষাঘাতে ও চক্ষুরোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

পরিচিতি

জায়ফল (জাতিফল) পূর্বএশিয়া, মালয় ও আমেরিকার উষ্ণপ্রধান অঞ্চল সমূহে জন্মে। সমগ্র পৃথিবীতে এই Myristica গণের প্রায় ৮০টি প্রজাতি পাওয়া যায়, কারও কারও মতে ৮৫টি প্রজাতি বর্তমান। তার মধ্যে ৩০টি প্রজাতির সন্ধান মেলে ভারত, মালয়, আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে।

এখানকার আলোচ্য প্রজাতিটির সংস্কৃত নাম জাতিফল বা জায়ফল। এটির বোটানিক্যাল নাম Myristica fragrans Houtt. ফ্যামিলি Myristicaceae. ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই গাছটির চাষ হয় মালয়, পেনাং, শ্রীলঙ্কা, জাভা, সুমাত্রা, মালাক্কা প্রভৃতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। বর্তমানে ভারতের তামিলনাড়ু ও কেরালায় এর কিছু কিছু চাষ করার চেষ্টা হ'চ্ছে। এই গাছগুলি খুব বড় হ'লেও ৩০/৪০ ফুটের বেশী উঁচু হয় না। চিরসবুজ বৃক্ষ, পাতা পুরু, বেশ শক্ত, কাঁঠাল পাতার মত, লম্বা ৪/৫ ইঞ্চি ও চওড়া দেড়/দুই ইঞ্চির মত, পাতার উপরটা সবুজ, উল্টোদিকের বর্ণ ফিকে হরিদ্রাভ ধূসর, ফুল আকারে ছোট আর হরিদ্রাভ, অল্প সুগন্ধযুক্ত। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে একটি গাছ আছে কিন্তু সে গাছে কোন ফুল বা ফল হ'তে দেখা যায় না। ফল ২/৩ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা যায়, গায়ে ডোরা ডোরা দাগ, দেখতে আকারে অনেকটা ছোট নাসপাতির মত। বর্ষার আগে ফুল ও পরে ফল হয়। স্ত্রী-পুরুষ ভেদে দুই প্রকারের গাছ জন্মালেও স্ত্রীগাছ সংখ্যায় বেশী হ'য়ে থাকে। ফল পাকলে আপনা-আপনি ফেটে যায়, ফলের মধ্যস্থিত বীজের চারিদিকে বিভিন্ন আকারের পাতলা লালচে হ'লদে দেখতে জালের মত বহিরাবরণ থাকে—সেটা তৈলাক্ত ও ক্ষণভঙ্গুর; সেইটাকেই আমরা জৈত্রী বা জাতিপত্রী বলি আর যেটাকে বলি জায়ফল সেটার মধ্যে থাকে এর বীজের শাঁস আর এই বীজের বাইরেটা মসৃণ এবং শক্ত, গায়ে ডোরা দাগ। ওই তৈলাক্ত বীজের শাঁসটাই ঔষধে ব্যবহৃত হয়। এই শাঁস থেকে যে তৈল নিষ্কাষিত হয় সেটাকে বলা হয় "Nut meg oil". এই গণের আর একটি প্রজাতি কঙ্কন, মালাবার, কর্ণাটক প্রভৃতি প্রদেশাঞ্চলে পাওয়া যায়। যার ফলের মধ্যস্থিত নরম দ্রব্যগুলি দেখতে জৈত্রীর মত, কিন্তু সেগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা, গন্ধ অনেকটা জৈত্রীর মত, সেগুলি বাজারে রামপত্রী নামেও পরিচিত। এটির বোটানিক্যাল নাম Myristica malabarica. এটা জৈত্রীর সঙ্গে ভেজালও দেওয়া হয়।

ঔষধার্থে ব্যবহার হয় জায়ফল এবং জৈত্রী।

লোকায়তিক যোগ

প্রথমেই ব'লে রাখি যে, জায়ফলের বীর্যবিত্তায় কাজ হয় রসবহ স্রোতে বায়ুর

বিকার হ'লে।

১। রক্তাতিসারে— এই রোগটির উৎপত্তি এবং কার্য সম্বন্ধে 'চিরঞ্জীব বনৌষধি'র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। তথাপি সংক্ষেপে বক্তব্য, যেসব দ্রব্য স্বভাবতই পিত্তবৃদ্ধিকর, যেমন কোন রুক্ষ দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য—এগুলি প্রধানভাবে খেলে প্রথমে হয় অতিসার, তারপরে ঐ অভ্যাস না ছাড়লে হয় রক্তাতিসার। এক্ষেত্রে এই জায়ফল চূর্ণ মাত্রামত নিয়ে একটু ছাগল দুধ মিশিয়ে দু'বেলা খেলে ২/৩ দিনের মধ্যেই রসবহ স্রোতে বায়ুবিকারজনিত যে অতিসার সেটা সেরে যাবে। তবে প্রধানভাবে এর মাত্রা ১০০ মিলিগ্রাম।

২। অপাক রোগে— যাকে বলে হজম ব'লতে আর কিছু নেই, যা খাচ্ছেন সেটা কচা-কচা অবস্থায় পরের দিন বেরিয়ে যাচ্ছে, সে মলটাও দুর্গন্ধযুক্ত, দাস্ত হ'য়ে যাওয়ার পর যেন আধমরা, সুতরাং শরীরের পোষণ তো হয় না। এর কারণটা হ'লো, আমাশয়ের ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্তী যে অন্নবহা নালী, এখানেই থাকে আমাদের প্যান্‌-ক্রিয়াস্‌ (Pancreas), সেই স্থানটিতে থাকে আমাদের জঠরাগ্নি; এই অগ্নিদ্বারাই আমাদের আহার্য অংশ পরিপাকের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে দেয়। রসবহ স্রোত দোষযুক্ত হ'লে এই অগ্নির মান্দ্য হয়, তখন জায়ফল জল দিয়ে ঘষে (চন্দনের মত) ১০/১৫ ফোঁটা আর একটু জল মিশিয়ে খেতে হবে, এর দ্বারা পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হবে এবং অপাকটা ক'মে যাবে।

৩। মন্দাগ্নিতে— যাঁরা মাঝে মাঝে পেটের দোষে ভোগেন, কথাটা এই যে, অগ্নির বল যাতে বাড়ে সেসব খাদ্য না খেয়ে প্রায়ই শীতবীর্য দ্রব্য খেয়ে থাকেন, তাঁদের পাচকাগ্নিটা দুর্বল হয়ে যায়, এই যেমন কাঁচা পোস্তবাটা, পুঁইশাক, ঝিঙে, লাউ, কড়াইডাল (বিউলিডাল) প্রভৃতি খেয়ে খেয়ে এমন হয় যে, কোন জিনিস আর তাড়াতাড়ি পরিপাক হ'তে চায় না। এই ধরনের পেটের দোষে জায়ফল চূর্ণ সামান্য গরমজল (ঈষদুষ্ণ) সহ ১০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় কয়েকদিন খেলে ও অসুবিধেটা চ'লে যায়।

৪। মূত্রকৃচ্ছ্রে— এই রোগের উপসর্গ কি হয় সে সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করা হ'য়েছে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে। উপরিউক্ত ক্ষেত্রে জায়ফল চূর্ণ ১০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় গোক্ষুর ভিজান জলসহ খেলে কয়েকদিনের মধ্যে ওটার উপশম হবে। গোক্ষুরের জল প্রস্তুত ক'রতে গেলে ৫ গ্রাম গোক্ষুর (বীজ) একটু থেঁতো ক'রে নিয়ে রাত্রে ১ গ্লাস গরমজলে ভিজিয়ে রাখতে হবে, পরের দিন সকালের দিকে তাকে ছেঁকে নিয়ে ওই জলটা নিতে হবে।

৫। বিবমিষায় (গা বমি দেওয়া)— এটা কিন্তু রসবহ স্রোতের বিকারে হয়, এবং এটা আমাশয়জাত ব্যাধি, অতিসার হ'লেই যে বমি হবে তা নয়, আমদোষ হ'লে এই বিবমিষা এসে থাকে। এক্ষেত্রে জায়ফল জলে ঘষে ১০/১৫ ফোঁটা নিয়ে ৭/৮ চা-চামচ জল মিশিয়ে খেলে, ওই বমনেচ্ছাটা চ'লে যাবে।

বাহ্য ব্যবহার

৬। হাতে পায়ে খিল ধরা রোগে— যাঁদের হাতে-পায়ে মাঝে মাঝে খিল ধরে তাঁরা যদি জায়ফল দিয়ে তৈরী তেল মালিশ করেন তাহ'লে ওটা আর হবে না। এই তেল তৈরী করতে জায়ফলকে গুঁড়ো করে নিতে হবে অথবা বেটে নিতে হবে, তারপর কড়ায় ৫০ গ্রাম তেল চড়িয়ে গরম হ'লে ওই তেল নামিয়ে ৫/৬ গ্রাম জায়ফলের

গঁুড়ো অথবা বাটা ওই গরম তেলে দিয়ে নেড়ে কোন পাত্র দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তারপর ৪/৫ ঘণ্টা বাদে ওটাকে ছেঁকেও নেওয়া যায় অথবা ঐ গঁুড়ো সমেত থাকলেও ক্ষতি নেই, তবে মালিশের সময় ঐ গঁুড়ো ছেঁকে নিতেই হবে।

৭। **শিরঃপীড়ায়—** যে মাথা ধরাটা বৈকালের দিকে হয়, অথবা কপালের এক দিকটায় যন্ত্রণা হয়, যাকে আমরা "আধকপালে" বলি, এক্ষেত্রে জায়ফল চন্দনের মত ঘ'ষে সেখানে লাগিয়ে দিলে ওটা ক'মে যাবে।

৮। **মেচেতায়—** এ রোগের নাম সকলেই জানেন এবং কোথায় হয় সেটাও সকলের জানা আছে, তবুও বলি এটা নাকে মুখেই হয়, আব্‌ছা হাল্‌কা কালো দাগ কারুর বা আন্দামান দ্বীপের আকার আবার কারও বা উত্তমাশা অন্তরীপের আকারে দাগ-গুলো হয়। এটা উর্ধ্বগত পিত্ত শ্লেষ্মজ ব্যাধি। এই রোগে জায়ফল ঘষা কয়েক দিন লাগালে নিশ্চয়ই সেরে যাবে।

নিবন্ধের পরিসমাপ্তিতে একটা কথা মনে আসছে যে, মূর্খ লোকের গালাগালি "জাত হারিয়ে বৈষ্ণব", কিন্তু বিংশ শতকের ভারতের জাতির জনক ব'লে গিয়েছেন, "সব হারিয়ে এক জাতি হও"। তাহ'লে কোন্‌টা বাঞ্ছনীয়? এত ফলের মধ্যে এই একটি মাত্র যেটি জাতিফল। তাহ'লে এইটাই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক ব'লে প্রতিপন্ন হ'য়েছে নাকি? এখন আমরা তো জাত হারাতে ব'সেছি, আর সংস্কারমুক্ত হ'য়ে বলিদ্বীপ-বাসীদের মত রামগুলাম হ'তে চ'লেছি।

যাক, কালস্রোত যেখানে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সেইটাই তো যুগধর্ম, তাই নয় কি?

CHEMICAL COMPOSITION

Myristica fragrans

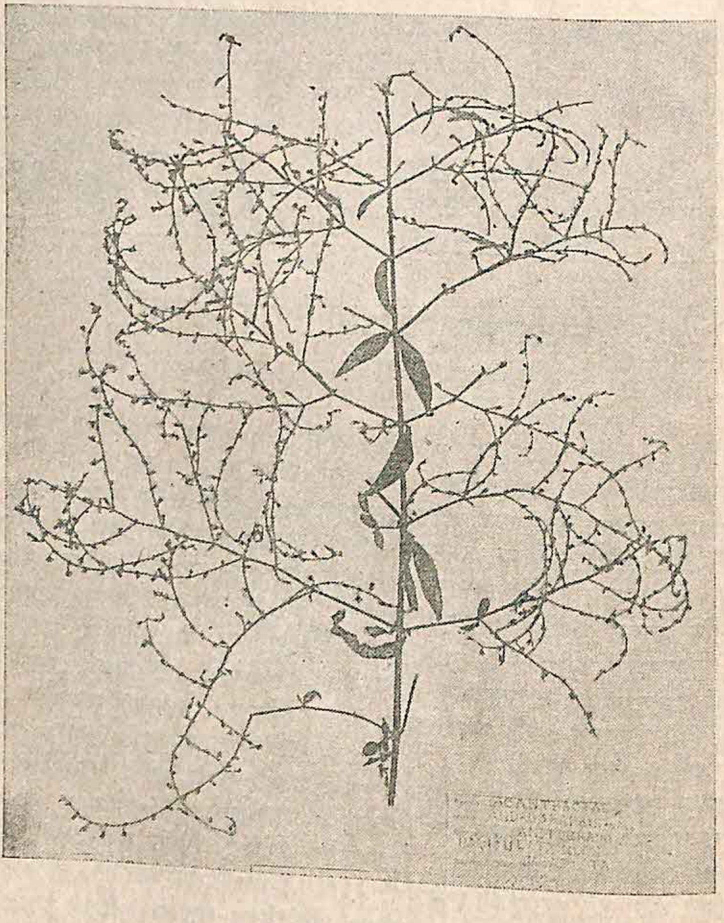
Fatty acids are :— lauric 4%; myristic 71.8%; Palmitic; stearic 1.2%; and linoleic 1.5%. Other constituents are :— β-pinene; p-cymene; d-linalol; diterpene; geraniol; myristicin; carotene as Vitamin-A; starch; furfural; aminodextrine; reducing sugar; resinous colouring material and glycerides. The leaves, bark and flowers contain :— light brown volatile oil and stem contains a tannine mucilage complex.

কালমেঘ [যবতিক্তা]

নিবন্ধটি লিখতে ব'সে নাম আর শব্দের ভাবার্থ গ্রহণ ক'রতে দ্বিধাগ্রস্ত হ'লাম, কারণ কাল-মেঘ কোন অর্থে? ইংরেজীতে আছে নো মানে 'জানা'ও হয়, আবার 'না'ও হয়, কিন্তু তার বানান পৃথক; তাই শ্রুতিসাম্য থাকলেও পার্থক্য থেকে যাচ্ছে, কিন্তু "কাল" এটা কি রঙের বিশেষণ? না সময়কে নির্দেশ ক'রছে? কারণ এ রকম শব্দ তো বাংলা ভাষায় বহু আছে। এই যেমন—কালকূট, কালকেতু, কালগু, কালঘাম, কালদূত, কালনেমি, কালনাগিনী, কালপুরুষ, কাল প্যাঁচা, কালবেলা প্রভৃতি। এর মধ্যে কিছু কিছু শব্দ দ্ব্যর্থ অর্থ প্রকাশ করে, তাই কবিরাজ হ'য়ে রাজকবির শরণাপন্ন হ'লাম, তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কালমেঘ' এটি কোন্ অর্থে তার নাম দেওয়া হয়েছে? তিনি ফাঁদলেন মহাভারতের একটি গল্প। দ্রুপদ রাজার আহ্বানে পান্ডবগণ ছদ্মবেশে উপস্থিত হ'য়ে অসাধ্য সাধন কাজটি সেরে দ্রৌপদীকে লাভ ক'রলেন—কেউ চিনতে পারেন নি কে এরা? তবে কৃষ্ণ বলরাম চিনতে পেরেও তাঁদের কাছে আত্মপরিচয় দেননি; তাই যেখানে পান্ডবগণ ফিরে এলেন, সেটা ভার্গবের কর্মশালা, সেই পথ ধ'রে কৃষ্ণ বলরামও অনুসরণ ক'রলেন। প্রয়োজন শুধু পরস্পরের পরিচয়, কিন্তু সবার অলক্ষ্যে এলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, আর তাঁর কয়েকজন ছদ্মবেশী সহচর। পিতা দ্রুপদই তাঁদিকে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, আমার একমাত্র কন্যা দ্রৌপদীকে যাঁরা নিয়ে গেলেন তাঁদের প্রকৃত পরিচয় কি? ধৃষ্টদ্যুম্ন যথাসময়ে উপস্থিত হয়েই ভার্গবের কর্মশালার আশেপাশে লুকিয়ে থেকে সন্ধ্যার পর সেই গুপ্ত গৃহের দেওয়াল ঘেঁষে লুকিয়েই শুনতে লাগলেন, পান্ডববৃন্দ, তাঁদের মা কুন্তীদেবী এবং দৌপদীর প্রতি তাঁদের আলাপ ও ব্যবহারের কথাবার্তা। সব শুনে গিয়ে ভোরের আগেই সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন; বাড়িতে পৌঁছে পিতা দ্রুপদকে গিয়ে বললেন, বাবা, আমাদের জীবন সার্থক হ'য়েছে। দৌপদীকে

নিয়ে গিয়েছেন পান্ডবগণ। সেই ভার্গবের কর্মশালায় শুয়ে ওঁদের যেসব কথা শুনলাম তা ব্রাহ্মণের কথা নয়, বৈশ্যেরও নয়, আর শূদ্রেরও নয়। সেসব ক্ষত্রিয়ের আলাপ। এ'রা যে পারিবারিক সমস্যার প্রবল তাড়নায় পলায়ন ক'রে গুপ্তস্থানে ছদ্মবেশে আছেন এবং ভিক্ষা দ্বারা জীবন কাটিয়েও, ভবিষ্যতে যে একটা প্রচণ্ড সংগ্রাম ক'রে অতীত বেদনাকে মুছে ফেলবেন তার জন্য কেবল সংগ্রাম আর ভীষণ ভীষণ অস্ত্রের কথাই আলোচনা ক'রছেন। ওঁদের কথালাপে বুঝলাম ও'রা দেখতে পাচ্ছেন সামনে গাঢ় "কালমেঘ", তারপর শুরু হবে প্রচণ্ড তার প্রতিক্রিয়া।

এটা আছে মহাভারতের আদিপর্বে (১৯৩।১৩ শ্লোক)



ন বৈশ্য-শূদ্রৌপয়িকীঃ কথাস্তা।
ন চ দ্বিজানাং কথয়ন্তি বীরাঃ॥
তেনর্দমানা ইব কালমেঘাঃ।
কথার্বিচিত্রাঃ কথয়াম্বভূবুঃ॥

(এই শ্লোকটির অনুবাদ উপরেই দেওয়া হ'য়েছে)

এখন বিচার্য বিষয় হ'লো—এই নামকরণটিতে দ্রব্যের অন্তর্নিহিত কোন পদার্থের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য দেখেই কি বাংলার বৈদ্যগণের দেওয়া এই কালমেঘ নাম? এটা কি লক্ষ্যে লক্ষণের সমন্বয় করা হ'য়েছে? সে বিচার ক'রলে এটাই মনে আসে নাকি যে, যার চেয়ে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণতিক্ত গাঢ় ঘন রস অতি বিরল। তাই বা কেন—নেই ব'ললেই হয়, তাই কি তার নাম দেওয়া হ'য়েছে কালমেঘ? এর রূপ, গুণ, ক্রিয়া, ধর্ম, প্রকৃতির মধ্যে যে পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টির সামান্য (সম+অন্য) রূপ রয়েছে, তা ছাড়াও যে একটা বিশেষ পদার্থ রয়েছে, সেটাই নিজস্ব সত্ত্বা।

দ্রব্য বিজ্ঞানের এটা তো জানা যে, প্রতিটি পদার্থের মধ্যেই এক বিশেষ ধর্মের পরমাণু আছে। একই বর্ষার জল, একই মাটিতে বীজ পুতলেও প্রতিটি বীজে এমন বিশেষ ধর্ম আছে যে, বীজ থেকে অঙ্কুর উৎপত্তির পূর্বে তার রস অব্যক্ত থাকলেও অঙ্কুর উৎপত্তির পর সে যখন ক্রমে বৃক্ষলতায় পূর্ণ রূপ নেয়, তখন তার মধ্যে পৃথক রসের বিকাশ হয়। অথচ আকাশের জল, মাটির সত্তায় কিন্তু ওই বিশেষ শক্তি বিকাশের জন্য বিশেষ কোন কিছুর উপাদান তাতে কেউ যোজনা করেনি। অর্থাৎ আম এবং উচ্ছের বীজ যখন মাটিতে পোতা হয়, তখন তাদের বীজ শক্তিতে ছিল অব্যক্ত রস, কিন্তু ব্যক্ত অবস্থায় একটি হ'লো টক আর একটি হ'লো তেতো (তিক্ত)। এই যে পৃথকভাবে প্রতীতি সেটা কিন্তু উভয় পদার্থের মধ্যে মূল পরমাণুনিষ্ঠ পদার্থ বিশেষ। সেই পরমাণু অনন্ত এবং বিশেষ ধর্মও অনন্ত। তাকে বোঝাতেই বাংলায় নাম "কালমেঘ", কারণ ওই ভেষজটিতে যে বিশেষ পদার্থ আছে তা অন্যতে নেই।

পাঞ্চভৌতিক দৃষ্টিভঙ্গি

শিশির বা শীত ঋতুতে বায়ু ও আকাশধর্মী তিক্তরসের মধ্যে অন্যান্য তিক্তরসে যে সামান্য পদার্থ অর্থাৎ একধর্মিত্ব আছে, এই কালমেঘ ভেষজে তা তো আছেই, তাছাড়া আছে এক বিশেষ পদার্থ, যা অন্য তিক্তরসে নেই। অর্থাৎ কালগত, পাত্রগত, সংযোগ-বশতঃ পাকবশতঃ, আতপজন্য, ভাবনাজন্য, দেশগত কারণে, কালগত কারণে, পরিণামের জন্য, উপসর্গ জন্য এবং বিক্রিয়া জন্য বহু রসেরই রূপান্তর, ধর্মান্তর প্রভৃতি ১১ প্রকার বিকার ঘটে, কিন্তু সবই সংযোগবশতঃ হ'লেও প্রতিটি রসের মধ্যে যে বিশেষ ধর্ম আছে তার পরিবর্তন হয় না; সেইজন্য এই কালমেঘ ভেষজটির বর্গগত রূপ সৌম্য, গুণগত রূপ শীত এবং বর্গগত রূপ পিত্তশমন, মূর্ছা শমন এবং অবিদাহী হ'লেও পাচন সংস্থান, ও রক্তবহ সংস্থানে এক বিশেষ শক্তি নিয়েই কাজ করে; অর্থাৎ অন্য তিক্তরসপ্রধান ভেষজ রক্ত আমাশয়ে, অম্লরোগে, উদরাময়ে; কোষ্ঠবদ্ধতায়, ক্রিমিতে উল্লেখ্যযোগ্য উপশমন ক্রিয়া করে না, কিন্তু কালমেঘ উক্ত প্রতিটি রোগে তা করে। কালমেঘ যেক্ষেত্রে কাজ করে, চিরেতা, কুইনাইন তিতো হ'লেও সেখানে কাজ করে না।

নব্যের সমীক্ষায়

ইহা স্বাদে তিক্ত রসান্বিত, ক্রিমিনাশক, জ্বরঘ্ন ও বলকারক।

ঔষধার্থে প্রয়োগ— পাতা ও মূল, ক্ষুধাবর্ধক ও বলকারক। চিকিৎসকগণ এর পাতার রসের সঙ্গে দারুচিনি, লবঙ্গ ও এলাচ একত্রে শিশুদের অনিয়মিত দাস্তে এবং পেট মোচড়ানো ব্যথায় প্রয়োগ করে থাকেন। কেউ কেউ অতিসারে উক্ত রস খাওয়ার উপদেশ দিয়ে থাকেন। এভিন্ন চর্মরোগে বিশেষতঃ এক্‌জিমায় এর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

ইউনানী চিকিৎসক সম্প্রদায় উপদংশজনিত রোগে এই গাছের পাতার ক্বাথ ঘন করে চেটে (লেহন করা) খাওয়ার ঔষধ হিসেবে রোগীকে প্রদান ক'রে থাকেন।

পরিচিতি

অল্প শাখাবিশিষ্ট বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। মূলকান্ড ও শাখাগুলি চতুষ্কোণাকৃতি ও নরম, সাধারণতঃ ১ থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা যায়। পাতা ২/৩ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ ও বোঁটার দিকটাই ক্রমশ সরু এবং গাঢ় সবুজ বর্ণের, এর বোঁটাও ছোট। আকৃতি ও গঠন অনেকটা লঙ্কাপাতার (Capsicum annuum) মত। পরস্পর বিপরীতমুখী জোড়া জোড়া পাতার গোড়া ও মূলকাণ্ডের সংযোগস্থল থেকে শ্বেত বর্ণের ছোট ছোট ফুল হয়। ফল দেখতে যবের মত অথচ তিক্ত, তাই এর আর এক নাম যবতিক্তা। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বীজ থাকে। বর্ষার পর থেকে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়, এর সমগ্র গাছটাই স্বাদে তিক্ত।

এটি ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায় তবে অঞ্চল বিশেষে বেশীও হয়, এছাড়া পতিত জমিতেও এটি দেখা যায়।

এর সংস্কৃত নাম যবতিক্তা, বাংলায় প্রচলিত নাম কালমেঘ ও হিন্দীতে মহাতিয়া বলে। এর লোকায়তিক নাম কল্পনাথ। বোটানিক্যাল নাম Andrographis paniculata Nees, ও ফ্যামিলি Acanthaceae।

ঔষধার্থ ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

লোকায়তিক যোগ

প্রথমেই জানা দরকার যে, কালমেঘের রস আয়ুর্বেদীয় দৃষ্টিতে কিভাবে দেহের কোথায়, কোন্ অংশে প্রধানভাবে কাজ করে। প্রথমতঃ যেভাবে রস, গুণ হিসেবে বিচার করা হয় সেটা পূর্বেই আলোচিত হ'য়েছে। বীর্যবত্তায় এটি যে শক্তি নিয়ে থাকে সেটা পুষ্টিকর হিসেবে কাজ করে, অতএব এর বীর্যবত্তা খুবই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু কাজ করে বিপাকে এবং বিপাকে কাজ ক'রতে গেলে সেটা রসবহ স্রোতের মাধ্যমে; এ কিন্তু স্থায়ী হয় না, এটা বিপাকে কাজ করে ব'লেই রক্তবহ স্রোতে এর কার্যকারিতা প্রকাশ পায়; অতএব কালমেঘের প্রধান বিবেচনা হ'লো যে, এটা রসপ্রধান নয়, এটি বীর্য-প্রধান—এটি যাবতীয় রক্তগত ব্যাধির ক্ষেত্রে—যেমন রক্তদুষ্টি—পিত্ত এবং রক্ত উভয়ে পাশাপাশি একধর্মী থাকে ব'লে পিত্তগত অম্লপিত্ত, চুলকণা, খোস-পাচড়া হয়। কেন আমরা এটা বলি যে, দেহের সাতটা ধাতুতেই বায়ু-পিত্ত-কফ তার প্রভাব নিয়ে থাকে অর্থাৎ পিত্ততে তাপ প্রধান, রস অপ্রধান ও বায়ু অপ্রধান। এই যখন দেহধাতুর বিচার বিবেচনা, সেক্ষেত্রে কালমেঘের রস বীর্যগত কাজ করা অপেক্ষা এর বিপাকে কটুতা আসে না ব'লেই এই কালমেঘ বিপাকপ্রধান দ্রব্য, তাই সে রক্তবহ স্রোতে সর্বাধিক কাজ করে, তাই আমরা একে যকৃত এবং প্লীহাগত অর্থাৎ রক্তবহ স্রোতের মূল কেন্দ্র হ'লো যকৃত এবং প্লীহা, তাই সে সেখানেই তার ক্রিয়া প্রকাশ করে।

যাক, এখন বলা যাক এর রসগত প্রভাব কতখানি।

১। **ক্রিমিতে—** সে যেকোন প্রকারেরই হোক না কেন, এর প্রভাব তার উপর কিছু না কিছু প'ড়বেই। এই ক্রিমিরোগ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের পূর্বেকার তিন খণ্ডে বিস্তৃত ক'রে বলা হ'য়েছে। তা হ'লেও একটা বিচার্য থাকে যে, রোগীর অগ্নিবল কি রকম

আছে সেটা নিরূপণ করা। মোটামুটি সে দিকটায় যদি বিশেষ ঘাটতি না থাকে তাহ'লে কালমেঘের পাতার রস ৩০/৩৫ ফোঁটা ও কাঁচা হলুদের রস ৩০/৩৫ ফোঁটা একসঙ্গে ক'রে সামান্য চিনি মিশিয়ে সকালের দিকে একবার এবং বিকেলের দিকে একবার খেতে হবে। তবে এটা পূর্ণ মাত্রা। তবে গর্ভবতী, শিশু বা বৃদ্ধের জন্য মাত্রা কত দেওয়া হবে সেটা চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

২। **পেটের দোষে—** একে আয়ুর্বেদীয় ভাষায় বলা হয় উদরাময় বা অতিসার, এই রোগটি জন্ম নেয় অগ্নিমান্দ্য থেকে। তার ওপর যারা খাওয়ার বাছবিচার না ক'রে তার উপর যথেচ্ছভাবে খেয়ে যান, তাঁরাই এই রোগে আক্রান্ত হ'য়ে থাকেন। এ রোগ যাঁর হয় তিনি জেনে রাখুন, এমন কোন রোগ নেই যা অগ্নিমান্দ্য থেকে হয় না, যদি তেমন কারণে উদরাময় হয় তবে তৎক্ষণাৎ সকালে বৈকালে চা-চামচের আধ চামচ করে জল মিশিয়ে খেতে হবে, তবে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকার পেতে গেলে লবঙ্গ অল্প ভেজে ওটাকে গুঁড়ো ক'রে রাখতে হবে, তা থেকে একটিপ নস্যির মত নিয়ে ঐ কালমেঘের রসের সঙ্গে মিশিয়ে দু'বেলাই খেতে হবে। এইভাবে ৩/৪ দিন খাওয়ার পর থেকে উদরাময়টার উপশম হবে এবং ক্ষিধেও বেড়ে যাবে।

৩। **অম্ল ও অজীর্ণে—** আমরা একে চলতি কথায় অম্বলের অসুখ ব'লে থাকি। এ রোগের জন্মসূত্র অজীর্ণ থেকে। এই দুটি রোগের বিস্তৃত বর্ণনা এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া হ'য়েছে। এই ক্ষেত্রে কালমেঘ পাতার রস আধ চা-চামচ, তার সঙ্গে বড় এলাচের দানা চূর্ণ ২ টিপ নস্যির পরিমাণ মিশিয়ে সকালে খেলে এই দুটি রোগ উপশম হয়, তবে প্রয়োজনবোধে দু'বেলাই খাওয়া যায়। এটাও ঠিক যে, আহারাদির বাছবিচার না ক'রলে এ অসুখের উপশমও হয় না। অম্লরোগের উপশমের অন্তরায় হ'লো যে কোন মিষ্ট দ্রব্য, এমনকি মিষ্ট ফলও ভাল নয়। এই পথ্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষাংশে পথ্যাপথ্য বিচারে।

৪। **রক্তামাশয়ে—** এই রোগটি আসে, যেক্ষেত্রে অতিসার রোগ ভাল সারেনি, তার ওপর খাওয়াদাওয়া অত্যাচার চ'লছে, সেখানে প্রথমে হয় আমাশা, তারপর কয়েকবার দাস্ত হওয়ার পর মলের সঙ্গে রক্ত প'ড়তে থাকে। সেক্ষেত্রে কালমেঘের পাতার রস ১৫ ফোঁটার সঙ্গে মুথো চূর্ণ ১৫০ মিলিগ্রাম (দেড় রতি আন্দাজ) মিশিয়ে সকালের দিকে একবার ও বৈকালের দিকে একবার খেলে দু'দিনের মধ্যেই রক্ত আমাশাটা সেরে যাবে।

৫। **দূষিত জ্বরে—** সে যে কোন প্রকারেরই হোক—সে ম্যালেরিয়া ঘটিতই হোক আর অন্য কোন জীবাণুঘটিতই হোক, আভ্যন্তরীণ প্রদাহজনিত জ্বর, স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় বাস ক'রে ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হ'লে কিম্বা দীর্ঘদিন পাণ্ডুরোগে (এনিমিয়ায়) ভুগে জ্বর হ'চ্ছে, রক্তের তাপমাত্রা কমে গিয়ে যে জ্বর হ'য়ে থাকে, এসব ক্ষেত্রে কালমেঘের পাতার রস ১৫/২০ ফোঁটা জল মিশিয়ে দিনে ২ বার বা ৩ বার খাওয়ালে এই জ্বরের উপশম হবে এবং কয়েকদিন ব্যবহার ক'রলে ওটা নিরাময় হবে। বাংলার কবিরাজ সম্প্রদায় পুরাতন রীতিতে এই কালমেঘ রসে যোয়ান ভিজিয়ে রাখতেন অর্থাৎ ৮ ভাগ কালমেঘ রস, ১ ভাগ যোয়ান, ৮ ভাগ গুড় দিয়ে কোন মাটির পাত্রে বা চীনা মাটির পাত্রে ১৫/২০ দিন ভিজিয়ে রাখতেন, তারপর তাকে চোলাই ক'রে যেটা পাওয়া যেতো সেইটা ওই পূর্বোক্ত জ্বরে ৫/৭ ফোঁটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে ২/৩ বার খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রতেন।

বাহ্য ব্যবহার

৬। **পচা ঘায়ে—** সে যেকোন রকমেরই ঘা হোক না কেন, কালমেঘ পাতা সিদ্ধ ক'রে সেই জল দিয়ে ঘা ধোওয়ালে অবশ্য ৩/৪ দিনের (অন্ততঃ ২ বার ধোয়াতে হবে) মধ্যেই ঐ ক্ষত আরাম হবে।

এই কালমেঘ নিবন্ধ লেখার শেষে ভাবছি যে, এর অন্ত্যজ ভাষানাম "কেলেবিষড়ে"। খুড়ো ব'লতো ছোটবেলায় পিসীমা যখন নাক টিপে এর রস খাওয়াতো তখন মুখ থেকে আরম্ভ ক'রে সব কালো হ'য়ে যেতো। ঘটনাচক্রে বৈদ্য হ'য়ে এই পরিণত বয়সে দেখছি—এখন বৈদ্যসম্প্রদায়ের ভাগ্যাকাশে উঠেছে কালমেঘ; বোধ হয় মৃত্যুর পূর্বে যে নিঃসরণটা হয় এটা কি তার পূর্বাবস্থার খিঁচুনি?

CHEMICAL COMPOSITION

(a) Alkaloids viz., Kalameghin; (b) A bitter principle andrographolide; (c) Sterols.

সুপারি

অতিথি কথাটা উচ্চারণ করা যত সহজ, তার সেবা লাগাতে গেলেই দম বেরিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গটা সেই রকমই। রোজ পানের সঙ্গে সুপুরি খাই, কিন্তু কেন যে তার এই নাম হ'লো—সেটা জিজ্ঞেস করলেই চক্ষু চড়কগাছ।

তাই ফেলে আসা গ্রামীণ জীবনের কুলচুরির স্মৃতিটা মনে ভেসে ওঠে। খুড়োর

কুলগাছ থেকে চুরি ক'রে কুল পাড়তে গেলেই চেঁচাতে চেঁচাতে তেড়ে আসতো—'ধ'রে নিয়ে আয় শালাদের, ওদের মাথায় সুপুরি রেখে খড়ম পেটা করবো, তবে যদি ওরা সিধে হয়।'

বৈদ্যক-জীবনের শেষ অঙ্কে এসে ব'সে ভাবছি—কেন এই সুপুরি নাম হ'লো? সেটা তো আজও জানা হ'লো না! এই নিবন্ধটি তারই পরিপ্রেক্ষিতে। তা'হলেও এটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি যে, এ সমস্যার সমাধানের থেকে মাথায় খড়ম পিটে সুপুরি ভাঙ্গাটা যেন সহজ।

আচ্ছা! সুপারি নামটি তো সংস্কৃত নয়, যদিও মহারাষ্ট্রে, হিন্দুস্থানীতে আর বাংলাতেই সুপারি নাম, তাহ'লে এই নাম এলো কিভাবে?

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের অভিধান খুললে দেখা যায়—এককালে নৌকো ও জাহাজে চড়ে বণিকরা এদেশ-ওদেশে এই ফল নিয়ে বাণিজ্য ক'রতে যেতেন। ওই যাত্রাকে আরবী ভাষায় সফর বলে। এ ফল নিয়ে বণিকগণ বিভিন্ন দেশে সফরে যেতেন ব'লেই এই ফলের নাম "সফরী" ফল। বিশেষভাবে এর খ্যাতি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে। সেই শক্ত ফলটির নাম সফরী। কালে তা হ'লো—সপ্‌রী, তারপর সুপরী, এথেকেই এসে গেল সুপারি, চলতি নামে সুপুরি।

সব্‌রী কলাও (সফরী) ঐ সফর থেকে আসা। তা যাক্‌, এটা তো বেরো (বাইরের) নাম, তাহ'লে তার ঘোরো (ঘরের) নাম কি?

প্রাচীন অভিধানে দেখা যাচ্ছে—এই ফলটির নাম 'পূগ'। সেই পূগই পরে উল্টে-পাল্টে 'গুয়া' হ'লো নাকি? তাই গোঁড়া পণ্ডিতের কাছে জিজ্ঞেস করতেই বললেন—এসব অর্বাচীনের কথা। পূগ মানে তো সমূহ। তার প্রমাণ মনুসংহিতা। এই সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫১ শ্লোকে বলা হয়েছে—যাঁরা পূগ-যাজী ব্রাহ্মণ, তাঁদিকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ ক'রবে না, খাওয়াবে না—

"যাজয়ন্তি চ যে পূগাংস্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ"

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ বহু যাজন করেন, তাঁদিকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণও ক'রবো না; কখনও খাওয়াবেও না। তবে পূগ শব্দটি ভাগবতের পৃষ্ঠায় গিয়ে ভিন্ন রূপ নিয়েছে, সেখানে বলা হ'য়েছে, এটা দাক্ষিণাত্যের তাল শ্রেণীর বৃক্ষফল। কারণ দাক্ষিণাত্য-সংস্কৃতি ঘেঁষা যত গ্রন্থ, সবারই লেখায় পূগ শব্দের উল্লেখ। ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোকটিতে পাওয়া যাচ্ছে কদলী আর পূগের কথা।

সেখানকার বর্ণনায় দেখানো হ'য়েছে সৎ-মা সুরুচির ভুল যেদিন ভেঙ্গে ছিল ধ্রুবের তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পর এবং শ্রীহরির করুণা লাভের পর, তখন ধ্রুবকে রাজকুমারের সম্মান জানাতে নিয়ে এসে রাজপ্রাসাদের তোরণ দ্বারটি কদলী, পূগ ও তাল বৃক্ষ দিয়ে সাজানো হ'য়েছিলো। এ উপাখ্যানটি দক্ষিণ ভারতেরই গ্রাম্য পরিবেশের রূপকে অবলম্বন ক'রেই; সেখানেই পূগ বৃক্ষের প্রাকৃতিক শোভা সততই থাকে।

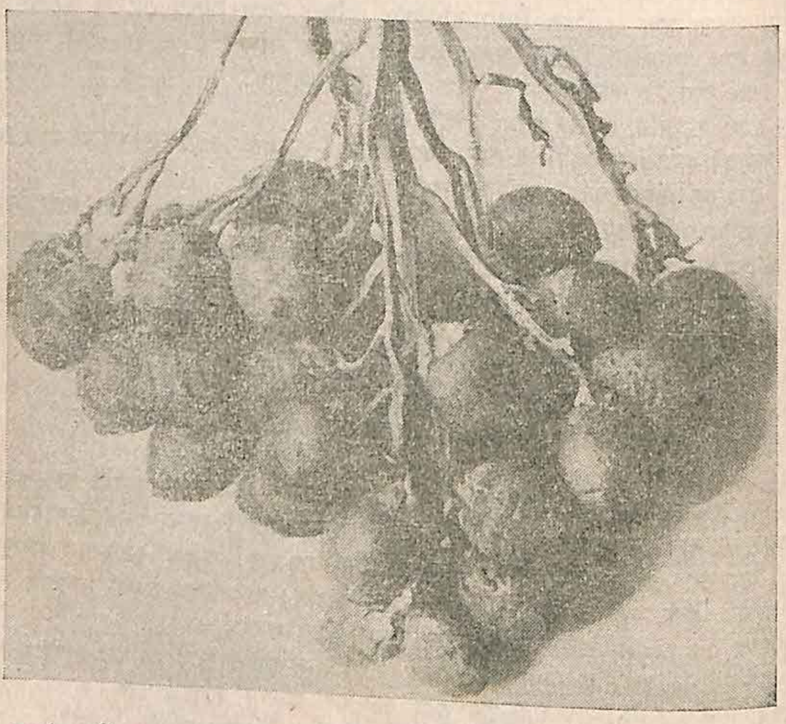
তাই শ্লোকাকারে বলা হ'য়েছে—

"তত্র তত্রোপ সংক্লৃপ্তৈঃ লসৎ মকর তোরণৈঃ।
সবৃন্দৈঃ কদলীস্তম্ভৈঃ পূগ পোতৈশ্চ তদ্বিধৈঃ॥"

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, এখানে পূগ অর্থে সমূহ নয়, একশ্রেণীর বৃক্ষ, যার ফলই পূগফল।

তারপর কবি কালিদাস ও মাঘের যত রচনা, সবেতেই পূগ নামের উল্লেখ। তবে এ সন্দেহের আর অবকাশ থাকবে না ত্রয়োদশ শতাব্দীর শার্ঙ্গধরের উপবন বিনোদ গ্রন্থের ভূমি নিরূপণ প্রসঙ্গে, যেখানে আনূপদেশজাত বৃক্ষলতাদির পরিচয়ে অর্থাৎ আনূপ ভূমিতে কি কি বৃক্ষলতাদি প্রধানভাবে পাওয়া যায়, তার বর্ণনা প'ড়ে। তাই শ্লোকাকারে বলা হয়েছে—

পনস-লকুচ-তালী বংশ-জম্বীর-জম্মু
তিলক-ঘটকদম্বাম্রাত-খর্জ্জূর-পূগাঃ।
কদলি-তিনিশ-মৃদ্বী-কেতকী-নারিকেল
প্রভৃতয় ইতি চান্যে প্রায়শোঽনূপজাঃ স্যুঃ॥



অর্থাৎ কাঁঠাল, লকুচ (মাদার), তেড়েৎ, বাঁশ, জামীর লেবু, জাম, তিল, ঘট-কদম্ব, আমড়া, খেজুর, সুপারি, কদলী, তিনিশ, দ্রাক্ষা, কেতকী এবং নারিকেল—এরা সবাই আনূপ দেশের ভূমিতে জন্মে। আনূপ মানে জলাসন্ন দেশও বলা হয়। অতএব নিঃসন্দেহে বলা চলে—সুপারি জাঙ্গল, পার্বত্য ও মরুদেশজ গাছ নয় অর্থাৎ সেখানকার ভূমি বা প্রাকৃতিক পরিবেশে এ গাছগুলি লাগালেও হতে চায় না।

তাই বেদ সূক্তিতে এর সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু চরক-সুশ্রুতে এই পূগ ফলটির গুণাগুণ ও প্রয়োগ দেখা যায়, শুধু একটি ক্ষেত্রে নয়, বহুক্ষেত্রেই। অবশ্য বলা যায়—আর্যদের বিচরণ ক্ষেত্রে পূগের সমাবেশ সম্ভব নয় ব'লেই কোন বৈদিক সংহিতাগ্রন্থে এর উল্লেখ নেই।

যাক্, এখন তার নামের শব্দ বিন্যাসের তাৎপর্য ও তার গুণাদির পরিচয় উদ্ধৃত করছি।

বৈদ্যকের নথি

সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের ২০৮ শ্লোকে পরিষ্কার বলা হ'য়েছে—

কফপিত্ত হরং রুক্ষং বক্তৃক্লেদ মলাপহম্।
কষায়মীষন্ মধুরং কিঞ্চিৎ পূগফলং সরম্॥

অর্থাৎ এই পূগ ফলটির স্বভাবশক্তি কফবিকারে ফলপ্রদ, তবে রুক্ষ এবং উষ্ণবীর্য; কিন্তু বাতপিত্ত প্রকৃতির ব্যক্তির তো বটেই, এমন কি মাত্রাবৎ ব্যবহার না করলে কণ্ঠের স্বর বিকার ঘটায়। তবে মুখের ক্লেদ এবং পিত্ত-কফের মল দূর করে, আর এটি স্বাভাবিক কষায় রসপ্রধান এবং সামান্য মধুর রসতাও আছে, তাছাড়া এতে সারকতাও আছে।

এমনিভাবে দ্রব্যের রস গুণ বীর্যের প্রাধান্য গণনায় সুপারিকে আর নূতন ক'রে পরিচয় না করিয়েও চরক সংহিতার চিকিৎসাস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোকে বলা হ'য়েছে—এই ফলটি অন্যান্য ভেষজের সঙ্গে মিশিয়ে রক্তপিত্ত পীড়ায় ব্যবহার্য।

অর্থাৎ সুশ্রুতের উক্তিতে রসবহ স্রোতের পীড়ায় এবং চরকের উক্তিতে রক্তবহ স্রোতের পীড়াতেও ব্যবহার্য। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, সুশ্রুতে বলা হ'য়েছে—এই ফলটির নাম পূগ আর চরকের উক্তিতে 'ক্রমুকং'। এর অপর নাম ক্রমুক কেন? এই প্রশ্নের সমাধান এইভাবে করা হ'য়েছে যে, আফিং (অহিফেন) এবং গাঁজার মধ্যেও যে বিকাশি শক্তি আছে অর্থাৎ ও দুটিতে যে মদকারি শক্তি আছে, সেটা কিন্তু দেহে বিকাশের ক্রমকে অপেক্ষা করে না, এই পূগফলের মদশক্তিটি ঊর্ধ্বগ বায়ুদ্বারা নাভি, বক্ষ ও পরে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে; তাই এর থেকে মদ্য আহরণ করা হয়, অর্থাৎ মদ্যে যেমন মত্ততা শক্তিতে ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্বদিকে যায়, এই পূগের মদ্যও তেমনি ক্রমে ক্রমে বিকাশ পায় বলেই এর এক নাম ক্রমুক। ক্রম+উক—এইভাবে শব্দটি নিষ্পন্ন হ'য়েছে। পূগ শব্দটি চরকে একবার আর ক্রমুক নামের উল্লেখ দু'বার; অর্থাৎ সূত্রস্থানের ২৫ অধ্যায়ে মদ্যযোনি প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে—কোন্ কোন্ ভেষজ থেকে মদ্য উৎপন্ন হয়; সেইখানেই এই পূগ ফলটির উল্লেখ। আবার চরকেরই সিদ্ধিস্থানের সপ্তম অধ্যায়ে বস্তিগত বিপত্তিতে ক্রমুক শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। অন্যান্য অভিধানে সুপারির পর্যায়বাচী নামগুলিতে আরও দু'টি নাম বেশী রয়েছে—'খপুর' ও 'গুবাক'।

শব্দ বিশ্লেষণেও দেখা যায়—খং=ইন্দ্রিয়ং পিপর্ত্তি এবং গুং=ধূসরং ইতি আক্; অর্থাৎ যার অভ্যন্তরের বর্ণ ধূসর। আর যেখানে খপুর শব্দ সেখানেও ক্রমুকেরই অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ বিকাশি দ্রব্য বলেই এটি শরীরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে মাদকতার ব্যাপ্তি হয়, পরে সমস্ত শরীরে, এমন কি মস্তিষ্কেও; তাই সিদ্ধ ক'রে কিম্বা গোময়ে পর্যুষিত ক'রে শুকিয়ে নেওয়ার পর এই সুপারির ব্যবহার। কিন্তু কাঁচায় এটি যোগ্যমত মাত্রায় ও সহযোগী দ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে হয়। এখন এটা প্রমাণিত হ'লো যে, এই পূগ ফলটি ভেষজের দিক থেকে ভারতে খুবই প্রাচীন।

একাদশ শতকের চক্রদত্তেও (এটি আয়ুর্বেদীয় সংগ্রহ গ্রন্থ) এটিকে কাঁচা অবস্থায় প্রলেপের ক্ষেত্রে (উপদংশ) ব্যবহার্য ব'লে উল্লেখ দেখা যায়, তাছাড়া মসূরিকা (বসন্ত) দেখা দিলে কাঁচা সুপারির ক্বাথ ব্যবহার করারও নির্দেশ দেওয়া আছে। হারীত সংহিতাকার

ব'লেছেন (চিকিৎসাস্থান ২১ অধ্যায়ে)—তিল তেলের সঙ্গে কাঁচা সুপারির ক্বাথ দিয়ে পাক ক'রে (এই তেল তৈরিটা কোন আয়ুর্বেদসেবীর তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত) সেই তেল ব্যবহার করতে।



নব্যের সমীক্ষায়

কাঁচা সুপারি কষায়ধর্মী, এতে প্রচুর পরিমাণে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড আছে। সুপারি বল্য, কামোত্তেজক, উত্তেজক ও উল্লাসজনক। এটা খেলে মাথা ঘুরতে থাকে, তারপর ঝিমুনি আসে, অনেকে বমিও করেন।

ঔষধার্থে ব্যবহার হয়—অগ্নিমান্দ্যে, দূষিত ক্ষতে, মূত্রযন্ত্রের বিবিধ পীড়ায়। অন্তর্ধূমে দগ্ধ সুপারিতে মাজন তৈরী হয়। অবশ্য সেটাকে মিহি চূর্ণ করে মাজনে মিশাতে হয়।

১। ক) **দাঁতের ব্যথায়—** সুপারি ভস্ম দিয়ে দাঁত মাজলে মাড়ির ব্যথা ক'মে যায়।

খ) **অতিসারে—** কাঁচা সুপারি শুকিয়ে, তাকে গুঁড়ো ক'রে ৫০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় সকালে ও বৈকালে দু'বার খেলে দুর্বলতাজনিত অতিসার উপশম হবে।

গ) **ক্রিমিতে—** সুপারি চূর্ণ ৫০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দুধসহ সেবন ক'রলে ক্রিমির উপদ্রব কমে যায়, এমনকি ফিতে ক্রিমির উপদ্রবেরও শান্তি হয়। তবে এই মাত্রায় উপকার

না হলে আর একবার দেওয়া যায়, তবে যদি মাথা ঘুরতে থাকে তবে দু'বার দেওয়া উচিত নয়।

ঘ) **পায়োরিয়ায়—** যাঁরা এই রোগে ভুগছেন তাঁরা মাজনের মত গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজবেন। এটাতে উপকার হবে।

ঙ) **দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তপড়া—** ইহার কষায় ধর্মিত্বের জন্য মাড়ির রক্তক্ষয় বন্ধ করে।

চ) **যোনিস্রাবে—** যোনি থেকে জলের মত যে স্রাব বেরোয়, সেটা বন্ধের জন্য মুলতানের মেয়েরা ইহার আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্য প্রয়োগ করেন।

ছ) **কুকুরের ক্রিমিনাশে—** আধখানা সুপারির চূর্ণ মাজনের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিলে কুকুরের ক্রিমিনাশ হয়। এক বা দুই মাত্রাই যথেষ্ট।

২। **কচিপাতা—** সুপারির কচি পাতার রস তেলের সঙ্গে মিশিয়ে মালিশ করলে কটিবাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পরিচিতি

ভারতের উষ্ণ-প্রধান অঞ্চল সমূহের প্রায় সর্বত্রই এটির চাষ হ'য়ে থাকে; এমনকি ৩০০০ ফুট উঁচুতে পর্যন্তও চাষ হয়। তবে স্থানে স্থানে এর বাড়-বৃদ্ধি বেশী, কোথাও আবার খুবই কম। সাধারণতঃ অল্প লোনা বেলে মাটিতে এটির বাড়-বাড়ন্ত, এবং অধিক ফলনের পক্ষে অনুকূল। বাংলায় এটির চাষ হলেও পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে বেশী হয়। ৭/৮ বছরের গাছ না হ'লে ফল হয় না, ফল হওয়া আরম্ভ হ'লে তারপর ৮/১০ বছর ভাল ফল হয়, তারপর থেকে ফলন কমতে থাকে। গাছ বেশ শক্ত, সরু ও লম্বা, নারকেল গাছের মত শাখা-প্রশাখাহীন গাছ, তবে বাঁশের মত মোটা হয়। লম্বায় ২৫/৩০ ফুট হতে সচরাচর লক্ষ্যে পড়লেও, বেশী দিনের গাছ হ'লে ৩০/৪০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে যে দেখা যায় না তা নয়। নারিকেল পাতার মত পত্রদণ্ডের পরস্পর বিপরীত দিকে পাতাগুলো থাকে, লম্বায় ১½ ফুট/২ ফুটের মত, পত্রদণ্ড ৭/৮ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতেও দেখা যায়। পুষ্পদণ্ড প্রায় নারকেলের পুষ্পদণ্ডের মত, বহু শাখা-প্রশাখা তাতে, চলতি কথায় সেটাই কাঁদি, কাঁদিতে প্রচুর ফল হয়, কাঁচায় ফলগুলো সবুজ, পাকলে লাল, হলদে বা কমলালেবুর রঙের মত হয়। ফলের খোসা ছাড়ালে তার মধ্যে সুপারি পাওয়া যায়। বৎসরের প্রায় সব সময় অল্প-বিস্তর ফুল ও ফল হলেও বেশীরভাগ সুপারি সংগৃহীত হয় নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। সংস্কৃত একে পূগ, পোগীফলম্; বাংলা ও হিন্দীতে সুপারি, বাংলার ও উড়িষ্যার অঞ্চল বিশেষে 'গুয়া' বলে। এটির বোটানিকাল্ নাম Areca Catechu Linn., ফ্যামিলী Palmae. সুপারির কয়েকটি জাত আছে, সেগুলি এইরূপ—

১. Areca Triandra Roxb.—দেখতে লালবর্ণ, বাংলাদেশের চট্টগ্রামে, আন্দামান, আইসল্যান্ড, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে এটির চাষ হয়।

২. Areca Gacilis Bl.—বর্তমানে এটির নাম Pinanga gracilis kurz. সিকিম, আসাম, পূর্ববঙ্গ প্রভৃতিতে এটা বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। এই গাছে বৎসরের প্রায় সবসময় ফুল ও ফল হয়। শ্রীহট্ট প্রদেশে এইটিকে নাকি রামগুয়া বলে। এগুলির ফ্যামিলী একই Palmae.

ঔষধার্থে ব্যবহার্য অংশ হচ্ছে—ফল, ফুল, ত্বক্ ও শিকড়।

লোকায়তিক যোগ

প্রথমেই ব'লে রাখি—কাঁচা সুপারি বিকাশি অর্থাৎ পরিপাক হবার পূর্বেই এটি এক ধরনের মত্ততা সৃষ্টি করে, সেজন্য সর্বদা কাঁচা সুপারিকে শুকিয়ে ব্যবহার করতে হয়। সুপারি রসবহ স্রোতে এবং রক্তবহ স্রোতে কাজ করে।

১। **ক্রিমিতে—** এই রোগটির সম্পর্কে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কয়েকবারই লেখা হয়েছে, তবুও সংক্ষেপে বলি—এগুলি বিষ্ঠাতেও হয়, কফবিকারের জন্য আমাশয়েও হয় আবার রক্তদুষ্টিতেও হয়। কেউ শক্তিতে কারুর চেয়ে কম নয়। তবে সচরাচর বিষ্ঠাজাত ক্রিমি বড় বিশ্রী উৎপাত করে, এখানের আলোচনা সেইটাকে উপলক্ষ ক'রে।

এগুলির বর্ণ সাদা, আকারে খুব ছোট ছোট, যাকে চলতি কথায় বলে কুচো বা ঝুরো ক্রিমি। পেটফাঁপা ও অগ্নিমান্দ্য, বলক্ষয়ে, হৃদ্‌রোগে এদের উপদ্রব সাধারণতঃ বৃদ্ধি পায় এবং সরলান্ত্রে সেগুলি অবস্থান করে ও বিষ্ঠার সঙ্গে বেরোয়, সুযোগমত আবার সুড়সুড়িও দিয়ে থাকে। এই উপদ্রবটি দেখা দিলেই সুপারি ৪ গ্রাম থেঁতো ক'রে তাকে ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, সকালে ও বৈকালে ওটাকে দু'বেলায় কয়েকদিন খেলে ওগুলোর উপদ্রব প্রশমিত হবে।

২। **ক্রিমি-জন্য অতিসারে—** যে অতিসারে প্রবল বমনেচ্ছা, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে পেটে কুন্‌কুন্‌ ব্যথা আর মুখে অনবরতঃ জল আসতে থাকে, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে—এর হেতু ক্রিমিই। এটাতে বমির ইচ্ছে হলেও বমি হয় না, যেখানে বমি হয়ে যায়, বুঝতে হবে—এর পেছনে অন্য কোন হেতু আছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে সুপারি ৪ গ্রাম থেঁতো ক'রে ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, ঐ ক্বাথটাকে সকালে ও বৈকালে দু'বেলায় খেলে অতিসারেরও উপশম হবে এবং ক্রিমির উপদ্রবও কমে যাবে। তবে হ্যাঁ, এ ধরনের রোগীর পথ্যে অল্প অম্লরস থাকাটা কিন্তু ভাল।

৩। **রক্তামাশয়ে—** সাধারণ পেটের দোষকে ঠিকভাবে না সারিয়ে পুষ্টিকর খাদ্য খেলে সেটা কিন্তু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় আর প্রায় ক্ষেত্রেই এরই পরিণতিতে আসে রক্তামাশা, পেটে যন্ত্রণা, দাস্তের সঙ্গে রক্ত পড়া, তার সঙ্গে কুন্থন ও আম নিঃসরণ। এক্ষেত্রে ঔষধ ও পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করলে আম ও রক্তের বৃদ্ধি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই ধরনের ক্ষেত্রে যদি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করা যায়, তাহলে আরও রোগের বৃদ্ধি হয়ে থাকে, যেমন—দুর্গন্ধযুক্ত মল-নিঃসরণ, তার কারণ থাকবে, অন্ত্রের মাংস ক্ষয়। এর প্রথমাবস্থায় যদি সুপারির ক্বাথ (পূর্ব বর্ণিত নিয়মানুসারে—১ বা ২নং যোগ দ্রঃ) দু'বেলা খাওয়া যায়, তাহলে বিপদটা কেটে যায়। আরও ভাল হবে, ওর সঙ্গে বেলশুঁঠের চূর্ণ ১ গ্রাম মাত্রায় মিশিয়ে দিলে।

৪। **অজীর্ণে—** এই রোগে যাঁরা ভুগছেন, তাঁদের ভোরের দিকে পিপাসা লাগে, মাঝে মাঝে শরীরে কামড়ানি, যাকে বলে অঙ্গমর্দ, সাধারণতঃ এঁদের একটু পিপাসা লেগেই থাকে, মুখ দৌর্গন্ধ, এছাড়া সর্বদাই যেন মুখটা শুকিয়ে আছে অর্থাৎ মুখে লালাংশ কম হয়ে যায়। অনেকের ধারণা—এটা বোধহয় লিভারের দোষেই হচ্ছে। এক্ষেত্রে ১ বা ২নং যোগ-প্রস্তুতের প্রক্রিয়ায় সুপারির ক্বাথ তৈরী ক'রে দু'বেলা কয়েকদিন খেলে অবস্থাটার উন্নতি হবে।

৫। **রমণে অতৃপ্তি—** এযেন পাকা বেল ও কাকের চঞ্চু, মনের অবস্থাটা এইরকম, দাম্পত্য-জীবনে অসুখী, এটা সাময়িক কোন কারণে উদ্ভব হলে তাকে খানিকটা

মেরামত করতে পারে যেটা, সেটা হচ্ছে—কাঁচা সুপারি কুচি কুচি ক'রে কেটে শুকিয়ে তার মিহিচূর্ণ ১ গ্রাম, ঈষদুষ্ণ দুধ ১ কাপ ও ১ চা-চামচ চিনি একত্র মিশিয়ে সকালে অথবা বৈকালে কয়েকদিন খাওয়ার পর, তারপর দু'বার করে খাওয়া যেতে পারে। কিছুদিন ব্যবহার করলে নিজে উপলব্ধি করতে পারবেন।

সর্বশেষে এই কথাটা ব'লে রাখি—আভ্যন্তরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বদাই সতর্কতার সঙ্গে মাত্রা নিরূপণ করতে হবে। সুপারি খেতে যাঁরা অনভ্যস্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রথমে অর্ধ মাত্রায় শুরু করতে হবে। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীর ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসকের পরামর্শ ভিন্ন প্রয়োগ করা সমীচীন নয়।

বাহ্য প্রয়োগ

৬। **দাঁতের যন্ত্রণায়—** অনেক সময় দেখা যায়—যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে এক-প্রকার কালো দাগ পড়তে থাকে, যাকে মনে হয় পোকায় খাওয়া দাঁত। সেইসঙ্গে দাঁতের গোড়াটা ফোলাও থাকে; এইরকম যে ক্ষেত্র, সেখানে সুপারি গাছের শিকড় ও কাঁচা সুপারি (শুক্‌নো) সমভাগে নিয়ে অন্তর্ধূমে পুড়িয়ে (হাঁড়ির মধ্যে দ্রব্য রেখে মুখটা সরা দিয়ে ঢেকে পোড়াতে হবে) সেই ছাই দিয়ে দু'বেলা দাঁত মাজলে যন্ত্রণাটা চলে যাবে, দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে কালো দাগটাও চলে যায়।

৭। **পচা ঘায়ে—** ঘা পচে গিয়ে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে, বিশ্রী স্রাব নির্গত হচ্ছে—সে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি; এ অবস্থায় কাঁচা সুপারি ভালভাবে শুকিয়ে খোসা সহ থেঁতো ক'রে তার মিহিচূর্ণ ঘায়ে লাগালে ঘা-টা যেমন শুকোবে, তেমনি দুর্গন্ধটাও দূর হবে।

আজ নিবন্ধের শেষে পান চিবোতে চিবোতে ভাবছি—হায়রে সুপুরি, তুই তো ছিলি পূগ হ'য়ে, গেলি ক্রমুকের পর্যায়ে, এমনিভাবে হতবাক্ ক'রে গুবাক্ হলি, তারপর গুয়া নাম নিয়ে চরমে চ'লে গেলি; এবার একটু গম্ভীর হয়ে যদি ভাবি, তাহ'লে দেখতে পাই—বৈদিকযুগেও অনেকের নামের মালা গাঁথা হয়েছে, তখন মুখে-মুখেই ফিরতো—তারপর দামামা ও দুন্দুভি, তারপর খোল-করতাল—তারপর— এ যেন যত মত তত পথ। তাই এখন দিশেহারা হ'য়ে বৈদ্যকগোষ্ঠী যেন—'আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ।

CHEMICAL COMPOSITION

Areca catechu

1. Nuts contain :— (a) Moisture 31.3%; (b) Protein 4.9%; (c) Fat (Ether extract) 4.4%; (d) Carbohydrates 47.2%; (e) Mineral matter 1.0%; Calcium 0.05%; Phosphorus 0.13%; iron 1.5 mg/100 g. 2. Glycerides of :— (a) Lauric acid 50%; (b) Myristic acid 21%; (c) Oleic acids upto 29%. 3. Catechin. 4. Arecoline (Alkaloid, 0.1%). 5. Arecaidine (alkaloid). 6. Guvacoline (alkaloid). 7. Guvacine (alkaloid). 8. The green kernels contain 67% of tannin. 9. The husk contains 47.6% of cellulose.

ঘণ্টাকর্ণ [ঘেঁটু]

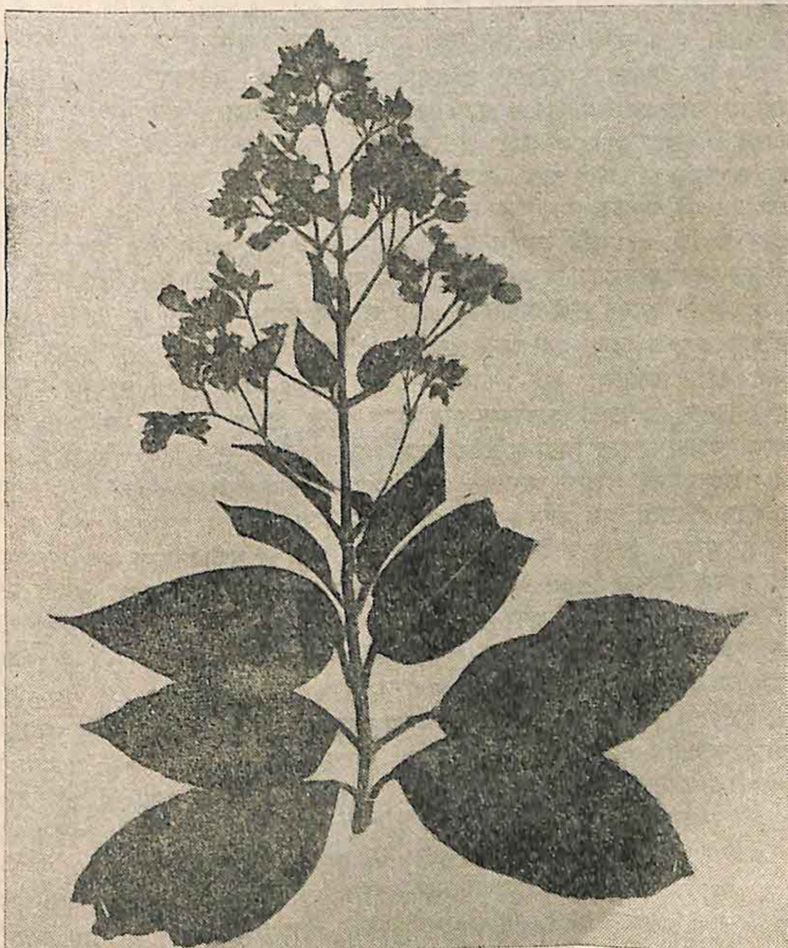
এই ভেষজটির আলোচনা ক'রতে ব'সে ভাবছি—পুরোহিততন্ত্রের যাঁরা স্রষ্টা, তাঁরা দেবদেবীর বাহন, পাল্টাপাল্টি বিয়ের সম্বন্ধটা অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গেই ক'রেছিলেন, কিন্তু তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক হদিস খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন। এই যেমন—ঘণ্টাকর্ণ, যাকে লোকে ডাকে 'ঘেঁটু ঠাকুর', তাঁর বিয়ে হ'য়েছিলো মা শীতলার সঙ্গে, যিনি নাকি মসূরিকা রোগের (বসন্ত রোগের) অধিষ্ঠাত্রী, আর ফাল্গুন চৈত্রেই অর্থাৎ বসন্তকালেই ইনি প্রাণীকুলকে দয়া করেন, তাই লোকে ব'লে থাকে "মায়ের দয়া" হ'য়েছে, শত শত বিস্ফোটক সৃষ্টি করে মানুষের এমনকি প্রাণীকুলেরও শরীরে ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন; যদিও এটি ঋতু সঙ্করের রোগ, তবুও সংস্কার এমনই জিনিষ যে, এটাকে আমরা মন থেকে সরাতে পেরেছি কি? আর সব থেকে আশ্চর্য লাগে যে, এঁর স্বামীর নাম ঘণ্টাকর্ণ; এই ভেষজটির নামও ঘণ্টাকর্ণ। এখন দেখা যাক এর সামঞ্জস্য আছে কোথায়!

নাম-মাহাত্ম্য

নিবন্ধোক্ত নামগুলির প্রথমটি অর্থাৎ ঘণ্টাকর্ণ নামটি পৌরাণিক আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থাৎ ঘেঁটু ও ভাঁট নাম শব্দ দুটি লোকায়তিক; তবে লোকায়তিক ব'লতে কেবল বাংলাতেই নয়, হিন্দি, মহারাষ্ট্রী ভাষাতেও ভাঁট। ঘণ্টাকর্ণ নামটি কিন্তু পুরাণে পাওয়া যায়, সেই শব্দ গড়িয়ে গড়িয়ে বাংলায় হ'য়েছে ঘেঁটু। প্রাচীন বৈদ্যগণ পরম্পরায় দেখে এসেছেন ঘেঁটুই ভাঁট। এখন প্রথমেই এই ঘণ্টাকর্ণ নামের উপাখ্যানটা শোনানো যাক।

মহাভারত রচনার ঢের আগেই ভারতের অন্যতম চিহ্নিত ভূমি কাশী। কারণ বৈদ্যশাস্ত্রের অন্যতম প্রণেতা ছিলেন কাশীরাজ দিবোদাস; আবার কৌরব পাণ্ডব বংশের

প্রতিষ্ঠাতা যে ভীষ্ম, তিনি তো ছিলেন কুমার, কিন্তু তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের তো বিবাহ দিয়েছিলেন কাশীরাজের কন্যার সঙ্গে। (ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হয় কাশীরাজ-কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে) তাহ'লে অনায়াসে বলা যায় মহাভারতের বহু আগেই কাশী। কিন্তু কাশী নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুরাণের ঐতিহ্যপূর্ণ (ইতিহাস নয়) একটি কাহিনী। ওকে অবলম্বন ক'রেই বাংলাভাষায় একটি সরস কৌতুকপূর্ণ গ্রন্থ লেখা হ'য়েছে ভরতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল"। এই কাহিনীটি স্কন্দ-পুরাণের অন্যতম বিশাল খণ্ড "কাশীখণ্ডে"।



তা যাক, সেই কাশীখণ্ডের ঐতিহ্যবার্তা হ'লো—দক্ষরাজের কন্যা সতী তাঁর পতি শিবের নিন্দা সহ্য ক'রতে না পেরে আত্মহত্যা করার পর আবার হিমালয়ের রাজকন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কালে সেই শিবের সঙ্গেই আবার তাঁর বিবাহ হয়; যৌবন তখন ছিল না শিবের। শিব স্বতন্ত্র গুহায় বাস ক'রলেও মহাদারিদ্র এবং ভিক্ষুক তিনি,

এদিকে গৃহিণীটি তো রাজকন্যা এবং নাম উমা। স্বামীর ভিক্ষা যেদিন জোটে সেদিন ভাল ক'রে ভোজন হয়, নইলে উপবাস। অবশেষে দুর্গা বা উমার পরামর্শে তাঁর পিতার বাড়িতে (শিবের শ্বশুর) অবস্থান ঘটে; কিন্তু স্বাধীনচেতা জামাতার তাতে মানে লাগে। শেষে উমার চেষ্টায় পিতার ঔদার্যে সমতল ভূমিতে গঙ্গার তীরে এক উজ্জ্বলতর ভূমি (উজ্জ্বল মানে কাশীও/কাশ্‌দীপ্তৌ কাশী) কাশীতে নূতন পুরী নির্মিত হয়। দুর্গাই তার নাম দেন শিবভূমি "কাশী"। কিন্তু প্রজাবৃন্দ বলেন অন্নপূর্ণালয়, বিরাট নগরী নির্মিত হ'লো, শিব স্বয়ং তা দেখে এলেন। এরপর উমা সহ এবং কৈলাসের অনুচর ও প্রতিবেশী নিয়ে নবপুরী প্রবেশ ক'রবেন, ইত্যবসরে কিন্তু স্থানটি দখল ক'রলেন ব্যাসদেব। তিনি সেখানে গিয়ে কেবলই শ্রীহরির নাম, শ্রীহরির গুণমাহাত্ম্য প্রচার করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শিবনিন্দা, শিব চরিত্রের গ্লানি প্রচার ক'রতে থাকেন। এই ঘটনা ও রটনাতে কাশীবাসী প্রজাবৃন্দ প্রায় বিভ্রান্ত। এদিকে শিবও চুপ ক'রে ছিলেন না। বহু প্রকার সন্ধান ও গুপ্ত সন্ধান, গুপ্তচর প্রেরণ ক'রতে থাকেন। দুর্গাও নানান রূপ ধারণ ক'রে কাশীতে প্রবেশের পথ পেতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ব্যাসের প্রচারে তাঁদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ। অবশেষে শিব ক্ষুব্ধ হ'য়ে নিজের ভয়ঙ্কর রুদ্রশক্তির সাহায্যে একটি অদ্ভুত আকৃতির চর পাঠালেন—তিনি রুদ্রানুচর। তাঁর ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত আকৃতি, পা দু'টি যেমনি দীর্ঘ তেমনি স্থূল, মুখখানি প্রায় অদৃশ্য কিন্তু মাথাটিতে উজ্জ্বল স্বর্ণের মুকুট আর দু'কানে বড় বড় দু'টি ঘণ্টা বাঁধা, তাই তার নাম ঘণ্টাকর্ণ। তাঁর কানের সেই ঘণ্টাবাদ্য এমন ভয়ঙ্কর হ'তে লাগলো যে, সমগ্র কাশী-নগরীর দিক্‌কুম্ভ বোধ হয় ফেটে যেতে লাগলো, আর তার সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে নিশ্বাস বইতে লাগলো; এই ঘণ্টাকর্ণ কিন্তু দিগম্বর, এ'র সঙ্গে প্রবেশ ক'রলেন অসংখ্য রুদ্রানুচর, তাঁরা কাশীবাসীদের গৃহে গৃহে প্রবেশ ক'রতে লাগলেন; ফলে অনেকে পলায়ন ক'রতে গিয়ে মূর্ছিত হ'য়ে প'ড়লো, কেউ বা ভীষণ পীড়ায় আক্রান্ত হ'য়ে প'ড়লো, সেই পীড়ায় অনেকের মৃত্যুও হ'লো। তার ফলে কাশীধাম শূন্য নগরী-প্রায় হ'য়ে প'ড়লো আর ব্যাসও ভয়ে পলায়ন ক'রলেন গঙ্গার পরপারে, গঙ্গাকে তা জানিয়ে গেলেন। এর ফলে শিবভূমির পুনরুদ্ধার ক'রলেন ঘণ্টাকর্ণদেব এবং তারপরেই উমার সহিত ভগবান শিবও কাশীতে প্রবেশ ক'রলেন, যেন চিত্রা যোগে চন্দ্রের মত।

বক্তব্য হ'লো—এই ঘণ্টাকর্ণ নামশব্দটির সঙ্গে আমরা এমন একটি ঐতিহ্যপূর্ণ লোকায়তিক আচারের মিল দেখতে পাই, যাতে আমাদের চিরাচরিত সংস্কার বদ্ধমূল হ'য়েছে যে হয়তো বা ঐসব ঘটনার মধ্যে এমন তথ্য নিহিত আছে যে, কোন সময় রাজনৈতিক বিশেষ ঘটনার আভ্যন্তরীণ কারণগুলিকে চাপা দিয়ে এক ধর্মীয় কাহিনীর বহিরাবরণ সৃষ্টি করা হ'য়েছে। তা হোক, কিন্তু মজা এই যে, আজও আমরা চৈত্র সংক্রান্তিতে ঘণ্টাকর্ণ বৃক্ষের পূজো করি, দেহের চর্মরোগ নিবারণের বা প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক হিসেবে, শুধু তাই নয়, এটা শিশু মারক রোগের প্রতিষেধকও বটে। তাই আমরা ঘণ্টাকর্ণের শরণাপন্ন হই এবং এই ঘেঁটুগাছের ফুলই এর প্রধান উপচার। এ তো গেল একটা দিক; তাছাড়া অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি, যেমন ক্রিমি, পুরাতন শূল প্রভৃতিও দূর ক'রতে ঘেঁটু বা ঘণ্টাকর্ণ একটি উৎকৃষ্ট ভেষজ ব'লে বৈদ্যকগোষ্ঠী পরম্পরায় চ'লে আসছে; এটা শুধু বাংলাতেই নয়, সমগ্র ভারতেই বৈদ্যগণ ঠিক একই পদ্ধতিতে সেটা ব্যবহার ক'রে আসছেন।

বৈদ্যকের নথি

এই ভেষজটি আমাদের কাছে যে নামে পরিচিত, সে নামে অথর্ববেদ অথবা বেদমান্য

সংহিতাগ্রন্থ যে উপবর্হণ সংহিতায় এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, তবে অন্য কোন নামে এর গুণ বর্ণনা আছে কিনা আমাদের অজ্ঞাত। শুধু তাই নয়—এমনকি আমাদের প্রামাণ্য যে সংহিতাগ্রন্থ চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভট—এ সবেও এ নামে কোন ভেষজের উল্লেখ নেই। তবে এই ধরনের এমন বহু ভেষজের নাম আছে যেগুলির সঙ্গে আমরা অপরিচিত। যাহোক্, পরম্পরা প্রচলিত লোকায়তিক ব্যবহৃত যোগ-গুলিকে আমরা এখানে সন্নিবেশ ক'রবো।

দ্রব্যের রস বিচার

এই ঘেঁটু বা ঘণ্টাকর্ণের ব্যবহার্য অংশ পঞ্চাঙ্গ (মূল, ডাঁটা, পত্র, ফুল ও বীজ)। এর সব অংশই তিক্ত (তিতো); এর ব্যক্ত রস যখন তিক্ত তখন অবশ্যই বুঝতে হবে এটি বায়বীয় ও আকাশীয়—এই দুটি মৌল উপাদানের প্রাধান্য এটিতে বর্তমান অর্থাৎ বায়ুধর্মিতা থাকার জন্য এর গুণগত ফল রুক্ষতা এবং শৈত্যকারকতা, আর আকাশীয় শক্তি থাকার জন্য এ ভেষজটি লঘুতাকারকও (চরক সূত্রস্থান ২৬ অধ্যায়)। তাছাড়া ব্যক্ত তিক্তরস সাধারণতঃ কৃমি দূর করে, তৃষ্ণা নিবারক হয়, পাচকশক্তি বাড়ায়, এবং পুরীষের ক্ষেত্রে গাঢ়তাও আনে, আর রক্তবহ স্থানগুলিতে প্রসাদন কাজ করে, যাকে বলে রক্ত দোষদুষ্ট হ'লে সেটার মলিনতা দূর করে, এবং স্তন্য শোধনও করে। আর একদিক থেকে চর্মের উপর তার ক্রিয়া হ'লো স্বেদ দূর করে, কণ্ডূরোগ (চুলকণা), কুষ্ঠ রোগ এবং দাহ রোগও দূর করে। এছাড়া জ্বরঘ্নও বটে। এককথায় বলা যায়—তিক্তে এতটাই যখন ব্যক্তরস তখন অবশ্যই তা পিত্তের বিপরীত গুণ ভূয়িষ্ঠতার জন্য সেটি কফেরও শামক।

তবে বলা যায়, এ রসের অধিক সেবা (সেবন) ক'রতে নেই, তাতে ধাতুবহ স্রোতের শুষ্কতা আসে, কৃশতা বাড়ায় অর্থাৎ বায়ুর বিকারগুলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

পরিচিতি

গুল্মবৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ্। সাধারণতঃ ৩/৪ ফুট উঁচু হতে দেখা যায়, কচি কাণ্ডের গায়ে শ্বেতবর্ণের রোম আছে। শাখা ও প্রশাখা খুব কম। পাতা লম্বায় ৪ থেকে ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে, দেখতে অনেকটা ডিম্বাকৃতি তবে অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, খসখসে ও বোঁটা ১—৩ ইঞ্চি লম্বা, মূলকাণ্ড ও শাখার অগ্রভাগে ৬—১২ ইঞ্চি লম্বা পুষ্পদণ্ড বের হয়, তাতে গুচ্ছাকারে বহু শ্বেতবর্ণ ও লাল আভাযুক্ত ফুল হয়, এর বহিরাবরণ রোমযুক্ত। ফলের ব্যাস ⅓ ইঞ্চি, চেপ্টা ও কালো রঙের। শীতের শেষে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়। পশ্চিমবাংলায় প্রায় সর্বত্র এবং ভারতের অঞ্চল বিশেষে কম বেশী এটি জন্মে। সাধারণতঃ জঙ্গলের ধারে, পতিত জমিতে জন্মে থাকে।

এর সংস্কৃত নাম "ঘণ্টাকর্ণ", বাংলায় প্রচলিত নাম ঘেঁটু, ভাঁট ও হিন্দীতে ভাঁট নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Clerodendrum infortunatum Linn., ফ্যামিলি Verbenaceae. ঔষধার্থ ব্যবহার্য অংশ—পাতা, ফুল ও মূল।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণ—এটি স্বাদে তিক্তরসান্বিত, বলকারক, কামোদ্দীপক, পিত্ত বিকারে ও কফে হিতকর ও ব্যথা-বেদনানাশক।

ঔষধার্থ প্রয়োগ—পাতার সদ্যরস শিশুদের ক্রিমি ও জ্বর বিনাশের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাছাড়া এটি উৎকৃষ্ট বিরেচকও। গ্রামবাসীরা এটি বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগে ও খোস পাঁচড়ায় সেবন করে থাকেন।

লোকায়তিক যোগ

এই ভেষজটির রসবিচার পূর্বেই করা হ'য়েছে, তবুও ব'লে রাখি—এইসব তিক্ত রসের স্বভাব হ'চ্ছে—বায়ু ও আকাশধর্মী, তার ফলে এরা রসবহ স্রোতে কাজ ক'রলেও পরিপাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর অর্থাৎ আহারের পরিণামে সে কাজ করে রক্তবহ স্রোতে। এইটিই হ'চ্ছে বৈশিষ্ট্য।

১। **পেট ব্যথায়—** যে ব্যথা অজীর্ণে ভোজনজনিত কারণে আসে, সে ব্যথাটা হয় কুন্‌কুনে। এর সঙ্গে থাকে পেটে অস্বস্তি। এইভাবে খানিকক্ষণ থাকার পর আর অনুভূত হয় না, তখন মনে হয় এখন আর কিছু নেই, সব হজম হ'য়ে গিয়েছে। তারপর আবার গুরুপাক কিছু খাওয়া হ'লো। তারপর আর হজম হ'লো না, কারও বা পাতলা দাস্ত হ'তে থাকলো আবার কারও ভেদ বমি দুটোই হতে থাকে; তার সঙ্গে এসে জোটে পিপাসা, তখন ঠাণ্ডা পানীয় খেতে ইচ্ছে হয়। এরই পরিণামে আসে অন্ত্রে ক্ষত। এই ধরনের ক্ষেত্রে ঘেঁটু মূলের ছাল ৩/৪ গ্রাম টাটকা ঘোলে বেটে, ছেঁকে নিয়ে এটা খেলে ওই অজীর্ণজনিত উপসর্গগুলি চ'লে যাবে। দরকার হ'লে এটা সকালে-বৈকালে দু'বারও খাওয়া যায়। অজীর্ণে ভোজনের এই কুঅভ্যাসটা কিন্তু ভাল নয়। এই ঘেঁটু মূলের ছাল দুই/একদিন সামলে দিতে পারে, কিন্তু নিত্য অত্যাচার ক'রবো আর ঘেঁটু মূলের ছাল খাবো এটা চলে না। এই যে অজীর্ণে ভোজনের কুফল, সে সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হ'য়েছে।

২। **ক্রিমিতে—** যেকোন ধরনের ক্রিমি—সে যে বয়সেই হোক না কেন, এই ঘেঁটু পাতার রস এক চা-চামচ ২/৩ চামচ জল মিশিয়ে সকালের দিকে খালি পেটে খেতে হবে। এইভাবে কয়েকদিন খেলে এর দ্বারা যেকোন ধরনের ক্রিমির উপদ্রবের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, এবং কুচো ক্রিমিগুলি ম'রে গিয়ে মলের সঙ্গে প'ড়ে যাবে। এমন কি "কেঁচো ক্রিমিও" বেরিয়ে যায়। তবে একটা বিষয়ে সাবধান থাকতে হয়, এটাতে খুবই ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাই ব'লে এই সময় যে দ্রব্য আহারে মধুর রসের আধিক্য বাড়ে সেই ধরনের কোন দ্রব্য ব্যবহার ক'রতে নেই, তাহ'লে ক্রিমির উৎপাত কমানো যায় না।

৩। **ম্যালেরিয়া জ্বরে—** এই জ্বর বেশ কিছুদিন ভোগ ক'রলে আমাদের রক্তবহ স্রোতের মূল কেন্দ্র যে যকৃত আর প্লীহা সেটা বাড়তে থাকে, তার ফলে প্রথমেই দেখা দেয় পাণ্ডুরোগ, মূত্রের পরিমাণ ক'মে যাবে, তারপরে অজীর্ণ, তারপরে পেটের দোষ একটু একটু করে সুরু হবে; এমন অবস্থা এলে তো ক'রবেনই, কিন্তু কিছু আগে থেকেই সাবধান হ'লে ক্ষতি কি? তাই ব'লছি প্রথমাবস্থায় ঘেঁটুপাতার রস এক চা-চামচ ৭/৮ চামচ জল মিশিয়ে একটু গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে হবে।

বাহ্য ব্যবহার

৪। **চর্মরোগে—** সে যে প্রকারেরই হোক না কেন, এই ভেষজটি ব্যবহার করা

যাবে। কারণ পূর্বেই বলা হ'য়েছে যে, এই ভেষজটির মৌলগঠনে আছে বায়ু ও আকাশ-গুণের আধিক্য। এই রোগটার সৃষ্টিতে থাকে কফ ও পিত্তের বিকার; অবশ্য কীট বা জীবাণু যেটাই সৃষ্টি হোক না কেন, ক্ষেত্রটা উপযোগী হ'য়েছে বলেই তো জীবাণু সৃষ্টি হ'য়েছে; সুতরাং এই দ্রব্যটিতে বায়ু ও আকাশধর্মিত্বের আধিক্য থাকায় ঐ কীটাণু বা জীবাণুকে ধ্বংস ক'রে তো দেয়ই, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রকেও শোধন করে। তাই যেকোন চর্মরোগে ঘেঁটুপাতার রস ৩/৪ দিন লাগালে ওই অসুবিধেটা চ'লে যায়।

৫। **বিছের কামড়ে—** আমরা ব'লে থাকি বিছে কামড়েছে; বিছে কিন্তু কামড়ায় না, হুল ফুটিয়ে দেয়, এর হুল একটু ফোটালেই আর রক্ষে নেই, মনে হয় জ্বলন্ত কোনকিছু ওখানে চেপে ধ'রেছে। এই সময় ওখানে ঘেঁটুপাতা বেটে লাগিয়ে দিলে জ্বালাটার উপশম হয়, এক্ষেত্রে ঘেঁটুর ফুল চ'টকে লাগালেও জ্বালার উপশম হয়।

৬। **অর্বুদে (টিউমারে)—** যে অর্বুদ দূষিত ধরনের নয়, অর্থাৎ ক্যান্সার-জাতীয় নয়, সেই অর্বুদে ঘেঁটুপাতা ও মুলের ছাল একসঙ্গে বেটে তার ঘন রস ওখানে কয়েকদিন মালিশ ক'রলে ২/৪ দিনের মধ্যেই ওটা আস্তে আস্তে ক'মে গিয়ে মিলিয়ে যাবে।

৭। **উকুনে—** মাথায় বা গায়ের যেকোন জায়গায় উকুন হ'লে ঘেঁটুপাতার রস ক'রে সেখানে লাগাতে হবে। ঘণ্টাখানেক রাখার পর ধুয়ে ফেলতে হবে। এর দ্বারা মাথার উকুন বা যেকোন জায়গার উকুন ম'রে যায়। একদিনে যদি সব নাও মরে, দুই/একদিন পরে আর একদিন লাগাতে হয়।

নিবন্ধের শেষে আমরা অনেকেই ব'লে থাকি উপসংহার করছি। খুড়োর কাছে উপসংহার অর্থ হবে—উপসর্গ খতম করো, আর পণ্ডিতের কাছে তার অর্থ হবে, উপসংহৃতি অর্থাৎ সব গুটিয়ে ফেলো। এখন পৌরাণিক উপখ্যানের ঘণ্টা কর্ণে বেঁধে লোকের কান ঝালাপালা ক'রেছিলো, আর বৈদ্যককুল ঘণ্টা গলায় বেঁধে মিউমিউ ক'রে পশ্চিমের দরজায় ব'সে ভাবছি—এক মুঠো ভাত পাব তো হায়-চরকের শিষ্য-শাবকেরা!

CHEMICAL COMPOSITION

Clerodendrum infortunatum

1. Clerodin. 2. Sterol. 3. Xanthophyll. 4. Carotene. 5. Leaves contain :— (a) Ash 8.0%; (b) Protein 21.2%; (c) crude fibre 14.8%; (d) Reducing sugars 3.0%; (e) Total sugars 17.0%. 6. Leaves contain a fixed oil consisting of (a) linolenic acid; (b) Oleic acid; (c) Stearic acid; (d) Lignoceric acid.

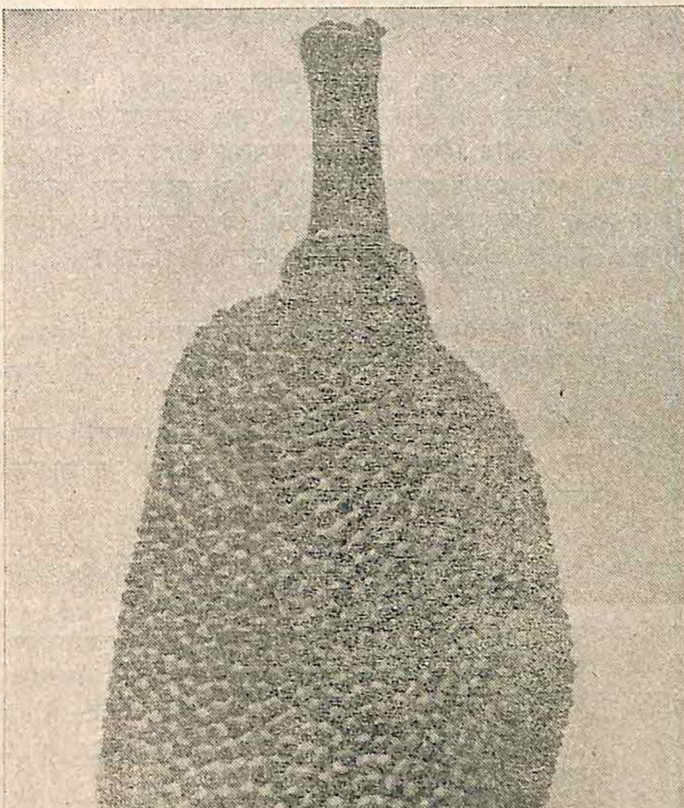
পনস [কাঁঠাল]

এই বৃহদাকার ফলটিকে উপলক্ষ্য ক'রে বাংলায় লোককথার অভাব নেই, অবশ্য সবই সমাজশিক্ষা—যেমন বলা হয়, "গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল", "কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো", গ্রামবাংলার টগ্‌রা বউ ঠাকুরপোকে ঠাট্টা ক'রে ব'লতো "লবঙ্গের বঙ্গ ছাড়া পাঁঠার ছাড়া পা, কায়স্তের অস্ত ছাড়া কিনে এনো তা", "এ যেন কাঁঠালের আঠা", ছাড়তেই চায় না।

এখন অনেকের এ প্রশ্ন, কাঁঠালটা কি আমাদের দেশে পূর্বে ছিল? না বহিরাগত? তার উত্তরে বলা যায় যে, বৈদিক ভেষজপঞ্জীর মধ্যে এই নামে কোন ফল বা ভেষজের উল্লেখ পাওয়া যায় না সত্যি, কিন্তু রামায়ণে এই নামীয় ফলটির উল্লেখ দেখা যায়। সেটা আছে ঐ মহাকাব্যের অযোধ্যা কাণ্ডে, সেখানের বর্ণনায় দেখা যায়, সে সময় শ্রীরাম নির্বাসিত হ'য়ে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ অযোধ্যা থেকে বহুদূরে চ'লে গিয়েছেন চতুর্দশ বৎসরের জন্য, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে; সে সংবাদ পেয়েই ভরত এলেন অযোধ্যায়, এবং বেশ কিছু সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজকীয় মর্যাদায় আবার শ্রীরামকে ফিরিয়ে আনতে; অযোধ্যা থেকে বহির্গত হ'লে, পথে সাক্ষাৎ হ'লো গুহকের সঙ্গে, তিনিই পথ-প্রদর্শক হ'লেন—শ্রীরামের অবস্থান এখন কোথায়!

কিছুদূর আসার পর ওঁরা এলেন ভরদ্বাজের আশ্রমে। ভরত যথোচিত মর্যাদায় সম্মানিত হ'লেন মুনি ভরদ্বাজের কাছে, তার পরেই তিনি ওখান থেকে ফিরে যেতে চাইলেন, কারণ সঙ্গে ছিলেন প্রচুর লোকজন। ভাবলেন, মুনির আশ্রমপীড়া হবে। রাজা ভরতের এই সঙ্কোচের কারণটা বুঝতে পেরে তিনি হেসেই ব'ললেন, সেকি! আপনি যাবেন কেন, আপনার সঙ্গে যত লোক র'য়েছেন তাঁরা অনায়াসে সুখে কাটাতে পারবেন এখানে, কারণ কোন কিছুরই অভাব নেই। আমার জীবনের ব্রতই এই—অতিথি-সৎকার আমায় ক'রতেই হবে। ভরত লজ্জিত হ'লেন। মুনির বিপুল ঐশ্বর্যের মূল

শক্তি যে যোগবল, তাই তাঁরা অনুভব ক'রলেন অচিরেই। ভরতের সৈন্যসামন্তদের এবং তার সংগে সহযাত্রী যে হাতি ঘোড়া সকলেরই খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা হ'য়ে গেল, এমনকি মদ্যও এসে গেল। রাজা ভরত আরও আশ্চর্য হ'লেন সময়-অসময়ের ফল-মূলের প্রাচুর্য দেখে। তিনি ভরদ্বাজের বিশাল বাগান ঘুরে দেখলেন সেখানে আছে—



তস্মিন্ বিল্বাঃ কপিত্থাশ্চ পনসা বীজপূরকাঃ।
আমলক্যো বভূবশ্চ চূতাশ্চ ফলভূষিতাঃ॥

অর্থাৎ বেল, কত্‌বেল, কাঁঠাল, বাতাবিলেবু, আম প্রভৃতি বিভিন্ন ফলের গাছে ভরা সেই বাগান।

এ তো গেল ভরদ্বাজের বাগানের কাঁঠাল, এদিকে শ্রীরাম যখন চিত্রকূটে বাস ক'রছেন, তখন সেখানকার প্রাকৃতিক বনশোভায় কত রকমের গাছ দেখেছেন তার বর্ণনার প্রতিলিপি হ'লো—

আম্র জম্বসনৈ লোধ্রৈ পিয়ালৈঃ পনসৈরপি।
অঙ্কোঠৈর্ভব্য তিনিশৈ র্বিল্ব তিন্দুক বেনুভিঃ॥

অর্থাৎ আম, জাম, অসন, লোধ, পিয়াল, কাঁঠাল, ধব, চালতা, তিনিশ, তিন্দুক (গাব ও কেঁদু বা কেঁউদ্), বেল প্রভৃতি চিত্রকূটে আরও অন্ততঃ দশ বারো রকমের ভাল ভাল ফলের গাছ। এটাও কিন্তু রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের বর্ণনা।

তারপর শ্রীরাম যখন চিত্রকূট ছেড়ে পঞ্চবটীতে এসে স্থায়ীভাবে আশ্রম নির্মাণ ক'রে দীর্ঘকাল বসবাস ক'রলেন সেখানেও দেখেছেন, ওই ভূমিতে কত রকমের গাছ— যেগুলি সেখানের মাটিতে অযত্নজাত। সেখানকার বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে—

স্যন্দনৈ শ্চন্দনৈ নীপৈঃ পনসৈঃ লকুচৈ রপি।
ধবাশ্চ কর্ণখদিরৈঃ শমী-কিংশুক পাটলৈঃ॥

অর্থাৎ চন্দন, কদম, কাঁঠাল, লকুচ (ডেহুয়া), ধব, পলাশ, শমী, খদির, পাটল (পারুল) প্রভৃতি আরও কত। অতএব কাঁঠাল যে সুপ্রাচীন এবং তা ভারতেরই এক প্রখ্যাত ফল তা রামায়ণেই পাওয়া গেল।

বৈদ্যকের এক্তিয়ারে

এই ফল যে আয়ুর্বেদীয় সুপ্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রামাণ্য সংহিতাগ্রন্থ চরকে আছে এবং এটি ভেষজ হিসেবেও সুপরীক্ষিত হ'য়েছিলো তারও নিদর্শন রয়েছে চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ের ১১৬ শ্লোকে। ওখানে বলা হ'য়েছে—

সম্পক্কং পনসং মোচং রাজাদান ফলানি চ।
স্বাদূনি সকষায়াণি স্নিগ্ধশীতগুরূণি চ॥

কাঁঠালের পাকা ফল শুধু সুমিষ্ট নয়, সামান্য কষায় রস স্নিগ্ধগুণ এবং শীত-বীর্য, অর্থাৎ একাধারে এর মধ্যে আছে পিত্তহারিত্ব, ধাতু বর্ধকত্ব, শোণিত স্তম্ভকত্ব, বর্ণকরত্ব; তবে সামান্য শ্লেষ্মাবর্ধক, অতএব বিপাকে গুরু। মৌল উপাদানে এটি আপ্যধর্মী ভেষজ। তারপর সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের ১৮১ শ্লোকে এবং ১৮৫ শ্লোকে—

পনসং স কষায়ংতু স্নিগ্ধং স্বাদুরসং গুরু।

অর্থাৎ কাঁঠাল ফল পাকা হ'লে স্বাদুরস ঠিকই, তবে সামান্য কষায়ধর্মিতা থাকেই, এবং বিপাকে (পরিপাকান্তে) গুরুতা আনে। তারপর ষষ্ঠ শতকের বাগ্ভটের সূত্র-স্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১২০—১২২ শ্লোকে পূর্ববর্তী চরক ও সুশ্রুত সংহিতাদ্বয়ের

অভিমতকেই অনুসরণ করা হ'য়েছে।

হয়তো ক্ষুদ্র একটা প্রশ্ন মনে আসে যে "পনস" এই তিনটি অক্ষরে ফলটির নামকরণের মধ্যে কি আয়ুর্বেদের দ্রব্যগুণ বিচারটি সম্পুটিত করা আছে? তার উত্তরে বলা যায় যে—হ্যাঁ, এর মৌল ধাতুটি পন এবং সেটি আত্মনেপদী, এটিতে অসচ্ প্রত্যয় ক'রেই পনস্। পন ধাতুর অর্থ দূর করা বা তাড়িয়ে দেওয়া। অতএব ধাতুগত অর্থকে ভিত্তি ক'রলে চরক সুশ্রুতের দ্রব্য বিচারটি স্নিগ্ধ ও শীতবীর্যবত্তার জন্য পিত্ত-হারকত্বটাই পন ধাতুর বক্তব্যার্থ।

এরপর দেখা যায় একাদশ শতকের চক্রপাণি দত্ত মহাশয় তাঁর প্রণীত দ্রব্যগুণ বিচারের গ্রন্থে চরক সুশ্রুতের অভিমতকেই সম্মতি জানিয়ে—পনসং সকষায়ং তু স্নিগ্ধং স্বাদুরস গুরু—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রেছেন।

আয়ুর্বেদিক মহল থেকে আর একটি প্রশ্নেরও উত্তর র'য়েছে—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া—যেমন বৃক্ষত্বক্ ও পত্রের দ্রব্যগুণ সম্পর্কে কোন যোগেরই উল্লেখ নেই, তেমনি পনস বা কাঁঠালের সম্পর্কে ঠিক ততখানি না হ'লেও ফলগুণ প্রাধান্যেই পনসের ভৈষজ্য সাধন।

তবে একটিমাত্র গ্রন্থ রাজনিঘণ্টুর ১১ অধ্যায়ে দেখা যায়, এই পনস বা কাঁঠাল গাছের পাতা, পাকা ও কাঁচা কাঁঠালের (এঁচোড়) দ্রব্যশক্তি ও কাঁঠালের বীজ নিয়েও গবেষণা হ'য়েছে।

পরবর্তীকালে তাকেই অবলম্বন ক'রে লোকায়তিক যোগগুলি প্রচলিত হ'য়েছে।

নব্যের সমীক্ষায়

ইহার ফল কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই উপাদেয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা ফল কষায়ধর্মী এবং পাকা ফল মৃদু বিরেচক গুণসম্পন্ন।

১। কাঁঠালের কচি পাতা বিবিধ চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

২। কাঁঠাল গাছের আঠা গ্রন্থি ফুলায় এবং ফোড়া পাকানোর জন্য প্রলেপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩। কাঁঠাল গাছের শিকড় অতিসারে খেতে দেওয়া হয়।

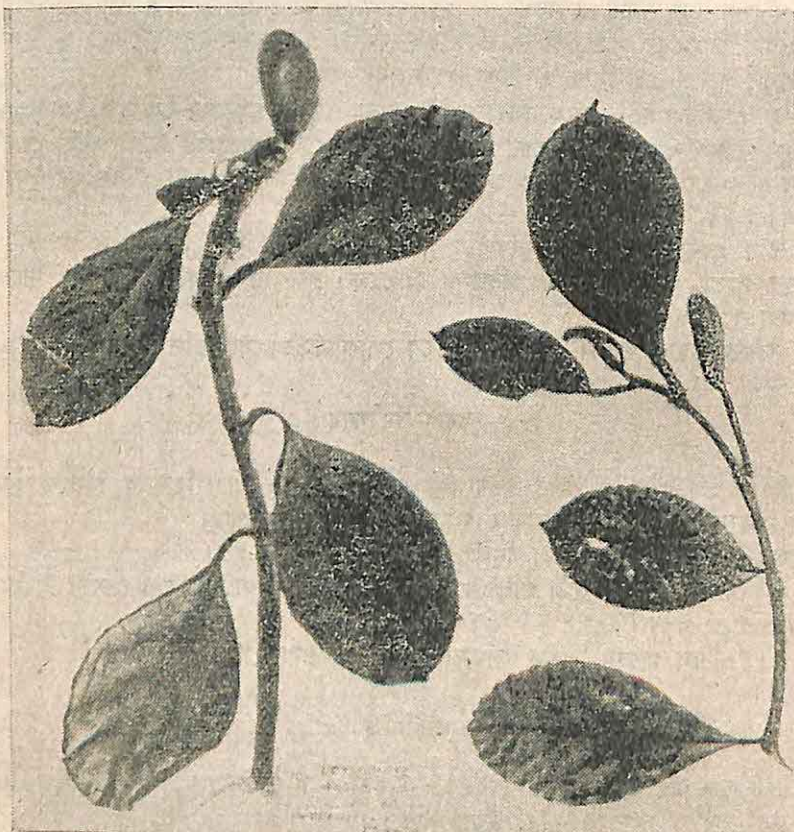
পরিচিতি

চিরসবুজ এই গাছটি সমগ্র ভারতবর্ষে অল্পবিস্তর রোপিত হয়, এমন কি ৪০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত স্থানেও এটি পাওয়া যায়।

এটি বট অশ্বত্থের মত বৃহদাকার হয় না বটে, তবে দীর্ঘদিনের হ'লে ৫০/৬০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হ'তে দেখা যায়, গাছের ছাল ধূসর, কাঠ খুব একটা শক্ত নয়, মিহি আঁশ, রঙ হ'লদে, পাতার আকার লম্বায় ৬/৭ ইঞ্চি এবং চওড়া ৪/৫ ইঞ্চি হয়। পাতার আগাটা (অগ্রভাগটা) ডিমের আকারের মত এবং ঈষৎ পুরু। গাছের গায়ে ও শাখায় সবুজ রঙের কাঁঠাল হয়—এক একটা বৃহদাকারও হয়। অপক্কাবস্থায় একে আমরা এঁচোড় বলি এবং তরকারি হিসেবে সেটাকে ব্যবহার করি। গাছে ও ফলে দুধের মত সাদা চিট্‌চিটে আঠা, গায়ে লাগলে আর ছাড়তে চায় না, তাই তো আমরা ক্ষেত্রবিশেষে উপমা দিয়ে থাকি, "লোকটা যেন কাঁঠালের আঠা।"

এদেশে বিশেষতঃ বাংলায় এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে এই গাছ যত্রতত্র হয়ে থাকে। সুতরাং এর বিশেষ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

অগ্রহায়ণ পৌষে ফুল, তারপরে ফল। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে ফল পাকে। আবহাওয়ার তারতম্যে অন্য ঋতুতেও কোন কোন অঞ্চলে কাঁঠাল হয়, এই যেমন মাদ্রাজ অঞ্চলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে কাঁঠাল হয়। এর সংস্কৃত নাম পনস, হিন্দীতে কাণ্‌থাল্। এই গাছের বোটানিক্যাল নাম Artocarpus heterophyllus, Lam. এই Artocarpus গণের ৪০টি প্রজাতি এশিয়া মহাদেশের উষ্ণপ্রধান অঞ্চল সমূহে পাওয়া যায়। এদের ফ্যামিলি Moraceae. ব্যবহার্য অংশ পাতা, ফল, মূল, আঠা ও কাঠ।



লোকায়তিক ব্যবহার

১। **ক্লান্তিতে—** যেকোন কারণে পরিশ্রান্ত অথবা ক্লান্ত হ'লে কাঁঠালের রস ৩/৪ চা-চামচ মাত্রায় নিয়ে আধ কাপ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে ক্লান্তিটা চলে যাবে। এক্ষেত্রে একটা কথা জানিয়ে রাখি—যাঁদের সর্দির ধাত কিংবা সর্দি হয়েছে, তাঁরা পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও কাঁঠালের রস খাওয়া ঠিক হবে না।

২। **দৌর্বল্যে—** বার্ধক্যের ক্ষয় জনিত দুর্বলতায় অথবা যেকোন কারণে শরীর ক্ষয় হতে থাকলে যে দুর্বলতা আসে, সেক্ষেত্রে কাঁঠালের স্বচ্ছ রস এবেলা-ওবেলা দু'বেলা ৫/৬ চা-চামচ ক'রে খেলে দুর্বলতাটা থাকবে না।

৩। **অরুচিতে—** মানসিক কারণে অরুচি যে হয় না তা নয়, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পিত্ত অথবা বাত-পিত্ত বিকারে অরুচি দেখা দেয়, এই অরুচির উৎপত্তিস্থান হচ্ছে আমাশয়ে। একমাত্র বিকৃত শ্লেষ্মা ছাড়া অন্য দু'টি কারণে বা পিত্ত প্রকৃতির ব্যক্তির যদি বিকার হয়, তবে কাঁঠালের রস ২/৩ চা-চামচ নিয়ে তার সঙ্গে মরিচ চূর্ণ ২/১ টিপ ও সামান্য একটু চিনি মিশিয়ে কয়েকদিন খেলেই অরুচিটা চলে যায়। কেবল দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেও চলে।

৪। **হৃদ্দৌর্বল্যে—** এ সম্পর্কে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে অনেকবারই বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কাঁচা কাঁঠালের অর্থাৎ এঁচোড়ের টুকরো (বহিরাবরণ সমেত) অল্প জল দিয়ে বেটে নিংড়ে সেই রস ৪/৫ ফোঁটা অল্প দুধসহ তিন ঘণ্টা অন্তর কয়েকবার খেলেই হৃদ্দৌর্বল্যজনিত বুক ধড়ফড়ানিটা কমবেই।

৫। **মাংসাশ্রিত বাতে—** যাঁরা মাংস খাওয়ার পরিমাণ ক্রমেই বাড়াতে থাকেন, পরিণামে তাঁদের মাংসগ্রন্থিগুলো ক্রমেই শক্ত হয়ে যায়। মাংস খাওয়ার একটা উপকারিতা আছে, কিন্তু সব মাংস সবার ক্ষেত্রে উপকারী নয়, সে দিক্‌টা বিচার ক'রে পরিমাণমত মাংস খেলে কোন অসুবিধে হয় না। যেক্ষেত্রে মাংসের বাছ-বিচার না ক'রে ক্রমেই পরিমাণ বাড়ানো হয়, সেক্ষেত্রে তারই পরিণতিতে শিরাগুলো ক্রমশঃ মোটা হ'তে থাকে, অধিকন্তু মাংসগ্রন্থিগুলিও শক্ত হয়, শেষে মাংসজ বাতের পীড়া এসে হাজির হয়। মাংসজ বাত একবার ধরলে হঠাৎ ছেড়ে যাওয়ার কোন লক্ষণ সহসা দেখা যায় না। এক্ষেত্রে কাঁঠালের মধ্যস্থিত শক্ত দণ্ডটি কুচি কুচি ক'রে কেটে ৪/৫ গ্রাম নিয়ে ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে এবেলা-ওবেলা দু'বেলা খেলে ও-রোগটা সেরে যাবে। (বিকল্প ক্ষেত্রে এঁচোড়ের দণ্ডটিও নেওয়া যায়।)

৬। **চর্মরোগে—** যেকোন চর্মরোগ, যেমন—দাদ, একজিমা, হাজা, চুলকুনি প্রভৃতি রোগে কাঁঠালের কচি পাতা ২/৩টি থেঁতো ক'রে ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সকালে ও বৈকালে দু'বেলায় ওটা খেতে হবে এবং ঐ জল বেশী পরিমাণে তৈরী ক'রে ব্যাধিত স্থানগুলি ধুতে হবে। এর দ্বারা অতি সহজেই এগুলির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এর থেকে তেল তৈরী ক'রে রাখলেও হ'তে পারে (১০০ গ্রাম সরিষার তেল কড়ায় চাপিয়ে মৃদু জ্বাল দিতে হবে। তেল নিষ্ফেন হলে অর্থাৎ তেলে ফেনা মরে গেলে কাঁঠাল পাতা বাটা আন্দাজ ১০ গ্রাম তাতে দিয়ে ভেজে নিলে তেলটি তৈরী হয়। তবে মনে রাখতে হবে—বাটাটি যেন পুড়ে না যায়, আবার কাঁচাও যেন না থাকে।)

৭। **রক্তপিত্তে—** এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে বহুবারই বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কাঁঠালের বীজ ৮/১০টা অল্প থেঁতলে নিয়ে ৫/৬ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ২/৩ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সারাদিন ৪/৫ বারে ওটাকে খেতে হবে। ২/৩ বার খাওয়ার পর বোঝা যাবে—গলা সুড় সুড় ক'রে যে কাসির ধমকটা আসতো ও সেইসঙ্গে এক ঝলক রক্ত উঠতো, সেটা আর হচ্ছে না।

বাহ্য-প্রয়োগ

৮। **শোথে—** যে শোথের কারণ বাত-পিত্তের বিকার, সেখানে এঁচোড়ের ক্বাথ ক'রে ফুলোয় সেই ক্বাথ লাগালে একদিনেই কমে যায়। অবশ্য বায়ু বা পিত্ত বিকারের হলে সারবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য— যেকোন প্রকারের কাঁঠাল (মজা বা খাজা) হোক না কেন, পাকা কাঁঠালের বীজ বের ক'রে সেই কোষ (কোয়া) চটকে নিয়ে ছেঁকে ঐ রস ঔষধার্থে ব্যবহার করা উচিত। বিচালির টুকরো (৪/৫ ইঞ্চি) কয়েকটা নিয়ে কাঁঠালের কোয়ার সঙ্গে ধ'রে চাপলেই সহজে পাতলা রস বেরোয়, তারপর সেটাকে ২/৩ বার ছেঁকে নিলেই চলবে।

কাঁঠাল শেষ ক'রে ফেললাম, এখন তো কেবল ভূতুড়ি প'ড়ে রইলো।

আগে লোকে ব'লতো, "পিরীতের আঠাকাঠি যেন কাঁঠালের আঠার", এখন কিন্তু তা আর নেই, এখনকার ভোমরাগুলোও তো চালাক হ'য়ে গিয়েছে, ও আঠাকাঠিতে আর তারা বাঁধা পড়ে না, কারণ ওটাতে যেন আর আঠা নেই।

আবার গৃহী ধার্মিকরা ব'লেছেন—সংসার করবে, ঠিক যেন হাতে তেল মাখিয়ে কাঁঠালের কোয়া খাওয়ার মত। যেন আঠায় না জড়িয়ে পড়ো, কিন্তু বৈদ্যকগোষ্ঠীর কাঁঠালের কোয়াটাই জুটছে না, তারপরে তো তেল, তারপরে সেবা। আসল কথা, সে তেল লাগানোর বিদ্যেও তো হারিয়েছে। কাঁঠালের কোয়া তুলে খাওয়া যাবে কি ক'রে! সে তেলের সন্ধান ক'রে নেওয়ার ক্ষমতাও নেই, তাই অন্যে খায় আর বৈদ্যকগোষ্ঠী তা শুধু দেখে থাকেন; পরে ভূতুড়ি নিয়ে খুঁজতে থাকেন এর মধ্যে কোয়া আছে কিনা। আজ তাই ভাবছি, এ তেলের সন্ধান কি বৈদ্যককুল আর পাবে? মনে হয় সে আজ দূর অস্ত্!

CHEMICAL COMPOSITION

Artocarpus intigrifolia

1. The fruit contains (a) Moisture 77.2%; (b) Protein 1.9%; (c) Fat 0.1%. (d) Carbohydrates 18.9%; (e) Fibre 1.1%; (f) Mineral matter 0.8%; Calcium 0.02%; Phosphorus 0.03%; iron 0.5 mg. (g) Vitamin A 540 IU. (h) Vitamin C 10 mg/100 g. 2. Seeds contain :—(a) Moisture 51.6%; (b) Protein 6.6%. (c) Fat 0.4%; (d) Carbohydrates 38.4%. (e) Fibre 1.5%; (f) Mineral matter 1.5%. 3. Vitamin B_1 & B_2. 4. Artostenone (a steroketone).

কর্মরঙ্গ [কামরাঙা]

"রঙ্গ ক'রে কর্ম করার রূপক হ'লো কামরাঙায়,
বাল্মীকি তার রূপ দিয়েছেন শূর্পনখার রূপখানায়।"

রামায়ণ প'ড়ে থাকলে নিশ্চয়ই আপনার নজরে এসেছে পঞ্চবটী বনের কাহিনী, (সেটা আছে অযোধ্যা কাণ্ডের ১৭/১৮ অধ্যায়ে)।

একটা কথা মনে প্রশ্ন জাগায় যে, রাম জন্মাবার আগেই তো রামায়ণ লেখা হ'য়েছিলো? তাহ'লে এই মহাকাব্যের যত চরিত্র এবং তার বৈশিষ্ট্য সবই কি ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রের মত হুবহু ঘ'টেছিলো? তাহ'লে এটা কি এক ভাঁড়েরই কর্পূর? যাক্, গৃহস্থ শতেক পাপী, আর চোর হ'লো এক পাপী, কারণ গৃহস্থের সন্দেহ দশ-দশের ওপর।

আর একটা কথা কি জানেন? বুদ্ধিমান লোকে বিষ্ঠা মাড়ালে তা তিন জায়গায় লাগে, প্রথমে জুতোয়, সন্দেহ নিরসনের জন্য আঙ্গুলে, সেটা আরও নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার জন্যে শুঁকতে গিয়ে নাকের ডগায়। আর এক্ষেত্রে মোটাবুদ্ধির লোকের সমস্যাটা ওই জুতোতেই থেকে যায়; সুতরাং রাম আগে না রামায়ণ আগে, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে হাত থেকে করতালটাই প'ড়ে যাবে।

যাক, নিবন্ধোক্ত বনৌষধিটির নাম কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকির কলমের ডগায় স্থান পেয়েছে। সে ঘটনাটা ঘ'টেছিল পঞ্চবটী বনে। উপাখ্যানটা শুনুন—রাম, লক্ষ্মণ, সীতা তখন পঞ্চবটীর আশ্রমে। সেখানে এসেছিলো রাবণের বোন শূর্পনখা; তার এই নামটা কেন দিয়েছিলো জানেন? তার হাত-পায়ের নখগুলি ছিল এখনকার মেয়েদের থেকেও বড়, কুলোর মত। এই শূর্প শব্দের অর্থই হ'লো কুলো। এ শূর্পনখা রামের অপূর্ব রূপ দেখে কামপীড়িতা হ'য়ে পড়ে; প্রথমটা ইতস্ততঃ করে, থাকতে না পেরে অবশেষে ব'লেই ফেললো, এত রূপ আমি আর কখনো দেখিনি, তোমাকে দেখেই আমি মনে

মনে তোমাকে পতিত্বে বরণ ক'রেছি, এখন আমাকে তুমি পত্নীরূপে গ্রহণ করো, তুমি চিরকাল আমার স্বামী হও। ওই সীতা কি তোমার উপযুক্ত? দ্যাখো, আমার ভাই রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, সবাই এক একটা বড় বড় দিক্‌পাল। তাছাড়া, শূর্পনখা নিজের গুণ গাইতে তো বাকীই রাখ'লো না। তারপর এ প্রস্তাবও ক'রলো—"আমাকে নিয়ে তুমি আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে এখানে থাকো"।

রাম শূর্পণখার এই প্রস্তাব শুনে মুচকে হেসে ব'ললেন—দ্যাখো, তুমি তো চমৎকার মেয়ে, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করার বাধা কোথায় জানো? আমার পত্নী সীতা রয়েছেন; তোমাকে যদি বিবাহ করি তাহ'লে তোমার মত মেয়েকে ওঁর দাসী করা কি ঠিক হবে? তার থেকে তুমি আমার ভাই ওই লক্ষ্মণ—ও এখনও অবিবাহিত, ওকেই বিয়ে করো, ও বিয়ে ক'রতেও ইচ্ছুক। রামায়ণের সে শ্লোকটি হ'লো—



অনুজস্ত্বেষ মে ভ্রাতা শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
অনুরূপশ্চ তে ভর্ত্তা রূপস্যাস্য ভবিষ্যতি॥
শ্রীমানকৃতদারশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্য্যবান্।
অপূর্বো ভার্যায়া চার্থী তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ॥

রামের সরস চাতুরী ধ'রতে না পেরে, শূর্পনখা লক্ষ্মণের কাছে গেল, তেমনি ক'রে আবার সেই প্রস্তাবই ক'রলো। লক্ষ্মণ বিনীত স্বরে ব'ললেন, দ্যাখো, আমি হ'লাম রামের দাস, তোমাকে বিবাহ ক'রলে—তখন তুমিও হবে তাঁর দাসী; সেটা কি ভাল? শূর্পনখা লক্ষ্মণের চাতুরীও বুঝতে পারলো না, তখন কামাতুরা হ'য়ে রামের কাছেই এগিয়ে যেতেই সীতা আঁত্‌কে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই রাম লক্ষ্মণকে ব'ললেন, লক্ষ্মণ! আর দেরী ক'রো না, ওই কামরাঙ্গার মত শিরাসর্বস্ব রাক্ষসীটার রূপটাকে আরও কুৎসিত ক'রে দাও।

ন কার্য্যং পশ্য বৈদেহীং পরিহাসঃ কথঞ্চন।
কর্মরঙ্গশিরালাংত্বং বিরূপয়িতুমর্হসি॥

এর পর কি ঘ'টলো সে তো সবারই জানা।

এই সাতকান্ড রামায়ণের অনেক কাহিনীই এই শূর্পনখার নাককান কাটাকে ভিত্তি ক'রে। মহাকবি বাল্মীকিই বর্ণনা ক'রেছেন শূর্পনখার আসল রূপটি কেমন ছিল। তার রূপের উপমা দিয়েছেন শিরালা কামরাঙ্গা আকৃতির সঙ্গে।

এইবার একে নিয়ে একটা লোকায়তিক হে'য়ালির কথা বলি—

রুইলাম কালোজীরে হ'লো শালডাঙ্গা
ফুটিলো পারুল ফুল ধরে কামরাঙ্গা?

বলুন তো এটা কি হ'তে পারে?

দেশগাঁয়ের লোক হ'লে আপনার বোঝার অসুবিধে হবে না—তিল, তার গাছ, তার ফুল ও ফল মিলিয়ে দেখুন হে'য়ালীর উত্তর এই তিল। আর এই তিলের, তার গাছ-গাছগুলির গুণাগুণ চিরঞ্জীব বনৌষধির দ্বিতীয় খন্ডের ৩১১ পৃষ্ঠায় খুঁজে পাবেন।

এইবার বৈদ্যের পাঁতি খুলি—প্রাচীন আয়ুর্বেদ সংহিতায় যত অম্লাস্বাদের ফলের উল্লেখ, তাদের মধ্যে দন্ত্যশঠ, ভব্য, এই দুটি নামের অনুবাদ এবং টীকায় কেচিৎ ইতি ব'লে জের টেনে বলা হ'য়েছে, ও দুটি নাম কর্মরঙ্গ বা কামরাঙ্গাতেও হয়; কিন্তু চাল্‌তা (ভব্য) এবং আমরুল (Oxalis corniculata) এদুটি নামেরই সমর্থনে যেমন যুক্তি এবং নিঃসন্দিগ্ধতা আছে, কর্মরঙ্গ নামের পর্যায়ে এবং তাদের ব্যাখ্যায় কিন্তু তেমন নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না, কারণ সর্বশেষে রচিত ১৬ শতকের রচিত ভাবপ্রকাশে কর্মরঙ্গ বা কামরাঙ্গার নামের পর্যায়ে তা নেই, এই জন্যই নিঃসন্দেহে বলা যায় কর্মরঙ্গ ফলটির উল্লেখ যখন ভাবপ্রকাশেই র'য়েছে, তখন আর কোন ভারতীয় সুপ্রাচীন গ্রন্থে আছে? কেন, সেটার প্রমাণ তো রামায়ণই।

এখন দেখা যাক, এই শব্দটি সাধিত হ'য়েছে কিভাবে—

কর্মণি=ভোজনাদৌ রঙ্গো রুচির্ভবতি, রঙ্গ্‌ ধাতৌ ঘঙ্‌

অর্থাৎ এই ফলটির রস ভোজনের আদিতে গ্রহণ ক'রলে অন্নে রুচি হয়। রঙ্গ্‌ ধাতুর উত্তরে ঘঞ্‌ প্রত্যয়।

ভাবপ্রকাশোক্ত শ্লোক

কর্মরঙ্গঃ শিরালং চ বৃহদম্লং রুজাকরম্‌।
শীতবীর্য্যং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতকৃৎ।
(আম্রাদি ফল বর্গ)

এর গুণ পরিচয় হ'লো—এটি শীতবীর্য, মল সংগ্রাহক, অম্লরস, আর তার কর্মগত পরিচয়=এটি কফবিকার ও বায়ুবিকার দূর করে। এ অভিমত শুধু ভাবপ্রকাশেরই নয়; রাজনিঘণ্টুকারেরও।

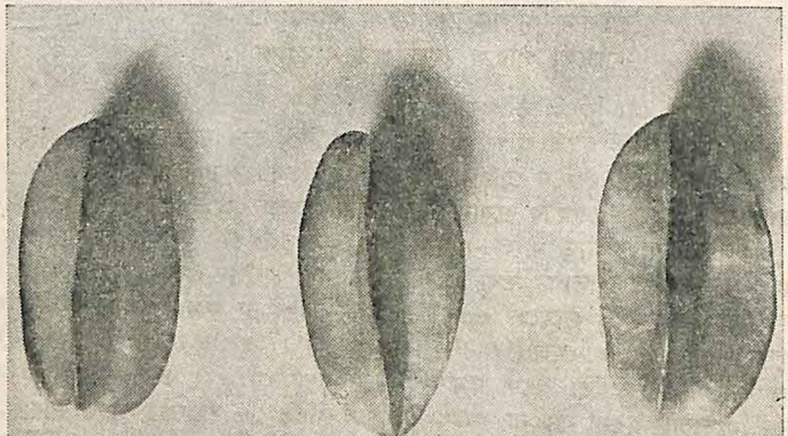
চরক সংহিতায় দোষ বিকারের অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফবিকারের জন্য চিকিৎসা সূত্র বলা হ'য়েছে—

তং মধুরাম্ললবণ স্নিগ্ধোষ্ণৈ রুপক্রমৈঃ বায়ুং

(চরক সূত্রস্থান ২০ অধ্যায়)

অর্থাৎ মধুর, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য দ্বারা বায়ু ও বায়ুবিকারের চিকিৎসা ক'রবে।

দ্বিতীয় কথা—শ্লেষ্মবিকার দূর ক'রতে হ'লে অর্থাৎ বক্ষস্থল, মস্তক, গ্রীবা পর্বসমূহ, আমাশয় ও মেদোবহ স্রোতই হ'লো শ্লেষ্মার স্থান, তাহ'লেও বক্ষোদেশেই শ্লেষ্মবহ স্রোতের অবিরাম গতি। অতএব বায়ুর স্থান এবং শ্লেষ্মার স্থানের ব্যাধি দূর করার পক্ষে কর্মরঙ্গ বা কামরাঙ্গার রস খুবই উপযোগী। এ বিচারটি আরও পরিষ্কার ক'রে লিখিত হ'য়েছে চরকের সূত্রস্থানের ২৬ অধ্যায়ে।



ওখানে বলা হ'য়েছে অম্লোরসঃ ভক্তং রোচয়তি, অগ্নিং দীপয়তি—দেহং বৃংহয়তি প্রভৃতি, অর্থাৎ অম্লরস পাচনক্রিয়ার সাহায্য করে, কারণ দ্রুত লালাস্রাব করায়, রুচি আনে, অগ্নিবল বাড়ায়, আর বায়ুর অনুলোমন করে। এবং রক্তবহ সংস্থানে এটি হৃদ্য, তবে এই অম্লরসের অত্যধিক সেবায় রক্তপিত্ত রোগের সৃষ্টি করে। আর একটি দোষ শুক্রের বলের হ্রাস করে, এমন কি শুক্রের জীবকীটও বিনষ্ট করে। তবে মূত্রবহ স্রোত পরিষ্কার রাখে এই জন্যই রসবহ স্রোতের বল বাড়ায়। যে কামরাঙ্গা মধুরাম্ল সেইটিই উৎকৃষ্ট। কারণ মধুর রসও রুচিকর, এবং অন্নের সংযোগে তৃপ্তি আনে, যেহেতু ওতেও পার্থিব শক্তির অনুযোগ আছে। কামরাঙ্গার স্বাভাবিক রসশক্তিটি রসবহ স্রোতেই কাজ করে অর্থাৎ মানবদেহের নাভিকে কেন্দ্র করে যেসব স্রোতপথ রয়েছে সেগুলিতে আহার্য রস প্রবাহিত হয়, তাদেরই নাম রসবহ স্রোত, এদের সংখ্যা ২৪টি। এদেরই মাধ্যমে

আমাদের আহার্য রসটি প্রবাহিত হ'য়ে থাকে, এবং পরে হৃদয়ে এসে ওখানে প্রধমিত হ'য়ে তিনটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়, তখন তাদের নাম রক্তবহ স্রোত, সেই তিনটির মহামিলন ঘটে যকৃৎ ও প্লীহায়। বাক্‌প্রবৃত্তি, নিদ্রা, জাগরণ, শুক্র-সংজনন প্রভৃতি কাজগুলি দ্রুত নিষ্পন্ন হয়। অএতব মূলতঃ রক্তবহ স্রোতই আমাদের জীবন ধারণের আদিতম। এইজন্য যে কোন আহার্য পথ্য ও ঔষধ সবের মধ্যেই বিশুদ্ধতা রক্ষা ক'রতে হয়। আর ঔষধ চিন্তার সময়েও ওই বিজ্ঞানের কথা মনে রাখতে হয়। যাতে ভৈষজ্য-শক্তিটি রসবহ স্রোতের মাধ্যমে এসে সেইজাতীয় ব্যাধি দূর ক'রতে পারে।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণ—কাঁচা ফল স্বাদে অম্ল, দেহের তাপ বর্ধক ও বক্ষের পীড়াদায়ক। পাকাফল স্বাদে মধুরাম্লরস, বলকারক ও পিত্তবর্ধক।

ঔষধার্থ প্রয়োগ—কম্বোডিয়ায় এই গাছের পাতা বেদনানাশক ঔষধ হিসেবে ও খোস-পাচড়া নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত ইন্দোচীনে উক্ত পাতার রস ক্রিমির উপদ্রবে ও চুলকানিতে প্রয়োগ করা হয়।

পাকা ফলের রস কোন কোন দেশে রক্তাতিসারে ও যকৃতের রোগে ব্যবহৃত হয়।

পরিচিতি

শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট মাঝারি ধরনের গাছ। উচ্চতায় সাধারণতঃ ২০—২৫ ফুট পর্যন্ত হতে দেখা যায়। ছালের বর্ণ ধূসর। পাতা ২/৩ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়, বোঁটার দিকটা অনেকটা ডিম্বাকৃতি এবং অগ্রভাগ ক্রমশ সরু, এরা কিন্তু কচি অবস্থায় অনেকটা রক্তাভ বর্ণের হয়ে থাকে ও পরে সবুজ বর্ণ ধারণ করে। কচি কান্ডের অগ্রভাগ থেকে গুচ্ছাকারে ছোট ছোট ঈষৎ লাল আভাযুক্ত ফুল বের হয়, তবে পুরাতন কান্ড থেকে যে ফুল বের হয় না তা নয়। ফল ৩/৪ ইঞ্চি লম্বা, ৫টি শিরা বিশিষ্ট এবং দুইটি শিরার মাঝখানটাই অপেক্ষাকৃত নীচু। কাঁচা অবস্থায় সবুজ কিন্তু পাকলে পীতবর্ণের ও সুগন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। কাঁচাফল কষায় রসযুক্ত ও পাকলে অম্লমধুর হয়। এটি অনেকে অম্বল ও আচার করে খেয়ে থাকেন। সাধারণতঃ দুই প্রকারের কামরাঙ্গা দেখা যায়—একটি মধুর ও অপরটি অম্ল। জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ফুল আসে, তারপর ফল এবং সেটা নভেম্বর মাস থেকে পাকতে শুরু করে। ভারতের সর্বত্রই বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে একে লাগানো হয়ে থাকে, এছাড়া লাহোরেও দেখতে পাওয়া যায়।

এই গণের (Genus) ৩টি প্রজাতি আছে, তৎমধ্যে ২টি ভারত ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে বর্তমান। এর সংস্কৃত নাম কর্মরঙ্গ ও শিরাল, বাংলায় প্রচলিত নাম কামরাঙ্গা, ও হিন্দীতে খম্‌রক্, কামরাঙ্গা নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Averrhoa Carambola Linn. ও ফ্যামিলি Oxalidaceae.

ঔষধার্থ ব্যবহার্য অংশ—ফল, পাতা ও মূল।

লোকায়তিক যোগ

এটি রসবহ স্রোতেই কাজ করে।

১। **অতিসারে—** এই কামরাঙ্গা ধারক ঔষধরূপে প্রয়োগ ক'রতে হয়; তবে

অতিসার রোগের প্রথম অবস্থায় কখনও ধারক ঔষধ দেওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় কামরাঙ্গার রস খাওয়াতে নেই, কিন্তু রোগীর অত্যধিক পাতলা পায়খানা হ'তে হ'তে দেহের বল হীন হ'য়ে গেলে তখন আর অপেক্ষা ক'রতে নেই, তৎক্ষণাৎ তাকে বন্ধ ক'রতে হয়। সেইটাই শ্লোকাকারে বলা হ'য়েছে—

"ক্ষীণধাতু বলার্ত্তস্য, আমোঽপিস্তম্ভনীয়ঃ স্যাৎ"

ওই সময়ে বারে বারে খুব মিষ্টি পাকা কামরাঙ্গার রস এক চা-চামচ ক'রে কয়েকবার খাওয়ালে ধীরে ধীরে দাস্ত হওয়াটা বন্ধ হবে আর প্রস্রাবটাও পরিষ্কার হবে; কারণ যখন দাস্ত হ'তে হ'তে দেহের ধাতুর বলটাই ক'মে গেল, তখন আর তাকে অপেক্ষা ক'রে রাখা কি যুক্তিসঙ্গত?

২। **বায়ুবিকারে—** বায়ুবিকার দূর ক'রতে হ'লে—কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করে বলি, কারণ আয়ুর্বেদের তো তিনটি পরিভাষা—বায়ুবিকার, পিত্তবিকার আর শ্লেষ্মবিকার; অতএব কামরাঙ্গার রস বায়ুবিকার দূর করে বললে কি বোঝা যাবে? আচ্ছা বায়ুর যে-কোন বিকারেই কি একে ব্যবহার করা যাবে?

তা'র উত্তরে জানাই যে, না, তা যাবে না, কেবলমাত্র তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুবিকার হয়; অর্থাৎ যে সময়ে আমাশয়ে, মূত্রাশয়ে বায়ুবিকার হ'য়ে মূত্রাল্পতা হবে, পেটফাঁপ হবে, মলের তরলতা দেখা দেবে, সেই সময় মিষ্টি (পাকা) কামরাঙ্গার রসের দ্বিগুণ ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে, একটু চিনিসহ ২/৩ চা-চামচ ক'রে খাওয়ালে ওই বায়ুবিকারজনিত যে অসুবিধেগুলি দেখা দিয়েছিলো সেগুলি আর থাকে না।

৩। **অর্শরোগে—** খুব ধারালো অস্ত্র দিয়ে কামরাঙ্গা (মিষ্টি) কুচি কুচি করে কাটতে হবে, তাহ'লে ওর রসগুলি আর প'ড়বে না। সেই কুচিগুলিকে রৌদ্রে ভাল ক'রে শুকিয়ে নিতে হবে, তারপর সেই কুচিগুলিকে বেটে আন্দাজ দেড়গ্রাম ক'রে জলসহ খেতে হবে; অবশ্য এটাকে বড়ি ক'রেও রাখা যায় এবং সেটা জলসহ খাওয়ান যায়। এইটা প্রত্যহ দুবেলা খেলে অর্শের রক্তপড়া ও মলদ্বারের দপ্‌দপানি, যন্ত্রণা থাকে না, তবে এটা বেশ কিছুদিন ব্যবহার ক'রলে অর্শরোগটা অদৃশ্য হবে।

৪। **পুরনো (পুরাতন) জ্বরে—** এ জ্বরের বর্ণনা এই গ্রন্থের প্রায় সব খণ্ডেই দেওয়া হ'য়েছে।

এক্ষেত্রে কামরাঙ্গার পাতার মিহি চূর্ণ ২ গ্রাম মাত্রায় ৩/৪ দিন সকালে ও বৈকালে দু'বার ক'রে জলসহ খেলে পুরনো জ্বরটা নিরাময় হবে, এবং অগ্নিবলও বেড়ে যাবে।

৫। **যকৃৎ শূলে—** পাকা কামরাঙ্গার রস ৩/৪ চা-চামচ জল মিশিয়ে খেলে যকৃতের শূলজনিত ব্যথার উপশম হয় এবং এটাতে পিত্তশূলও দূর হয়। এই রোগটির বর্ণনা এই গ্রন্থের অন্য খণ্ডে দেওয়া হ'য়েছে।

বাহ্য ব্যবহার

৬। **লোহার মরিচার দাগে—** অনেক সময় অসাবধানতাবশতঃ কাপড়ে-চোপড়ে দাগ হ'লে সে সময় কামরাঙ্গা ফল পাওয়া গেলে, ওটাকে কেটে ওই টুকরো ওই দাগের উপর ঘ'ষলে ওটা উঠে যায়।

দেখুন, এই কামরাঙ্গা লিখতেই আমার চোখ যেন রাঙা হ'য়ে গেল ভবিষ্যতের ছবিটা মনে ফুটে উঠতে। হয়তো এমন একদিন ছিল যেদিন রামায়ণ মহাভারতের মত মহাকাব্য প্রচারের প্রয়োজন হ'য়েছিল, তবে সেসব ঘটনা কতখানি বাস্তব সেটা আজ সমলোচনার বিষয় হ'য়েছে, কিন্তু জাতিকে তাঁবে রাখতে রটনার দরকার ছিল বৈকি! অবশ্য সেটার সহায়ক ছিল পুরোহিততন্ত্র। তখনকার অবস্থা এমন হ'য়ে প'ড়েছিলো যেন—ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দে মা লুটেপুটে খাই। আজ কিন্তু তার ধারা ব'দলেছে। এখন আমরা দেখছি যেন সবই "কামরাঙ্গা"!

CHEMICAL COMPOSITION

Averrhoa carambola Linn.

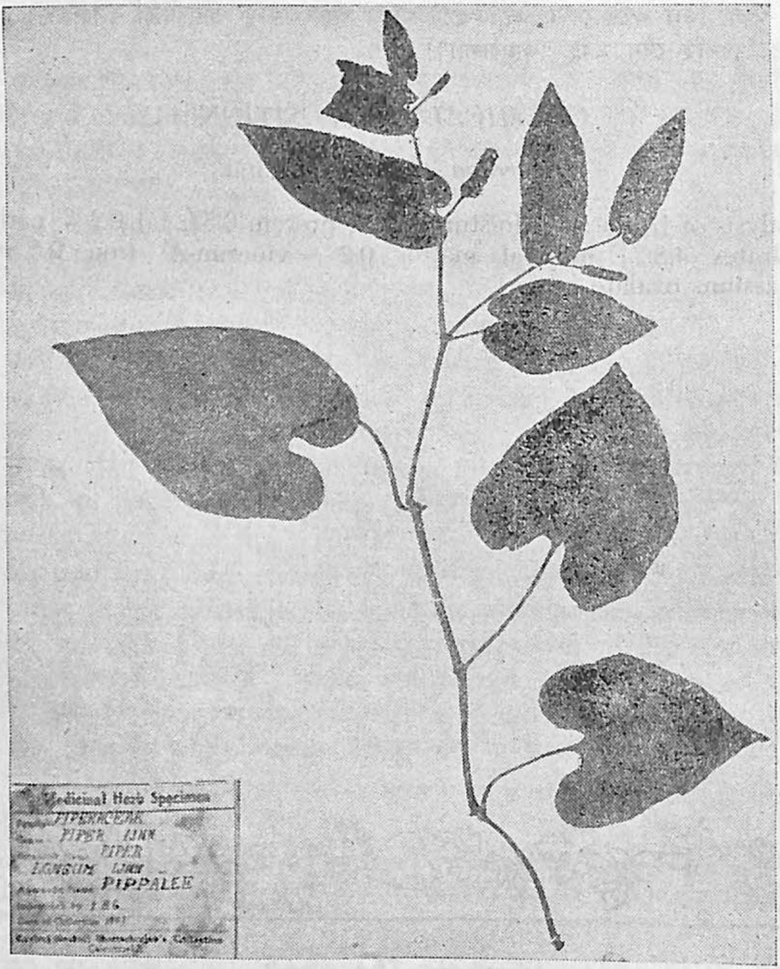
Analysis of fruits :— Moisture 93.9%; protein 0.5%; fat 0.2%; carbohydrates 4.8%; mineral matter 0.2%; vitamin-A; iron 0.6 mg; potassium oxalate.

কণ [পিপুল]

প্রবাদ আছে পাপ আর পারা—এ দুটো শরীরে প্রবেশ ক'রলে একদিন না একদিন শরীরে ফেটে বেরুবেই; তাই সংস্কারের বাঁধনে পাপটা যে গর্হিত এই কথাটার উল্লেখ ক'রেই একটা বেড়া দেওয়া হ'য়েছে ব'লেই মনে হয়। কিন্তু এই পারা (পারদ) এমনই একটা জিনিস যে, দোষমুক্ত না থাকলেই শরীরকে ব্যাধিগ্রস্ত ক'রবেই; কারণ গরম পেলেই তা বাষ্পীয় আকারে সূক্ষ্মস্রোতপথে প্রবেশ করার শক্তি আছে ব'লেই রসতান্ত্রিক

চিকিৎসকগণ তাকে জপমালা ক'রেছিলেন, আর বৈদিকযুগে (যে যুগে পারা ছিল না) পিপ্পলই ছিল পারদের স্বভাবধর্মী গুণবিশিষ্ট ভেষজ। সে আমাদের শরীরে অস্থি-সন্ধিতে প্রবেশ ক'রে রসকে শোষণ ক'রে নিতে পারে।

এখন দেখা যাক বৈদিকতথ্যে এর ভৈষজ্যশক্তির কি ইঙ্গিত দেওয়া আছে।



'বিধৃতিং নাভ্যা পূষণং বলিষ্ঠন্ আন্ধাহীন্ স্থূলগুদয়া
আন্ত্রৈ রপো কণান্ নয়ন্তি'।

(অথর্ববেদ বৈদ্যককল্প ৬৯২। ২। ২৭ সূক্ত)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

নাভ্যা উদরাধস্তগ্রন্থিনা বিধৃতিং=শরীর ধাতুশক্তিং পূষণং শুক্রং বলিষ্ঠঃ। স্থূলান্ত্রং তেন পূষণং আন্ধাশ্চ অহয়শ্চ যে ক্রিময়ঃ তান্

স্থূলগুদাতিরিক্তৈঃ গুদভাগৈঃ অপিচ অন্ত্রে ভবা আন্ত্রাঃ অন্ত্র-সম্বন্ধিনো মাংসভাগঃ অপোবস্তি মূত্রপুটং তেনাপো কণান্ নয়ন্তি দেবা ইতি।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—উদর ও তার অধোগত গ্রন্থির দ্বারা শরীরের ধাতু-শক্তিকে শুক্র ধারণ ক'রে রেখেছে, আর স্থূলান্ত্রকেও কিন্তু (স্থূলান্ত্র এবং গুহ্যস্থানের ঊর্ধ্বাধ ভাগ এবং মূত্রপুটকে) ক্রিমিগণ বিনষ্ট করে, কণা তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করে; দেবতারা তাই করেন।

নাম ও ধাম

খুব সূক্ষ্ম হ'য়ে প্রবেশ ক'রতে পারে বলেই বেদে বলা হয়েছে কণ বা কণা, কিন্তু প্রবেশ করে সে কি করে? সেটা অনুসন্ধান ক'রে দেখা হ'য়েছে সংহিতার যুগে, তাঁরা দেখেছেন সেই দ্রব্যটি সূক্ষ্ম হ'য়ে প্রবেশ ক'রে বিকৃত রসধাতু পান ক'রে নেয় এবং সূক্ষ্ম হ'য়েই তা নির্গত হ'য়ে যায়, তাই সেই কণ দ্রব্যটির ক্রিয়াশক্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রেই তার নাম রেখেছেন পিপ্‌পল, অর্থাৎ পা+অলচ অর্থাৎ পান ক'রে নেয় বা শোষণ করে নেয়। তারপর এই দ্রব্যের প্রিয় জন্মভূমি যে সমগ্র মগধদেশ তাও আবিষ্কার হ'য়েছে পরে, অবশ্য তখনকার মগধের প্রান্ত উপান্ত সীমারেখা এখনকার মত টানা ছিল না। তখন উত্তর প্রদেশের নাম ছিল উত্তর ও দক্ষিণ কোশল, সেও ছিল মগধের অংগভূমি. তাই পিপ্‌পলীর প্রসিদ্ধ নামগুলির মধ্যে মাগধি এই নামটিই অনেক সংহিতাকার গ্রহণ করেছেন।

তবে চরক সংহিতায় কণের যতগুলি নাম তাদের মধ্যে কণা, পিপ্পলী, মাগধি এইগুলিই বেশী গৃহীত হ'য়েছে। একে চ'ল্‌তি কথায় বলি পিপুল।

পিপুল বনাম নব শূল?

চরক সংহিতার সূত্রস্থানে দেখা যাচ্ছে, নয়টি বিশিষ্ট রোগে পিপুলকে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা দেওয়া হ'য়েছে। যেমন (১) দীপনীয় হিসেবে, (২) কন্ঠ্য (কণ্ঠ রোগ দূর করে), (৩) তৃষ্ণা রোগে (৪) আস্থাপনে (বস্তি বা ডুস্ প্রয়োগের উপযোগে) (৫) শিরো বিরেচনে, (৬) হিক্কা দমনে, (৭) কাস রোগে (৮) শীত প্রশমনে (৯) শূল রোগে এর উপযোগিতা যে আছে সেটা বর্ণিত হ'য়েছে। এক কথায় বলা যায়—একমাত্র পিপ্পলীই একটি ভেষজ যাকে চরকসংহিতার যুগে সর্বাপেক্ষা বেশী অনুশীলন করা হ'য়েছে।

এই পিপ্পলীকে বৈদিক সমীক্ষায় এমন উঁচুতে স্থান দেওয়া হ'য়েছে যে, এই ভেষজটি দেবতারাই যেন গ্রহণ ক'রতেন ক্রিমিরোগে, গুদরোগে এবং অন্ত্র রোগে—এই রোগের কারণ ক্রিমিজনিত হ'লে। বর্তমানের চিন্তাধারায় এটি উদরের নিম্নাংশের ও মূত্রাশয়ের যে কোন ব্যাক্‌টিরিয়া জনিত রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহারের ইঙ্গিত। চরকে নয়টি রোগের ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা উপলব্ধি ক'রলেও যেকোন শূলের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করার ইঙ্গিত দেওয়া আছে। শূল শব্দটির অন্বয়ে দেখা যাচ্ছে—

শূলের আদি উৎস

শরীরের মধ্যভাগে অর্থাৎ উদরে যে রোগ সৃষ্টি হ'য়ে সমগ্র দেহকে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য জর্জরিত করে সেইটারই পূর্বরূপ গ্রহণী, এই গ্রহণী থেকে নাভিশূল

(Pain in the umbilical region), যকৃৎ শূল (Hepatic pain), পিত্তশূল (Biliary colic), প্লীহাশূল (Pain in the spleen), মূত্রপুট শূল (Cystitis), বংক্ষণ শূল (Inguinal pain), কটিশূল (Lumbago), আমশূল (Intestinal spasm), গুল্ম শূল (Colic due to abdominal tumour), বাতশূল (Pain due to lympanitis), অজীর্ণ শূল (Colic due to indigestion), বিদগ্ধ শূল (Gastro-duodenal pain) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের শূল জন্ম গ্রহণ করে।

মোটকথা, এ রোগের কারণ যেমন গ্রহণী রোগ, আবার তারও তো কারণ আছে—সেটা হ'লো অপরিমিত ভোজন, অহিত আহার্য গ্রহণ, ঋতুর স্বভাবে শরীরে যে দোষের প্রকোপ হ'তে থাকে তাকে উপেক্ষা ক'রে চলা। এখন প্রশ্ন হ'লো এই শূল রোগে (সে যে কোন প্রকারেরই হোক) আক্রান্ত হ'লে এ থেকে উপশম ও নিরাময়ের উপায় কি—এইসব ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়, চিকিৎসকের অধীনেই তাকে থাকতে হবে, কারণ তখন বিচারের ক্ষেত্র থাকে কোন শূল রোগে বমন করাতে হবে আবার কোন শূল রোগে বিরেচনের ব্যবস্থা দিতে হবে। কোন ক্ষেত্রে হয়তো কিছু খেলে ভাল থাকবেন, কোন ক্ষেত্রে অল্প খেলে, অথবা জলীয় পদার্থ খেলে ভাল থাকবেন. কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষারঘটিত ঔষধ খেলে ভাল—এসব ক্ষেত্র বিচার করে ঔষধ প্রয়োগের দরকার হয়, তবে এর দ্বারা রোগ নিরাময়ের পদ্ধতিটা গ্রহণ করা হ'লো না, কেবলমাত্র উপশমেরই ব্যবস্থা হ'লো। এর উপর আছে আবার ঋতুর প্রভাব, অনেক সময় সে এসে রোগের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যায়। এও দেখা যায় বর্ষাকালের শূল রোগ গ্রীষ্মকালে কম, আবার শরতে বৃদ্ধি, হেমন্তে কম—এই ঋতুপ্রভাবও রোগের উপর পড়ে। সুতরাং চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে না থেকে শূলের চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। তবে অন্য সাধারণের পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব সেইটুকু লোকায়তিক ব্যবহারে এখানে লেখা হ'চ্ছে। আর একটা কথা, চরকেই যে পিপুল নিয়ে গবেষণা হ'য়েছে তা নয়, সুশ্রুতেও এ নিয়ে গবেষণা হ'য়েছে। এই সংহিতার সূত্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ে দেখা যায় যে পিপুল কত প্রকার রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হ'য়েছে।

সুপ্রাচীনকালের বৈদ্যগণ অত্যন্ত জটিল কফরোগে পিপ্পলী খণ্ড ব্যবহার ক'রতেন। তাছাড়া মেধা বৃদ্ধির জন্য পিপ্পলী রসায়ন, নবজ্বরের জটিল পরিণতি হ'লে পিপ্পল্যাদি কষায় এবং গ্রহণী দোষে দুষ্ট কঠিন শূলে পিপ্পল্যাদি ঘৃত, হিক্কায় পিপ্পল্যাদি অবলেহ, উদর ও শোথ রোগে পিপ্পলী যোগ, পুরাতন ক্রিমি রোগে পিপ্পলী চূর্ণ, পালাজ্বরে ও ঘুষঘুষে জ্বরে পিপ্পলী রসায়ন খণ্ড।

এইজন্যই বলা যায়, যথাযথ ক্ষেত্রে পিপ্পলীর প্রয়োগ ক'রতে পারলে বহুরোগের চিকিৎসা সম্ভব হবে। এইবার কতকগুলি লোকায়তিক যোগের কথা বলি, তবে এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি তথ্য জানা দরকার—যেমন (ক) কাঁচা পিপুল কফ বাড়ায় তবে পিত্তদাহ কমায়। (খ) শুকনো (শুষ্ক) পিপুল সংস্কার ক'রতে না জানলে সে পিপুলে পিত্ত বাড়াবে।

নব্যের সমীক্ষায়

১। শুষ্ক অপক্ব ফল ও শিকড়ই সাধারণতঃ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহারা বায়ুনাশক, পাচক, মৃদু রেচক, বলকর এবং জরা ও ব্যাধি বিনাশক। কাসি, স্বরভঙ্গ, হাঁপানি, বদহজম ও পক্ষাঘাতে বিশেষ উপকারী। মধুর সঙ্গে পিপুল চূর্ণ সেবনে কাসি, স্বরভঙ্গ, হিক্কা ও নিদ্রাহীনতা দূর হয়। প্রসবের পর ফুল পড়ার জন্য কেহ

কেহ ইহার মূল ব্যবহার করেন।

২। ইউনানি সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ বলেন—পিপুল যকৃৎ ও প্লীহার দোষনাশক, পরিপাকশক্তির বর্ধক, রসায়ন, মূত্রকারক ও ধাতুপুষ্টিকারক। পিপুলের মূল ও পিপুল বাতেও ব্যবহৃত হয়। রাতকানার জন্য পিপুল ভিজানো জল দিয়ে চোখ ধোয়ার নির্দেশ আছে।

পরিচিতি

পিপুল ৪ প্রকারেরঃ— (১) পিপ্পলী—এর একটি নাম মাগধি; মগধ প্রদেশে (দক্ষিণ বিহার) বেশী জন্মাতো ব'লে এই নামকরণ। ভারতবর্ষজাত ছোট ও বড় পিপুল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (২) গজপিপ্পলী একটি সন্দিগ্ধ ভেষজ, অনেকে চবিকার ফলকে গজপিপ্পলী বলেন। (৩) সৈংহলী—সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা), সিঙ্গাপুর, বর্মা প্রদেশে জন্মে, একে চলতি কথায় জাহাজী পিপুল বলে। (৪) বনপিপ্পলী—অযত্নসম্ভূত বনজ পিপুল। পশ্চিমবঙ্গের যেখানে সেখানে জন্মে, আকারে ছোট, সরু, ঝাঁজ কম। বর্তমানে ২ প্রকারের পিপুল বাজারে পাওয়া যায়, বড় ও ছোট। বড়গুলি সৈংহলী পিপুল আর ছোটগুলি পশ্চিমবঙ্গে অধিকজাত পিপুল।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, নেপাল, হিমালয়ের পাদদেশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, বাংলাদেশ (পূঃ বঙ্গ) ইত্যাদিতে অধিক পরিমাণে পিপুল জন্মে।

লতানে গাছ, মাটিতে পড়ে থাকে, কখনো বা অন্য গাছে উঠে পড়ে। লতাটির সামনের অংশ কোমল, পাতাগুলি ডিম্বাকৃতি, অনেকটা পানের মত দেখতে, ২/৩ ইঞ্চি লম্বা। একলিঙ্গী ফুল, পুষ্পদণ্ড ১—৩ ইঞ্চি লম্বা, সোজা ও উন্নত। ফলগুলি সবুজ-হরিদ্রাভ বর্ণের, পাকলে রক্তবর্ণের এবং শুকিয়ে গেলে কৃষ্ণাভ ধূসর বর্ণের হয়। বর্ষাকালে ফুল হয় এবং শরৎকালে ফল হয়।

সংস্কৃত নাম পিপ্পলী, বাংলায় পিপুল ও হিন্দীতে পীপল বলে। বোটানিক্যাল নাম Piper Longum Linn. ফ্যামিলী Piperaceae. এর আর একটি জাত আছে, তাকে পাহাড়ী পিপুল বলে, বোটানিক্যাল নাম Piper Sylvaticum Roxb.। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে বেশী জন্মে, পাতাগুলি কিঞ্চিৎ বড় হয়।

লোকায়তিক যোগ

পিপুল প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ স্রোতে।

১। **কাশিতে—** এটা যে বেশী থাকলেই দিতে হবে তা নয়, তবে তার সঙ্গে থাকবে ঘুষঘুষে জ্বর। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের আশঙ্কা হয় হয়তো এটা ক্ষয়জ জ্বর, এক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের চিকিৎসা সুরু করার পূর্বে পিপুলচূর্ণ ২৫০ মিলিগ্রাম ঈষদুষ্ণ জলসহ সকালে ও বৈকালে দু'বার ক'রে খেতে হয়, এর দ্বারা ওই কাসি ও ঘুষঘুষে জ্বর ছেড়ে যেতে পারে। অবশ্য ৪/৫ দিন খাওয়ার পর এর উপকারিতা উপলব্ধি হবে।

২। **জীর্ণ জ্বরে—** যে জ্বরের ফলে শরীরের গঠন নষ্ট হ'চ্ছে অথচ অগ্নিবল ঠিক আছে, সেখানে বুঝতে হবে খাদ্যরসটি রক্ত তৈরীর যোগ্য হয়নি; তার জন্য ধীরে ধীরে রক্তের বলও ক'মছে, তার ফলে চামড়ায় শুষ্কতা, চোখ ফ্যাকাসে হ'চ্ছে, সেক্ষেত্রে পিপুল চূর্ণ ২৫০ মিলিগ্রাম ৫/১০ ফোঁটা ঘি মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস ক'রতে হয়, এর দ্বারা কয়েকদিনের মধ্যেই জ্বরটা ছেড়ে যাবে এবং অন্যান্য উপসর্গেরও

উপশম হবে, যার ফলে রোগীর মানসিক বলও ফিরে আসবে।

৩। **মেদহ্রাসে—** যাঁরা মেদস্বী, তাঁরা এটাকে কমাতে চাইলে ২৫০ মিলিগ্রাম পিপুল চূর্ণ আধ চা-চামচ মধুসহ খাওয়ার ১০/১৫ মিনিট বাদে এক কাপ ঈষদুষ্ণ গরমজল খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। তবে যাঁদের শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু, তাঁরা সকালে ও বৈকালে উপরিউক্ত মাত্রায় দু'বার খেতে পারেন। এইভাবে ১৫/২০ দিন ব্যবহার ক'রলে মেদের হ্রাস হবে, তবে তার সঙ্গে আহারের নিয়মও পালন ক'রতে হবে। যেমন চিনি বা যেকোন মিষ্ট দ্রব্য মোটেই না খাওয়া, আলু বর্জন করা, এবং একবেলা ভাত ও একবেলা কড়া সেঁকা রুটি খাওয়া, তবে প্রাচীন বৈদ্যগণ বলেন, শ্যামাচালের ভাত বা রুটি, (গমের মত পেষাই ক'রে নিতে হয়) মেদহ্রাসে অদ্বিতীয়।

৪। **হাঁপানিতে—** অল্প শ্রমেই হাঁপানি, অল্প পেটভারি ক'রে খেলেই হাঁপের কষ্ট, তাঁদের উচিত পিপুলচূর্ণ ২৫০ মিলিগ্রাম জলসহ আহারের কিছু পরেই খাওয়া, এর দ্বারা হজমও ভালো হবে হাঁপেরও কষ্ট হবে না। নইলে ২ গ্রাম পিপুল একটু থেঁতো ক'রে সেটা ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আন্দাজ ২ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সেই জলটা ২/৩ ঘণ্টা অন্তর ৩/৪ বারে খেতে হবে। এর দ্বারা হাঁপের কষ্ট আর আসবে না।

৫। **অগ্নিমান্দ্যে—** এর কারণ হয়তো দাঁতের অভাব হ'য়েছে অথবা থেকেও নড়-বড়ে কিম্বা ঋতুর বিপর্যয়—এর ফলে এই রোগটায় যাঁরা গ্রস্ত হ'য়েছেন তাঁরা দু'বেলা আহারের পর পিপুলচূর্ণ ২৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় জলসহ কয়েকদিন ব্যবহার ক'রে দেখতে পারেন; এর দ্বারা অগ্নিমান্দ্য নিশ্চয় উপশম হবে।

৬। **বাতরোগে—** তবে এ বাতে শ্লেষ্মার প্রাধান্য থাকবে। শুধু তাই নয়, প্রায়ই শরীরটা থুম্ মেরে যায়, মনে হ'চ্ছে, এবার শরীর অচল হ'য়ে প'ড়বে। এই রকম পরিস্থিতিতে পিপুল চূর্ণ ২৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় ১ চা-চামচ আদার রস সহ সকালে ও বৈকালে দু'বার খেতে হবে। তবে আদার রসটা গরম করার পর তার ওপর থেকে ১ চা-চামচ ঢেলে নিতে হবে। আর একটা কথা, শরীরটা কড়া হ'য়ে যাচ্ছে এটা বুঝলে একবার ক'রে খেতে হবে।

৭। **প্লীহা বৃদ্ধিতে—** এটা আস্তে আস্তে বড় হ'য়ে চ'লেছে, তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য লক্ষণগুলিও এসে পৌঁছুচ্ছে, যেমন রক্তাল্পতা, আহারে অরুচি, দাস্ত অপরিষ্কার; সেক্ষেত্রে কুলেখাড়ার রস ৪/৫ চা-চামচ একটু গরম ক'রে তার সঙ্গে ২০০ অথবা ২৫০ গ্রাম পিপুল চূর্ণ মিশিয়ে এক সপ্তাহ খেলেই এর উপকারিতা উপলব্ধি ক'রতে পারবেন। অনেক প্রাচীন বৈদ্য এক্ষেত্রে কাঁচা দুধসহ পিপুল চূর্ণ খেতে দিয়ে থাকেন।

অথবা

তালজটা ভস্ম ২০০ মিলিগ্রাম এবং পিপুল চূর্ণ ২০০ মিলিগ্রাম একসঙ্গে মধুসহ খেতে হবে। তবে মধু ২৫/৩০ ফোঁটা মিশিয়ে নিয়ে তারপর তার সঙ্গে ২/৩ চা-চামচ দুধ মিশিয়ে খেতে পারলে ভালো হয়।

তালজটা ভস্ম করার পদ্ধতি— জটা তালগাছ থেকে কাঁচা জটা কেটে তাকে টুকরো ক'রে শুকিয়ে নিয়ে হাঁড়িতে পুরে, সরা দিয়ে মুখ বন্ধ ক'রে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে নিতে হয়। তারপর সেটাকে মেড়ে মিহি ক'রে নিলেই তালজটা ভস্ম প্রস্তুত হ'লো।

৮। মেধা হ্রাসে— পূর্বে মেধা ভালই ছিলো কিন্তু আস্তে আস্তে ক'মে যাচ্ছে—সেক্ষেত্রে পিপুল চূর্ণ ১৫০ মিলিগ্রাম ২০/২৫ ফোঁটা ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে কিছুদিন খেয়ে দেখুন, নিশ্চয়ই উপকার পাবেন।

৯। ঝুরো ক্রিমিতে— কি শিশু কি বৃদ্ধ—এর উপদ্রব অনেককেই ভোগ ক'রতে হয়। এ'দের উচিত ২৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় প্রত্যহ বৈকালের দিকে বাসি জলসহ খাওয়া। এর দ্বারা অগ্নিবলও বেড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ক্রিমির উপদ্রবও ক'মে যাবে।

১০। বার্ধক্যে— যাঁরা বয়সের ধর্মে বার্ধক্যগ্রস্ত হ'চ্ছেন কিন্তু তার সঙ্গে শ্লেষ্মার বিকারজনিত রোগেও আক্রান্ত হ'চ্ছেন, তাঁরা সকালে ও বৈকালে দু'বার বাসক পাতার রস ৩/৪ চা-চামচের ২৫০ গ্রাম পিপুল চূর্ণ মিশিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। তবে বাসক পাতার রসটা একটু গরম ক'রে নিতে হবে। এর দ্বারা আংশিক উন্নতি তো হবেই।

১১। জ্বরে— যে জ্বর কোন কিছুতেই ছাড়তে চায় না, এমনকি ক্ষয়মূলক জ্বরেও ১০ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন একটি ক'রে বাড়িয়ে খেয়ে যেতে হবে; তারপর প্রত্যহ একটি ক'রে কমিয়ে খাওয়া বন্ধ ক'রতে হবে। এই সময় পথ্য দুধ-ভাত (পুরনো ধানের চালের ভাত)। অল্প গাওয়া ঘি মিশিয়ে খাওয়ার উপদেশ। আর একটু বক্তব্য—এই পিপুলগুলির মাত্রা কিন্তু ১০টি দানা থাকবে এতটুকু পিপুল, এতটুকু পরিমাণ পিপুল নিয়েই এর একক মাত্রা। এই রকম প্রতিদিন একটি ক'রে বাড়িয়ে যেতে হবে।

এই চিকিৎসা পদ্ধতিটি রাজস্থানে, বাংলায় ও দক্ষিণ ভারতের বৈদ্যদের মধ্যে প্রচলিত। তবে বাংলায় এই পিপ্পলী-বর্ধমান চিকিৎসাপদ্ধতিটি আর শোনা যায় না। তবে এ চিকিৎসা ধারাটা চরকোক্ত—এটা আছে চিকিৎসাস্থানের প্রথম অধ্যায়ে।

পিপুল নিবন্ধের শেষে বৈদ্যকবৃত্তির আদি কথা স্মরণ ক'রে বলা যায় যে, ঋষিদের কার্যই ছিল আর্তের সেবা, সে সম্প্রদায় যে ঐকান্তিকভাবে কেবল ব্রাহ্মণ শ্রেণীরই এটাও সর্বতঃ স্বীকার্য; কিন্তু সেই ঋষি সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণী যখন জীবিকা হিসেবে বৈদ্যক কৃত্যকে গ্রহণ ক'রলেন এবং সাম্মানিক দান ছাড়া বিনিময় বাণিজ্যের অন্তর্গত ক'রে আনতে লাগলেন অর্থ, আর সেবা ধর্মটা তখন গৌণ হ'য়ে গিয়ে, সেই চিকিৎসাবৃত্তি তাঁদের জীবিকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো, সেই থেকে তাঁরা বৈদ্যক হ'য়েও বা যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ হ'য়েও অর্থাৎ চরকীয় শাখার চিকিৎসক বা বৈদ্য ব্রাহ্মণ হ'য়েও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হ'লেন। তবে এটা বেশী নজরে পড়ে বাংলায়। তাঁদের গবেষিত একটি ভেষজ এই পিপ্পলী। তার অন্তর্নিহিত শক্তি হ'লো—শোষণ ক'রে সূক্ষ্ম স্রোতপথে প্রবাহিত হওয়া।

এখন ব'সে ভাবছি, আজ বৈদ্যকবৃত্তি পিপুলের পর্যায়ে প'ড়ে গিয়েছে নাকি?

CHEMICAL COMPOSITION

Piper longum

1. Piperine. 2. Piperlonguminine. 3. Piperlongumine (O=Piplartine) 4. N-Isobutyl deca-trans-2-trans-4-dienamide. 5. Sesamine 6. Diaendesmine. 7. 1-Undecyl-3, 4-methylenedioxy benzene 8. Piplasterol. 9. Terpinolene. 10. p-cymene. 11. Dihydrocarveol 12. ∝-Thujene. 13. Zingiberene. 14. β-Caryophyllene. 15. n-Eicosane. 16. n-Heptane. 17. n-Hexadecane. 18. n-Hexeicosane. 19. n-Nonadecane. 20. n-Octadecane. 21. p-Methoxy-acetophenone 22. Phenyl ethyl alcohol.

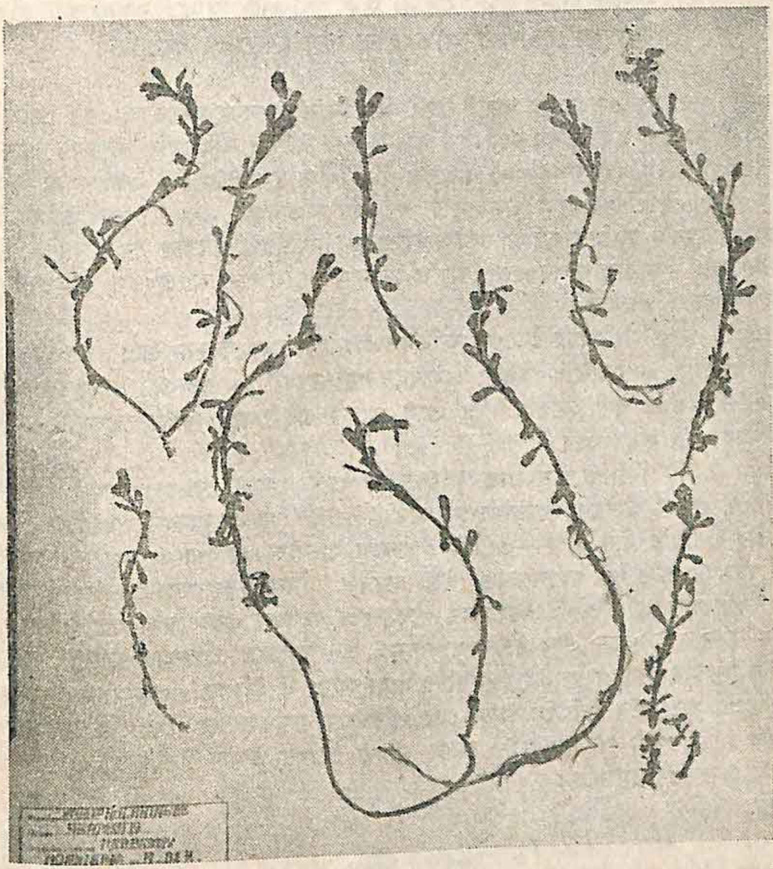
ব্রাহ্মী

ভাষা গবেষকগণ মনে করেন যে—ভারতের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি তো শ্রুতি, তবে লিপিবন্ধ ভাবে তা কিছু ছিল না, ভাঙ্গাচোরা, ভ্রষ্ট, ভ্রংশ, অপভ্রংশ ভাষাগুলিই তো তাঁদের সম্বল; সেগুলি অবলম্বন ক'রেই তো প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা। নিবন্ধোক্ত ব্রাহ্মী ভেষজটি অথর্ববেদে পাওয়া যায়, তবে তাকে সোম বলে চিহ্নিত করা হ'য়েছে, অথচ সোম যে কি বস্তু সে হদিশ আজও মেলেনি, কিন্তু ঋক্, যজু এমন কি গানের গ্রন্থ সামেও উল্লেখ প্রচুর—যেমন ঋকের ১।৬৫।১০, আবার ৩।৩৫।৫ এবং ৪।২৪।৮ সূক্তে তো আছেই, তাছাড়া যজুর সোমও তো ৮।৫৬ এবং ৯।২৬ থেকে প্রায়ই কোন না কোন সূক্তে সোমের উল্লেখ। শুধু তাই নয়, উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও ভেদ। এই যেমন, কোথাও সোম রাজা, কোথাও চাঁদ, কোথাও যজ্ঞের অশ্ব, ঘি (ঘৃত), দুধ, নদী, মদ্য, সুরা, এমনি ভাবে বহু অর্থে প্রকাশ করা হ'য়েছে, তারপর অথর্ববেদেও, অবশ্য সেখানে সোমের অর্থ প্রধানতঃ তিনটি—সুরা, এক জাতীয় লতা, সেটা আবার গুলঞ্চও হ'তে পারে। আবার করঞ্জাও হ'তে পারে, তাছাড়া খয়ের, সোমরাজী, পাতাল-গরুড়ী প্রভৃতি কতকগুলি ভেষজলতাকে সোম আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে; অন্য অর্থে সোম হ'লো যজ্ঞ আবার কোথাও বা সোমযাগ (যাগ ও যজ্ঞ পৃথক)। এদেরই ভিতর থেকে একটি ভেষজকে চিহ্নিত করার প্রয়াস দেখা যায় চরক, সুশ্রুত ও দুটি নিঘণ্টুকারের পর্যায়ে। প্রথমে বলি, অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৫।৩।৫২ সূক্তের উক্তিটি—

সোমা ত্বমোহসি জোহসি তবেব ত্বিষির্ভূয়াৎ।
ওজোহসি মৃত্যোঃ পাহি, ত্বা দুম্নেন অভিষিঞ্চামি॥

মহীধর এই সূক্তটির ভাষ্য ক'রেছেন—

> সোমা ইতি সোমো ব্রাহ্মী ভেষজং, তদেব বিবৃণোতি শিরসি অভিষেকার্থং সোমশ্চ সমন্তাৎ প্রীতান্ স্বাস্মিংশ্চ স চ শুক্রায় পূত শারীর বল সহঃ তদ্রূপমসি দ্যুম্নেন চন্দ্রস্য যশসা ত্বা অভিষিঞ্চামি। সোমশ্চ ওজরূপঃ স এবং সুরক্ষিতঃ মৃত্যোঃ অকালমৃত্যোঃ রক্ষতি।



এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—সোমা, এটি সোম, এবং সেটি ব্রাহ্মী ভেষজ, শরীরের শিরোভাগে একে অভিষিঞ্চিত করা হয়। এটি সমন্তাৎ (সর্বতোভাবে) প্রীত করে। শুক্রের পবিত্রতা এবং শরীরের বল সহ আগমন করে। চন্দ্রের সমান যশোলাভ হয়, সেইজন্য তোমাকে অভিষিঞ্চিত করি। সোমই ওজ, সেই অকালমৃত্যু থেকে রক্ষা করে।

বৈদিক সূক্তের ভেষজ রহস্যবাদটি ইঙ্গিতে বলা থাকলেও আয়ুর্বেদীয় ভেষজ-বিজ্ঞানীদের প্রেরণা জুগিয়েছে, তাছাড়া বেদপ্রোক্ত ভেষজগুলি যে সর্বতোভাবে পরীক্ষিত হ'য়েছিল সেটা সুদূর অতীতকাল থেকে আজও পাত্র কাল ভেদে যে প্রয়োগের নির্দেশ তা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হ'লে অভীষ্ট ফল দিয়ে আসছে, তাই চরক সংহিতার আমলে

নিঃশংসয়ভাবে বলা হ'য়েছে (চরক সূত্রস্থানের ২৫ অধ্যায়ের ৪৩ গুচ্ছে) সোম ওষধীনাম, অর্থাৎ ওষধিগুলির মধ্যে সোম নামের ভেষজটি সর্বাগ্রগণ্য।

দ্বিতীয় তথ্য—বেদের উক্তি হ'লো, সোম নামক ভেষজটি ওজ ধাতুকে রক্ষা করে এবং সেই ওজই অকালমৃত্যু থেকে রক্ষা করে। এও এক আশ্চর্য ভেষজ-বিজ্ঞানের সূত্রপাত।

এ সম্বন্ধে চরকে বলা হ'য়েছে (চরক নিদানস্থান চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৫ গুচ্ছে)—

"ওজঃ পুনর্মধুর স্বভাবং তদ্ রৌক্ষ্যাদ্ বায়ুঃ কষায়ত্বেন অভি-
সংসৃজ্য মূত্রাশয়ে অভিবহতি তদা মধুমেহং করোতি।

অর্থাৎ শরীরের ওজধাতুকে বায়ুই বহন করে নিয়ে আসে মূত্রাশয়ে, তারপর প্রস্রাবের সঙ্গে যখন ক্ষরিত হয়, তখন নাম হয় মধু-মেহ। তাহ'লে আজকের পাশ্চাত্য ভাষায় যেটি এ্যাল্বুমেন্ (Albumen) চরকের নিরীক্ষায় সেইটাই কি ওজঃ? না অন্য কিছু? কারণ উভয়ের বক্তব্যে ওজধাতুটি বর্ণগত, স্বভাবগত এক। ওজধাতু মধুর। তাছাড়া আয়ুর্বেদ সংহিতাগুলির সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত হ'য়েছে যে রসাদি সর্ব-ধাতুর সারভাগ এক ধাতুবিশেষ ওজঃ, অর্থাৎ দেহে যতগুলি ধাতু আছে (রস, রক্ত প্রভৃতি) সবেরই সারভাগ ওজধাতু।

তাছাড়া চরক সংহিতার বিশেষ অভিমত "অগ্নিসোমাত্মকত্বেন ওজঃ" অর্থাৎ এই বস্তুটি আগ্নেয় ও সোমীয় অর্থাৎ একাধারে অগ্নিধর্মী ও জলধর্মী। "তন্নাশনাৎ নাশমৃচ্ছতি"—ওজঃ ক্ষয় হ'লেই মৃত্যু এসে পড়ে। এই ক্ষেত্রে ব্রাহ্মী ভেষজটি তাকে রক্ষা করার শক্তি ধারণ করে।

এমন একটি বিশিষ্ট ভেষজের পরিচয় সম্পর্কে প্রথমে দেওয়া হ'য়েছে চরকের সূত্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে সংজ্ঞাস্থাপন বর্গে। ওখানে বয়স্থা নামক ভেষজটিই সোম এবং তার প্রচলিত নাম ব্রাহ্মী—এইটিই পরম্পরা প্রসিদ্ধি। অবশ্য এ কথাটাও চক্রদত্ত গ্রন্থপ্রণেতা চক্রপাণি দত্ত মহাশয়েরও (ইনি চরকের প্রসিদ্ধ টীকাকার)। চরক সংহিতার বক্তব্যে দেখা যায়, এটি একটি অসাধারণ গুণসম্পন্ন ভেষজ। একে দেখা যায় চিকিৎসা-স্থানের রসায়ন অধ্যায়ে এবং চিকিৎসাস্থানের ১৫ অধ্যায়ে অপস্মার রোগে। এই রোগটির নিরাময় করার শক্তি এই ভেষজটির মধ্যে আছে, এ ইঙ্গিত ওখানে করা হ'য়েছে।

তারপর সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানে তো পরিষ্কার বলা হ'য়েছে, মেধা ও আয়ুবর্ধক ভেষজের মধ্যে ব্রাহ্মী সর্বাগ্রগণ্য। তাছাড়া চক্রদত্ত গ্রন্থের উন্মাদ চিকিৎসাতেও ব্রাহ্মীর স্বরস ব্যবহার করা হ'য়েছে।

গোড়ায় গলদ

কিন্তু মুশকিল হ'লো সারা ভারতের ভেষজ পরিচয়ের পঞ্জিকাটি খুললে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন ওষধিকে তাঁরা ব্রাহ্মী বলেন, তবে এ সম্পর্কে দুটি নিঘণ্টুতে একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথমটি ভাবপ্রকাশ গ্রন্থের (এটি ষোড়শ শতকের গ্রন্থ) গুড়ূচ্যাদি বর্গে। সেখানে বলা হ'য়েছে—

মণ্ডূকপর্ণী মাণ্ডূকী ত্বাষ্ট্রী দিব্যা মহৌষধী।
ব্রাহ্মী হিমা সরা তিক্তা লঘু মেধ্যাচ শীতলা॥

এখানে মণ্ডূকপর্ণী এবং মাণ্ডূকী এ দুটি শব্দ যেমন লোকপ্রখ্যাত, থানকুনী বা থুলকুড়ির তেমনি আর একটি ইঙ্গিত দেখা যায় রাজনিঘণ্টুতে, ওখানে দেখা যায় পর্পটাদিবর্গে; সেখানে বলা হয়েছে—

স্বায়ম্ভুবী সোমলতা মণ্ডূকী সুরসা তথা।
দিব্যা চ শারদী চেতি চতুর্বিংশতি নামকা॥

এখানে বিশেষ ইঙ্গিত এটি বর্ষান্তে জন্মে। তবে উভয় নিঘণ্টুকারের অভিমত—

ব্রাহ্মী হিমা কষায়াচ তিক্তা...

এর আস্বাদন তিক্ত ও কষায় রস, কিন্তু শীতবীর্য, এইদিক থেকে বাংলার খুব পরিচিত থানকুনীকেই চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মী নামের ভেষজ পরিচয়টির সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণ— ইহা স্বাদে তিক্ত, মূত্রকারক, মৃদুবিরেচক, কামোদ্দীপক ও রক্ত পরিষ্কারক।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— পাতা ঘিয়ে ভেজে খেলে স্বরভঙ্গ, স্নায়বিক দুর্বলতা, অপস্মার রোগ ও ক্ষিপ্ততার উপশম হয়। শিশুদের শ্বাসনালীর পীড়ায় চায়ের চামচে এক চামচ পাতার রস খাওয়ালে বমি হয়ে ওটার আরাম দেয়। এভিন্ন সাধারণ কোষ্ঠ-বদ্ধতায়ও এই রস হিতকর। রক্তদুষ্টিতে, খোস-পাচড়ায়, শ্বিত্ররোগে ও উপদংশ রোগে ব্রাহ্মীর রস সেবনে উপকার পাওয়া যায়। "ব্রাহ্মীঘৃত" অপস্মার ও মূর্ছা রোগের মহৌষধ। ইউনানী চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মতে এটি শরীরের পুষ্টিবর্ধক ও শ্লেষ্মানিঃসারক। বাহ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেউ কেউ উক্ত রস পেট্রোলের সাথে মিশিয়ে বাতব্যাধিজনিত যন্ত্রণায় মালিশের উপদেশ দেন।

এতদ্ব্যতীত অনেকে ব্রাহ্মী থেঁতো করে (শ্লীপদ) গোদরোগে ও প্রদাহজনিত চর্মরোগে সেঁক দেওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন।

পরিচিতি

লতানে উদ্ভিদ। মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যায় এবং প্রত্যেক গাঁট থেকে শিকড় বের হয়। কান্ড নরম, রসালো ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমযুক্ত। কান্ডের বিপরীত দিকে জোড়া জোড়া ½ থেকে ½ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা পাতা হয়, এদের বোঁটাও কান্ড সংলগ্ন, এর গঠন অনেকটা ডিম্বের মত। ফুল ফিকে নীল ও শ্বেত বর্ণের। বীজাধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ফিকে রঙের বীজ থাকে। সমগ্র উদ্ভিদটাই তিক্ত। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই কমবেশী জন্মে, পুকুর ও খালের ধারে, সেঁতসেঁতে ভূমিতে ও ক্ষেতের আলের গায়ে ব্রাহ্মীশাক হতে দেখা যায়। এর সংস্কৃত নাম ব্রাহ্মী, বাংলায় প্রচলিত নাম বিরমীশাক, বরমীশাক, ব্রাহ্মীশাক ও হিন্দীতে শ্বেতচামনী, ব্রহ্মী নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Bacopa monrieri (Linn.) H. B. & K. ও ফ্যামিলি Scrophulariaceae.

ঔষধার্থ ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ ও মূল।

লোকায়তিক যোগ

প্রথমেই বলি—এই ভেজষটি রসবহ ও শুক্রবহ উভয় স্রোতেই কাজ করে।

১। **স্বরভঙ্গে—** এটা প্রথম প্রথম মনে হবে, তেমন কিছু নয়, এটা ওটা খেঁতো করে বা সিদ্ধ ক'রে খেলে চ'লে যাবে; অথবা বচের টুকরো মুখে রাখলে কিম্বা লবঙ্গ রাখলে ওটা সেরে যাবে। তবুও বলি এই রোগটাকে এতটা হাল্কা ক'রে দেখলে ভুল হয়, হয়তো অনেক সময় সামান্য একটু টোট্‌কাতেই ভাল হ'য়ে যায়; তাহ'লেও অন্য অনেক কারণেও তো হ'তে পারে, তবে কিসের জন্য হ'য়েছে তা ধরার উপায় হ'লো, মুখের রঙটা কালো হবে, আর মলের (পায়খানার) রঙটা কালচে হবে; বায়ুপ্রধান হলে, আর পিত্তপ্রধান হ'লে কাসতে, কথা কইতে, গলাটার জ্বালা হবে। শ্লেষ্মাপ্রধান হ'লে দিনে যাও-বা গলার স্বর একটু খুলবে, রাতে (রাত্রে) তাও বন্ধ হ'য়ে যাবে। এই শেষেরটি হ'লে অর্থাৎ শ্লেষ্মাপ্রধান হ'লে ব্রাহ্মীশাকের রস ২/৩ চা-চামচ একটু গরম ক'রে ঠাণ্ডা হ'লে সমান পরিমাণ মধু মিশিয়ে (আন্দাজ এক চা-চামচ মিশালেও হবে) সকালের দিকে একবার এবং বৈকালের দিকে একবার খেতে হবে। এটাতে সেরে না গেলে, বুঝতে হবে এটা ক্ষয় জন্যই হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এভিন্ন মেদবৃদ্ধি হ'লে সাধারণভাবে গলাটা ধ'রে যায়।

২। **শিশুদের শ্লেষ্মায়—** গলার কাছে কফ আটকে প্রায় দমবন্ধ ক'রে দিচ্ছে অর্থাৎ প্রচুর শ্লেষ্মায় হাস্‌ফাস্‌ ক'রছে, সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মীশাকের রস গরম ক'রে ঠাণ্ডা হ'লে ঐ রসটা ২৫/৩০ ফোঁটা এক চা-চামচ দুধ মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। এর দ্বারা ওই শ্লেষ্মাটা উঠে যাবে অথবা সরে যাবে, তারফলে ওই হাঁফটা ক'মে যাবে।

৩। **মূত্রকৃচ্ছ্রতায়—** যাঁরা এর সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগছেন, তাঁরা সকালে এবং বৈকালে দু'বার করে ২/৩ চা-চামচ ক'রে ব্রাহ্মী শাকের রস খাবেন; তবে খাওয়ার সময় ৫/৬ চা-চামচ দুধ মিশিয়ে নেবেন, এর দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্রতাটাও ক'মে যাবে, দাস্তটাও পরিষ্কার হবে।

৪। **শুক্রতারল্যে—** এটা অস্বস্তিকর ও দুঃখকর রোগ। এটি হ'য়ে পড়'লে সামলানোর জন্যে প্রত্যহ সকালের দিকে ২ চা-চামচ ক'রে ব্রাহ্মীশাকের রস এক কাপ দুধে মিশিয়ে সপ্তাহখানেক খেলে এটাতে নিশ্চয় উপকৃত হবেন।

৫। **বাতে** (রসগত)— এ বাতটা এমন যে, ক্রমশ শরীরে অবসাদের ঝিমুনি আসে. এই অবস্থা চ'লতে থাকলে ব্রাহ্মীশাকের রস একটু গরম ক'রে তা থেকে ২ চা-চামচ নিয়ে প্রত্যহ একবার অথবা ২ বার খেতে হবে। এর দ্বারা শরীরটা ঝরঝরে হবে।

৬। **স্মৃতির ন্যূনতায়—** হয়তো স্মৃতি ভালই ছিল, কিন্তু সেটা আস্তে আস্তে ক'মে যাচ্ছে। তাঁরা সকালে কিছু খাওয়ার পর ২ চা-চামচ বা ১ চা-চামচ ব্রাহ্মী শাকের রস আধ চা-চামচ গরম ঘি মিশিয়ে আধ কাপ দুধের সঙ্গে খাবেন। এইভাবে ১৫/২০ দিন খেলে যে অসুবিধে আসছিলো সেটা আর থাকবে না।

৭। **অপস্মারে** (মৃগী রোগে)— এই রোগটি নারী-পুরুষ উভয়েরই হয়, যদি জন্মসূত্রে না হ'য়ে থাকে, তবে যে কোন বয়সেই এ রোগ আক্রমণ করুক না, সেটা উপশমিত হ'তে পারে যদি ব্রাহ্মীশাকের রস ২ চা-চামচ একটু গরম ক'রে আধ কাপ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বেশ কিছুদিন খাওয়া যায়।

ব্রাহ্মী সম্পর্কে বক্তব্য রাখার পর এইটাই মনে উঁকি দিচ্ছে—বয়সের গড়ানে বেলায় একে কি আবার ভজনা ক'রবো? জ্ঞানের পিপাসা তো এখনও মিটলো না। যাক্‌ একটা

কথা ব'লে চ'লে যাই, যদিও এটা মহাভারতের বিদুরের মুখ থেকে বলানো হ'য়েছে—

"দ্বাবিমাবপ্সু নিক্ষেপ্যৌ কণ্ঠে বদ্ধ্বা মহাশিলাম্।
ধনবন্ত মদাতারং দরিদ্রঞ্চাতপস্বিনম্॥"

অর্থাৎ এ সংসারে ওই দুটি ধরনের লোকের গলায় পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দিতে হয়। (১) যার প্রচুর আছে কিন্তু কৃপণ, (২) যার কিছু নেই কিন্তু তাতে উদ্যোগ না ক'রে আলস্যে কাটায়।

আমাদের আয়ুর্বেদসেবীদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি—যাঁদের গবেষণা করার, অধ্যয়ন করবার প্রচুর সুযোগ আছে, অথচ সেদিক থেকে তারা কৃপণ। আর এক দল আছেন, যাঁরা ক্রমেই দীনতর হ'চ্ছেন, কিন্তু উদ্যোগী হ'য়ে কারোর সাহায্য নিয়ে যে আরও উন্নতি করা যায়, তাতে একেবারে নিশ্চেষ্ট। সুতরাং আয়ুর্বেদসেবিগণ ডুববে না তো ডুববে কে? এ রাহুর দৃষ্টি কি আর কাটবে?

CHEMICAL COMPOSITION

Bacopa monrieri Linn.

Alkaloids viz., brahmine, herpestine. Bases viz., B_1 oxalate, B_2 and B_3 chloroplatinate. Betulic acid. Hersaponin. Stigmasterol.

জিবল [জিওল]

এই নিবন্ধটির মুখবন্ধ লিখতে কবি ভারতচন্দ্রকে ভর ক'রতে হ'চ্ছে। তাঁরই লেখা অন্নদামঙ্গল কাব্য গাথায় শিবের বিয়ের যে কাহিনী পাওয়া গেছে, সেটাকে এখানে উপস্থাপিত ক'রছি (লোকপ্রবাদ এটা নাকি তাঁরও পারিবারিক জীবনের একটি আলেখ্য)।

একদা শিব ছিলেন যেন ভবঘুরে। তারপর প্রেমে প'ড়েছিলেন নগকন্যা গৌরীর। তারপরের চিত্র হ'লো—প্রেমের জীবনের উদ্দাম কোলাহল ফুটে ওঠে, যতদিন না প্রাত্যহিক জীবনের আয়ব্যয়ের পরিধি আয়ত্তে আসে। তারপর প্রেমিকা যখন বুঝতে পারেন আমার সুখ-আহ্লাদ মেটাবার সামর্থ্য এই পতিদেবতার নেই, তখনই খিটিমিটি লেগে যায় প্রিয়তমের সঙ্গে। আর পতিদেবতাও যখন বুঝতে পারেন যে, প্রিয়তমার রূপ যৌবন দিয়ে পেটের ক্ষুধার জ্বালা দূর হয় না, তখনই হয় সংঘাত। এই মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশনায় কবির কলমে—

> "শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি
> ক্ষুধায় কাঁপায় অঙ্গ বলহ কি করি!"

এ শুনে শঙ্করী বেজার হন আর মুখ ফিরিয়ে অন্যত্র সরে যান। শংকর ভিক্ষায় বের হন কিন্তু কি-ই বা পান তাতে!

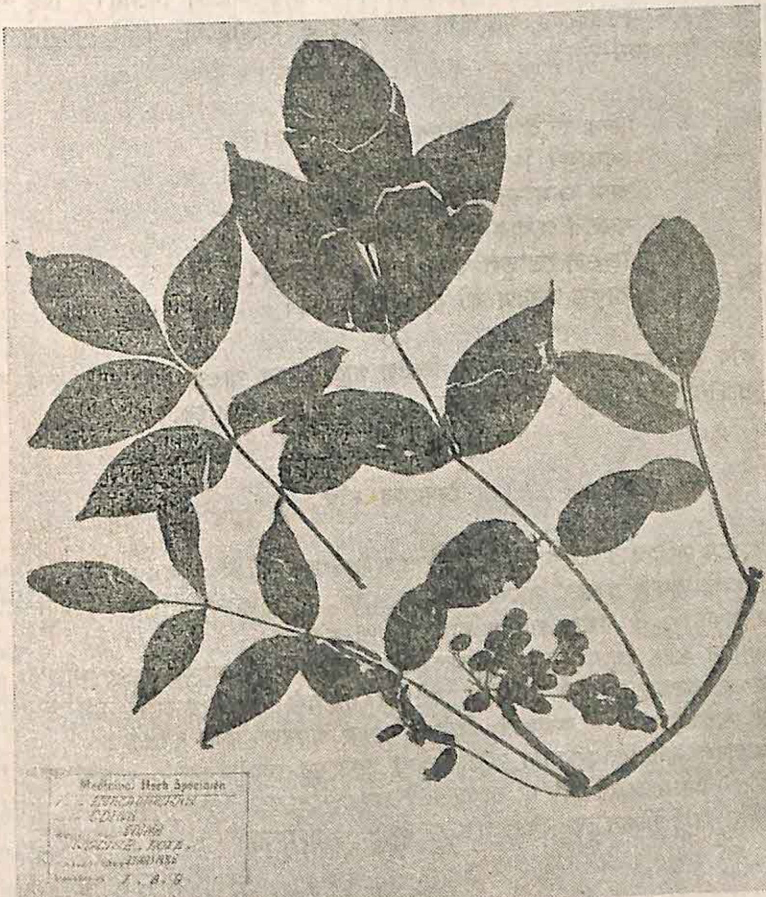
আবার এদিকে শংকরী দুঃখ করেন—

> "কি অশুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর।
> খাইতে না পাইনু কভু পূরিয়া উদর॥

শুনিয়াছি পরম্পরা লোকমুখে সূত্র।
স্ত্রী ভাগ্যেতে ধন, পুরুষের ভাগ্যে পুত্র॥"

শংকরী ক্রমশ বিরক্ত হ'তে থাকেন। অবশেষে সখী জয়ার কাছে ব'লে ফেললেন—

"কেবা এমন ঘরে থাকিবে।
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে॥
আপনি মাখেন ছাই, আমারে কহেন তাই,
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
মা বাবা পাষাণ হিয়া, হেন ঘরে দিল বিয়া।
হায় হায় এবে আর কি আছে উপায় ?"



ক্রমশঃই এই অবস্থাটি বাড়তে বাড়তে সে দুঃখের কাহিনী শিবের কানে পোঁছে গেল। পরিণামে উভয়ের মুখোমুখি কলহও সুরু হ'য়ে গেল। শিব তিতো বিরক্ত হ'য়ে "দূর তোরি সংসার" বলে ভাং-গাঁজার থলি, চিমটে, ত্রিশূল ও নন্দী-ভৃঙ্গী এঁদের

নিয়ে ষাঁড়ের পিঠে চ'ড়ে গৃহ ত্যাগ ক'রে পলায়ন ক'রলেন। শিবানী তো খুবই অপ্রস্তুতে প'ড়ে ক্রোধে, দুঃখে, অভিমানে কাঁদতে লাগলেন। সখী জয়া ব'ললেন, দেবী, তুমি এক কাজ করো, নিজে অন্নপূর্ণা মূর্তিতে পথের ধারে এক দানসত্র খুলে দাও। শিব ভিক্ষে ক'রতে ক'রতে এসে তোমারই কাছে ভিক্ষে গ্রহণ ক'রবেন। তুমি কিন্তু ধরা দিও না।

জয়ার কথা শুনে দেবী তাই ক'রলেন। এদিকে শিব ভিক্ষে ক'রতে বেরিয়ে কোথাও কিছু পেলেন না, অবশেষে নিরুপায় হ'য়ে পেটের জ্বালায় অন্নপূর্ণার আলয়ে এসে পরমানন্দে সেবা গ্রহণ ক'রলেন। ক্রমে সেই আলয়টি শিব ও তাঁর চেলাচামুণ্ডার নিবাস হ'য়ে উঠলো। চারিদিক থেকে আরও কত লোক এসে অন্নপূর্ণার আলয়ে নিত্যই অঢেল অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ ক'রতে ক'রতে স্থানটি অন্নপূর্ণাধাম হ'য়ে উঠলো। দেবী তখন বিশ্বকর্মাকে ডেকে এক বিশাল পুরী নির্মাণ ক'রতে আদেশ দিলেন। এই পুরী নির্মাণ ক'রতে কতরকমের গাছপালা নষ্ট ক'রতে হ'য়েছিলো, তারই বর্ণনায় কবি ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"জবা জুই জাতী চন্দ্রমল্লিকামোহন।
শেফালী পিয়ালী দোনা পারুল রঙ্গন।
আম জাম নারিকেল জামীর কাঁঠাল।
খাজুর গুবাক শাল পিয়াল তমাল।
জিওল তেঁতুল তাল বিল্ব আমলকী।
পাকুড় অশ্বত্থ বট বৃক্ষ হরীতকী।

কবি ভারতচন্দ্রের কলমের ডগায় জিওল গাছের নাম পাওয়া গেল বটে, তাই ব'লে তার প্রাচীনত্বের নজির পাওয়া গেল না, এখন দেখা যাক আর কোথায়—

বৈদ্যকের নথি

সুশ্রুত সংহিতার সূত্রস্থানের লোধ্রাদিগণে জিঙ্গিনী পঠিত হ'লেও সেখানে জিঙ্গিনী কৃষ্ণশাল্মলী অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পের শিমূল বৃক্ষ। আবার চরক সংহিতার বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়েও ঐ কথার ব্যাখায় মঞ্জিষ্ঠা বলা হ'য়েছে।

এখানে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, শাল্মলী বৃক্ষের জিঙ্গিনী নামের সঙ্গে মঞ্জিষ্ঠা এই লতাবাচক বিশেষণের সার্থকতা থাকে কি? তারপর ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের লেখা বাগ্‌ভট নামের গ্রন্থের সূত্রস্থানের ১৫ অধ্যায়েও জিঙ্গিনী কৃষ্ণ শাল্মলী বলা হ'য়েছে।

একাদশ খৃষ্টাব্দে চক্রপাণি দত্তের লেখা চক্রদত্তের মেহচিকিৎসায় কন্দর্পসার তেলে জিঙ্গীর দ্বারা তেলের মূর্ছনা দেওয়ার উল্লেখ। সুশ্রুতের সূত্রস্থানের (৩৮ অধ্যায়ে) জিঙ্গীনি বা জিঙ্গিনীকে বৃক্ষবর্গের অন্তর্গত করা হ'য়েছে।

ভাবপ্রকাশের বক্তব্য

"তমাল শালবদ্ বেদ্যো", অর্থাৎ তমাল ও শাল গাছের মত। তাহ'লে মঞ্জিষ্ঠাকে গ্রহণ করা চলে না, যেহেতু মঞ্জিষ্ঠা যে লতা এটা অবিসম্বাদী সত্য।

নিঘণ্টুকারগণের দৃষ্টিকোণে

রাজবল্লভের নিঘণ্টুগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে—

"জীবলঃ জিঙ্গিনিঃ প্রোক্তঃ ঝিঙ্গী চাপি প্রমোদিনী
তমাল শালবদ্ বেদ্যো দাহ বিস্ফোট হৃৎ পুনঃ"

এই গ্রন্থ রচিত হ'য়েছে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে, তার পূর্বেই রচিত হ'য়েছে "ভাবপ্রকাশ" —তিনিও যে বক্তব্য রেখেছেন রাজবল্লভেও প্রায় তাই, বৈশিষ্ট্য এর নাম সংজ্ঞায় অর্থাৎ এই যে এত প্রসিদ্ধ, "জিওল" সংজ্ঞাটি—আমরা আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থমালায় ভাবপ্রকাশের পূর্বে এর কাছাকাছিও কোন নামের উল্লেখ দেখতে পাইনি। এদিকে লোকপ্রসিদ্ধ কথা "জীবলঃ বহু পুত্রদঃ" অর্থাৎ নিয়মিতভাবে জিওলের আঠা দুধ মিশিয়ে খেলে বহু পুত্রের জনক হওয়া যায়। এই জীবলই যে কালে "জিওল" নামে খ্যাত হ'য়েছে সেটার একটা সূত্র লোকায়তিক যোগের প্রয়োগক্ষেত্র দেখে অনুমিত হয়। তবে একটা ব্যাপারে কারও মতভেদ নেই যে, জীবল বা জিঙ্গিনীর ত্বক্ ও নির্যাস মধুররস উষ্ণবীর্য এবং বিপাকে সামান্য কটু ও কষায়। লক্ষ্য করার বিষয়—ভেষজটির (জিওল) আঠা ও ত্বকের পক্কাবস্থায় উষ্ণবীর্য, এ সিদ্ধান্তেও কারোর মতভেদ নেই অর্থাৎ উষ্ণ-বীর্য দ্রব্য যে পাচন, মূর্ছন, স্বেদন বিরেচন বিলয়ন বায়ু ও কফের শমন করে এ বিষয়ে সকলে একমত। অপরপক্ষে ভেষজটির বীর্যগত অর্থাৎ উষ্ণবীর্যত্ব থাকার জন্য এটির অভ্যাস দীর্ঘদিন ক'রলে এর কুফল হ'লো—"তৃষ্ণা উৎপাদন করে, গ্লানি আনে, পিত্তের কোপ বাড়ায়, দেহে দাহেরও সৃষ্টি করে।" এ বিচারটি এই গ্রন্থের নয়, এটা সুশ্রুত সংহিতার সূত্রস্থানের ৪০ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। তবে এটা এখানে জানিয়ে রাখি যে, এই ভেষজটি রসবহ স্রোতে ও শুক্রবহ স্রোতে ভাল কাজ করে।

নব্যের সমীক্ষায়

ব্যবহার্য অংশঃ— পাতা, কাঁচকান্ড, ছাল ও আঠা।

গুণঃ— ইহা রসে স্বাদু, ক্ষুধাবর্ধক, ক্ষতনাশক, ধারক, চর্মগতরোগে, দাঁতের যন্ত্রনায় ও পেশীর ব্যথা-বেদনায় হিতকর।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— পাতা তেলে সিদ্ধ করে সেই তেল হাঁপানি রোগে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়, বাতজনিত ব্যথা-বেদনায়ও মালিসে হিতকর। তাছাড়া এর পাতা জলে সিদ্ধ করে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেই জল দ্বারা ধৌত করলে শ্লীপদ (গোদ রোগ), দেহের কোন স্থানে থেঁতলে গেলে সেখানে লাগালে ও সাধারণ ব্যথা-বেদনারও উপশম হয়।

ছাল থেকে ঈষৎ কালো রং-এর ও পিচ্ছিল একপ্রকার আঠা নির্গত হয়, ইহা বলকারক, স্তন্যবর্ধক ও হাঁপানিতে হিতকর। ছালের ক্বাথ ধারক। অতিসার ও গ্রহণীরোগে এর ক্বাথ ২০ মিলিলিটার মাত্রায় খাওয়ালে রোগের নিরাময় হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহার বাহ্য প্রয়োগও দেখা যায়, যেমন পুরাতন ব্রণ, দূষিত ক্ষত, চর্মগত রোগ ও কুষ্ঠজনিত ক্ষত ধোয়ার জন্য, দাঁতের যন্ত্রণায় ও মুখের ঘায়ে উক্ত ছালের ক্বাথ উপযোগী। এর আঠা নারকেলের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে পেশীগত বেদনার উপশম হয়। এভিন্ন জিওলগাছের গুঁড়ো নিমতেল সহযোগে ক্ষতস্থানে লাগালে আরাম পাওয়া যায়। সবুজ কান্ডের রস ৫০ মিলিলিটার বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ ও তাহার

সহিত ৫০ মিলিলিটার তেঁতুলজল মিশিয়ে খাওয়ালে opium প্রভৃতি মাদক দ্রব্য অতিসেবনে সংজ্ঞাহীন হ'লে বমন করানোর জন্য খাওয়ানো হয়।

পরিচিতি

শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট মাঝারি গাছ। ছাল মোটা, ধূসর বর্ণ ও মসৃণ। শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে যায়। পাতা ৬—৮ ইঞ্চি লম্বা, দেখতে অনেকটা দেশী আমড়া (Spondias mangifera) পাতার ন্যায় এবং এর পত্রবিন্যাসও ঐ ধরনের। বসন্তে দেশী আমড়ার মত এর ডালে মুকুল হয় ও পরে থোকা থোকা ছোট আঙ্গুরের মত ফল হয়। সাধারণতঃ ভারতের উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে হয়ে থাকে। হিমালয়ের সানুদেশেও এই গাছ জন্মে, বাংলা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এই গাছটিকে লোকে বেড়ার ধারে খুঁটি হিসেবে লাগিয়ে থাকে। এর সংস্কৃত নাম—জিঙ্গিনী বা জিবল, বাংলার প্রচলিত নাম জিওল ও হিন্দীতে জিঙ্গন নামে পরিচিত। বর্তমানে এর বোটানিক্যাল নাম Lannea grandis dennst. ও ফ্যামিলি Anacardiaceae. কিন্তু পূর্বে এর বোটানিক্যাল নাম ছিল Odina woodier Roxb.

ব্যবহার্য অংশ—ছাল, আঠা ও পাতা।

লোকায়তিক যোগ

১। **অতিসারে—** এটা যদি বাত অর্থাৎ বায়ুজনিত হয় সেই ক্ষেত্রেই কার্যকরী। এই রোগটির লক্ষণ এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে কিছু কিছু বলা হ'য়েছে, তবুও এ সম্পর্কে একটু ইঙ্গিত করি, যেক্ষেত্রে দাস্তের বেগ এলে আর দাঁড়ানো যায় না, পায়খানায় গেলে ছ্যাক্‌ড়া ছ্যাক্‌ড়া ফেনা ফেনা লাল্‌চে রঙের মত নির্গত হবে ও মলদ্বারে ব্যথা থাকবে এবং তার সঙ্গে কিছু বায়ুও নিঃসৃত হবে, এক্ষেত্রে জিওল আঠা, যে আঠা স্বচ্ছ প্রায় গঁদের মত দেখতে, সেই আঠা ১ গ্রাম ঠাণ্ডা জলে গুলে খেতে হবে। একদিনেই এটায় উল্লেখযোগ্য উপকার পাওয়া যাবে।

২। **রক্ত আমাশায়—** এও অতিসার রোগ—পিত্তপ্রধান আমাশয় হ'য়েছে, অর্থাৎ বিকৃত পিত্তের ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে, আর অমনি সমস্ত শরীরে দাহ, শোষ, পিপাসা হবে, তখন ইচ্ছে হবে, বেশ নুন ঝাল টক মেশানো খাই; যদি কেউ খান, তবে দেখা যায় মলের সঙ্গে রক্ত নির্গত হ'চ্ছে এবং দমকে দমকে দাস্ত হ'চ্ছে, ওই সময় জিওল ছাল ১০ গ্রাম (কাঁচা) সিদ্ধ ক'রে (জল ৪/৫ কাপ শেষ এক কাপ) ঠাণ্ডা হ'লে, ছেঁকে সমস্ত দিনে ২/৩ বারে ঐ ক্বাথটা খেতে হবে। এটাতে ওই রক্ত আমাশা সেরে যাবে।

৩। **হৃদ্‌রোগে—** অবশ্য এটা বাতপিত্তপ্রধান হওয়া চাই। এই রোগের প্রকৃতিটা এমনি যে, বার বার পিপাসা, আবার সামান্য শ্রমেই ঘাম, বুকের স্পন্দনটা অসময়ে দেখা দেবে, জল খেলেই আরাম, অথচ প্রস্রাবটা ততটা হবে না, (এর বিস্তৃত লক্ষণ এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া হয়েছে) এই অবস্থা ঘ'টলে জিওলের ছাল (কাঁচা) ১০ গ্রাম একটু থেঁতো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে সকালে ও বৈকালে ২/৩ বারে অল্প অল্প ক'রে ওই জলটা খেলে কয়েকদিনের মধ্যেই ওই অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৪। **স্তন্যের স্বল্পতায়—** জিওলের আঠা ৩/৪ মটর প্রমাণ নিয়ে কাঁচা দুধ সিকি কাপে মিশিয়ে অল্প একটু চিনির সঙ্গে সকালে ও বৈকালে ২ বার ক'রে

কয়েকদিন খেলে বুকের দুধ বেড়ে যাবে।

৫। **আফিং-এর নেশায়—** এটা যদি কাটানোর দরকার হয় তখন একটু তেঁতুল জলের সঙ্গে জিওল পাতার রস ২ চা-চামচ মিশিয়ে খাওয়ালে নেশাটা কেটে যাবে।

বাহ্য প্রয়োগ

৬। **পচা ঘায়ে—** ওই ঘায়ে একটু নিম তেল লাগিয়ে তার উপর জিওল ছালের মিহি গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে ২/৪ দিনের মধ্যে ওই পচানিটা কেটে যাবে, তারপর আরও ২/৪ দিনের মধ্যেই ঘা পুরে উঠবে।

৭। **দাঁতের যন্ত্রণায়—** এটা অসহ্য হ'য়ে প'ড়ছে—সেক্ষেত্রে জিওল গাছের ছাল ১০ গ্রাম (কাঁচা) একটু থেঁতো ক'রে ৩/৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে সেই জল কবল ধারণ ক'রতে হবে, অর্থাৎ মুখে নিয়ে ৫/৭ মিনিট রাখার পর ফেলে দিতে হবে। এইভাবে দিনে ২/৩ বার ক'রতে পারলে দাঁতের যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

৮। **ফোঁড়ার যন্ত্রণায়—** যে ফোঁড়া সবে উঠছে, অসম্ভব যন্ত্রণা হ'চ্ছে, সেক্ষেত্রে জিওলের আঠা জিওল ছালের রসে বেটে নিয়ে গরম ক'রে ফোঁড়ার চারিদিকে প্রলেপ দিতে হবে। এর দ্বারা ব্যথা, টন্‌টনানি ক'মে যাবে, এবং পেকেও যাবে শীগ্‌গির; শুধু তাই নয়, ফেটে যাওয়াতেও সাহায্য ক'রবে।

নিবন্ধের ইতি ক'রতে ব'সে ভাবছি শিবদুর্গার উপাখ্যান শুনিয়ে ঠাকুরমা দিদিমার মন ভোলানো গেল, কিন্তু ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক তো ওখানে ব'সে হাসছেন, আর ভাবছেন—লেখকের মনের গণ্ডী ওই ঠাকুরমা-দিদিমার ঝুলির মধ্যেই নিবন্ধ।

এইবার সান্দিগ্ধ হ'য়ে বাঁকা চোখে এইটাই যদি ভাবা যায় যে, আর্যরা যখন এদেশে এসেছিলেন (চলমান যে সম্প্রদায় তাদেরই বলা হ'তো আর্য) তাঁরা কৃষিসভ্যতার সঙ্গে খুব বেশী পরিচিত ছিলেন না, প্রাক্-আর্যরাই তাঁদের কৃষিবিদ্যা শিখিয়ে সম্পদশালী ক'রেছিলেন, তাই দুটি সভ্যতার মিলনই শিবদুর্গার উপাখ্যান সৃষ্টি, এটা তো বাস্তব দৃষ্টি।

পরবর্তী স্তরে পুরাবেত্তাগণ সমাজজীবনে সেইটাকে অন্য খাতে প্রবাহিত ক'রে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন, এই নয় তো?

CHEMICAL COMPOSITION

Lannea grandis Dennst

Analysis of wood :— Cellulose 53.37%; lignin 24.11%; pentosans 15.11%; Ash 1.6%. Analysis of barks :— Phlobatanin 8%. Analysis of gum :— Carbohydrates viz., l-arabinose and d-galactose. Jeolic acid (monobasic) as calcium, magnesium and potassium salt. Aldobionic acid viz., galactose-galacturonic acid.

কর্ণস্ফোটা [কানছিঁড়ে]

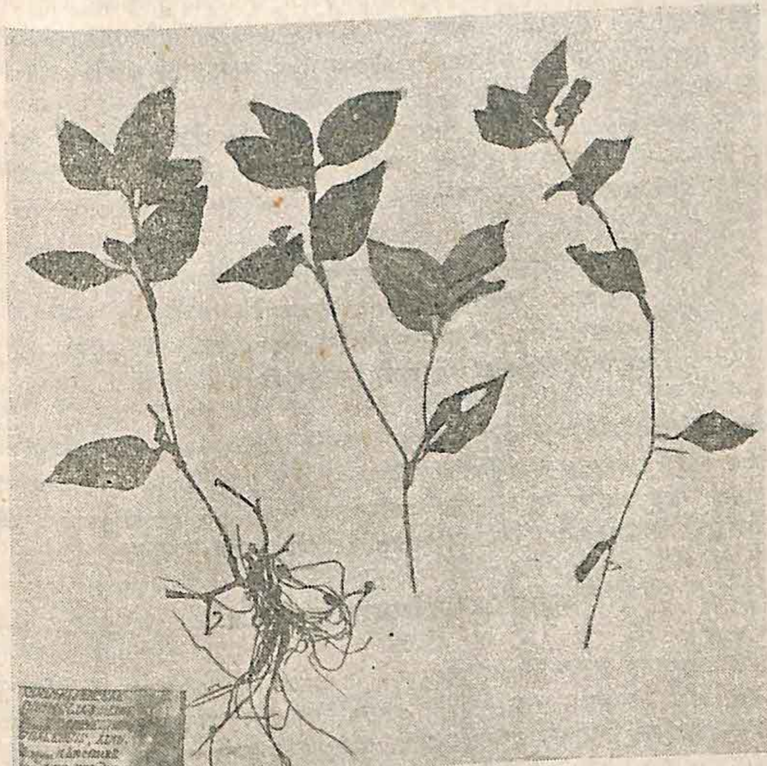
এই বনৌষধিটি লিখতে বসে আমার ছোটবেলার গ্রাম্যজীবনের কথাগুলি মনে উঁকি মারছে।

পাঠশালায় সরস্বতী পুজোয় মন্ত্র প'ড়েছি "বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ", কথাটা কিন্তু "বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এবচ"। সেই অবস্থা ঘটার মত এই ভেষজটির নাম নিয়ে, তারপর পরবর্তীকালে কালিদাসের মেঘদূতের ছবিগুলি দেখতে দেখতে মনে হ'তো এই যে পূর্বমেঘ—এর মানে কি পূর্বদিকের মেঘ? আর উত্তরমেঘ মানে কি উত্তরদিকের মেঘ? এই গাছটির নামের বেলায় কিন্তু ঠিক সেই অবস্থা। আরও একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে—দীপান্বিতা লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন "নেড়ানোড়ি" ঘর পোড়ানোর উৎসব হ'তো, আর পরের কলা গাছের শুকনো পাতা আর থাকতো না, কলা বাগানে ঢুকলেই নিবন্ধোক্ত এই গাছটার দরকার হ'তো শুঁয়োপোকার কাঁটাকে সামলাতে, তখন তার পরিচয় (গ্রাম্য লোকের কাছে) ক্যাঁদ্ড়া। আবার কেউ ব'লতো ঢলা পাতা, বেশ ঢলঢলে পাতাগুলো হয় ব'লে তাই কি তার নাম ঢলাপাতা? পরবর্তীকালে আমার কাছে এসে হ'য়েছিলো কানছিঁড়ে (এইটাই এতদঞ্চলের লোকপ্রচলিত নাম), আজ তারই নাম লিখছি "কর্ণস্ফোটা"। তাহ'লে আমার প্রথম জীবনে চেনা ক্যাঁদ্ড়াই আজ কর্ণস্ফোটা হ'য়ে গেল! তাই গ্রামের খিচোড় পণ্ডিত ব'লতো সরস্বতীকে যত "ঘেঁটাঘেঁটি" ক'রবি তত তোর বশ হবে, তখন কথাটা বড়ই বেয়াড়া লাগতো, আজ দেখছি কথাটা মিথ্যে নয়; তা যাক্, এইবার পণ্ডিতের টোলে ঢুকে সংস্কৃতভাষা কামধেনুর কাছে এসে আপনার মাথা গুলিয়ে যায় কিনা দেখুন।

এই যেমন গুরু একটি শব্দ—এই শব্দটির অর্থ সুবিধেমত হ'য়ে যায়, কখনও "বিশাল" কখনও ভারি, কখনও "মহান" কখনও দারুণ, কখনও "সার"। আবার ওই

গুরু হ'য়ে যায় দৃঢ়, কঠিন, পিতা, আচার্য, অধ্যাপক, প্রিয়, হর্ষ, দুর্বহ, কষ্টসাধ্য, দুষ্পাচ্য, শ্বশুর, পরাক্রম, অত্যাবশ্যক, তীক্ষ্ন, উত্তম, নিবিড় ও কখনও ঘন. এমনি নানান অর্থের উপলব্ধি হয়—শব্দটি পরিবেশগত অর্থ বিন্যাসের উপযোগী ক্ষেত্র হিসেবে। তাই এখন মনে হয়, যতই ঘাঁটাঘাঁটি করা যায়, ততই নিজেকে মূর্খ মনে হয়। এটা কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের কথা ব'ললাম। এইবার প্রথম স্তরের অর্থাৎ আদি স্তরের মনটার কথা বলি।

দেখা যায় ছোট্ট গন্ডীর বিদ্যের লোক নিজেকে এত বড় মনে করে যে, তখন সে "ধরাকে (পৃথিবীকে) সরা দ্যাখে" তারই খেদোক্তি হ'লো—



ভেকো ব্যক্তি বিলঙ্ঘ্য কুপসলিলং কো মে হনুমান পুরঃ
"কর্ণস্ফোট" রবং ধমন্ খরতরং স গর্দভ স্তৃপ্যতি।
খদ্যোতঃ প্রতিপদ্য দীর্ধিতি লবং চন্দ্রপ্রভাং নিন্দতি
ক্ষুদ্রঃ পশ্যতি নাত্ম-নীচতমতাং মিথ্যাভি মানান্বিতঃ।

অর্থাৎ একটি ব্যাং হঠাৎ কূপ ডিঙ্গিয়েছে, অমনি ভাবলো, আরে! আমার মত লাফাতে কি হনুমান পারে? আবার একটি গাধা নিজের ডাকে এত গদ্‌গদ হয় যে, সে মনে করে, আঃ কি তৃপ্তিই না দিচ্ছি লোককে; আরও জোরে ধমক দিয়ে ডাকে, তখন তার ডাকে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার জো। সেইরকম জোনাকী পোকাগুলিও

তাদের পুচ্ছভাগের আলো জেবলে ভাবে, হুঁ, এ আলোর কাছে আবার চাঁদের আলো? তাই তো বাংলায় প্রবাদ—

ক্ষুদ্রমনা ভাবে নাকো নিজের নীচতা।
এঁটোপাতা আনে নাকো স্বর্গের বারতা॥

তা যাক্, এই শ্লোকটিতে পাওয়া গেল কর্ণস্ফোট। এ শব্দটির ঢের অর্থ, কানের পরদা, কানে বর্ণ শক্তির প্রবাহ প্রবেশ, কান বেঁধানো, কানে ফোড়া হওয়া, এমনি আরও কত, আবার আয়ুর্বেদীয় অর্থ, যার পাতাগুলির চেহারা ঠিক কানের পাতার ধার যেমন ছেঁড়া ছেঁড়া তেমনি। তাই লোকপ্রচলিত ভাষা কানছিঁড়ে গাছ। হিন্দিতেও কানছিরে, মহারাষ্ট্রে কানফোড়ী, তামিলে কানভাজাই এইরকম। এই কানছিঁড়ে গাছটিও যে কত উপকারী তা প্রকাশ করা যাক।

এ নাম প্রথম পাওয়া যায় বৈদ্যক নিঘণ্টুগুলির মধ্যে, দ্বিতীয় রাজনিঘণ্টু, তৃতীয় নিঘণ্টু রত্নাকর, তবে পূর্বেকার বৈদ্যক নিঘণ্টুর উক্তিকেই অনুসরণ ক'রেছেন রাজ-নিঘণ্টুকার। সেই গ্রন্থে বলা হ'য়েছে—

কর্ণস্ফোটাতু কটুকা চোষ্ণা চাগ্নি প্রদীপনী।
তিক্তাহিমা বিষঘ্নীচ গ্রহদোষ নিবারণী॥
বাতগুল্মোদর প্লীহ কর্ণব্রণ বিষাপহা।
কফপিত্ত জরানাহ কফ শূল বিনাশিনী॥

অর্থাৎ কর্ণস্ফোট গুল্মটি কটু ও তিক্ত রসসম্পন্ন, উষ্ণ গুণধর্মী, অগ্নির দীপক, তবে তিক্ত হয়েও শৈত্যগুণ এবং বিষদোষ নিবারক। আর যেসব রোগে ব্যবহার ক'রলে ফল পাওয়া যাবে তাহ'ল কফপিত্তজ্বর, কফবিকারজ শূল, এবং শ্লেষ্মাপ্রধান পেটের ফাঁপ; তাছাড়া ঐ পিত্তশ্লেষ্ম বিকারজ আরও কয়েকটি রোগে।

আয়ুর্বেদের দ্রব্যবিচারের দৃষ্টিকোণে

প্রথমে দেখা হয় দ্রব্যের রস, তারপরে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি। এই যেমন, রসধর্মিতায় যেটি কটু এবং তিক্তরস সম্পন্ন সেটির সম্বন্ধে সুশ্রুতের অভিমত (সূত্রস্থান ৪২ অধ্যায়) কটুকো রসঃ শ্লেষ্মনঃ প্রত্যনীক ত্বাৎ...অর্থাৎ কটু রসের স্বভাবই হ'লো যেহেতু সেটি বায়ু ও অগ্নি এই দুই মহাভূত থেকে আগত বা উত্থিত হয়, সেই হেতু রূক্ষ উষ্ণ এবং লঘু গুণের সম্বন্ধযুক্ত হবেই। তাছাড়া এতে অতিরিক্ত সত্তা থাকে তীক্ষ্ণতা ও বৈশদ্য। এইসব গুণ থাকার জন্যই পিত্তের সমান যোনি হ'য়েই কফের প্রশমন ক'রবেই। দ্বিতীয়তঃ ভেষজটিতে তিক্ততাও আছে। তিক্ততার মূলীভূত মহাভূতও, বায়ু আর পার্থিব শক্তি; তারই ফলে রূক্ষতা, লঘুতা এবং শৈত্য ধর্ম থাকবেই। এসব কিন্তু বায়ুর সমান যোনি, কিন্তু পিত্ত বিকারের বিরোধিতা ক'রেই পিত্তের প্রশামক হবেই। অতএব কফবিকারের বিপরীত হওয়ার জন্য কফেরও প্রশামক।

কর্ণস্ফোট গুল্মটির সম্বন্ধে বাংলার বৈদ্যগণ যেভাবে প্রত্যক্ষ শক্তির প্রয়োগ দেখেন তা কিন্তু তার প্রভাবগত ফলই।

কথাটা এই যে আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের সূত্রস্থানের ২৬ অধ্যায়ে বলা

হ'য়েছে যে—

"রসাদি সাম্যে যৎকর্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজম্"

অর্থাৎ যে দ্রব্যে একটা বিশিষ্ট সামর্থ্য থাকে তাকে বলা হয় প্রভাব। যেমন অর্জুন-ছালের রস হৃদয়ের বল বাড়ায়, শিরীষ ছাল বিষদোষ দূর করে, খদির (খয়ের) কুষ্ঠ-রোগ সারায়, বিড়ঙ্গ ক্রিমি দূর করে। আধুনিক (পাশ্চাত্তের) বৈজ্ঞানিকগণও প্রভাব বা অচিন্ত্যশক্তিকে উড়িয়ে দিতে পারেন না। তাঁরা বলেন, বহুদ্রব্যের মধ্যেই একটা স্পেসিফিক্ প্রোপারটি (Specific property) আছে, সেই শক্তিতেই বহু ব্যাধি দূর করে, তবে এটা অলৌকিক কিছু নয়। আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'য়েছে আয়ুর্বেদে যেমন রক্তচিতামূল (Plumbago indica) এবং দন্তীমূল (Baliospermum montanum) এ দুটিই কটু রস, এবং বিপাকেও কটু বীর্যেও উষ্ণ, কিন্তু দন্তীমূল খুব বিরেচন করায়, অথচ রক্তচিতা ধারক। একেই বলা হয় প্রভাব। যষ্টিমধু মিষ্টরস, কিস্‌মিস্‌ও (দ্রাক্ষা) মিষ্ট রস, শীতবীর্যও উভয়ে, কিন্তু দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস্) বিরেচক, অথচ যষ্টিমধু সে পর্যায়ে ধরা হয় না।

এই প্রভাব শক্তিটির বিশদ ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন হ'লে, চরকের গঙ্গাধরীয় ব্যাখ্যাটির অনুশীলন ক'রলে আরও সুন্দর অনুভব করা যাবে। সে ব্যাখ্যার সার বক্তব্য হ'লো প্রভাবের প্রাত্যক্ষিক রূপটি প্রকাশ পায় দুই প্রকারে—একটি সমান প্রত্যয়ারব্ধ আর একটি বিচিত্র প্রত্যয়ারব্ধ।

এর প্রকৃত অর্থ হ'লো, যে দ্রব্যে দ্রব্যশক্তি ও তার ভৌতিকশক্তি (পঞ্চ মহাভূতগত শক্তি) সমান, তাকে বলা হয় সমান প্রত্যয়ারব্ধ প্রভাব, আর যেখানে দ্রব্যশক্তি ও দ্রব্যগত রসাদি শক্তি ভিন্ন হ'য়েও একত্র কাজ করে সেটা বিচিত্র প্রত্যয়ারব্ধ। যেমন দুধ ও ঘি হ'লো সমান প্রত্যয়ারব্ধ, আবার যব ও গম কিন্তু বিচিত্র প্রত্যয়ারব্ধ। গম বাতরোগ দূর করে, আবার শ্লেষ্মারও কোপ বাড়ায়, যব বায়ুকারক, দুধ শীতবীর্য, ঘৃত উষ্ণবীর্য, অথচ ভৌতিক দ্রব্যশক্তি হিসেবে দুধ ও ঘি একই।

তা যাক, কানছিঁড়ে বা কর্ণস্ফোট ভেষজটির কাজ কিন্তু অচিন্ত্য শক্তিতে, অর্থাৎ প্রভাব জন্য কারণ, এটি তিক্তরস হওয়ার জন্য শ্লেষ্মারই ছেদ করে, পিত্তের নয়; কিন্তু পিত্তের বিকারজাত রোগগুলিতে চমৎকার ফল দেখা যায়। এই প্রসঙ্গ নিয়েই পরে আলোচনা করা হবে।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— এটি তিক্তরসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ ও কোমলতা কারক, মৃদুবিরেচক।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— কুষ্ঠরোগে ও বাতব্যাধিতে বাহ্য ব্যবহারে হিতকর। পাতার ক্বাথ পানীয় হিসেবেও অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। কেউ কেউ কচিপাতার শাক রান্না করে খেয়ে থাকেন। তাছাড়া উক্ত উদ্ভিদ্ থেকে প্রস্তুত ঔষধ নারীর বন্ধ্যাত্বে ব্যবহৃত হয়। মাংসল মূলগুলিতে শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যের উপাদান থাকার জন্য অনেকে রান্না করেও খেয়ে থাকেন।

পরিচিতি

ভূমিসংলগ্ন ক্ষুপ। কাণ্ড নরম, গাঁটযুক্ত ও রোমশ। পাতা প্রায় ১—৩ ইঞ্চি লম্বা ও ½—১½ ইঞ্চি চওড়া হতে দেখা যায়। এর অগ্রভাগ গোলাকার কিন্তু বৃন্ত নেই বললেই

হয়। পাতার গোড়ার দিকটায় একটু চওড়া বেষ্টনী আছে যেটা লতাটাকে জড়িয়ে ধরে রাখে এবং এর গায়ে কোমল রোম আছে। পুষ্পাধি দেখতে অনেকটা ছেঁড়া কানের মত, তার মধ্য থেকেই ছোট ছোট নীল ফুল হয়। তাই এর লোকপ্রচলিত নাম কানছিঁড়ে। বীজকোষ ঝিল্লীযুক্ত। বর্ষার শেষ হতে শীতের প্রারম্ভে ফুল ও বীজকোষ এবং বসন্তের শেষে গাছ মরতে শুরু করে।

এই গণের (Genus) বহু প্রজাতি ভারত এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে থাকলেও বর্তমানে ৭/৮টি প্রজাতি প্রায়ই পাওয়া যায়।

ভারতের সর্বত্র অল্পবিস্তর জন্মে। বিশেষতঃ বাংলায় স্যাঁতসেঁতে জমিতে এটা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এর সংস্কৃত নাম কর্ণস্ফোট, বাংলা নাম কানছিঁড়ে ও হিন্দীতে কানছিরে নামে অভিহিত, দেশগাঁয়ে একে ঢোলাপাতা বলে। বোটানিক্যাল নাম Commelina benghalensis Linn. ও ফ্যামিলি Commelinaceae.

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র উদ্ভিদ্।

লোকায়তিক যোগ

কানছিঁড়ে রসবহ স্রোতেই প্রভাব আনে।

১। **বাতগুল্মে—** রোগটির প্রচলিত পরিচয় জানলে আর অসুবিধে হবে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এটা হওয়ার কারণ হ'লো মলমূত্রের বেগ চেপে রাখার জন্য, এবং প্রায়ই যাঁরা পেটটা পরিষ্কার থাকে না ব'লে জোলাপ নেওয়ার অভ্যাস করেন, আর ব্রত পার্বণ পালন ক'রতে গিয়ে উপবাস করেন, তাদের নাভির চারপাশে কুন্‌কুনে ব্যথা, অধোবায়ুর নিঃসরণ না হওয়া, মাথায় ভারবোধ, আর ক্রমে পেটের ভিতরে একটা চাকা ঘুরে বেড়ানো (বলের মত) এরই নাম বাতগুল্ম। এটা হ'লেই শুকনো (শুষ্ক) কানছিঁড়ে গাছ ৫ গ্রাম একটু ভিজিয়ে রাখার পর তাকে থেঁতো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রতে হবে, তারপর আন্দাজ এককাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে ওই জলটা সকালে ও বৈকালে দু'বারে খেতে হবে। এর দ্বারা ওই রোগটা সেরে যাবে, তবে যে কারণে রোগটা হ'য়েছে সেটাকে বর্জন ক'রতে হবে।

২। **উদর রোগে—** এই রোগটির জন্ম হয় অগ্নিমান্দ্য থেকে।

প্রথমে পেটে প্রায়ই ফাঁপ হয়, অথচ অম্বলও হয় না, অজীর্ণ যে হয়েছে সেটা বাহ্যতঃ বোঝা যায় না। মনে হয় ভুঁড়িটা বাড়ছে, আসলে পেটে ফাঁপ। লক্ষ্য করা যায় এঁদের অধোবায়ুর নিঃসরণ খুব কম হয়, শরীরের বলও ক'মে যেতে থাকে, কোথাও বেড়াতে যেতে মন চায় না, আর সব সময় ঝিমুনি। এই ক্ষেত্রে শুকনো কানছিঁড়ে গাছ ৫ গ্রাম (প্রয়োজন বোধে ১০ গ্রামও নেওয়া যায়, তবে প্রথমে ৫ গ্রাম ক'রে কয়েকদিন খেয়ে উপকার না বুঝলে ১০ গ্রাম ক'রে নিতে হয়) ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে ওই জলটা দু'বেলায় খেতে হবে; এর দ্বারা এক সপ্তাহের মধ্যেই ওই অসুবিধেটা আর থাকবে না।

৩। **বাতজ শূলে—** এর লক্ষণ হ'লো, এ'রা ডালের ভক্ত হ'য়ে থাকেন, সুপুরি জাতীয় শক্ত জিনিসে মুখশুদ্ধি করার ইচ্ছে, এর সঙ্গে মেরুদণ্ডে ফিক্ ব্যথা, কোমরে ব্যথা, তারপর কিছু খেলেই পেটে ব্যথা, সন্ধ্যায় বর্ষাকালে, শীতে ক্রমশঃ ওই ব্যথাটা বাড়তে থাকে, মাঝে মাঝে পেটের ভিতরে ছুঁচ ফোটার যন্ত্রণা—এইসব লক্ষণ প্রকাশ পেলে শুকনো কানছিঁড়ে ৫ গ্রাম ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আন্দাজ এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে ওটাকে দু'বেলা খেতে হবে, তবে প্রথম কয়েকদিন ক্বাথের অর্ধেক

পরিমাণ ফেলে দিতে হবে। যদি উপশম হয়ে যায় তবে ওই পরিমাণই বরাবর খেতে হবে।

বাহ্য ব্যবহার

৪। **কানের পূঁজে—** কানছিঁড়ে পাতার রস গরম ক'রে ফোটা ফোটা করে প্রত্যহ একবার বা দু'বার ক'রে দিতে হয়, তবে তুলো দিয়ে প্রত্যহ একবার ক'রে কানের ভিতরটা পরিষ্কার ক'রে নিতে হয়।

৫। **বিষাক্ত ঘায়ে—** কানছিঁড়ের গাছ (পাতা সমেত) বেটে অল্প গরম ক'রে ওই ঘায়ে প্রলেপ দিলে সেরে যাবে।

৬। **দাদ্ ও একজিমায়—** কানছিঁড়ের গাছ ও পাতা একসঙ্গে বেটে প্রত্যহ একবার ক'রে লাগালে ২/৪ দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপকার পাওয়া যাবে।

সর্বশেষে ব'লে রাখি, এর বিখ্যাত প্রভাব হ'লো, যে কোন্ বিষাক্ত পোকার শুঙ্গো (শুঁয়ো) ফুটলে কানছিঁড়ে পাতার রস অথবা পাতা বেটে ওখানটায় ঘষলে পোকার সাদা সূক্ষ্ম লোমগুলি গ'লে যায়। শুঁয়োপোকার উপর এই পাতার রস দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন, অথচ মৌমাছির গায়ে লাগালে কিছুই হবে না; বোল্‌তার হুল ফোটানো জ্বালায় এটায় বিশেষ কোন কাজ করে না। আর একটি তথ্য জানাই, এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; "তেড়ে" ব'লে এক রকম পাখি আছে তারা শুঁয়োপোকা, বিছে সব খায় এবং কুটুরে পেঁচাগুলো শুঁয়োপোকা খায়, ভাদ্র মাসে সাধারণতঃ শুঁয়োপোকা হয়—এই সময় কানছিঁড়ে গাছ বাংলায় যত্র-তত্র হয়, এবং প্রায়ই ওই কানছিঁড়ের পাতা খায়। তাহ'লে দেখুন জীবজন্তুর কাছ থেকে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি যে এটা এর ওষুধ। এটা তার ইন্‌টিউশন্—যাকে বলা যায় স্বভাব প্রেরণা।

কানছিঁড়ে নিবন্ধ শেষ হ'লো, এখন আত্মসমীক্ষা ক'রবার জন্য ব'সে প'ড়লাম। স্পুট্‌নিকের মত ঘুরতে ঘুরতে একটা ঢিল খেয়ে পাটকেলে আটকে গেল। রকমটা হ'লো এক জমিদার একদিন দ্যাখেন, তাঁর ম্যানেজারের দুই কানেই ফ্যাটা বাঁধা; কারণ জিজ্ঞেস করায় উত্তর এলো—আজ্ঞে প্রজাদের যত কড়া হুকুম দিচ্ছি কানটা তত বেশী মে.টা ক'রে জড়াতে হ'চ্ছে; তার কারণটা আর না বলাই ভালো।

আমাদের মত বৈদ্যকুলের এখন কানে ব্যাণ্ডেস্ ক'রে চ'লতে হ'চ্ছে, কান কাটার ভয়ে নয়, "সুখ্যাতির ভয়ে!"

এইভাবে এই পথে (এই নীতি নিয়ে) চ'ললে ব্যাঙের মত ফেটে ম'রে যেতে হবে না তো? না কি কানছিঁড়ে নামটাই আমাদের উপর প্রবর্তিত হবে!

CHEMICAL COMPOSITION

Commelina benghalensis Linn.

Flower pigment contains :— delphinidin diglucoside; p-cumaric acid; and awabanol.

পালঙ্ক্য [পালংশাক]

বিদ্যালঙ্কারের টোলের পাকশালার বারান্দায় ব'সে পরিচারিকা ক্ষেমঙ্করী রোদপিঠ্ হ'য়ে পালংশাক কুটছে, সেটা দেখেই দীপক অলঙ্কারের শ্লোকের ছত্র কয়টি মনে প'ড়ে গেল—টোলের সেরা ছাত্র চৈতন্যঠাকুরের। অমনি তাড়াতাড়ি আওড়ে শোনালো—

"কন্যা কৌতুকমেব, যৌবনবতী সম্ভোগ মাত্রার্থিনী।
বেশ্যা বিত্ত লবেচ্ছয়া, স্বগৃহিণী গত্যন্তরাসম্ভবাৎ।
পালঙ্কে শয়নং হ্যনেক সুখতঃ পালঙ্ক্য শাকাশনং
বাঞ্ছন্তীত্থমনঙ্গ শক্তি নিবহাৎ, পুণ্যৈঃ পরৈঃ প্রাপ্যতে॥"

অর্থাৎ যখন কন্যা থাকে, তখন মন চায় হুটোপাটি, আর যৌবনকালে চায় সম্ভোগে মন জমিয়ে রাখতে, বারবনিতা চায় অর্থ, কিন্তু গত্যন্তর না থাকায় স্বামীর সুখেই সুখ চায় গৃহিণী, আর দেহ সঙ্গসুখের বিহারভূমিটি যে পালঙ্ক তাও চায়, (খাট পালঙ্ক!) তাছাড়াও রসাস্বাদে জিহ্বা চায় পালং শাকের তরকারি; তবে বলা যায় বহু পুণ্যের দ্বারাই এসব পাওয়া যায়, কি বল হে জনার্দন?

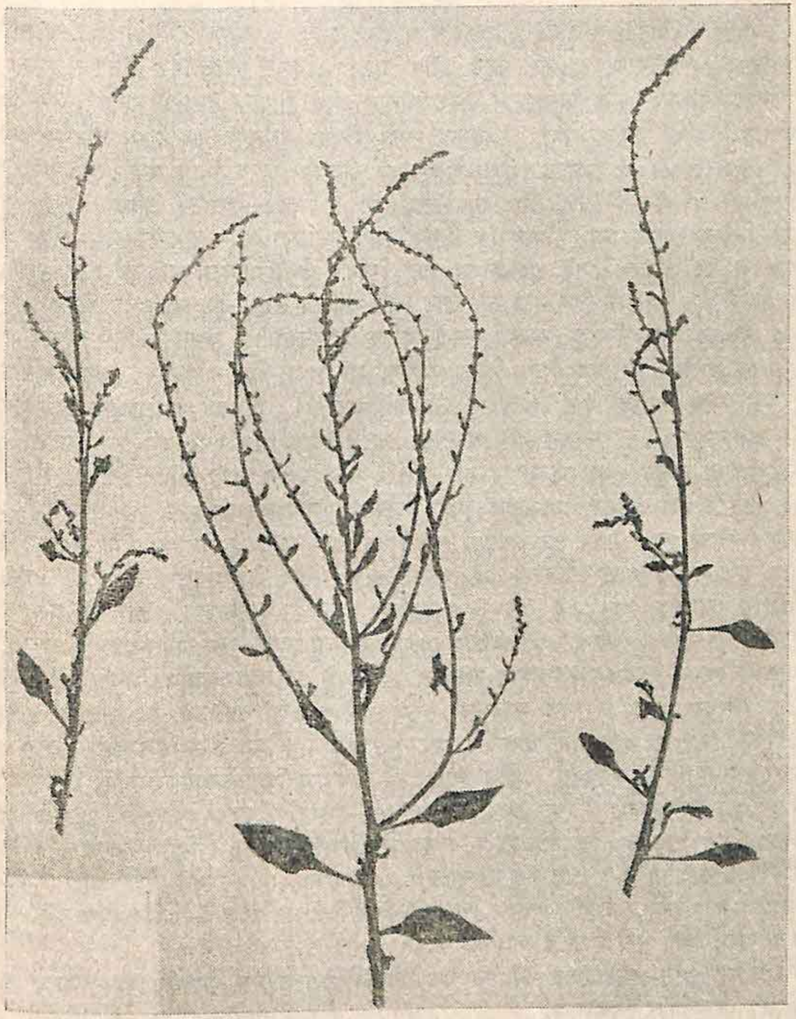
অমনি তখনি জনার্দন ঠাকুর সুরে সুর মিলিয়ে ঐ দীপক অলঙ্কারের আর একটি উদাহরণ আওড়ালো—

"অধরস্য মধুরিমাণং সুকবেঃ কবিতা স্বাদম্।
পালঙ্ক্য শাকেন ভোজনং হ্যনুভব রসিকো বিজানাতি॥"

অর্থাৎ অধরের চুম্বন মাধুরী, সুকবির কবিতার স্বাদ এবং পালং শাকের ঘণ্ট

দিয়ে আহার, এ যে কত তৃপ্তির তা অনুভবী রসিকই বোঝেন। অতএব পালং শাকের প্রশস্তি বহু প্রাচীন।

সেই প্রশস্তির মূলে আছে ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় বৈদ্যবৃন্দের সুমহান অবদান। কারণ যার ভৈষজ্যখ্যাতি চরক-সুশ্রুত বাগ্‌ভটের মত প্রাচীনতম বৈদ্যক গ্রন্থে লিপিবন্ধ আছে এবং তা সুস্পষ্ট ক'রেই বলা হ'য়েছে। এই পালঙ্ক্য বা পালং শাকটি একাধারে



ভেষজ ও পথ্য, অতএব তা আহার্যেরও সুষ্ঠু উপাদান। তবে দেখা যাচ্ছে—বেদে বা তৎপরবর্তী অথর্ব সংহিতা বা উপবর্হণ সংহিতায় এই নামে কোন ভেষজের নজির পাওয়া যায় নি, হয়তো বা নামান্তর হ'য়ে থাকাটাও অসম্ভব নয়; তাই বক্তব্যটা চরকের কাল থেকেই রাখছি।

বৈদ্যকের নথি

শাক সম্পর্কে চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে বলা হ'য়েছে—

শাকং গুরুচ রুক্ষঞ্চ প্রায়োবিষ্টম্ভ্য জীর্য্যতি।
মধুরং শীতবীর্য্যঞ্চ পুরীষস্য চ ভেদনম্॥

অর্থাৎ শাকের প্রকৃতিটাই হ'লো সে গুণগত গুরু ও রুক্ষ, তাই শাকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া পেটে বায়ু হওয়া, তবে জীর্ণ হয়; কিন্তু স্বাভাবিক রসপ্রকৃতিতে সে শীতবীর্য অর্থাৎ শাক অম্বুগুণ এবং বায়ুর গুণ প্রাধান্য নিয়েই জন্মে, এর ফলে আগ্নেয় হ'য়েও বায়ুকারক। সেইমত শাক ভক্ষণ সম্বন্ধে একটা সংস্কারের দ্বারা, যাকে বলে একটা প্রোসেসের (Process) পর আহার্য ক'রে নিতে হয়। সে সংস্কারটা হ'লো—স্বিন্নং নিষ্পীড়িত রসং স্নেহাঢ্যং তৎ প্রশস্যতে—অর্থাৎ একটু সিদ্ধ ক'রে নিয়ে নিংড়ে জলটা ফেলে দিয়ে ঘি অথবা সামান্য তিল বা বাদাম তেলের সঙ্গে পাক ক'রে অর্থাৎ সাঁতলে সেই শাকই খাওয়ার বিধি। তথাপি মনে রাখতে হবে—অন্যান্য শাকের সূপ (soup) করা যায় না, তবে লাউ-কুমড়ো এই রকম কয়েকটি শাকের সূপ করে খাওয়া যায়, কিন্তু পালং শাকই হ'চ্ছে সর্বোত্তম। কথাটা এই—এইসব শাক শুকিয়ে গেলেও তাদিকে সিদ্ধ ক'রে আহার্য বা পথ্য করা যায় এবং ভৈষজ্যগুণগুলি তাদের কাছে পাওয়া যায়, পালঙ্ক্য তাদেরই একটি। এভিন্ন—সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের ২৬৬ শ্লোকে বলা হ'য়েছে, পালং শাকের বৈশিষ্ট্য হ'লো—এটাতে কিছু ক্ষারধর্মিতা আছে এবং সে মধুর রস অর্থাৎ রসে মধুর তাই এটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য. এই শাকটি মল ও মূত্র নিঃসারক। তবে যাঁরা প্রবল শ্লেষ্মাবিকারে আক্রান্ত হন—এটা তাদের পক্ষে ভাল নয়। প্রকৃতপক্ষে বাত-পিত্ত প্রকৃতিটাতেই যাদের মৌল গঠন, যাকে বলে বাতপিত্তের ধাত্—তাদের এই পালং শাক প্রভূত উপকার সাধন করে, এমন-কি রক্তপিত্ত রোগের সুরুতেই এর উপকারিতা সহজেই উপলব্ধব্য। তাছাড়া বাগ্ভটের সূত্রস্থানের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৮৮ শ্লোকে যেটুকু বলা হ'য়েছে—তা প্রায় চরকেরই অনুরূপ! বৈশিষ্ট্য শুধু—পালং যে মলমূত্র উভয়ের নিঃসারক, তা বলা হয়নি। সর্বাপেক্ষা বিশেষ উক্তি চক্রদত্তের অর্থাৎ শাক সম্বন্ধে পঞ্চম ষষ্ঠ শতক পর্যন্তই যে তাদের গুণগত পরীক্ষা হ'য়েছে তাই নয়, একাদশ শতকেও যে নিরীক্ষা চ'লেছিল—তা বোঝা যায় চক্রদত্তের দ্রব্যগুণ সমীক্ষায়। তিনি বলেছেন—শাক যে বিষ্টম্ভকারক অর্থাৎ পেটে বায়ু-কারক তা নিঃসন্দেহ, কিন্তু যেগুলি তা নয়—সেগুলি, যেমন বাস্তুক, সুষ্নী এবং তন্ডুলীয়ক প্রভৃতি, তাদের মধ্যে—পালঙ্ক্যা বদ্ধ বিন্মূত্রা কফঘ্না তন্ডুলীয় বৎ—অর্থাৎ তন্ডুলীয় শাক রসে মধুর, পাকেও মধুর যেমন (এর অর্থ হ'লো পরিপাকান্তেও মধুর রস থাকে), তেমনি পালং শাকও। এর বিশেষ স্বভাব—এটি কফহারক, যাকে বলে কফবিকার নষ্ট ক'রতে সাহায্য করে।

এখন প্রশ্ন—সুশ্রুতের উক্তিতে কফবিকারে প্রশস্ত নয়, আর চক্রদত্তে আছে, কফ-হারিত্ব এর বিশেষ স্বভাব।

এখানে সমাধা এই যে—শ্লেষ্মা শব্দ যেখানেই থাকে, তার অর্থ দেহের মৌল ধাতু, আর যেখানে কফ শব্দের প্রয়োগ, সেখানে বুঝতে হবে—শ্লেষ্ম-প্রকোপকে বোঝায়। অর্থাৎ—

তুহিন পতনকালে শ্লেষ্মণঃ সং প্রকোপঃ
প্রভবতি দিবসাদৌ ভুক্তমাত্রে বসন্তে।

অর্থাৎ শিশির লাগিয়ে, বর্ষার জল ঘেঁটে, খেয়েই শুয়ে পড়ে যারা, তাদের শ্বাস রোগের সম্ভাবনা; তাছাড়া ধূমপানে, ধূলো লাগায়, রৌদ্রাদির উৎকর্ষ সংযোগে যে আগন্তুক শ্লেষ্মার উদ্ভব হয় সেটারই নাম কফ। এক্ষেত্রে পালং ক্ষতিকর তো নয়ই বরং হিতকর, অর্থাৎ কফবিকারে পালং ক্ষতিকর তো নয়ই বরং হিতকর। কিন্তু শ্লেষ্মা-প্রকৃতির কফবিকারে ক্ষতিকর; কারণ মূল প্রকৃতিতেই আগন্তুকের আগমনজনিত কফ-ধাতুর বিকার জনিত ব্যাধি। কিন্তু যাঁরা বাত-পিত্ত প্রকৃতির, তাঁরা যদি কফবিকারে আক্রান্ত হন তাদের পালং শাক খুবই উপকারী।

এখানে প্রসঙ্গতঃ দুটি কথা ব'লতে হয়—পালঙ্ক্য এই নামরহস্যের মধ্যে একটু তথ্য লুকিয়ে আছে, শয্যার আধার পালঙ্ক শব্দটির আদি রূপ পর্যঙ্ক। ওর অর্থ যার বিস্তৃত আধারটি যেন কোল পেতে আছে (পরি+সর্বতো ভাবেন অঙ্কঃ=ক্রোড় ইব), সেই পর্যঙ্ক শব্দটি মুখের ভাষায় গড়াতে গড়াতে পলঙ্ক, তারপর পালঙ্ক হ'য়েছে। আর যখন শাক অর্থ তখন পালঙ্ক্য। এইটিই আয়ুর্বেদের ভাষা। (পালং+বলং) অচ্+ক্বিপ্ পাল ততঃ অঙ্ক্য। এর অর্থ যে মলধাতুর বল রক্ষা করে, অসার মল দূর করে। এই অর্থই আয়ুর্বেদে গৃহীত, কারণ আয়ুর্বেদ সিদ্ধান্ত—"শুক্রায়ত্বং বলং পুংসাং মলায়ত্বং হি জীবিতং"—অর্থাৎ মানবের দেহবল ও মনোবল থাকে। শুক্রের আয়ত্তে, আর প্রাণের বল সঞ্চিত থাকে বিষ্ঠার বলে। এই পালং শাক দেহ থেকে মল দূর করে, সেটা অসার মল, সার ভাগকে নিষ্কাশন করে না এবং সার ভাগকে রক্ষাই করে। অসার মলে বায়ু কুপিত হয়, দেহের স্রোতগুলিতে বায়ুর স্বচ্ছন্দ সঞ্চার ব্যাহত হয়। এই পালং শাক সেই দেহগত স্বচ্ছন্দচারী বায়ুর গতিকে সমগ্র শরীরে সঞ্চারিত ক'রতে সাহায্য করে। তারপর অসার মল থাকাটায় যে বায়ু কুপিত বা স্তব্ধ হয়ে থাকা সেটাকে চল্‌তি কথায় "পেটে বায়ু হওয়া" বলে, আর চিকিৎসা-পরিভাষায় বলা হয় আনাহ—এইটার অপর নাম বিষ্টম্ভ। এটা এইভাবে ঘটে—

> আমং শকৃদ্ বা নিচিতং ক্রমেণ
> ভূয়ো বিবদ্ধং বিগুণা নিলেন।
> প্রবর্ত্তমানং ন যথা স্বমেনং
> বিকারমানাহ মুদহরন্তি॥

অর্থাৎ মল অল্প অল্প ক'রে সঞ্চিত হ'তে হ'তে (যাকে বলে কোষ্ঠ সাফ না হ'লে) ক্রমেই সেই মল বেশ স্তূপ হয়ে যায়, আবার আমাশয় ব্যাধিতেও মল কিছুটা সঞ্চিত কিছুটা নিঃসৃত হ'য়ে হ'য়ে তাতেও কোষ্ঠমল বোঝাই হয়, তারই ফলে কোষ্ঠাশয়ের এবং অগ্ন্যাশয়ের বায়ু ব্যাকুলিত হয় বা কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়, সমগ্র উদর গহ্বর শেষে বায়ু ভরা ভস্ত্রার মত (হাপরের মত) হয় আর সেই সঞ্চিত মল হয় গুঁটলে বাঁধে, নচেৎ থকথকে নর্দমা-কাদা হ'য়ে থাকে; এই অবস্থায় এমন দ্রব্য ব্যবহার ক'রতে হয়—যা ভেদক নয়, যা বিরেচকও নয়। ভেদক ভেষজ দিলে রোগী দুর্বল হ'য়ে যায়, আর বিরেচক যদি যথোপযুক্ত মাত্রায় না দেওয়া হয়, তখন সেই বিরেচক ভেষজই আবার মলের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে আনাহ বা বিষ্টম্ভকে বাড়িয়ে দেয়। এই ক্ষেত্রে পালং শাকের ব্যবহারের জন্য আয়ুর্বেদের উপদেশ। এই শাক সন্তর্পণেও কাজ করে। সন্তর্পণ শব্দটিও আয়ুর্বেদীয় পরিভাষা। এর অর্থ—আহার জন্য তৃপ্তি। এই তৃপ্তিকর আহারের মাত্রা বেড়ে গেলে তর্পণোত্থ ব্যাধি হয়; অর্থাৎ তর্পণ বা সন্তর্পণের মাত্রাও "অতি" ক'রতে নেই। অর্থাৎ তৃপ্তিকর দ্রব্যও বেশী খেতে নেই। যেমন আঙ্গুর, দাড়িম, খেজুর, কলা, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি।

নব্যের সমীক্ষায়

শ্বাসকষ্টে ও পিত্তবিকারজনিত রোগে এর বীজ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাকিম বৈদ্যগণ বলেন—ইহার বীজ স্নিগ্ধ ও শীতল গুণ সম্পন্ন এবং মৃদু বিরেচক।

পরিচিতি

বর্ষজীবী গুল্ম, ভারতের প্রায় সর্বত্রই চাষ হয়; বর্ষান্তে এটির চাষ ভাল হয়। ৩/৪ মাস পরে এর বীজ পেকে যায়, সাধারণের কাছে এই গাছের বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। এর আদি জন্মস্থান কোথায়—সেটা নিয়ে মতভেদ আছে, তবে অনেকের মতে এটির জন্মস্থান নাকি আফ্রিকা। ঔষধার্থে ও আহার্যে সমগ্র গাছই ব্যবহার হয়। এর পাকা বীজ থেকে চর্বিজাতীয় তেল পাওয়া যায়। এটির বোটানিক্যাল নাম Spinacia oleracea Linn., এর আর একটি প্রজাতি আছে, সেটার নাম Spinacia tetrandra Roxb., ফ্যামিলি Chenopodiaceae.

লোকায়তিক ব্যবহার

প্রথমেই ব'লে রাখি—পালং শাকের ব্যবহারগত ফল আমাশয়ে এবং অন্নমলেই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়।

১। **শ্লেষ্মার ধাতে—** যাঁরা শ্লেষ্ম-প্রধান প্রকৃতির, তাঁদের পক্ষে পালং শাক খুবই উপকারী। যাঁরা বাত-পিত্ত-প্রধান প্রকৃতির (এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে লেখা হয়েছে), তাঁদের যদি আগন্তুক কারণে শরীরে কফের আধিক্য হয় (যেমন—জল ঘাটলে, রোদ লাগালে, পেট গরম হলে বা ঠাণ্ডায় বেড়ানো প্রভৃতির ফলে), তাঁদের কিন্তু দেখা যায়—দাস্ত পরিষ্কার হয় না, এটা প্রকৃতির এমনই স্বভাব। এক্ষেত্রে পালং শাক আন্দাজ ৫০ গ্রাম অল্প একটু সিদ্ধ ক'রে জলটা ফেলে দিয়ে পুনরায় ৩/৪ কাপ জল দিয়ে ভালভাবে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সেই জলটা খেলে পায়খানাটা পরিষ্কার হয়, জমাট কফ আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে।

২। **মাথাঘোরায়—** যেকোন আগন্তুক কারণে মাথাঘোরায়, যেমন—কাঁচা সুপুরী বা সুপুরী গাছের মাথী কিংবা ধুতরোর বীজ অথবা সিদ্ধি, তাড়ি, তামাক, জর্দা প্রভৃতি খাওয়ার পর মাথা ঘুরছে বা বমি হচ্ছে; এক্ষেত্রে পালং শাকের রস ৪/৫ চা-চামচ অল্প গরম ক'রে অথবা আন্দাজ ৫০ গ্রাম পালং শাক অল্প সিদ্ধ করার পর জলটা ফেলে দিয়ে পুনরায় ৩/৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে খাওয়ালে মাথাঘোরা ও মত্ততা দুই-ই কমে যায়।

৩। **হাঁপ ধরায়—** অনেকের অল্প কারণেই হাঁপ ধরে, এটা অনেক কারণে হয়—বুকের দুর্বলতায়, মেদবৃদ্ধিতে, মূত্রকৃচ্ছ্রতায় ও শর্করামেহ প্রভৃতিতে; সেসব ক্ষেত্রের বিশেষ লক্ষণ পায়খানাটা কষে যায়, তাঁরা যদি পালং শাক উপরিউক্ত পদ্ধতিতে সিদ্ধ ক'রে সেই জলে অল্প মরিচচূর্ণ ও লবণ দিয়ে খান, তাহ'লে হাঁপটা আর ধরে না।

৪। **রক্তপিত্তে—** এ রোগটি সম্পর্কে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে। তবুও একটু বলি—সাধারণতঃ খাদ্য দ্রব্য হজম হতে না হতে পুনরায় খাওয়া,

ভোজনের ঠিক পরেই বেড়ানো, দৌড়ানো বা যানবাহনে যাতায়াত করা, বেশী লবণ খাওয়া প্রভৃতি কারণে এটির সৃষ্টি হয়। এর বিশিষ্ট লক্ষণ—লোহা-কাটা গন্ধে যাঁদের গা-বমি-বমি করে, তাঁরা রক্তপিত্তের রোগী; একটু বেশী দিনের হলে রক্তবমিও হতে থাকে; এ অবস্থায় প্রত্যহ পালং শাক সিদ্ধ জল (পূর্ব নিয়মানুসারে) আধ কাপ মাত্রায় দু'বেলা খেলে বমিটা ও রক্তস্রুতিটাও কমবে।

বাহ্য-প্রয়োগ

৫। **বিষাক্ত পোকার দংশনে—** বিষাক্ত পোকা কামড়ালে বা কাঁকড়াবিছে, বোলতা, মৌমাছি, ভ্রমরা প্রভৃতি হুল ফোটালে পালং শাকের শেকড় বেটে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা ও ফোলা দুই-ই কমে যায়।

এই নিবন্ধের শেষে আমার মনে প'ড়ে গেল সেই সরলা নাটকের গদাধরচন্দ্রের কথা—"আমি ডুডুও (দুধ) খাবো টামাকও (তামাক) খাবো"।

আমাদের ভেষজের মধ্যে এই রকম কয়েকটি ভেষজ আছে ঐ দুধ আর তামাকের মত অর্থাৎ একাধারে আহার্যও যেমন ঔষধও তেমনি; এই পালং শাকটি আহার্যের সময় রসপ্রাধান্যে কাজ করে, অন্যদিকে বীর্যপ্রাধান্যে ঔষধেরও কাজ করে। অবশ্য এ ধরনের দ্রব্য খুব কমই আছে, তাই একে হেলায়-ফেলায় ব্যবহার ক'রে যাই।

আমরা আজীবন মুষ্টিটাই দেখে গেলাম, তার সঙ্গে যোগটা আর ক'রলাম না, তাই এখন ভিটামিনের খোঁজ করি।

CHEMICAL COMPOSITION

SPINACIA OLERACEA

1. Spinach contains:— Water 88.47%; (b) Nitrogenous matter 3.49%; (c) Fat 0.58%; (d) Sugar 0.10%; (e) Nitrogen free extractive 4.34%; (f) Ash 2.09%; (g) Fibre 0.93%. 2. Anhydrous spinach contains:— (a) Nitrogen 4.94%; (b) Carbohydrates 37.93%.

হিংস্রা [কাকাদনী]

কোন কোন ক্ষেত্রে উপমাটাই আলংকারিক রূপ গ্রহণ করে, এই নামটিও সেই ধরনের।
ষোড়শ শতকের পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ উত্তপ্ত আবেগে ব'লেছিলেন—

মদ্‌গ্রন্থ! মা কুরু বিষাদ মনাদরেণ
হিংস্রালতাঙ্গ সহসা মনসা খলালাম্।
কাব্যারবিন্দ মকরন্দ মধু ব্রতানাং
আস্যেষু ধাস্যতিতমাং কতি নো বিলাসান্।

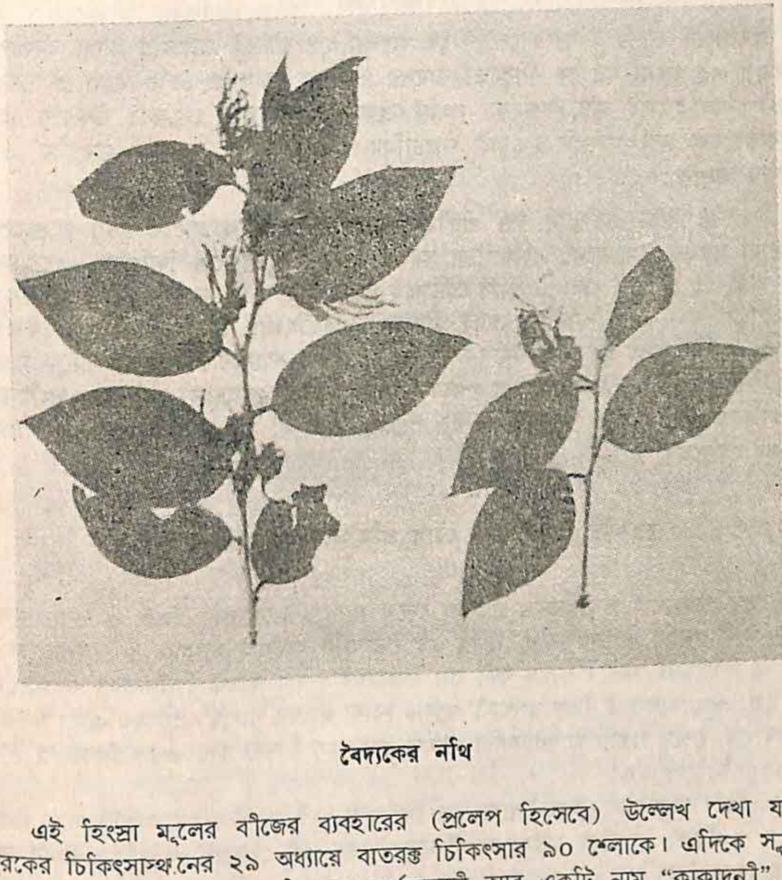
অর্থাৎ হে আমার কাব্যগ্রন্থ! হিংস্রালতার শক্তিশালী কাঁটায় বেঁধা খলের মনে তোমার আদর হবে না, হচ্ছেও না, তাই বলে দুঃখ কোরো না, তোমার মধ্যে যে কাব্যকমলের সৌগন্ধ আর সুমিষ্ট স্বাদ আছে, সে স্বাদে অবশ্যই তৃপ্ত হবেন সেইসব কাব্যকুসুমের মধুপতুল্য সাহিত্যমোদীরা। তাঁদের মুখেই তোমার সমাদর হবে।

শ্লোকটির পূর্বার্ধে আছে অবজ্ঞার বেদনা, আর উত্তরার্ধে আছে উল্লাস। আলংকারিকরা বলেন—

একস্য গুণদোষাভ্যাং উল্লাসোঽন্যস্য তৌ যদি।

অর্থাৎ একটি বক্তব্যেই যদি একের দোষ, অপরের গুণের কথা বলা হয় তবে সেটির নামই উল্লাসঅলংকার। মহাকবি জগন্নাথ শ্লোকটিতে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেটি আয়ুর্বেদসেবীরাও তাঁদের প্রখ্যাত এক আরণ্য ভেষজের নামের উল্লেখ করেছেন।

এখানকার বক্তব্যের তাৎপর্য হ'লো—পরের দোষ উদ্ঘাটন ক'রতে নিজের হৃদয়ে যদি হিংস্রা বা ঈর্ষার সঞ্চার না হয়, তবে পরের চরিত্রের দোষের উল্লেখই করা যায় না। এখানে দ্ব্যর্থ কল্পনা—(১) পূর্বার্ধে অবজ্ঞায় হিংস্রার স্বভাবধর্মিতার রূপায়ণ, দ্বিতীয়ার্ধের অভিব্যক্তি উল্লাস।



বৈদ্যকের নথি

এই হিংস্রা মূলের বীজের ব্যবহারের (প্রলেপ হিসেবে) উল্লেখ দেখা যায়—চরকের চিকিৎসাস্থানের ২৯ অধ্যায়ে বাতরক্ত চিকিৎসার ৯০ শ্লোকে। এদিকে সুশ্রুত সংহিতার বক্তব্যে দেখা যায়—হিংস্রার পর্যায়বাচী আর একটি নাম "কাকাদনী", এটা আছে সূত্রস্থানের ৩৯ অধ্যায়ের অষ্টম গুচ্ছে। ওখানে বলা হ'য়েছে, কাকাদনীর ভৈষজ্য-শক্তিটি শ্লেষ্মাবিকারের প্রশমনে বিশেষভাবেই ব্যবহার্য। এটার আর একবার উল্লেখ দেখা যায় সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানের ৫১ অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকে। চক্রদত্ত নামক গ্রন্থ-প্রণেতা চক্রপাণির বক্তব্যে এটির প্রাচীন নাম হিংস্রা, আর একটি নাম "কাকাদনী"—কাকৈ রদ্যতে অর্থাৎ ভক্ষ্যতে; যেহেতু এর ফলগুলি কাকে খায়, তাই এর নাম "কাকাদনী"। বাংলায় এর নাম কেলেওক্ড়া/কেলেকড়া/কালাওকড়া—এ নামটিও খুব নবীন নয়। চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস সেনের বক্তব্যে এটি জানা যায়। এটি আছে চক্রদত্তের হিক্কা-শ্বাস রোগের চিকিৎসার ২০ শ্লোকে; কারণ ইনি সুশ্রুত সংহিতার অনুসরণ ক'রে হিক্কাশ্বাস রোগে প্রয়োগ ক'রেছেন। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, এই ভেষজটি নিঃসন্দেহে বাতশ্লেষ্মাবিকারের প্রশমনে নির্বাচিত ভেষজ, সেই হেতু এটি শ্বাস, কাস, হিক্কা রোগে

এবং বিশেষ করে কণ্ঠের রোগেই বেশী ফলপ্রদ। অর্থাৎ কফপ্রধান বায়ুর বিকারে দেহের যে অবস্থা হয় তাতেই সুপ্রযুক্ত হ'লে কাকাদনী খুবই কার্যকর।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানীর সমীক্ষায়—

কফপ্রধান বায়ুর বিকারে দেহের যে অবস্থা হয় তাতেই সুপ্রযুক্ত হ'লে কাকাদনী কার্যকর এই জন্যে হয় যে, বিকৃতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শ্বাস প্রণালীর মধ্যে শ্লেষ্মাধরা কলায় শোথ হ'লেই বায়ু সঞ্চারের পথটি সংকীর্ণ হ'য়ে যায়, সেক্ষেত্রে উষ্ণবীর্য এবং কফবাতহারক দ্রব্য ফলপ্রদ হওয়াই স্বাভাবিক। এই হিংস্রা ভেষজটি উষ্ণবীর্য এবং কফবাত নাশক।

দ্বিতীয় কথা—চক্রপাণি দত্ত প্রণীত চক্রদত্ত গ্রন্থে হিক্কারোগের জন্য সুশ্রুতোক্ত হিংস্রাদ্য ঘৃতের উপাদানের যোগগুলি আহরণ ক'রে তাঁর গ্রন্থে লিপিবন্ধ ক'রেছেন। তরা অর্থ এই যে, এই রোগটি শ্বাস রোগেরই তুল্য এবং কফপ্রাধান্যেই জন্ম নেয়। কিন্তু শ্বাসরোগে কফ এবং বায়ুবিকারেরই প্রাধান্য আর হিক্কার ক্ষেত্রেও, যেহেতু উষ্ণবীর্য দ্রব্যেরই প্রয়োগ সেই হেতু স্পষ্টই বোঝা যায় হিক্কা ও শ্বাসরোগের মতই বায়ুর সঞ্চার পথটি সঙ্কুচিত হওয়ার জন্যই তার পথকে প্রসারিত করার প্রয়োজন; তাই চরক সংহিতার চিকিৎসাস্থানের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৭৬ গুচ্ছে উষ্ণবীর্য দ্রব্যের মধ্যে হিংস্রাকে স্থান দেওয়া হ'য়েছে।

চরকীয় চিন্তাধারায় রোগ প্রতিকারে ভেষজ নির্বাচন

কোন ভেষজকে কফবিকারে প্রয়োগ দেখে বুঝতে হবে কটু, তিক্ত ও কষায় রসই যখন কফবিকারের উপশম করে, তখন এই ভেষজটি অবশ্যই মুখ্যতঃ ও গৌণতঃ কটু, তিক্ত ও কষায়েরই মধ্যে। কারণ কটু রস প্রয়োগের দ্বারা কফের পিচ্ছিলতা ও গুরুতা দূর হয়, এবং তারপরই তিক্ত রসধর্মী দ্রব্যের দ্বারা মুখের মাধুর্য দূর হয় এবং কফেরও শোষণ হয়, শেষে কষায় রসের দ্বারা কফের স্নেহাংশ বিনষ্ট হয়, একক বিকারের নিঃসরণটাও নিরুদ্ধ হয়।

অতএব অনায়াসে ব'লতে পারা যায় যে, কাকাদনী বা হিংস্রা ভেষজটি যখন কফ-প্রশমন ও হিক্কা নিগ্রহণে ব্যবহারের উপদেশ তখন এই ভেষজটি কটু-তিক্ত-কষায় রস সম্পন্ন এবং উষ্ণবীর্য।

রাজনিঘণ্টুর সমীক্ষায়—

> হিংস্রা কাকদনী চৈব কফরোগ বিনাশকৃৎ।
> বাতদোষ হরা হোযা উষ্ণা হিক্কা বিনাশনী।
> রসায়নী তথা তিক্তা কটূষ্ণা বাতরক্ত হৃৎ।
> রুচ্যা পালিত রোগাণাং শোথঘ্নী বিষহা মতা॥

এই শ্লোকটির অর্থ হ'লো—হিংস্রা ও কাকাদনী এই দুটি নামের ভেষজটি কফরোগ দূর করে, বায়ুবিকার হরণ করে, উষ্ণবীর্য, তিক্ত, কটুরস রুচিকর, শোথ ও বাতরক্ত দূর করে।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণ—ফল রসে স্বাদু, 'কফ-বাত' প্রশমক, পিত্তনিঃসারক ও ক্ষুধাবর্ধক।

ঔষধার্থ প্রয়োগ— পাতার ক্বাথ প্রদাহ প্রশমক ও উপদংশ রোগে ব্যবহৃত হয়। এভিন্ন এটি ব্রণে, শোথে (ফোলায়) ও অর্শে হিতকর।

মূলের ছাল অবসাদক। এটি জ্বরনাশক ও কলেরা রোগে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

পরিচিতি

বহু শাখাপ্রশাখাযুক্ত ঝোপ-ঝাড় শক্ত লতা। এর গায়ে শক্ত এবং বাঁকা কাঁটা আছে, তাই এর পর্যায় নাম গৃধ্রনখী। পাতা ১½—৩ ইঞ্চি লম্বা ও ১—১½ ইঞ্চি চওড়া। এর গঠন ও আকার অনেকটা লেবু পাতার (citrus medica) মত। বর্ণ গাঢ় সবুজ। কান্ড এবং পাতার সংযোগস্থল থেকেই ফুল বের হয়, অবশ্য লতার আগার দিকটায়ই যে ফুল হয় তা নয়। ফুল বেগুণী রঙের, কেশরগুলি লম্বা এবং গুচ্ছবন্ধ, দেখতে অনেকটা বিড়ালের গোঁফের মত। ফল ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ও মসৃণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষায় ফল হয়।

ভারত এবং তৎসন্নিহিত উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে এটি সাধারণতঃ জন্মে। এর সংস্কৃত নাম কাকাদনী, বাংলায় প্রচলিত নাম কালওক্ড়া; সেইটারই অপভ্রংশ নামশব্দ কেলেকড়া ও হিন্দীতে অর্ধান্দা নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Capparis jeylanica Linn., ও ফ্যামিলি Capparidaceae.

ব্যবহার্য অংশ— সমগ্র গাছ।

লোকায়তিক যোগ

এটি প্রধানভাবে কাজ করে রক্তবহ স্রোতে।

১। **শ্লেষ্মণ ধাতুর বিকারে—** সর্বদাই মনে হবে তৃপ্ত আছি, কিন্তু ক্রমে দুর্বলতা আসে। সেটা সুরু হ'লেই কেলেওক্ড়ার মূল চূর্ণ ৫০০ মিলিগ্রাম অথবা মূলের ছাল চূর্ণ হ'লে ২৫০ মিলিগ্রাম প্রত্যহ একবার ক'রে জলসহ খেলে ওই শ্লেষ্মাবিকারটা ক'মে যাবে, এবং পরিপাক শক্তিরও বৃদ্ধি হবে।

২। **ঢুলুনি রোগে—** একটু চুপ ক'রে ব'সে থাকলে অথবা কোন কিছু প'ড়তে গেলেই তন্দ্রা; আবার সেটাতে ব্যাঘাত না হ'লে ঘুম, কিন্তু পাতলা ঘুম। এটা ভাল নয়, এটাতে দেহের বল ক'মে যেতে থাকে, আবার গলার স্বরটাও একটু চেপে যেতে থাকে; এক্ষেত্রে কেলেওকড়ার মূল চূর্ণ ৫০০ মিলিগ্রাম প্রত্যহ একবার ক'রে কয়েকদিন খেলে ওটা ক'মে যাবে, এটার উপশম হ'লে আরও কিছুদিন ব্যবহারে নিরাময় হবে।

৩। **সাদা পায়খানা—** মলের রং সাদা অথচ অম্বলের দোষ নেই, পেটেরও দোষ নেই, পরিমাণে অনেকটা হয়। এই ক্ষেত্রে কেলেওক্ড়ার মূল চূর্ণ ২৫০ মিলিগ্রাম ক'রে জলসহ প্রত্যহ একবার খেতে হয়। এটা ৩/৪ দিন খাওয়ার পর যদি দেখা যায় যে, ওইসব অসুবিধে যাচ্ছে না, তখন সকালে ও বৈকালে দু'বার খেতে হয়।

৪। **ফুলতে থাকলে—** সামান্য সময় ঘুমুলেই মুখ হাত ফুলো ফুলো হয়— এই অসুবিধে হ'তে থাকলে বুঝতে হবে, ভিতরের অন্ত্রে (শ্লেষ্মাধরা কলায়) শ্লেষ্মা

জ'মছে, নির্গত হ'চ্ছে না। তখন এই কেলেওক্ড়ার মূলচূর্ণ ২৫০ মিলিগ্রাম জলসহ একবার ক'রে খেতে হবে। প্রয়োজনবোধে দু'বারও খাওয়া যায়।

৫। **শ্বাস কষ্টে—** এই রোগটির সুবিস্তৃত বর্ণনা এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ডেই দেওয়া হ'য়েছে। এ রোগে যারা গ্রস্ত, তাঁদের কেলেওক্ড়ার মূলচূর্ণ ৫০০ মিলিগ্রাম এককাপ গরম জলে রাত্রে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে ছেঁকে ওই জলটা খেতে হবে, তবে এই চূর্ণটা একটু মোটা হওয়াই ভাল। একবার খাওয়াতে তেমন উপশম না হ'লে সকালে ও বৈকালে ২ বার খাওয়া যেতে পারে।

৬। **হিক্কায়** (হেঁচ্কী নয়)— এই রোগটি সম্পর্কে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৯০ ও ২৫৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বলা হ'য়েছে। ওই অবস্থা হ'লে এই কেলেওক্ড়া বীজ-চূর্ণ ১০০ মিলিগ্রাম (১ টিপ নস্যির মত) ২/৫ ফোঁটা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে একটু একটু চেটে খেতে হয়—এর দ্বারা ওটা ক'মে যাবে।

৭। **মলের আধিক্য—** যতটা পরিমাণ খাওয়া হ'য়েছে তার থেকে তার মলের পরিমাণ বেশী বেরোয়। যা খাওয়া হয় তাতে যে অম্বল হয় তাও নয়, মলটা শুক্নোও (শুষ্ক) হয় না—যাকে দেশগাঁয়ে বলে "ভস্কা"। এটাতে দেহের বল ক'মে যেতে থাকে, জিভে কেমন চট্চটে আঠা হয়। সেই ক্ষেত্রে কেলেওক্ড়ার বীজ ১ গ্রাম এককাপ গরম জলে ভিজিয়ে রেখে সেটা ছেঁকে ওই জলটা খেতে হয়। কয়েকদিন খেলে ওই মলের পরিমাণটা ক'মে যায়।

লোকব্যবহারিক যোগগুলি লেখা শেষ ক'রে ভাবছি যে, আজ যেকোন ব্যক্তি বলে থাকেন—আয়ুর্বেদের জড়িবুটিই তো আদি মশাই, তবে সে এখন অরণ্যই হ'য়ে আছে. যদিও আয়ুর্বেদের ভেষজগুলি আরণ্যক বটে। এদিকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা হ'লো বাঘের মত। তবে হ্যাঁ, এ কথাটা আর একবারও হয়েছিলো একাদশ/দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন তান্ত্রিকরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভেল্কি দেখিয়েছিলো পারদ, গন্ধক, হরিতাল বিষ উপবিষ দিয়ে, আর এখনও এসব যে নেই তাও তো নয়; কিন্তু বৈদ্যকসমাজ আজ নৈরাশ্যে ভুগছেন, কারণ সে ভেল্কি দেখাতে শেখেন নি, তাই তাঁরা রাহুর দশায় প'ড়েছেন বলা যায়। এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে গিয়েই তাঁদের বিড়ম্বনা। এ থেকে বাঁচতে গেলে আজ চাই টিম্ ওয়ার্ক (Team work)। আমাদের মনে পড়ে মহাভারতের সেই প্রখ্যাত নীতিসূক্তিটি, যেটি উদ্যোগ পর্বের ২৯ অধ্যায়ে বলা আছে। সেই উক্তিটি শ্রীকৃষ্ণের—সেখানে তিনি বলছেন সঞ্জয়কে—দেখ সঞ্জয়! কৌরবরা অরণ্যের মত, আর পাণ্ডবরা বাঘের মত। যেমন বাঘের আশ্রয় বন। এটা গেলে যেমন বাঘ সহজেই নিহত হবে. তেমনি বাঘের ভয় না থাকলে বনও তো নষ্ট করে ফেলবে। অতএব কেউ কারো উচ্ছেদ বাসনা ক'রো না। সেই রকম আয়ুর্বেদবিজ্ঞানটি আজ হাজার বৎসরের ওপর স্থবির হয়ে বসে আছে। একে পুনর্জীবিত ক'রতে গেলে অন্য বিজ্ঞানকে বর্জন করে নয়, বরং সহযোগী করাই সমীচীন।

CHEMICAL COMPOSITION

Capparis zelanica Linn.

An alkaloid; a phytosterol; a mucilaginous substance and water soluble acid.

ব্রহ্মযষ্টি [বামুনহাটি]

লিখতে বসেছি বামুনহাটি, তাই সেই বামুনের কথাটাই মনে পড়ে গেল।

গাঁয়ে কবি গান হচ্ছিলো, শুনতে গিয়েছেন অনেকেই—বিষয়টি "রাধাকৃষ্ণের লীলা", বেশ ফেনিয়ে ফেনিয়ে গায়ক গাইতে গাইতে যখন আঁখর দিলেন "তোমার কুলের কথা ব'লবো নাকি?" বামুন তখন ভাবছে, এইরে, সর্বনাশ, আমি যে "বড় বাইরে" ক'রতে ব'সে কুল খেয়েছিলাম ওরা সেটা দেখেছে নাকি?

আমার অবস্থাটাও তাই। বামুনদের কীর্তিকলাপ বেদ, পুরাণে যা আছে, সেসব তথ্য ফাঁস ক'রলে আর কি কেউ পেন্নাম (প্রণাম) ক'রবে? তবুও একবার ইচ্ছে হ'চ্ছে প্রাচীন ভারতের বিশেষ ক'রে মনুসংহিতা রচনার আমলে হিন্দু ভারতে সমাজচিন্তা (বিশেষ ক'রে নারীকে নিয়ে) কোন্ স্তরে চলাফেরা ক'রছিলো, সেইটাই একবার নাড়া-চাড়া করা যাক।

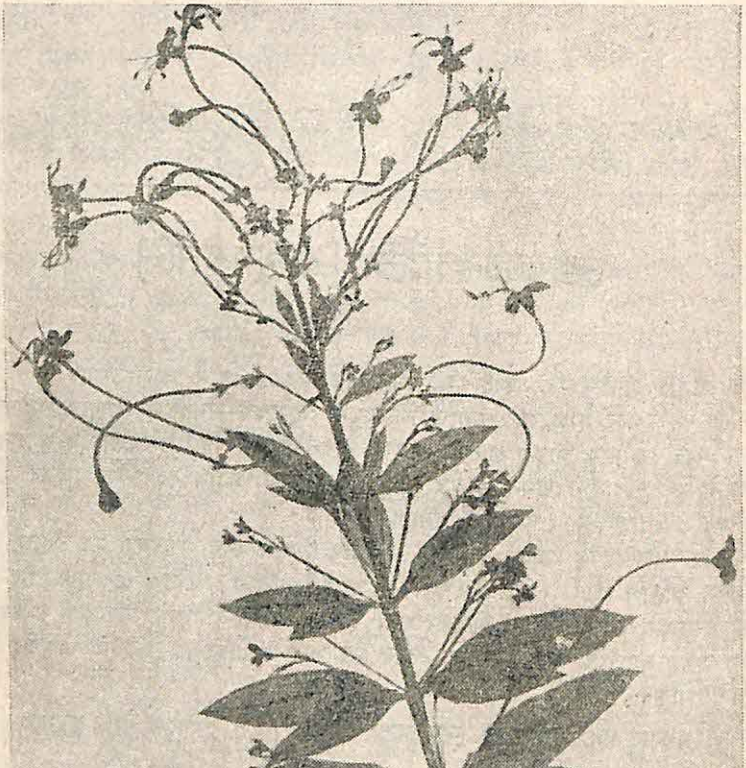
দেখা যাচ্ছে—মনু সংহিতার নবম অধ্যায়ের ২২/২৩ শ্লোকে বলা হ'য়েছে—

তাদৃক্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃক্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥
অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধম যোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হনীয়তাম্॥

অর্থাৎ সমুদ্রের জলে মিশে গিয়ে যেমন নদীগুলোর জলের স্বাতন্ত্র্য থাকে না, সব নদীর জল লোনা হ'য়ে যায়, তেমনি এই নারীশ্রেণী, স্বামী সৎ বা অসৎ যেমনই হবে স্ত্রীও তার সঙ্গে একই স্বভাব, একই গুণে মিলে যাবে, তার আর স্বতন্ত্র জাতি শ্রেণী

থাকে না। ওই যে বশিষ্ঠ, ওঁর সঙ্গে তো বিবাহ হ'য়েছিলো নমঃশূদ্রের মেয়ে "অক্ষমালার"; তিনি তো পরে পূজনীয়া মহিলাই হ'য়ে গেলেন, তারপর ঋষি মন্দপালের সঙ্গে নিম্ন-শ্রেণীর মেয়ে শারঙ্গীর বিবাহ, তাঁরও তো পূজ্যত্ব ঘটেছিলো। প্রসঙ্গটায় চমক লাগলেও পুরাণের কথাকাহিনী পড়তে গিয়ে দেখতে পেলাম। আপনার বিশ্বাস না হয় স্কন্দ-পুরাণের প্রভাসখন্ডের ১২৯ অধ্যায়ে অক্ষমালেশ্বর শিবের উপাখ্যানটা পড়ে দেখুন। সেখানেই বলা হ'য়েছে—

> কদাচিৎ সমনু প্রাপ্তে দুর্ভিক্ষে কাল পর্য্যায়াৎ।
> ঋষয়শ্চ মহাদেবি! ক্ষুধাক্রান্তা বিচেতসঃ।
> সর্বেচান্নং পরীপ্সন্তো গতাশ্চাণ্ডাল বেশ্মনি॥



অর্থাৎ কোন এক সময় ঘ'টেছিলো প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ। ঋষিরা ক্ষুধায় জর্জরিত হ'য়ে শেষে এক নমঃশূদ্রের (চণ্ডালের) বাড়িতে উপস্থিত হ'লেন। তাঁরা সেই নমঃশূদ্রকে ব'ললেন, ওহে মহাবুদ্ধি পুরুষ! আমাদিকে এক্ষুনি কিছু খেতে দাও, আমরা ক্ষুধায় প্রাণশূন্য হ'য়ে প'ড়ছি, রক্ষা কর আমাদের প্রাণ। তুমি নমঃশূদ্র নও (সেকালে নমঃশূদ্রকে

চণ্ডাল বলা হ'তো), অন্নদাতা মহাপ্রাণ পুরুষ। তাঁদের কাতর প্রার্থনা শুনে নমঃশূদ্র ব'ললেন—আমি কি ক'রে দিই! এ্যাকে তো আপনারা ব্রাহ্মণ, আর আমি তো শূদ্রও নই, এ্যাকেবারে অন্ত্যজ চণ্ডাল, আমার অন্ন খাবেন কি ক'রে? আপনাদের সব পবিত্রতাই বিনষ্ট হ'য়ে যাবে যে! আপনাদের শাস্ত্রে আছে "শূদ্রের অন্নগ্রহণ ক'রে ব্রাহ্মণ যদি মৃত্যুলাভ করে, তাকে গ্রাম্য শূকর হ'য়ে জন্ম নিতে হয়, আর ছয় মাসের মধ্যেই ব্রাহ্মণ পিশাচ হ'য়ে যায়।" এই কথাগুলিকে শ্লোকাকারে বলা হ'য়েছে—

অন্ত্যজান্নোদরস্থেন ব্রাহ্মণো ম্রিয়তে যদি।
সভবেৎ শূকরো গ্রাম্য স্তস্য বা জায়তে কুলে॥
যন্মাষাভ্যন্তরে বিপ্রঃ পিশাচঃ সোঽভিজায়তে॥

অন্ত্যজের ওইসব কথা শুনে ঋষিদের ধৈর্য প্রায় বিলুপ্ত হ'য়ে যায় যায়, তবুও তাঁরা একটু ধৈর্যের সঙ্গে বললেন, মহাশয়! এখন আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন, এমন বিপদে ওসব বিধির কোন মূল্য নেই, প্রাণ রক্ষা পেলে সব রক্ষা পাবে। আপনি শুনুন—

জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমাদ্রিয়তে ততঃ।
আকাশইব পঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে॥

অর্থাৎ জীবনের শেষ সীমান্তে এসে যে কোন অন্ন গ্রহণ ক'রলে কোন দোষ হয় না, আকাশ কখনও পঙ্কলিপ্ত হয় না। তাঁরা আরও বললেন, "ঋষি অজীগর্ত ক্ষুধার্ত হ'য়ে পুত্রবিক্রয় ক'রেছিলেন। ভরদ্বাজ ক্ষুধার্ত হ'য়ে নির্জন বনে গিয়ে গোমাংস ভক্ষণ ক'রেছিলেন, বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত হ'য়ে অন্ত্যজের বাড়িতে কুকুরের মাংস আহার ক'রেছিলেন, ঋষি বামদেবও তাই ক'রেছিলেন।" আপনি এখন আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন। অন্ত্যজ দেখলেন, আর তো কিছু বলার নেই, এই অবসরে ব'ললেন, আপনারা যদি আমার অন্ন গ্রহণ ক'রেও পাপলিপ্ত না হন, তবে আমার এই পবিত্র চরিত্রের একটি মাত্র কন্যা আছে, এর নাম অক্ষমালা, একেও গ্রহণ করুন। (তাই এইটাই শ্লোকে বলা হ'য়েছে)—

যদ্যেবং ভবতাং কার্য্যং ইদমঙ্গীকৃতং ধ্রুবম্।
তদীয়ং মৎসুতা হ্যেষা ভবদ্ভিঃ পরিগৃহ্যতাম্॥
ভবতাং যোঽগ্রণীর্জ্যেষ্ঠঃ সচেদুদ্‌বহেদ ধ্রুবম্।
অক্ষমালা মিমাং কন্যাং পশ্চাদ্ দাস্যে যথোচিতম্॥

ঋষিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মাননীয় বশিষ্ঠই অগ্রসর হ'য়ে কন্যাকে গ্রহণ ক'রলেন, আনন্দে তাঁর মুখ তখন প্রসন্ন ছিল, হাতে ছিল ব্রহ্মযষ্টি, আপৎকালে অধর্ম ব'লে কিছুই নেই, ঋষিরাও তাঁর কার্যকে সর্বতোভাবে সমর্থন ক'রলেন তৃপ্তির সঙ্গে।

বশিষ্ঠোহি সমাখ্যায় চালম্ব্য ব্রহ্মযষ্টিকাম্।
কালস্যানন্তর প্রেক্ষী প্রোদ্ববাহান্ত্যজাঙ্গনাম্॥

ঋষিরা সমস্বরে আনন্দ প্রকাশ ক'রলেন, হাতের ব্রহ্মযষ্টিটি তখনও বশিষ্ঠের হাতে,

তিনিও তাঁদের পরমপ্রীতির সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে নিয়ে অন্ত্যজ কন্যা অক্ষমালাকে বিবাহের সূত্রে অঙ্গীকার ক'রলেন।

যাক্, উপাখ্যানও শেষ হ'লো আর আমার ব্রহ্মযষ্টিটাও খুঁজে পেলাম। আবার কেন মনে প্রশ্ন আসছে, এই ব্রহ্মযষ্টি ঋষিদের অবলম্বনীয় ব্রহ্মজ্ঞানই নয় তো? এখন গোলাবাদ্যির হাতে প'ড়ে কোথায় গিয়ে এর মীমাংসা হয় দেখা যাক্।

আরও একটা কথা—এটির আরও একটি বিশিষ্ট নাম হ'লো ভার্গী, সেও তো প্রখ্যাত ঋষি ভৃগুনামের স্মৃতিবিজড়িত। এটাও তো হ'তে পারে পর্বতের তলদেশকেও তো ভৃগু বলা হয়। ওখানেই এটি বেশী জন্মে, তাই যদি বলি যে ভৃগুভবা বলেও এর নাম ভার্গী। অবশ্য এ মতবাদও প্রচলিত।

বৈদ্যকের নথি

চরক সংহিতায় দেখা যায়, এর নাম ভার্গী ও পদ্মা। এই পদ্মা নাম পাওয়া যায় চরকের বিমানস্থানের অষ্টম অধ্যায়ে ১৬৫ গুচ্ছের কষায় স্কন্ধে। আবার ওই স্থানেরই ১৭৩ গুচ্ছে শিরোবিরেচনে ভার্গীর প্রয়োগ। এমনিভাবে চরকের চিকিৎসাস্থানে অন্ততঃ ৮ বার এবং কল্প ও সিদ্ধিস্থানেও দু'বার। তারপর সুশ্রুতেও ১০/১২টি স্থানে, এবং বাগ্‌ভট ও চক্রদত্তের বহুস্থানে ভার্গী এবং ব্রহ্মযষ্টিকার নামের উল্লেখের সঙ্গে ব্যবহারগত ভৈষজ্য শক্তিরও নির্দেশ। এইজন্যই রাজনিঘণ্টু ও ভাবপ্রকাশে ব্রহ্মযষ্টি নাম পর্যায়ের সঙ্গে দ্রব্যগত শক্তির বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে। উভয়ের বৈশিষ্ট্য হ'লো রাজ-নিঘণ্টুকার এই ভেষজটিকে পিপ্পল্যাদি বর্গে এবং ভাবপ্রকাশকার হরীতক্যাদি বর্গেই একে লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। রাজনিঘণ্টু গ্রন্থে এই ভেষজটির পর্যায় নাম ১৬টি আর ভাবপ্রকাশে ৯টি নাম। এর পর্যায়গত বৈশিষ্ট্যটি যেমন লক্ষণীয় তেমনি গুণগত ক্ষেত্রেও দেখা যায়—ভাবপ্রকাশকার ব'লেছেন এটি দীপনীয় অর্থাৎ সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪১ অধ্যায়ে যে বলা হ'য়েছে—

"দীপনীয়ং তদেব স্যাৎ যদগ্নিভূয়িষ্ঠং তৎ সমানত্বাৎ"

অর্থাৎ যাতে অগ্নিগুণ ও বায়ুগুণের আধিক্য থাকে তাতেই থাকে আগ্নেয়ত্ব—এককথায় বলা যায় সমানবায়ুর যে কাজটি অগ্নিসন্ধুক্ষণের দ্বারা হয়। প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় এই ভার্গী সেই কাজটি করে, সেইজন্য এই ভেষজটি কাসে, শ্বাসে, অত্যন্ত উপযোগী। কারণ ওই সময় অগ্নিমান্দ্য থাকেই থাকে। এবং সেই অগ্নিমান্দ্য শ্লেষ্মাপ্রাধান্যের জন্য; যেহেতু কাস এবং শ্বাসরোগের উৎপত্তিই হয় আমাশয় সম্পর্ক ধ'রে। তবে এখানে আমাশয় মানে গ্রহণী রোগ নয়, দেহের আশয়গুলির অন্যতম স্থান আমাশয়। এক কথায় বলা যায়—নাভি ও স্তনের মধ্যবর্তীস্থানে যে সব ব্যাধির উৎপত্তি হয়, এই ব্রহ্মযষ্টি বা ভার্গী সেইসব রোগে ব্যবহার ক'রলে ভাল ফলই পাওয়া যায়। সেইজন্য ওই আমাশয়দুষ্ট জ্বরেও ভার্গীর ব্যবহারের নির্দেশ, তাছাড়া ভার্গীর বাহ্য ব্যবহারগতও যে সব ফল দেখা যায় সেগুলিও এতে লিপিবদ্ধ করা হবে।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণ— ইহা ঈষৎ তিক্তরসান্বিত, সর্দি ও কাসিতে হিতকর।

ঔষধার্থে প্রয়োগ— পাতা ক্রিমির উপদ্রব নিবারক। পাতা ও কচি কাণ্ডের রস

ঘি সহযোগে বাহ্য প্রয়োগে চর্মগত রোগের উপশম হয়।

মূলের ছালের ক্বাথ হাঁপানি, কাস ও ফুসফুসের পীড়ায় খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।

পরিচিতি

বৃহৎ আকারের গুল্ম হ'লেও আয়ুর্বেদীয় পরিভাষা অনুযায়ী এটি বৃক্ষের পর্যায়ে পড়ে, যেহেতু এটির ডাল (শাখা) কেটে দেওয়ার পর তার পাশ থেকে পুনরায় নূতন গাছ বের হয়। সাধারণতঃ ৪ থেকে ৮ ফুট পর্যন্ত লম্বা হ'তে দেখা যায়, কাণ্ড সরল, শাখাহীন ও অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা। গোড়ার দিককার পাতাগুলি পেকে ঝ'রে গিয়ে কাণ্ডের অগ্রভাগের পাতা থাকে। পাতা ৬ থেকে ৯ ইঞ্চি লম্বা, ১ থেকে দেড় ইঞ্চি চওড়া ও বোঁটা সিকি ইঞ্চির মত লম্বা হয়। ফুল সাদা কিন্তু বহিরাবরণটা সবুজ অথবা লাল আভাযুক্ত, ফুলটি বেশ কিছুদিন থাকে। পুষ্পদণ্ড ১০ থেকে ১৮ ইঞ্চি লম্বা, গাঢ় সবুজ অথবা ঈষৎ লাল্‌চে রঙের। ফল গোলাকার কিন্তু ৪ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেকটি ভাগে মটরের ন্যায় বীজ থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে ফুল ও পরে ফল হয়। এটি ৬০০০ ফুট উঁচুতেও জন্মে। বিশেষ করে ভারতের দক্ষিণাংশে, কুমায়ুন অঞ্চলে ও বঙ্গদেশে জন্মাতে দেখা যায়। এর সংস্কৃত নাম ভার্গী, বাংলায় প্রচলিত নাম বামুনহাটী বা ব্রহ্মযষ্টি ও হিন্দী নাম বামনহাটী। বোটানিক্যাল নাম Clerodendrum indicum (Linn.) ও ফ্যামিলি Verbenaceae.

ব্যবহার্য অংশ—পাতা ও মূলের ছাল।

এই সম্পর্কে একটি বক্তব্য আছে—কোন কোন প্রদেশের বৈদ্যকসম্প্রদায় এটিকে ভার্গী বলে স্বীকার করেন না। এর আর একটি পর্যায় নাম "ভৃগুভবা"; তাঁদের মতে এটি একটি পাহাড়ী অঞ্চলের গাছ। পাহাড়ের যে দিকটা অপেক্ষাকৃত কম ঢালু সেই দিকটার নামই "ভৃগু"। এই অংশেই এটি বেশী জন্মে। তাই মনে হয় এর নাম "ভৃগুভবা"। অন্য প্রদেশের বৈদিক সম্প্রদায়ের মতে এটির বোটানিক্যাল নাম Clerodendrum serratum. ফ্যামিলি ঐ একই।

লোকায়তিক যোগ

প্রথমেই ব'লে রাখি—এই লোকায়তিক যোগগুলি বাংলায় পরিচিত যে "বামুনহাটি" সেইটাকে কেন্দ্র ক'রে। এটি রসবহ স্রোতেই কাজ করে।

১। **হাঁপানিতে—** এই রোগটির বর্ণনা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩৫৯/৩৬০ পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে। ওই সময় বামুনহাটির মূলের ছাল এক বা দেড় গ্রাম ছোট একটা টুকরো আদা (১/১½ গ্রামের মত) একসঙ্গে বেটে গরম জলসহ খেলে ২/৫ মিনিটের মধ্যে হাঁপের টান ক'মে যাবে; এইরকম সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে হবে। অবশ্য এই রোগ কখনও নির্মূল হ'য়ে সারে না।

২। **বুকের ব্যথায়—** যে শ্লেষ্মা বুকে ব'সে বুকের স্পন্দন স্তব্ধ করে দেবার অবস্থা ঘটায় এবং মনে হবে বুক-পিঠ সেঁটে ধরেছে, আর বায়ু ব্যাকুলিত হ'য়ে যন্ত্রণা হয়, ওই সময় বামুনহাটির মূলের ছাল কাঁচা ৩ গ্রাম (শুষ্ক হ'লে ২ গ্রাম) বেটে গরম জলসহ খেতে হবে। দু/তিন দিন খেলেই ওটা সেরে যাবে।

৩। **বাত কাসিতে—** বামুনহাটির ক্বাথ দিয়ে ঘি তৈরী ক'রে (সমগ্র গাছ সিদ্ধ

ক'রে সেই ক্বাথ দিয়ে ঘি পাক ক'রতে হবে) সেই ঘি সকালে ও বৈকালে একটু গরম দুধে মিশিয়ে দুই/তিন দিন খেলেই কাসির উপশম হবে। কয়েকদিন খেলেই ওটা সেরে যাবে।

৪। **ক্রিমিতে—** যেসব ক্রিমি শ্লেষ্মাবিকার থেকে হয়, বেশী গুড়, পিঠে (পিষ্টক) মিষ্টি জিনিস খেয়ে হয়, সেসব ক্রিমি তাড়াতে বামুনহাটির মূল ও পাতা সমান পরিমাণে নিয়ে বেটে, মটর পরিমাণ বড়ি ক'রে শুকিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজন মত একটি থেকে ৩টি পর্যন্ত বড়ি খাওয়া যায়; অবশ্য বয়সানুপাতে। প্রয়োজন বোধে দু'বেলাই খাওয়া যায়।

বাহ্য ব্যবহার

৫। **শোথে** (ফুলোতে)— আমাশয় রোগে ভুগে ভুগে অনেকের শোথ হয়, সেক্ষেত্রে বামুনহাটির পাতা ও মূলের ছাল একসঙ্গে বেটে অল্প গরম ক'রে পায়ে প্রলেপ দিলে এবং সেই সঙ্গে পাতা ও মূল ৫ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সেই জলটাও খেতে হবে। একই সঙ্গে ওর প্রলেপ এবং ক্বাথ খাওয়ালে ফুলোটাও সেরে যাবে।

৬। **গাল-গলা ফুলে গেলে—** বামুনহাটি মূলের ছাল বেটে অল্প গরম ক'রে প্রলেপ দিলে গলার ফুলো ক'মে যাবে।

৭। **গাঁয়ের জ্বালায়—** যাঁরা প্রায়ই গায়ের জ্বালায় ভোগেন তাঁরা বামুনহাটি গাছ, মূল, পাতা অর্থাৎ সমগ্র গাছ অন্তত ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম এক লিটার জলে (৫/৬ কাপ) সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, সেই জলে শরীরটা মুছতে হবে। যাকে বলে সপ্‌সপে ক'রে ন্যাকড়া ভিজিয়ে শরীরটা মুছে ফেলতে হবে। এইভাবে ৩/৪ দিন মাখলে গায়ের জ্বালাটা ক'মে যাবে।

৮। **ন্যাবা রোগে** (জন্ডিসে)— বামুনহাটির ডাঁটা—উপরের দিকের ডাল (এর ভিতরটা ফাঁপা) আধ ইঞ্চি বা ¼ ইঞ্চি সাইজে কেটে মালা গেঁথে গলায় প'রতে হবে। এর দ্বারা জন্ডিসটা ক'মে যাবে।

এই নিবন্ধটির গোড়ার কাহিনীটা রেখে-ঢেকেই লিখতে হ'লো কেন? সেটা আর না বলাই ভালো। তারপর যেটা বৈদ্যের নজরে পড়লো সেটা তাঁরা তাকে তিন হাজার বছর ধরে উল্টেপাল্টে দেখেছেন, সমাজের কাজে যে লাগাতে পারেননি তাও নয়। তবে আমাদের মত হাল্‌কা বিদ্যের বৈদ্যের পাল্লায় প'ড়ে সেটা এখন রহস্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে, ব্রহ্মযষ্টি নাহয় উচ্চারণের হেরফের হ'তে হ'তে ব্রহ্ম-হট্টি, তারপর বামুনহাটি হলো—যদি বলি এটা উত্তরপদ সমাসে হাটের বামুনাটি হ'য়েছে?

আজ সে ন্যাবার মালা হ'য়েও তো বিক্রি হ'চ্ছে! দেখা যাচ্ছে আয়ুর্বেদ এখন বেদে বেদিনীর হাটের বেসাতি হ'য়ে বুক্‌লিস্টে ঢুকেছে। এরকম আরও অনেক জিনিস। একদিন দেখা যাবে বৈদ্যও "কাগুজে চরক" হয়ে রাস্তার ধারে ব'সেছে।

CHEMICAL COMPOSITION

Clerodendrum indicum Linn.

Bark contains :— D-mannitol 7.8% and sorbitol; Alkaloid and resin.

মুক্তবর্ষী [মুক্তোঝুরি]

এই নিবন্ধটি লিখতে ব'সে আমার বৈদ্যক জীবনের প্রথম কালের একটা কথা মনে প'ড়ে গেল—

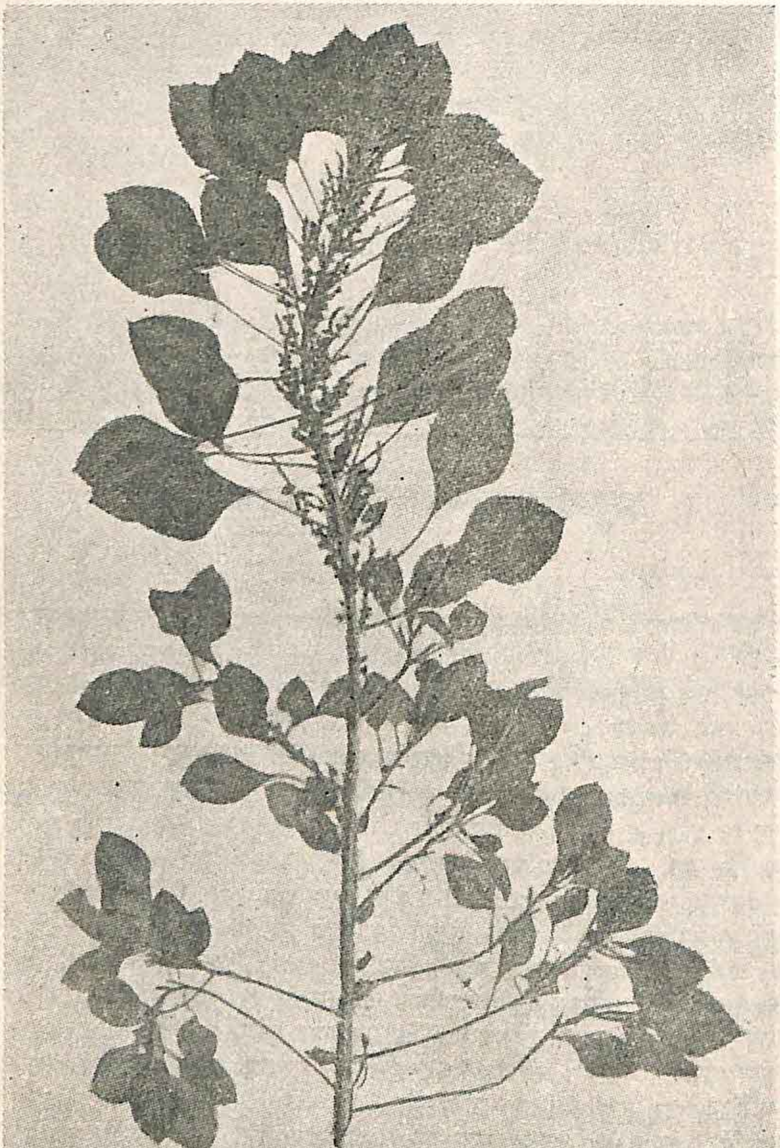
তখন ছিল অবিভক্ত বাংলা, তারই পূর্বাঞ্চলে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানেই এই গাছটির একটি গ্রামীণ নাম শিখে এসেছিলাম; শুধু শেখা নয়, প্রত্যক্ষ ক'রেছিলাম। উপলক্ষ্য হ'লো—আরে থ্যাবড়া, তোরে না কইছিলাম্ বিড়েলকান্দুনীর গাছ আনতে, আন্‌ছোস্ ? দ্যাখ্‌ছোস্ না কচিটার প্যাট্ (পেট) কামড়ায়, আর কান্দে, তিনদিন যে হাগে না (পায়খানা করে না)।

গাছটির নাম একটু খটোমটো লাগাতে ঔৎসুক্য জেগেছিলো—সেটা আবার কি গাছ ? একটু বাদেই গাছের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে দেখি ও, এ তো মুক্তোঝুরির গাছ।

এখানে বিড়েলকান্দুনী এ নাম হ'লো কি ক'রে জিজ্ঞেস করাতে, তখনই আমাকে প্রত্যক্ষ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই গাছটা বিড়ালের কাছে দিলে (হুলোবিড়াল) গাছটা চিবোয় আর ডাকতে থাকে। তখনই বুঝলাম এই নামকরণের তাৎপর্যটা। এ তো গেল, এর আর একটি নাম হ'লো "বেড়াল হাঁচি"। আবার বিহারে গেলে শুনতে পাবেন এরই নাম "বিল্লী লোটন"; এর অর্থ হ'লো এই গাছ প'ড়ে আছে দেখতে পেলে তার ওপর লুটিয়ে প'ড়ে ডাকতে থাকে আর চিবোয়। এই গাছের আরও নাম আছে "মুক্তবর্ষী", "মুক্তোঝুরি"; তা ছাড়াও আরও নাম আছে "হরিতজঞ্জরী"। সত্যিই এর মঞ্জরীগুলি হরিত বর্ণের।

যাক্, এইবার এর নামটা ছেড়ে তার আভিজাত্য আছে না উড়ে এসে জুড়ে ব'সলো—সেটাই সমীক্ষা ক'রে দেখা যাক্। তবে এ পর্যন্ত যতটা সমীক্ষা করা গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এই নামের অস্তিত্ব বেদ, সংহিতা এবং কোন প্রামাণ্য নিঘণ্টুর গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায় না, অথচ এই ক্ষুপটি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ

প্রভৃতি প্রতি প্রদেশেই অল্পবিস্তর ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। হয়তো সেইজন্যই বৈদ্যের খ্যাতি, তাই বলা হ'য়েছে—



নরেষু সৃষ্টাখিল দৃশ্যমানে
বনেষু ভৈষজ্য নিকেতনেষু।
দোষান্ পরিত্যজ্য গুণপ্রয়াসী
বৈদ্যায় তস্মৈ গুণিনে নমোঽস্তু।

অর্থাৎ মানবের দেহ এবং এ জগতের যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু, তাছাড়া অরণ্যের বৃক্ষলতা সবই তো ভেষজ নিকেতন, সবেরই মধ্যে দোষও আছে গুণও আছে কিন্তু বৈদ্য কারোর দোষ গ্রহণ না করে সকলের গুণই গ্রহণ করেন, তাই সেই হয় শ্রেষ্ঠ গুণী বৈদ্য, তাঁকে প্রণাম করি। তা যাক্, পূর্বেই তো বলা হ'য়েছে যে কোন নিঘণ্টু গ্রন্থে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, অন্ততঃ এই নামে, কিন্তু এর সাধারণ আস্বাদ তিক্ত কষায় রস, আর তার কাজও যা হয় সবই সৌম্যগুণ সম্পন্ন ব'লেই। অর্থাৎ কটু অম্ল এবং লবণ হ'লো আগ্নেয় আর মধুর তিক্ত কষায় এই তিনটি হ'লো সৌম্য। মুক্তঝুরি নামের ভেষজটি যে আগ্নেয় নয় এবং উষ্ণগুণ বা উষ্ণবীর্য নয় তা বোঝা যায়। কারণ আগ্নেয় দ্রব্য মূর্ছা (তা বহু প্রকার) বিদাহ সৃষ্টি করে; কিন্তু সৌম্যরস শীত এবং মূর্ছা ও বিদাহকে শমিত করে, অতএব এই সৌম্যধর্মীর কাজই যখন মুক্তাবর্ষী ভেষজে পাওয়া যায়, তখন বলা যায় এটি শীতগুণ ও কষায়রস এবং অবিদাহী।

আর একটি কথা, প্রাধান্য হিসেবে বা ব্যক্ত রস হিসেবে যখন এটিতে কষায় রস প্রকট, এবং গৌণ বা অব্যক্ত রসটি তিক্ত, তখন বায়বীয় শক্তি এবং পার্থিব শক্তি তো আছেই, তখন রুক্ষতা এবং শীততাও যেমন পার্থিব শক্তির জন্য, গুরুও তেমনি। তবে পরমাণুগত বিশেষ ধর্ম মধুর গুণও অবশ্যই আছে।

এই অনুশীলনটির সংক্ষিপ্ত সূত্র হ'লো—বাগ্‌ভটের সূত্রস্থানের ২০ অধ্যায়ের। ওখানে বলা হ'য়েছে—

"তিক্তঃ কষায়ো মধুর স্তদ্ব দেব চ শীতলাঃ।"

এই রস ও গুণ সম্পন্ন ভেষজের স্বভাবই হোলো রক্তবহ স্রোতে সন্ধানীয় কাজ করে এবং তখন সেটি অ-হৃদ্য। আর শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াবত্তায় এটিতে কফনিঃসারক শক্তিও আছে, মূত্র সংবহনের ক্ষেত্রে সংগ্রহণীয়। অতএব জননশক্তির জন্য এটি কোন সময়ে বৃষ্য হয় না। আর ত্বক্‌গত ক্ষেত্রেও এটি একক কাজ করতে পারে না, কোন একটি ক্ষারধর্মী দ্রব্যের সহযোগেই এটি বিশেষ ধর্ম প্রকাশক। এই মুক্তবর্ষীর ব্যবহার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র অপেক্ষা বাহ্য ব্যবহারই বেশী, আর শিশুর ক্ষেত্রেই আভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৈদ্যকুলে সর্বাধিক।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণ— পাতার রস কোষ্ঠ পরিষ্কারক, শ্লেষ্মা নিঃসারক ও বমনকারক। মূল বিরেচক।

ঔষধার্থে প্রয়োগ— পাতার ক্বাথের সহিত রসুন একত্র করে খাওয়ালে শিশুদের ক্রিমির উপদ্রব নিবারিত হয়। এভিন্ন উক্ত ক্বাথ ব্রোন্‌কাইটিস্, নিউমোনিয়া ও হাঁপানী রোগে হিতকর।

পাতার বাহ্য প্রয়োগেও বিবিধ রোগের প্রশমন হয়। যেমন—পাতার রসের সঙ্গে লবণ মিশিয়ে খোস-পাচড়ায় প্রয়োগে ও তেল মিশিয়ে বাতব্যাধিতে মালিসে উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া কানের যন্ত্রণায়ও এর পাতার ক্বাথ ফোঁটা ফোঁটা প্রদানে যন্ত্রণার উপশম হয়। পাতার গুঁড়ো শয্যাক্ষতে ও সাধারণ ক্ষতে প্রয়োগ করা হয়। পাতা বেটে একটু পুরাতন ঘি মিশিয়ে পানের বোঁটার সাহায্যে মলদ্বারে প্রবেশ করালে শিশুদের দাস্ত পরিষ্কার হয়। নিদারুণ মাথার যন্ত্রণায় উক্ত পাতার রসে এক টুকরো তুলো ভিজিয়ে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করালে যন্ত্রণার উপশম হয়, এমনকি নাসার রক্তস্রাবও নিবারিত হয়।

কোন কোন প্রদেশে সাপের কামড়ে ও উপদংশ জনিত ক্ষতে বেটে লাগানো হয়। ইউনানী চিকিৎসকেরা মুক্তবর্ষী গাছের রস দুই-এক দানা লবণ মিশিয়ে নাসারন্ধ্রে ফোঁটা দেওয়ার ব্যবস্থা দেন, এতে শিরোবিরেচন হয়।

মূল গরম জলে ভিজিয়ে সেই জল খাওয়ালে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

পরিচিতি

বর্ষজীবী গুল্ম, তবে এতে যে ছোট ছোট শাখা বের হয় না তা নয়। কমবেশী ১—৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা যায়। পাতা প্রায় গোলাকার, কিন্তু গোড়ার দিকটা একটু সরু, ব্যাস ১ ইঞ্চি, কিনারাটা করাতের মত কাটা এবং সূক্ষ্ম রোমশ, বর্ণ ফিকে সবুজ, বোঁটা ১—১২ ইঞ্চি লম্বা। সবুজ বর্ণের ফুল আকারে অনেকটা ছোট নাগ্-চাবির মত ও ১/১২ ইঞ্চি লম্বা, সরু সুতোর আকারে বঁটিদার ঝুরি নামে। বীজকোষ আকারে ছোট ও একটি বীজ বিশিষ্ট। বীজ গোলাকার ও মসৃণ। প্রায় সারা বৎসরেই ফুল ও ফল হয়।

এই গণের (Genus) প্রায় ২২০টি প্রজাতি আছে। তার মধ্যে ৬ থেকে ৮টি প্রজাতি ভারতে বর্তমান। সাধারণতঃ রাস্তার ধারে, বাগানে ও পতিত জমিতে দেখতে পাওয়া যায়। এর সংস্কৃত নাম হরিতমঞ্জরী, বাংলায় প্রচলিত নাম মুক্তোঝুরি ও হিন্দীতে খোকালী নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Acalypha indica Linn., ও ফ্যামিলি Euphorbiaceae.

ব্যবহার্য অংশ— সমগ্র গাছ।

লোকায়তিক যোগ

১। কোষ্ঠ কাঠিন্যে— (এটি শিশুর ক্ষেত্রে উপযোগী। বয়স ২ থেকে ৪ বৎসর পর্যন্ত) ক'ষে গিয়েছে, পায়খানা হ'চ্ছে না, অবশ্য সাধারণতঃ এটা হয় শ্লেষ্মাবিকার থাকলে এবং মায়ের বুকের দুধ বা পানীয় দুধটি জীর্ণ না হ'লে। সেক্ষেত্রে মুক্তোঝুরির মূল ২ গ্রাম ৫/৬ চা-চামচ জলে বেটে সেটাকে ন্যাকড়ায় ছেঁকে ওই জলটা খেতে দিলে দাস্ত পরিষ্কার হ'য়ে যায়।

২। শিশুর বুকে সর্দি ব'সে গেলে— মুক্তোঝুরির গাছ ও পাতা শুকিয়ে নিয়ে তা থেকে ২ গ্রাম নিতে হবে, সেইটাকে সিকি কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ৩/৪ চা-চামচ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে অল্প চিনি মিশিয়ে খেতে দিতে হবে। তবে একটা কথা— বংশে হাঁপানি রোগ থাকলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে শিশুকে খাওয়াবেন। অবশ্য বর্তমানে এ ধরনের প্রয়োগ কোন চিকিৎসক আর করেন না।

৩। তড়কা রোগে— শিশুর ঘন ঘন তড়কা হ'তে থাকলে মুক্তোঝুরির (সমগ্র গাছ পাতাসহ) শুষ্ক গাছ ২ গ্রাম সিকি কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে, ৩/৪ চা-চামচ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, সেই ক্বাথে একটিপ সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে খাওয়ালে শিশুর ওই তড়কাটা থাকে না।

তবে কাঁচা রসও দেওয়া যায়, তখন ওই রসটাকে গরম ক'রে, তা থেকে ৩০ ফোঁটা রস ৩/৪ চামচ (চা-চামচ) জলে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়।

৪। শিশুর ক্রিমিতে— পেটে ক্রিমি হ'লে তার কতকগুলি উপসর্গ দেখা দেয়, যেমন প্রায়ই কোঁৎ দিতে থাকে, পেট ব্যথা করে, তার জন্য পা গুটিয়ে নেয় বার বার।

এই ক্ষেত্রে মুক্তোঝুরির পাতার রস গরম ক'রে সেটা ছেঁকে ঠান্ডা হওয়ার পর তা থেকে ৩০ ফোঁটা নিয়ে ২ চামচ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। এর দ্বারা ক্রিমির উপদ্রবটা ক'মে যাবে।

বাহ্য ব্যবহারের যোগ

৫। **কানের যন্ত্রণায়—** শিশুর কান কট্ কট্ ক'রলে (বয়স ৫ বৎসর পর্যন্ত) মুক্তোঝুরি ((শুকিয়ে রেখে) ২/৩ গ্রাম পাতা সমেত শুষ্ক গাছ ৭/৮ চামচ গরমজলে আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর তাকে অল্প ফুটিয়ে নিয়ে সেটা ছেঁকে ওই ক্বাথটা এক ফোঁটা ক'রে কানে দিতে হবে, এই রকম সকালের দিকে একবার ও বৈকালের দিকে একবার দিতে হবে। এর দ্বারা ওটা সেরে যাবে।

৬। **জিভের ঘায়ে—** শিশুদের জিভে ঘা হ'লে নিম তেলের সঙ্গে ওই রসকে ফেটিয়ে দুই/এক ফোঁটা জিভে লাগিয়ে দিলে ঘা সেরে যায় আর পেটেও যদি একবিন্দু যায় তাতে কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই।

৭। **মাথার ঘা—** শিশুর মাথায় চাপ্ড়া ঘা, খুসকি, দাদ্ হ'লে মুক্তোঝুরির পাতা ১০/১২টি কাঁচা হলুদ এক গাঁটের মত নিয়ে একসঙ্গে বেটে খুব পাতলা ক'রে এক পাশের দিকে লাগিয়ে দেখুন তার অস্বস্তির কারণ হয় কিনা, এটাতে মাথার ঘায়ের ময়লাগুলি পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। তবে একদিনে সমস্ত মাথায় লাগানো উচিত নয় আর শিশুর সর্দি থাকলেও দেওয়া চ'লবে না।

৮। **বিছের কামড়ে—** এটা কিন্তু আমরা ভুল বলি—বিছে কামড়ায় না, বিছে হুল বিঁধিয়ে দেয়। এই হুল ফুটানোর জ্বালায় মুক্তোঝুরির পাতা বেটে ওখানে লাগিয়ে দিলে জ্বালার উপশম হয়।

৯। **ছুলি রোগে—** এটি কি রোগ সে সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ডেই বলা হ'য়েছে। মুক্তঝুরির পাতা বেটে হলুদের মত ওই সব জায়গায় মাখলে ওটা সেরে যায়, তবে প্রত্যহ ব্যবহার করার দরকার নেই, একদিন বা দু'দিন অন্তর লাগাতে হ'বে।

১০। **শিশুদের কোষ্ঠ-কাঠিন্যে—** অনেক শিশু ২/৩ দিন অন্তর পায়খানা ক'রে, তার জন্য তাদের পেটে যন্ত্রণা হয়। সেক্ষেত্রে মুক্তোঝুরির পাতা বেটে একটু ঘি মিশিয়ে (পুরনো হ'লে ভাল হয়) পানের বোঁটার মুখে লাগিয়ে মলদ্বারে একটু প্রবেশ করিয়ে দিলেই ১০/১৫ মিনিটের মধ্যেই দাস্ত হ'য়ে যাবে।

১১। **শিশুর হাঁপানিতে—** একটু পুরনো ঘি আর মুক্তোঝুরি পাতার রস মিশিয়ে, অল্প গরম ক'রে ওটা আস্তে আস্তে বুকে মালিশ ক'রতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁপটা ক'মে যাবে।

এই নিবন্ধের বক্তব্য শেষ ক'রলাম। এখানেই মনের একটা ক্ষোভের কথা জানিয়ে যাই—বর্তমান স্বাধীন ভারতের আয়ুর্বেদবিজ্ঞান ঘরজামাই মধুসূদনের মত আজ মোধো হ'য়ে ব'সে আছে; তাই বহু আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ নিজেদের কবিরাজ উপাধিতে চিহ্নিত হ'তে চান না, আর যাঁরা তা চান, তাঁরা সমাজের কাছে আজও তেমন সমাদর পান কি? তাই আপনমনেই ব'লতে চাই আয়ুর্বেদকে—হে আয়ুর্বেদ! সমাজের এই অবস্থা দেখে যেন ভেবো না আমি কত ক্ষুদ্র। মনে পড়ে সেই সর্বজন-শ্রদ্ধেয় মহাকবি জগন্নাথের কথা। তিনি ব'লেছেন—

"নিতরাং নীচোঽপি ত্বং খেদং মা কদাপি কূপ কৃথাঃ।
অত্যন্ত সরস হৃদয়ো যতঃ পরেষাং গুণ গ্রহীতাপি॥"

অর্থাৎ, ওহে কূপ, তুমি গভীরতায় দীর্ঘ হ'য়েও আয়তনে ক্ষুদ্র ব'লে যেন দুঃখ ক'রো না, নিশ্চয় সরস হৃদয় (জলভরা কলসী) এবং গুণগ্রাহী (দড়ি ধরে টানার লোক) কেউ কেউ আছে বৈকি! তারাই তোমার গম্ভীর হৃদয়ের রস গ্রহণ ক'রবে, এবং গুণগ্রাহীও জনসমক্ষে টেনে তুলবে।

CHEMICAL COMPOSITION

Acalypha indica Linn.

Alkaloids viz., acalyphine; cyanogenetic glucoside and triacetonamine; active principle HCN and an unknown substance, extremely poisonous to rabbits.

কবচ [ক্ষেৎপাপড়া]

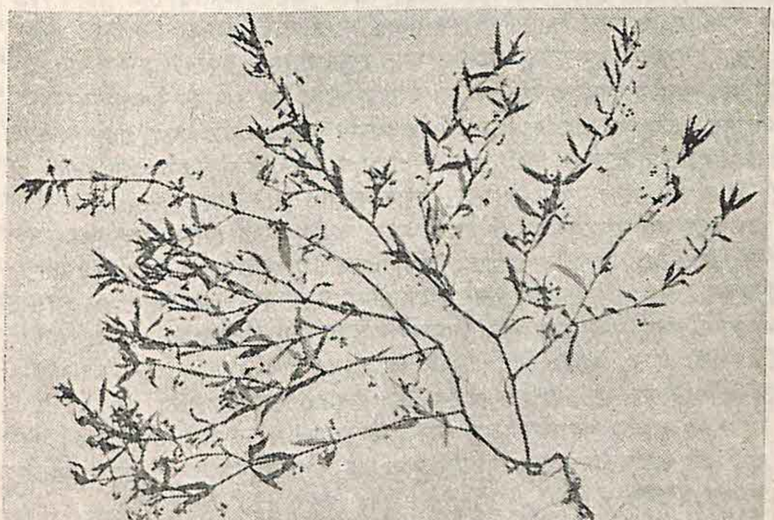
কবচ শব্দটি যেন বহুরূপী, স্থান-কাল অথবা পরিবেশ ভেদে তার রূপান্তর ঘটে। এই দেখুন না—বৃষ্টি-বাদলে ও রৌদ্রে ছাতাটা তো রক্ষে কবচ, আবার শীতবস্ত্রও তো শীতের কবচ। শুনেছি—কামরূপ-কামাখ্যায় গেলে ভেড়া বানিয়ে রাখতো, সেও সেই এক ধরনের রমণী-কবচ, তবে সে কবচ লোকে স্বেচ্ছায় পরতো। রামায়ণ-মহাভারতের

উপাখ্যানে কবচে কবচে তো ছড়াছড়ি, তবে তার পুরোভাগে রয়েছেন আমাদের কর্ণ, তাঁর ছিল সহজাত কবচ। আর অবোধ পুরাণের কবচের কথা শুনবেন? আমার গাঁয়ের খুড়োকে দেখেছি—যেন ন্যাবা রোগীর মালার সঙ্গে গাঁটুলী বাঁধা গলায় একটা কবচ ঝুলছে। এটা কি ও কেন?—জিজ্ঞেস ক'রতেই খুড়ো ব'ললো—মড়াঞ্চে দোষে তিন-তিনটে বৌ মরে হেজে গেল, তাই আমার এই কবচ নেওয়া। সে কি গো? মড়াঞ্চে দোষ তো মেয়েদের হয়। কেন? গজা পণ্ডিত তো আমাকেই প'রতে বলেছে।

খুড়োর মত অনেকেই কবচ পরেন, তবে তার রকমফের আছে। এই কবচের সংস্কারটা তো আরও প্রকট। বৈদিক ভেষজবিদ্‌রা কিন্তু এমন ধরনের কবচে বিশ্বাস করেন নি বা করতেন না। তাঁরা যে কবচ গ্রহণ ক'রেছিলেন, সেটার বর্ণনা পাওয়া যায় অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৫৩।৭।৬২ সূক্তে।

যে জনেষু মলিম্লবঃ তেন ত্বং কবচো বনে।
যে কক্ষেষু অঘায়বং তেষাং সংশিতং বলম্॥

মহীধর এই সূক্তটির ভাষ্য ক'রেছেন—



গ্রামবর্ত্তিষু যে মলিম্লবঃ রোগকরা পাপাভিলাষুকাঃ, তেন, ত্বং বনে কবচঃ=কায়ে অঞ্চিতং ভবতি ইতি (যাস্কঃ) পর্পট=পর্প গতৌ অটন্, অপিচ কক্ষেষু অঘায়বঃ, যে গ্রামেষু ঋতুজেষু চৌরা ইব তেষাং বলং অপহৃত্য কায়ে বলং বীর্য্যং সংশিতং ভবতি।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—গ্রামে অবস্থিত পাপকারী রোগ সকল চোরের মত দেহে প্রবেশ করে, তুমি তখন বনজ কবচ, অতএব পর্পট (তীক্ষ্ম গতিশালী) হ'য়ে তাদের বল অপহরণ করে দেহে বল বীর্য প্রকাশ কর। তুমিই বনবাসী কবচ।

এই হলো বৈদিক তথা আয়ুর্বেদিক কবচ। বৈদিক অভিধানকার যাস্ক এই কবচ

শব্দটির অর্থ ক'রেছেন "দেহের যে রক্ষক"। আবার ভাষ্যকার মহীধর ঐ কবচ শব্দটিই যে সমার্থক হয় পর্পট শব্দে, এবং সেই পর্পটই যে বনবাসী হ'য়েও দেহে প্রবেশ ক'রে রোগহারক হ'য়ে থাকে, তারই ব্যাখ্যায় ভাষ্য রচনা করেছেন। আমরা দেখছি বৈদিক ভাষ্যকারের কবচ শব্দের সমার্থক পর্পট নামের ভেষজটি চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থে উল্লেখিত হ'য়েছে।

বৈদ্যকের নথি

চরকের সূত্রস্থানের ৪র্থ অধ্যায়ে তৃষ্ণা নিগ্রহের জন্য পর্পট (ক্ষেৎপাপড়ার) ব্যবহার্য ব'লে নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে। তারপর এ প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে, তৃষ্ণা বা পিপাসাকে এমন গুরুত্ব দেওয়ার কি আছে? কারণ ওটা তো দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ওটা কি ব্যাধির পর্যায়ে পড়ে?

চিকিৎসকগোষ্ঠীর অভিমত হ'লো—দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি কি কোন কারণের প্রতিক্রিয়া নয়? জিহ্বামূল, গলদেশ, ক্লোম ও তালুতে যে শুষ্কতা সেটা তো তৃষ্ণারই কারণ, কিন্তু এই তৃষ্ণা যখন অন্য কারণ থেকে আসে তখনও তো শুষ্কতা আসে ওইসব স্থানে, তাহ'লে স্বাভাবিক পিপাসার সঙ্গে তার তুল্যতা হয় কি? এই যেমন বহুমূত্র, মধুমেহ, হৃদ্‌রোগ, বাতশ্লেষ্মায় হৃদয়াবরোধ, মর্করী সন্নিপাত (মেনিন্‌-জাইটিস্‌) প্রভৃতি রোগেও যে পিপাসা হয়, সেগুলি কি সাধারণ পিপাসার মতই হ'য়ে দেখা দেয়? দেয় না তো, তাহ'লেই চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা অবশ্যই গ্রহণ ক'রতে হয়, তৃষ্ণার একটা মৌল কারণ থাকে "সৌম্য ধাতুর ক্ষয়"—এই ক্ষয় যদি পূর্ণ করা না হয়, তবে চিত্তভ্রংশ, স্ট্রোক, প্যারালিসিস্‌, শোষ রোগও ঘটে যায়।

তারপর তৃষ্ণা রোগের আরও ক্ষেত্র আছে, সেটা হ'লো ক্ষয়জ তৃষ্ণা, এবং মদ্যপান-জনিত তৃষ্ণা; এই দ্বিতীয় প্রকারের তৃষ্ণা এমন যে, মদ্যপানের বিষক্রিয়া যখন সুরু হয় তখন ঠাণ্ডা জল পান ক'রলে দেহের উষ্মা রুদ্ধ হয়, এবং কোষ্ঠগত হ'য়ে আরও তৃষ্ণা সৃষ্টি করে, তখন সেই তৃষ্ণা নিবারণ ক'রতে শীতল জলপান ক'রলে, আরও তৃষ্ণা বাড়ে, বাধ্য হ'য়ে আবার মদ্যপানেরই প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে, এজন্য মদ্যপায়ী ব্যক্তি মাত্রা ছাড়িয়ে মদ্যপানই ক'রতে থাকে, এবং আরও তৃষ্ণায় কাতর হয়।

অতএব তৃষ্ণাকে শরীরের কোন ক্ষুদ্র চেষ্টা ভাবাই উচিত নয়। ঐজন্য চরক সংহিতায় তৃষ্ণাকে এত গুরুত্ব দিয়ে তার নিগ্রহের জন্য এই পর্পটের আময়িক নিযুক্তি করা হয়েছে। তাই বলা হ'য়েছে—

> বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ তৃষ্ণা সন্নিপাতাৎ রসক্ষয়াৎ।
> ষষ্ঠঃ স্যাৎ উপসর্গাৎ চ বাতপিত্তেতু কারণম্‌॥

অর্থাৎ বায়ু জন্য কিম্বা পিত্ত বা কফ অথবা সান্নিপাতিক কারণে কিম্বা রসক্ষয় জন্য তৃষ্ণা হয়, আর অন্য রোগের উপসর্গ জন্যও তৃষ্ণা রোগ হয়, তবে একটা কথা, যে কোন কারণই থাক, সাক্ষাৎ কারণ থাকে বায়ু ও পিত্ত। এই তৃষ্ণাকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়, একে উপেক্ষা ক'রলে এ থেকে যে অশুভ লক্ষণ (যাকে বলে অরিষ্ট লক্ষণ) দেখা দেয়, তাকে আর ঠেকানো যায় না, অসাধ্য হয়। সেই অশুভ লক্ষণ হ'লো—

"সর্ব্বদেহ ভ্রমোৎকম্প তাপ-তৃড়্‌ দাহ মোহকৃৎ।"

অর্থাৎ তৃষ্ণাকে (পিপাসাকে) উপেক্ষা ক'রলে (ওর কারণটা না জানলে) শেষে ভ্রম, শরীরে কাঁপুনি, সর্বদা দাহ, এবং এক ব'লতে এক বলা ও ভাবা এইসব ঘ'টতে থাকে। মোটকথা—এই পর্পট বা ক্ষেৎপাপড়া নামটি যেমন বহু প্রাচীনকাল থেকে অর্থযুক্ত তেমনি এর প্রচলিত ভাষানাম "ক্ষেত্রপর্পটি" এই নামটিও বোধ হয় দ্ব্যর্থ সমন্বিত। অর্থাৎ ক্ষেত্রে বা মাঠে এটি হয়। আবার ক্ষেত্র বুঝে এর ব্যবহার করাও হয় বলেই বোধ হয় ক্ষেত্রপর্পটি। এই জন্যই চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, চক্রদত্ত গ্রন্থের স্থানে স্থানে ক্ষেৎপাপড়া ব্যবহারের নির্দেশ।

ব্যবহারিক ক্ষেত্র

(১) চরকের চিকিৎসাস্থানের ৩ অধ্যায়ে ৮৯ শ্লোকে বাতপিত্ত বিকারজাত জ্বরে পর্পট (ক্ষেৎপাপড়া); চরকের চিকিৎসাস্থানের ৩ অধ্যায়ে ১৩১ শ্লোকে এবং ১৪৫ শ্লোকে প্রয়োগ করা হ'য়েছে; চরকের চিকিৎসাস্থানের ৪৯ অধ্যায়ে ৬৩ শ্লোকে (রক্ত-পিত্ত রোগে) এবং বাতপিত্তপ্রধান যে কোন রোগে বা উপসর্গে পর্পটকের ব্যবহার।

(২) সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানের নবম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে দেখা যায়, এই ক্ষেৎপাপড়া ভেষজটি কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করার উপদেশ; ওখানে ক্ষেৎপাপড়ার ক্বাথ পান এবং ঐ সিদ্ধ জলে কুষ্ঠের ক্ষত শোধনের কাজে ব্যবহারের উপদেশ।

তাছাড়া কুষ্ঠরোগের জন্য যে "মহাতিক্তক" নামে একটি প্রখ্যাত ঔষধ, তার মধ্যে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে ক্ষেৎপাপড়ারও ব্যবহার। তাছাড়া সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের ৩৯ অধ্যায়ে অন্ততঃ ৫।৬ বার এই ক্ষেৎপাপড়াকে কোথায় কোন জ্বরে কিভাবে ব্যবহার করা উচিত তার একটা সংখ্যাপঞ্জীর উল্লেখ।

এদিকে বাগ্‌ভটেও দেখা যায় জ্বরের এক একটি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় (প্রথম অধ্যায় চিকিৎসাস্থানে) ১৭।৪৮ শ্লোকে এবং ৫২।৫৪ ও ৭৫।৭৭ শ্লোকে পর্পটকের ব্যবহার। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় বাতপিত্ত বিকারের যেকোন ক্ষেত্রে (শুধু জ্বরটাই নয়) ক্ষেৎপাপড়ার নূতন নূতন সংস্কার চিন্তনার দ্বারা বহু পীড়ারই উপশম ও নিরাময় করা যায়।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— ইহা জ্বর ও ক্রিমিনাশক।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— ইহার ক্বাথ পিত্তজ জ্বরে এবং পাকস্থলীর পীড়ায় খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। ক্ষেৎপাপড়া ও ধনে একত্রে সিদ্ধ করে খেলে বহুদিনের পুরাতন জ্বর সেরে যায়। এছাড়া পাণ্ডুরোগেও এর ব্যবহার দেখা যায়। নব্য দৃষ্টিতে আরও বলা যায় এটি স্নায়ুগত পীড়ায় হিতকর।

পরিচিতি

ভূমি প্রসরণশীল বর্ষজীবী গুল্ম লতাটি ভারতের সর্বত্র, এমনকি ৬০০০ ফুট উঁচু পার্বত্য প্রদেশেও জন্মে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পতিত জমিতে, জমির আলের ধারে, বাগানের আগাছারূপে প্রচুর পরিমাণে হ'তে দেখা যায়। ঘনসন্নিবদ্ধ গাছগুলি ৩।৪ ইঞ্চি থেকে ২ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, একটু বড় হলেই গড়িয়ে পড়ে, শাখা-প্রশাখা

অনেক, কখনো কখনো গাছগুলি অল্প রোমশও হয়। শাখা-প্রশাখাগুলি ২।৩ ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। পাতাগুলি পাতলা, লম্বাটে ও ডিম্বাকৃতি, ½—২ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। ছোট ছোট ফুলগুলি একত্রে ৩।৪টি বা ততোধিকও হয়, দেখতে শ্বেতবর্ণের, ফল গোলাকার, তার মধ্যে বীজ থাকে। এই গাছ বিভিন্ন আকৃতিরও দেখতে পাওয়া যায়, অনেক সময় Oldenlandia diffusa Roxb. থেকে পৃথক করা যায় না। গাছগুলি আষাঢ়-শ্রাবণে জন্মে এবং মাঘ-ফাল্গুন মাসে মরে যায়। গাছে ফুল হলে বীর্যবান হয়।

এটিকে সংস্কৃতে পর্পট, পর্পটক, বরতিক্ত, কবচ, ক্ষেত্রপর্পটী; বংলায় ক্ষেতপাপড়া, হিন্দীতে দমনপাপড়া, পিতপাপড়া বলে। এর বোটানিক্যাল নাম Oldenlandia corymbosa Linn., ফ্যামিলী Rubiaceae.

ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ।

দ্বিতীয়তঃ পীত পর্পটক ব'লে আর একটি গাছ কোন কোন প্রদেশের বৈদ্যক সম্প্রদায় ব্যবহার ক'রে থাকেন, সেটির বোটানিক্যাল নাম Fumaria perviflora, Lam., ফ্যামিলি Fumariaceae. এর প্রচলিত বাংলা নাম বনশুল্‌ফা।

লোকায়তিক যোগ

এই ভেষজটি বীর্যবত্তায় কাজ করে, এটি আকাশ ও বায়ুধর্মী। এক কথায় জেনে রাখতে হবে যে, আকাশ এবং বায়ুধর্মী দ্রব্য মাত্রেই বিপাকে এবং বীর্যে কাজ করে, এইজন্য আমাদের দেশের বৈদ্যগণ এই ক্ষেৎপাপড়ার মৌল তথ্যটিকে অবলম্বন ক'রে ভেষজ দ্রব্যগুলির যৌগিক শক্তি সমাবেশের ফল রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রেছেন।

১। **প্রবল অতিসারে—** যেক্ষেত্রে দুর্গন্ধযুক্ত মল প্রবল বেগে নিঃসারিত হ'চ্ছে, অথবা তাতে মল নেই বললেই হয়, রোগী ঝিমিয়ে প'ড়েছে, মলদ্বারে জ্বালা, এবং দ্বারটা হেজে গিয়েছে, কখনও বা একটু লাল আভাযুক্ত মল নিঃসরণ হচ্ছে; এইক্ষেত্রে ক্ষেৎপাপড়া কাঁচা হ'লে ১৫ গ্রাম থেঁতো ক'রে দেড় বা দুই কাপ গরম জলে আধ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে, তাকে ছেঁকে নিয়ে ওই জলটা একটু একটু ক'রে ১৫।২০ মিনিট অন্তর খাওয়ার ব্যবস্থা দিতেন প্রাচীনেরা। শুষ্ক হ'লে ৬।৭ গ্রাম নিয়ে জল দিয়ে থেঁতো ক'রে নিয়ে, তাকে ৩ কাপ জলে ফুটিয়ে আন্দাজ ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, সেটাকে ছেঁকে ১৫।২০ মিনিট অন্তর ৪।৫ চামচ ক'রে খাইয়ে যেতে হবে, এর দ্বারা দাস্ত বন্ধ হবে, এবং ক্ষিধে লাগবে, এর দ্বারা প্রস্রাবও হবে।

২। **রক্তদোষে—** শরীরের কোথাও কিছু রোগ হয়তো দেখা যাচ্ছে না, প্রস্রাব ও মল পরীক্ষা করানো হ'লো কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। এদিকে কোন জায়গায় কেটে গেলেও তাড়াতাড়ি রক্তটা বন্ধ হ'তে চায় না অর্থাৎ রক্তটা জমাট বাঁধতে চায় না, শরীরে কোন কোন জায়গায় ফোড়াও হয়তো হ'য়েছে কিম্বা হচ্ছে, সেগুলি সারছে না, ভোগাচ্ছে, একটা পাকছে, ফাটছে, শুকোচ্ছে, আবার নতুন ফোড়া উঠছে; এই ক্ষেত্রে ক্ষেৎপাপড়া ৬।৭ গ্রাম নিয়ে জলে ভিজিয়ে তাকে থেঁতো ক'রে এক গ্লাস গরম জলে তাকে ১০।১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে (রাত্রে ভিজালে ভাল হয়) পরের দিন সকালে ওটাকে ছেঁকে নিয়ে সকালে ও বৈকালে দু'বারে ওই জলটা খেতে হবে। তবে ওটাকে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ওটা দু'বারে খেলে রক্তদোষজনিত ফোড়া হওয়া বন্ধ হবে। তবে এটাও দেখা দরকার যে, ব্লাড্‌সুগার আছে কিনা! আয়ুর্বেদে একে বলা হয় মধুমেহ। এই দোষ থাকলে ফোড়া বা কোন ঘা সারতে চায় না, সুতরাং

সঙ্গে সঙ্গে এর চিকিৎসাও ক'রতে হবে।

৩। **কফবিকারে—** শিশুর কফ, বৃদ্ধের কফ যদি এলো তাহ'লে আর যেতে চায় না; এই ক্ষেত্রে ক্ষেৎপাপড়া কাঁচা হলে ১০ গ্রাম এবং শুষ্ক হ'লে ৫ গ্রাম নিয়ে ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ওটাকে সকালে ও বৈকালে দু'বারে খেতে হবে। এর দ্বারা ওই কফের দোষটা সেরে যাবে।

৪। **তৃষ্ণা রোগে—** এর বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া হ'য়েছে। তবে প্রাচীন বৈদ্যকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ যেসব যোগ এই ভেষজটিকে কেন্দ্র ক'রে আছে, তা থেকে কয়েকটি এখানে লিখছি। প্রথমেই বলি কিবা যুবক কিবা বৃদ্ধ—যে বয়সেরই হোক্ না কেন, একটা হুঁসিয়ারি দিয়ে রাখা দরকার—কোনও ক্ষেত্রে খাওয়া বেশী হ'লে, কিম্বা গুরুভোজন অথবা সংযোগবিরুদ্ধ ভোজন, তাতে পরে আসে পিপাসা—তারা জেনে রাখুন ভবিষ্যতে সে সামান্য ছুতো ধরে হৃদ্‌রোগ হৃদ্‌দৌবল্য কিম্বা হাঁপের ভাব আসবে না এ কথা বলা যায় না, তবে সতর্কতা অবলম্বন ক'রতে হ'লে তাঁদের উচিত ক্ষেৎপাপড়া ৭।৮ গ্রাম (কাঁচা) থেঁতো ক'রে এক গ্লাস গরম জলে, ৪।৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে সেটাকে ছেঁকে ওই জলটা সমস্তদিনে দুই-তিন বারে খেতে হবে। আর শুকনো (শুষ্ক) ৫ গ্রাম খানিকক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পর তাকে থেঁতো ক'রে ৩ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রতে হবে, সেটা ক'মে গিয়ে আন্দাজ ২ কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সকালে ও বৈকালে দু'বারে খেতে হবে। এর দ্বারা তৃষ্ণা রোগটি চ'লে যাবে। হৃদ্‌রোগের পূর্বলক্ষণেও তৃষ্ণা আসে।

৫। **হাত-পা জ্বালায়—** এর আর যুক্তি-বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, এটা বাড়ে গ্রীষ্মে, বর্ষায় ও শরতে। এই ক্ষেত্রে ক্ষেৎপাপড়া ৫।৭ গ্রাম (শুষ্ক) অল্পক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখার পর সেটাকে থেঁতো ক'রে, তারপর তাকে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে দু' কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে সকালে ও বৈকালে দু'বারে খেতে হবে, এর দ্বারা ওই হাত-পা জ্বালাটা চ'লে যাবে।

বক্তব্য শেষ ক'রছি—কবচটা সকলের কাছে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হ'লাম।

নিবন্ধের মুখবন্ধে খুড়োর কবচ পরাটা হাসিরই উদ্রেক্ ক'রেছিলো; তবে আজ আর বৈদ্যক সম্প্রদায় কবচ কুণ্ডল দান ক'রে ভিখিরি হয় না। কারণ এই ভারতের মাটিতে সোনা, হীরে আর জলে প্রবাল, মুক্তো আর বনে ভেষজরাজি থাকতেও তাকে গ্রহণ করার যোগ্যতা কোথায়? তাই ব'লছি, প্রাচীনগণ ব'লতেন—

সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম।
(মহাভারত—বিদুরোক্তি)।

অর্থাৎ এই পৃথিবীটায় সোনার ফুল ফোটাতে পারে তেমন শক্তি আছে তিনজনের—(১) বীর (২) বুদ্ধিমান বিদ্বান আর (৩) যে ব্যক্তি গুণীজনের আনুগত্য ক'রে তথ্য জেনে নেয়। তাহ'লে এখন আমরা কোন্ পর্যায়ে থাকার উপযুক্ত?

CHEMICAL COMPOSITION

Oldenlandia corymbosa

Air dried plant contains :— Alkaloid 0.12%; biflorin; biflorone.
Stored plant contains :— Ursolic acid; sitosterol; ebanolic acid.

তাম্রকূট [তামাক]

এক ছিলিমে যেমন তেমন
দু' ছিলিমে তাজা।
তিন ছিলিমে নাজির-উজির
চার ছিলিমে রাজা॥

আমার কিশোর বয়সে খুড়োর কাছে শেখা; এ যেন সন্ত্ তুলসী দাসের দোঁহা এও কিন্তু তামাক, তবে "বড়"। এ রসে রসিক যিনি, তাঁর কাছে এ যেন হীরে।

আজ আমি লিখতে ব'সেছি তারই পাড়াপ'ড়শী এক ভাইয়ের চরিত্রের কথা। কিন্তু প্রথমেই তো মনে প'ড়ে গেল সেই দেবী ভাগবতের একটা কাহিনী; এটা আছে ৬ষ্ঠ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে। সেখানে জনমেজয় প্রশ্ন করছেন—হে মুনিবর! বশিষ্ঠকে বেশ্যাপুত্র কেন বলা হয়?

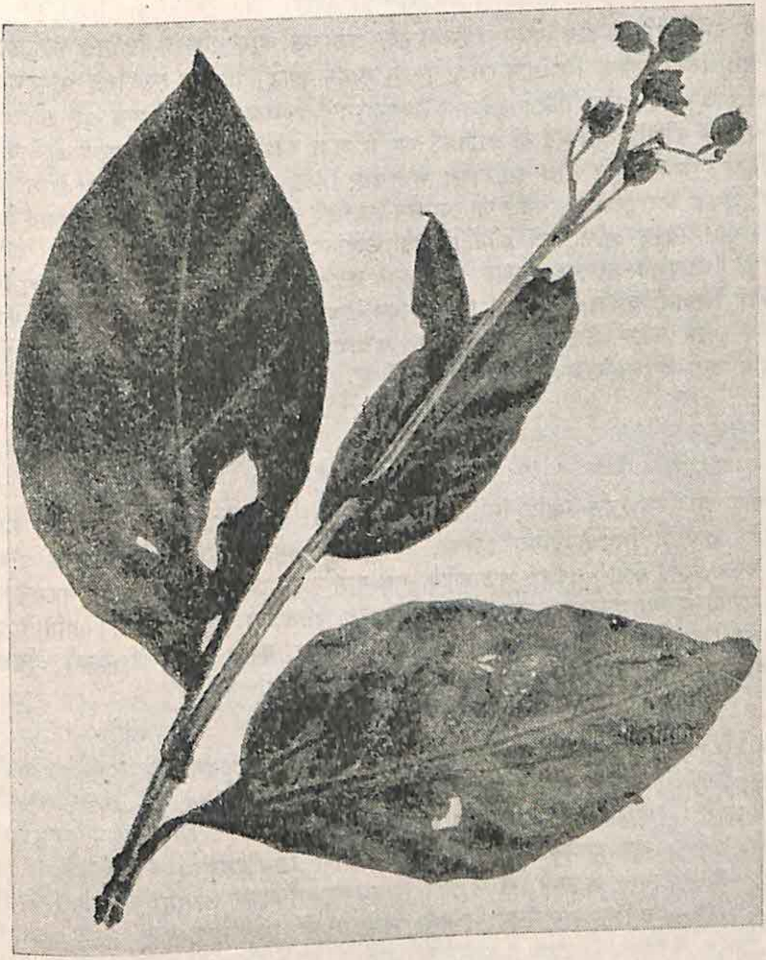
ব্যাসদেব উত্তর দিচ্ছেন—"প্রাচীনকালে ইক্ষ্বাকু নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ১২টি পুত্র। প্রথম পুত্র "নিমি", পরে তাঁরই নাম হ'য়েছিলো "বিদেহ"। এক সময় তিনি বহুকাল যজ্ঞ করার জন্য ইচ্ছা ক'রলেন। কুলগুরু ছিলেন বশিষ্ঠ, তাঁকে এবং আরও কয়েকজন ঋষিকে অনুরোধ ক'রলেন তাঁর এই যজ্ঞটি পূর্ণ ক'রতে। বশিষ্ঠ ব'ললেন, এখন আমি ইন্দ্রের যজ্ঞ ক'রতে ব্রতী হ'চ্ছি, আপনি অপেক্ষা করুন, পরে ক'রে দেবো। নিমি অপেক্ষা না ক'রে তাঁকে (বশিষ্ঠকে) বাদ দিয়ে অন্যান্যদের নিয়ে (গৌতম প্রভৃতি) যজ্ঞ ক'রছিলেন। ওই যজ্ঞের সময় একদিন বশিষ্ঠ এসে দেখলেন, কুলপুরোহিতের অপমান ক'রে নিমি যজ্ঞ ক'রছেন। খুব রেগে গিয়ে অভিশাপ দিলেন নিমিকে, সেই অভিশাপে তিনি হ'লেন বিদেহ; তাই শ্লোকাকারে বলা হ'য়েছে—

শাপং চ দত্তবান্ তস্মৈ রাজ্ঞে মন্যুবশং গতঃ।
বারিতোঽপি ময়া তস্মাদ্ বিদেহস্ত্বং ভবিষ্যসি॥

তারপর বশিষ্ঠের অভিশাপ শুনে নিমিও তাঁকে অভিশাপ দিলেন—

"তবাপিচ পতত্বদ্য দেহোঽয়ং ক্রোধসংযুতঃ।"

অর্থাৎ হে বশিষ্ঠ! তোমারও দেহ খ'সে প'ড়বে। উভয়েই শাপাশাপি ক'রে চিন্তিত হ'লেন।



তারপর বশিষ্ঠ গেলেন ব্রহ্মার কাছে একটা বিহিত ক'রতে। ব্রহ্মা ব'ললেন, বশিষ্ঠ! তুমি জ্ঞানবান বেদজ্ঞ সর্বজ্ঞ হ'য়েই থাকবে, তবে "মিত্রাবরুণের" দেহে প্রবেশ ক'রে স্বর্গবেশ্যা উর্বশীর গর্ভে তুমি জন্ম নেবে।

অতএব নিরুপায় বশিষ্ঠের জন্মান্তর হ'লো, মিত্রাবরুণের সংযোগে স্বর্গবেশ্যা উর্বশী গর্ভবতী হ'লেন। যমজ পুত্র হ'লো—একজনের নাম অগস্ত্য আর একজনের নাম

বশিষ্ঠ। তাঁদের আতুরঘরটি কুম্ভের আকার ব'লেই কুম্ভজন্মাও খ্যাতি তাঁদের। তাই শ্লোকাকারে বলা হ'য়েছে—

> তয়োস্তু পতিতং বীর্য্যং কুম্ভে দৈবাদনাবৃতে।
> তস্মাৎ জাতৌ মুনী রাজন্ দ্বাবেবাতি মনোহরৌ॥
> অগস্তিঃ প্রথম স্তত্র বশিষ্ঠশ্চাপরস্তথা।
> বেশ্যাপুত্র অতঃ শিষ্টঃ বশিষ্ঠঃ ঋষিরুত্তমঃ॥

এই কাহিনীটি স্মরণে এলো এইজন্য যে, এত বড় ঋষি বশিষ্ঠ, তিনিও ঘটনাক্রমে বেশ্যাপুত্র, কিন্তু তাতে কি এসে গেল, তিনি যেমন জ্ঞানী ছিলেন তেমনিই থাকলেন।

তা যাক্, এই কাহিনীটিকে এইজন্য উপস্থাপিত করলাম যে, আমাদের এই ভারতের গর্ভে তামাক বীজটি কবেকার বা কাদের? অর্থাৎ মূল বীজ কোন্ দেশ থেকে এসেছে—আমেরিকা? অথবা পর্তুগীজ (ত্রয়োদশ শতকের কিছু আগেই বা), কিম্বা গ্রীস্ বা ইতালী অথবা অন্য কোন দেশের? তা যেকোন দেশেরই বস্তু হোক না, সবারই ভাষায় তো Tobacco; কিন্তু প্রতিবেশী চীন দেশের ভাষানামের সঙ্গে প্রায় শ্রুতিসাম্য আছে "টাম্বাকু"। তারপর সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতরা তাকে সংস্কৃত ভাষার দ্বারা জলশুদ্ধি করে নাম দিলেন, অর্থাৎ বলা চলে যে, এ যেন এক জারজ সন্তানের জন্ম; কিন্তু তার গুণপনা দেখে তাকে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত ক'রলেন গুণীজ্ঞানীর দল। সোজাসুজি নামকরণ করা হ'লো তামকূট।

বৈদ্যকের নথি

শালিগ্রাম নিঘণ্টুতে (এটি নির্মিত হ'য়েছে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে) এই ভেষজের নাম তমাকু। তাছাড়া নিঘণ্টুরত্নাকর গ্রন্থেও এর উল্লেখ আছে (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থ) কিন্তু আর একটি কথা—পঞ্চদশ শতাব্দীর গ্রন্থ রাজনিঘণ্টুতে একটি ভেষজের নামোল্লেখ আছে, সেটি হ'লো ধূম্রপত্রা। তার রসগত বিচারে ব'লেছেন এটি তিক্তরস। এটি গুণে উষ্ণ এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে এটি শোথে, ক্রিমিতে, কাসে খুবই উপকারী; কিন্তু পরবর্তী যে শালিগ্রাম নিঘণ্টু, সেখানে বলা হ'য়েছে—

> তমাখুঃ পিত্তলস্তীক্ষ্ণশ্চোষ্ণো বস্তি-বিশোধনঃ
> মদকৃদ্ ভ্রামকস্তিক্তো দৃষ্টিমান্দ্যকরঃ সরঃ।
> বামকঃ কটুকোরুচ্যঃ বাতস্যানুবিলোমকঃ
> কফ-কাস-শ্বাস-কোষ্ঠ-বাতাংশ্চাপি ক্রিমীঞ্জয়েৎ।
> দন্ত-শুক্র-দৃষ্টি রুজো লিক্ষা-যূকাদিকান্ গদান্
> বৃশ্চিকাদি বিষং শোথং নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্॥

আরও পরবর্তীকালে এর অন্যবিধ যোজক যাঁরা, তাঁরা এর সঙ্গে যোজনা ক'রেছেন—

> কলঞ্জ সংবেষ্টন ধূমপানাৎ স্যাদ্দন্ত শুদ্ধির্মুখ রোগহানিঃ।
> কফঘ্নমাম জ্বরহানিকৃচ্চ গান্ধর্ববিদ্যা প্রবনৈক সেব্যম্॥

(সিদ্ধান্ত সারাবলী।)

এই শ্লোকগুলির অর্থ হ'লো—এর আর এক নাম কলঞ্জ, এর পাতা এবং শিকড় (মূল) পিত্তকর। তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বস্তিশোধক, মত্ততাকারক, তিক্তরস, বেশী ব্যবহার ক'রলে দৃষ্টিশক্তির হানি ঘটায়, এবং রোচক ও বমনকারী, তাছাড়া কটু ও রুচিকারক। তবে বায়ুর অনুলোম করে, কফ, কাস, শ্বাস, বাতরোগ দূর করে, কোষ্ঠের বায়ু, ক্রিমি দূর করে, দাঁতের রোগ, বিছার (বৃশ্চিক) বিষ, শোথ, দাঁতের মাড়ির ক্ষত দূর করে; এ ভিন্ন এর চূর্ণের নস্য গ্রহণে শিরোরোগ দূর হয়।

অন্য দৃষ্টিকোণে

অর্থাৎ এটি সত্যই কি জারজ? আরও একটু এগিয়ে দেখা যাক—আচ্ছা ভারতের যাঁরা আদিবাসী, যেমন ওরাং, মুন্ডা, সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি তাঁরাও কি বহির্ভারতের তামাক আসার পর তামাক পাতার ধোঁয়া টানা অথবা তামাক পাতা গালে রাখা শিখেছেন?

দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মদেশ তো এককালে ভারতেরই অংশ ছিল, সেখানে প্রাচীন দেশের এবং প্রাচীন বংশের আচার-অনুষ্ঠান যাঁরাই পালন ক'রে আসছেন (নূতন সংস্কৃতিতেও) তাঁরাও "বার্মা চুরুটের" ধূমপান ক'রে থাকেন। আচ্ছা, এইবার যদি বলি যে "চুরুট্টু" শব্দটি তো দ্রাবিড় গোষ্ঠীর তামিল ভাষা, কারণ তামিল ভাষার "ছুরুট্টু" শব্দই ভ্রংশ হ'য়ে চুরুট্ হ'য়েছে। পরে তারই অনুসরণে ইংরাজী নাম চুরুট্, এইজন্য ব'লছি যে, তামিল ভাষার "ছুরুট্টু" শব্দের অর্থ ধূমপানের জন্য শুক্নো (শুষ্ক) পাতার বাতি। ব্যবহারতঃ দেখা যায়, তামাক পাতাকে পাকিয়ে বাতির মত ক'রেই আগুন ধরিয়ে ধূমপান করার রীতি।

এরপর তৃতীয় যুক্তি—সিদ্ধান্ত সারাবলি গ্রন্থের শ্লোকের প্রথমেই বলা হ'য়েছে, "কলঞ্জ সংবেষ্টন ধূমপানাৎ", অর্থাৎ কলঞ্জপত্রকে বাতির মত পাকিয়ে নিয়ে ধূমপান। তাহ'লে এই কলঞ্জ শব্দের অর্থ কি? এই কলঞ্জ শব্দ কিন্তু নবীন নয়, অথর্ববেদেও আছে, ঋক্‌বেদেও আছে এবং যে কোন সংস্কৃত অভিধানেও আছে। সকলেই ব'লেছেন—

"কলঞ্জস্তু পরিমাণে, বিষদিগ্ধ মৃগে, বিষপত্রে চ"

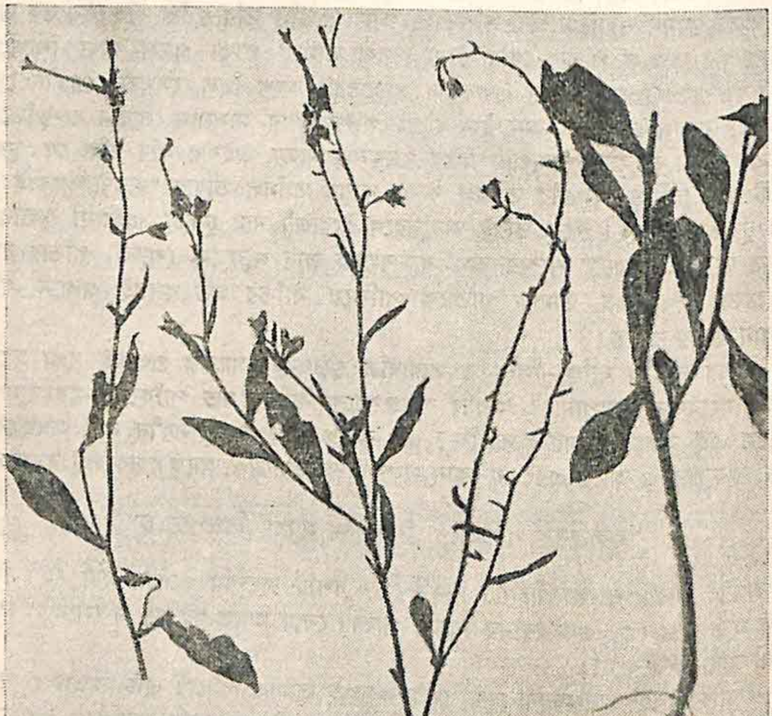
অর্থাৎ কলঞ্জ শব্দের তিনটি অর্থ—(১) দশটি রূপোর খণ্ডের মান (২) বিষাক্ত তীরে মৃত মৃগ (৩) এক ধরনের বিষাক্ত পাতা। বেদে আছে "কলঞ্জ ন সেবেত" অর্থাৎ কলঞ্জ সেবা ক'রবে না।

অধ্যাপক পরম্পরায় জানা যায়, সেই কলঞ্জই তামাক পাতা। এটি অত্যধিক তীক্ষ্ণ ও তীব্র রসসম্পন্ন, তবে এসব যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এটা সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া তো গেল না যে, তামাক পাতাই কলঞ্জ; তবে প্রাক্‌আর্য সভ্যতার কালে তামাক পাতা যে ভারতে (দ্রাবিড় সভ্যতার যুগে) ছিল, এটা ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, সুতরাং এটা যে বহির্ভারতীয়, এবং তাকে সমর্থন করার মত জোরালো যুক্তিতেও সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়, তবে বলা চলে এই তামাকপাতা দীর্ঘদিন ধ'রে রোগ প্রতিকারের ক্ষেত্রে যেসব লোকায়তিক যোগ ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে, সেগুলিকে পরে উপস্থাপিত ক'রবো।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— তিক্তরসবিশিষ্ট, এবং গুণগত স্বভাবে এটি উষ্ণ, এর কার্য অবসাদক, ক্রিমিনাশক, মৃদুবিরেচক, বমনকারক, পেটের বায়ু দূর করে এবং আক্ষেপ নিবারক।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ—এর শুক্‌নো (শুষ্ক) পাতা অত্যন্ত অবসাদক ও আক্ষেপ নিবারক। সাধারণ ব্যথা-বেদনা ও বাতজনিত ফোলায়, গর্মিরোগে ও চর্মগত ব্যাধিতে হিতকর। এর ধূম আক্ষেপযুক্ত হাঁপানিতে, কাসিতে ও কলেরা রোগে উপকারী। এছাড়া উক্ত ধূম স্নায়বিক উত্তেজনা আনে ও নিদ্রানাশ করে। ইহা কীটনাশক ঔষধ হিসেবেও কাজ করে। হুঁকোর জল মূত্রকারক। তামাকের অতিরিক্ত নস্য গ্রহণে হজমশক্তির হ্রাস পায় এবং অতিরিক্ত ধূমপানেও স্নায়ুমণ্ডলির দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য ও যকৃতের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়। এভিন্ন ঔষধার্থ তামাকের বাহ্য প্রয়োগও কম নয়, যেমন ধনুষ্টঙ্কার রোগে, মাংসপেশীর আক্ষেপে ও গাঁটের ফোলায় তামাক পাতার সেঁক হিতকর। এর সবুজপাতা থেঁতো করে অণ্ডকোষে লাগালে যন্ত্রণা ও তজ্জনিত শোথের (ফুলো)



Nicotiana plumbaginifolia

উপশম হয়। পাতার বোঁটা এরণ্ড তেলে ডুবিয়ে গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করালে ভাল বিরেচন হয়। এছাড়া এটা দাঁতের যন্ত্রণা ও তজ্জনিত শোথে হিতকর। হুঁকোর জল পুরাতন ক্ষতাদি ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। হুঁকোর কাইট্ চোখে লাগালে রাতকানা নিবারিত হয়। তবে বাংলায় এটা প্রচলিত নেই। পাতার ছাই ক্ষতনিবারক ও বিষনাশক ঔষধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরিচিতি

গুল্ম জাতীয় গাছ। শীতের পরে ফুল ও ফল হয়। মূলকাণ্ডের অগ্রভাগে পুষ্পগুচ্ছ হয়, পাতা বৃহৎ ও লম্বা, আকারে অনেকটা কদম (Anthocephalus indicus) পাতার মত, গায়ে সূক্ষ্ম কোমল রোমাবৃত। ফুলের গঠন অনেকটা কলকের মত কিন্তু মুখের অংশটি ৫ ভাগে বিভক্ত ও গোলাপী বর্ণের। বীজকোষে ছোট ছোট কালো বর্ণের অনেকগুলি বীজ থাকে, আকারে এরা পোস্তদানার মত, কোন কোন অঞ্চলে তার থেকেও ছোট হয়। সমগ্র ভারতে কেন, পৃথিবীর সর্বত্রই এর অল্পবিস্তর চাষ হচ্ছে। এর সংস্কৃত নাম তাম্রকূট, বাংলা নাম তামাক ও হিন্দীতে তামাকু নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Nicotiana tabacum Linn, ও ফ্যামিলি Solanaceae.

ব্যবহার্য অংশ— পাতা (কাঁচা ও শুষ্ক), কাণ্ড ও বীজ।

ব্যবহার্য অংশ—পাতা ও ডাঁটা

(ক) এক বৎসরের বেশী পুরানো তামাক কিছুটা হীনগুণ হয়। (খ) ঔষধার্থে প্রয়োগের দুই-তিন দিন পূর্বে তাকে ভাল ক'রে ধুয়ে, রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে, এবং সেইটাই ব্যবহার ক'রতে হবে।

লোকায়তিক যোগ

লোকায়তিক যোগগুলি লেখার পূর্বে একটু বক্তব্য রাখছি—

অধ্যাপক পরম্পরায় জানা যায় সেই কলঞ্জ দ্রব্যটিই তামাক (পাতা)। অত্যধিক তীক্ষ্ণ এবং তীব্র রসসম্পন্ন। এইসব যুক্তির উপস্থাপনার দ্বারা আমরা মনে করি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ছুরট্টু যে পত্রের ধূমপান সেটি আসে কি ক'রে। আর্য গোষ্ঠীর বংশধরগণ এদেশে আসার ঢের আগেই ওঁরা ছুরট্টুর স্বাদ জানেন, এবং ওই তামাক পাতা পাকিয়েই খেতেন। এখন এই তামাক পাতা যে কত প্রাচীনকাল থেকে এদেশের মুষ্টিযোগে কাজে লাগানো হ'য়েছে সেটা উপস্থাপিত ক'রছি।

১। **ক্রিমির উপদ্রবে—** (এটা বালক বা শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই ভাল) ধোয়া তামাক পাতাকে গুঁড়ো ক'রে নিয়ে, তা থেকে ১২৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় সকালের দিকে কিছু খাওয়ার পর অল্প গরম জলসহ খেতে হবে। তামাকে তৈরী কোন জিনিসের নেশা করা অভ্যাস যাঁদের নেই (যেমন সিগারেট, দোক্তাপাতা, বিড়ি, জর্দা, খৈনি প্রভৃতি) তাঁরা ১০০ মিলিগ্রাম মাত্রার বেশী খাবেন না, আর যাঁরা এসবে অভ্যস্ত, তাঁরা ওই মাত্রায় সকালে বৈকালে অল্প গরম জলসহ দু'বার খেতে পারেন। এর দ্বারা ক্রিমির উপদ্রব ক'মে তো যাবেই, অধিকন্তু ২।৩ দিনের মধ্যে ক্রিমি ম'রে মলের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে।

২। **এলার্জিতে—** একে আগন্তুক শোথও বলা যেতে পারে। যদিও শোথ মানে এলার্জি নয়, কিন্তু এক ধরনের এলার্জি হয়, তাতে সারা শরীর চিড়বিড় ক'রে, এবং দেহের উপরাংশে মশা কামড়ানোর মত ফুলে ওঠে এবং চুলকোতে থাকে। ওই সময় তিন ঘণ্টা অন্তর ৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় (আধ টিপ্ নস্যির মত) ঈষদুষ্ণ জলসহ দু'বার বা তিন বার খেতে হবে; এর দ্বারা ওটা সেরে যাবে।

৩। **অগ্নিমান্দ্যে—**(শ্লেষ্মাপ্রধান অগ্নিমান্দ্যে) এই রোগটির আসল স্বরূপ কি? কি কি ভাবে সে আত্মপ্রকাশ করে, সে সম্বন্ধে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩৩৬-৩৩৭

পৃষ্ঠায় বিশদ পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে, ওই সময় তামাকপাতা চূর্ণ ৭৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় ঈষদুষ্ণ জলসহ প্রত্যহ সকালের দিকে একবার এবং বৈকালের দিকে একবার খেতে হবে। এর দ্বারা দুই-চার দিনের মধ্যে অগ্নিবল ফিরে আসবে, তার ফলে অগ্নিমান্দ্য আর থাকবে না।

৪। **শ্বাস রোগে—** যে শ্বাস আমাশা সঞ্জাত শ্লেষ্মাপ্রাধান্যে আত্মপ্রকাশ করে, সেখানেই এটি ব্যবহার্য। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩৬০ পৃষ্ঠায় ও ৩৬১ পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে। সেখানে দেওয়া হ'য়েছে শ্বাসরোগের প্রকার ভেদ, কোন অবস্থায় কি নাম, কি কি তার লক্ষণ। উপরি উক্ত কারণে সঞ্জাত শ্বাসরোগে তামাকপাতা চূর্ণ ৭৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় ১ গ্রেণের একটু বেশী) ৩ ঘণ্টা অন্তর ঈষদুষ্ণ জলসহ প্রত্যহ একবার বা দু'বার খেতে হবে। এর দ্বারা শ্বাসকষ্টের একটু লাঘব হবে।

৫। **বাতের কষ্টে—** যাঁরা শ্লেষ্মাপ্রধান বাতে আক্রান্ত হ'য়ে থাকেন, তাঁদের দেহ কোথায় কোথায় আক্রান্ত হয় তার পরিচয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫৯ থেকে ৩৬২ পৃষ্ঠার মধ্যে রোগ পরিচিতিটি দেওয়া হ'য়েছে। ওগুলি দেখা দিলে তামাকপাতা চূর্ণ ১০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় ঈষদুষ্ণ জলসহ দিনে-রাতে ২ বা ৩ বার ক'রে খেতে হবে; এর দ্বারা ওই ধরনের বাতের কষ্টের লাঘব হবে।

বাহ্য ব্যবহার

৬। **চোখে ঝাপ্‌সা দেখায়—** এটা কেন হয়—সেটার এক কথায় উত্তর হ'লো, শ্লেষ্মাপ্রধান দেহে শ্লেষ্মার বিকার ঘটলেই হয়, তবে সে বিকারটা ঘটা চাই ঊর্ধ্ব-জত্রুতে, যাকে সহজে বোঝানো যাবে, সেটা হ'লো E.N.T. এলাকায়। ওই রোগগ্রস্ত হ'লে ধুয়ে শুকিয়ে রাখা তামাক পাতার (চূর্ণ করা নয়) ২-৩টি টুকরো চায়ের পাতার মত ২-৩ চা-চামচ জলে অন্ততঃ ৩-৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে, তারপর সেই জল ছেঁকে নিয়ে চোখে ফোঁটা দিতে হবে। দু-চার দিন দিলেই ওই অসুবিধেটা চ'লে যাবে। তবে এই ক্ষেত্রে লোকপ্রচলিত একটি মুষ্টিযোগ আছে, সেটা গ্রামাঞ্চলে এখনও প্রচলিত। সেটা হ'লো—প্রত্যহ সকালে "হুঁকোর জলে চোখ ধোওয়া"। তবে রোজই এ হুঁকোর জল বদলাতে হয়। এটা আমার চোখে দেখা—আমার পিতৃদেব তামাক খেতেন, প্রত্যহ সকালে ওই হুঁকোর জলে চোখ ধুতেন। যখন তাঁর বয়স ৮০ বৎসরের উপর তখনও খালি চোখে দেখতে পেতেন, তাঁর চোখের কোন অসুখ কোনদিন দেখিনি।

তবে আর একটা কথা জানিয়ে রাখি, হুঁকোর জল দু-চার দিন বদলানো না হ'লে, সে জল চোখে দিলে চোখ ভয়ঙ্কর জ্বালা করে। তবে আমার মনে হয়, তামাক পাতা জলে ভিজিয়ে চোখে দেওয়ার থেকে হুঁকোর জল চোখে দেওয়া আরও বেশী বিজ্ঞান-সম্মত।

৭। **উকুন হ'লে—** এ একটা উপদ্রব, এটা মাথায়, গায়ে ও অন্যান্য স্থানে হ'য়ে থাকে ও স্থানগুলি অপরিষ্কার রাখলে ওখানের ময়লা থেকেই উকুনের উৎপত্তি হয়; তারপর অন্য লোকের শরীর থেকে আর একজনের শরীরে এসে বাসা বাঁধে। ওইসব পোকা তাড়াতে তামাক পাতা ২-৩ গ্রাম সিকি কাপ জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে, ওটাকে ছেঁকে নিয়ে সেই জল মাথায় দিতে হবে। একদিন অন্তর কয়েকদিন দিলে উকুন ম'রে যায়।

৮। **বিছের বিষে—** যেকোন প্রকার বিষাক্ত পোকার কামড়ের জ্বালায় অথবা বিছে,

বোল্‌তা, ভীমরুলের হুলের জ্বালায় তামাক পাতা বেটে (এ পাতা ধোওয়ার দরকার নেই) অল্প গরম ক'রে ওখানে প্রলেপ দিতে হবে। কিছু সময়ের মধ্যেই জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হবে।

৯। **পচা ঘায়ের** (ক্ষতের) **রক্ত বন্ধ ক'রতে—** তামাক পাতা পুড়িয়ে ছাই ক'রে নিতে হবে, একটু তেল বা ঘি গরম ক'রে তার সঙ্গে ওই ছাই মিশিয়ে ঘায়ে লাগাতে হবে। এর দ্বারা ক্ষত থেকে রক্ত পড়াটা বন্ধ হবে এবং কোন পোকারও জন্ম হবে না।

নিবন্ধটি শেষ হ'লো; এখন ভাবছি, সরলা নাটকের শশিভূষণের শালা গদাধরচন্দ্রের সেই ডায়লগ্‌—"ডি-ডি ডি-ডি (দিদি) আমি ডুডুও (দুধও) খাবো টামুকও খাবো।"

বর্তমান যুগের বৈদ্যকগোষ্ঠী, আমরা প্রমাদ গুনছি, যেহেতু আয়ুর্বেদের মৌলচিকিৎসার ধারা থেকে স'রে এসে আমরা লাক্ষণিক চিকিৎসাকে প্রাধান্য দিচ্ছি, অথচ রোগমুক্ত করার হাতিয়ার সীমিত; তাও আবার ভোঁতা (ধার নেই)। অথচ ধার দেওয়ার টেক্‌নিক্‌ও আমাদের জানা নেই বা জানা হয়নি; আর এ শূন্যতা পূরে উঠতে যে নিষ্ঠার দরকার সেটারও অভাব যে নেই, সেটার প্রমাণও আমরা দিতে পারছি না—তাই মাঝে মাঝে বড়টাকে (তামাক) ভজনা ক'রে, চোখ লাল ক'রে জিগির তুলি—"আমাদের সব আছে" (নেই কেবল আমি)।

CHEMICAL COMPOSITION

Nicotiana tabacum Linn.

Tobacco contains :— moisture 10.15%; carbohydrates 25.50%; alkaloids; proteins; organic acids 20%; polyphenols; carotenoids; enzymes; resins and minerals.
Carbohydrates :— reducing sugar, sucrose; starch, pectins; cellulose; lignin; pentose; dextrin; maltose; stachyose; raffinose; rhamnose; ribose; inositol and sarbitol.
Alkaloids :— nicotine, nicotimine; nicoteine; analcasine and nornicotin.
Proteins :— auxin; alanine; γ-aminobutyric acid; asparagine; aspertic acid; glutamine; lysine; serine; proline; phenyl alamine; tyrosine and tryptophan.
Caratenoids :— B-carotene; neo-B-carotene; lutein and neoxanthin.

লোণিকা

"খেদাই নে, তোর উঠোন চষি"—ব'লে দেশগাঁয়ে একটা কথা চালু আছে; এটাকে সাধুভাষায় ব'ললে এটাই হয় যে, তোকে তাড়াচ্ছি না, তবে তোর উঠোনটা চ'ষে দিচ্ছি।

আধুনিককালের শহর দিল্লী আর বোম্বাই প্রায় সেই এক্তিয়ারেই যায় নাকি? এখানে গরীবের থাকার পরিবেশ কি আছে? কারণ, চাই গাড়ী-বাড়ী, তাছাড়া লেখাপড়া শিখতে গেলে স্কুলে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে আসতে কেতা-দুরস্ত হ'য়ে চ'লতে হয়, এবং তা ক'রতে হ'লেও সেখানকার নিয়ম মাফিক চ'লতে গেলে যে মালকড়ির দরকার, সেটা গরীবের চিন্তার বাইরেই নয় কি? তাই এখানে কোটি বা লক্ষপতিদের বিচরণভূমি ধ'রে নেওয়া কি অন্যায় হবে?

এ বক্তব্য আজকের নয়—যখন থেকে রাজতন্ত্র চালু হ'য়েছে, তখনও এর ছোঁয়াচ যে লাগেনি তাই বা বলি কি ক'রে!

এমনি একটি হুকুমনামা এক স্বৈরাচারী রাজার কালে দেওয়া হয়েছিলো বলেই কি এক কবি রহস ক'রে লিখেছিলেন—ওহে রাজন! আপনি যে ব'লেছেন আমার এখানে কোটিপতি ছাড়া কেউ থাকবে না, তা আমিও তো কোটিপতি, তাহ'লে এ ভূমি ছেড়ে দূরে যাব কেন? তার প্রমাণ হ'লো—

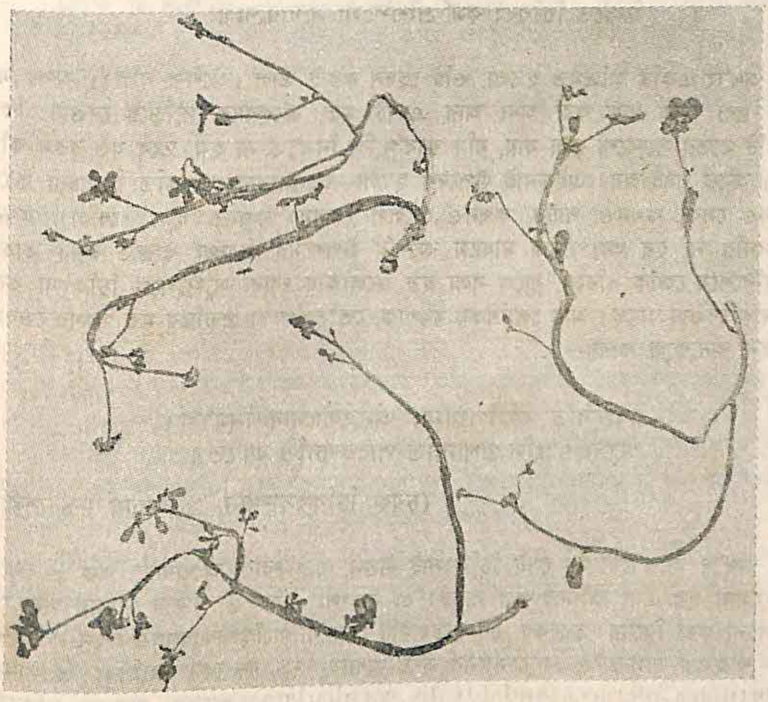
> বাট্যাং বাট্যাল কোটি গৃহশরণিকা লোণিকা কোটিসংখ্যা
> কোটির্গণ্ডূপদীনাং মম গৃহ পটলে মৃক কোটিঃ কবর্য্যাম্।
> অঙ্গে বিস্ফোটকোটিঃ কটিতট বিলসৎ কর্পটে গ্রন্থিকোটিঃ
> রাজন? কোটীশ্বরোঽহম্ কথয় চ কিমতো দূরমন্যত্র যামি॥

অর্থাৎ আমার বাড়ির চারিদিকে এককোটি বেড়েলা গাছ আছে, আর বাড়িটিকে

আশ্রয় করে আছে কোটি সংখ্যক লোণিকা শাক, উঠোনে ঘ্রে বেড়ায় কোটি ভেক (ব্যাঙ), আমার পত্নীর কোমরে আছে কোটিগ্রন্থির বস্ত্রখণ্ড, মাথার চুলে আছে কোটি সংখ্যক উকুন, তারপর গায়ে আছে কোটি সংখ্যক খোসপাঁচড়া—ওহে রাজন! আপনিও বলুন, এমন কোটিপতি এখানে আর ক'জন আছে? তাহ'লে আমি কেন যাবো এ ভূমি ছেড়ে?

শহরে থাকা কবির দারিদ্র্য বর্ণনা চরম হ'লেও সে বর্ণনার মধ্যে দুটি অপূর্ব ভেষজের উল্লেখও দেখতে পাই—একটি বেড়েলা (Sida cordifolia) আর একটি লোণিকা শাক।

এই দ্বিতীয়টি নিয়েই আমার আরব্ধ বক্তব্য। প্রথমটির বিস্তৃত উল্লেখ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪১ পৃষ্ঠায় করা হ'য়েছে। এই নিবন্ধোক্ত ভেষজটিও একটি মূল্যবান ভেষজ। বৈদিকদের সমীক্ষার কালে এটি অন্য নামে পরিচিত ছিল কিনা আমাদের সমীক্ষায় ধরা পড়েনি, তবে চরক সুশ্রুতের যুগে যে এটি সমীক্ষিত হ'য়েছে তার প্রমাণ আমরা উপস্থাপিত ক'রছি।



বৈদ্যকের নথি

এই শাক সম্পর্কে সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ে ২৯০ শ্লোকে বলা হ'য়েছে, লোণিকা এবং আরও কয়েকটি শাকের রস লবণানুগ, সক্ষার, তাই বাতকারক, কিন্তু এই শাকের প্রকৃতিই এমনি যে, এগুলি সারক অর্থাৎ—

মলাদিকমবদ্ধং যদ্ বদ্ধং বা পিণ্ডিতং মলৈঃ
ভিত্ত্বাধঃ পাতয়তি-যৎ-তৎ ভেদনম্ ॥

অর্থাৎ যে দ্রব্যটি গড়্‌লে মলকে অধঃপাতিত করে সেটি ভেদক দ্রব্য। আর যেটি,

বিপক্কং যদপক্কং বা মলাদি দ্রবতাং নয়েৎ।
রেচয়ত্যপি তজ্‌ জ্ঞেয়ং সারকো রেচনং তথা॥

অর্থাৎ যে দ্রব্য পক্ক অথবা অপক্ক মলকে তরল ক'রে অধোনিঃসৃত ক'রে দেয় তাকেই বলা হয় রেচক বা সারক। চরক সংহিতায় এই লোণিকা শাককে অর্শোরোগে ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে, "সুবর্চলাং সলোণিকাং" (চরক চিঃ ৯ অধ্যায় ৮৪ শেলাক)। অর্শোরোগের চিকিৎসায় চরকের বক্তব্য হ'লো—

তত্রায়ুরেকে শস্ত্রেণ কর্ত্তনং হিতমর্শসাম্‌।
দাহং ক্ষারেণ চাপ্যেকে দাহমেকে তথাগ্নিনা॥
ক্রিয়তে ত্রিবিধং কর্ম ভ্রংশস্তস্য সুদারুণঃ॥

অর্থাৎ একটি অভিমত হ'লো, ওটি ছেদন করাই ভাল (অর্শের বলি)। অপর মত, ক্ষার দ্রব্য দিয়ে দাহ করা/অন্য আর একটি মত, একেবারে পুড়িয়ে দেওয়া, কিন্তু তিনটি মতের সম্বন্ধে বলা যায়, যদি কার্যগুলি নিখুঁত না হয়, তবে যত রকম কঠিন রোগ আছে সবই হয়। এইজন্যই উপদেশ হ'লো—অর্শোরোগের প্রকৃতি বিবেচনা ক'রেই কখনও সেক, কখনও পাচন, কখনও প্রলেপ (মলম) কখনও ধূপ (ধোঁয়া), কখনও পিচকারি না হয় অন্নপথ্যের মাধ্যমে অর্শের উপশমের ব্যবস্থা ক'রতে হয়। তাছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে জোঁক ধরিয়ে, যাকে বলা হয় জলৌকার দ্বারা সুষ্ঠুপথে চিকিৎসা করার নির্দেশ দেওয়া আছে। আর লোণিকা, যবশাক, তেঁতুলপাতা প্রভৃতির মত সক্ষার ভেষজও এখানে অনুকূল কারণ—

বিড়্‌বাত কফপিত্তানাং অনুলোম্যেন নির্মলে।
গুদেঽর্শাংসি প্রশাম্যতি পাবকশ্চাভি বর্ধতে॥

(চরক চিকিৎসাস্থান, ৯ অধ্যায় ৮১ শেলাক)

অর্থাৎ অর্শোরোগের সেই চিকিৎসাই উত্তম, যার দ্বারা অধোবায়ু, কফ ও পিত্তের অনুলোম হয় এবং অগ্নির বল বাড়ে। এ ব্যবস্থা ঔষধ ও পথ্যের মাধ্যমে সমভাবেই বিবেচনা করা বিধেয়। চরকের এই মতবাদটি অন্যান্য সংহিতাকারগণও গ্রহণ ক'রেছেন। ষষ্ঠ শতকের বাগ্‌ভটও (সূত্রস্থানের ষষ্ঠ অধ্যায়, ৭৯ শেলাক) লোণিকা ও আমরুল (Portulaca oleracea and Oxalis corniculata) শাকের ব্যবহার সম্পর্কেও বলেছেন যে, এক্ষেত্রে এই দুটি শাক খুবই যোগ্য। তাছাড়া ঐ বাগ্‌ভটের চিকিৎসাস্থানের অষ্টম অধ্যায়ের ১৬১ শেলাকে ব'লেছেন—

অর্শোঽতিসার গ্রহণীবিকারাঃ প্রায়েণ চান্যোন্য নিদানভূতা।
সন্নেঽনলে সন্তি ন সন্তি দীপ্তে রক্ষে দতস্তেষু বিশেষতোঽগ্নিম্‌॥

অর্থাৎ অর্শ (পাইলস্‌), অতিসার (ডিসেন্‌ট্রী) এবং গ্রহণী (কোলাইটিস্‌) এই তিনটি রোগ এমনি যে, এ ওকে জন্ম দেয়, ও ওকে উৎপাদন করে। তিনটিরই কারণ

এমনও হয় যে, পাচকাগ্নি অবসন্ন হ'লেও তারা আসে।

ভাবমিশ্রের সমীক্ষা

ষোড়শ শতকে আয়ুর্বেদগ্রন্থ সংকলয়িতা ভাবমিশ্র, যাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ভাবপ্রকাশ"— তিনি উপরিউক্ত মতবাদকে সমীক্ষা ক'রে ভৈষজ্য বিচার ক'রেছেন, সেটা উল্লেখিত আছে পূর্বখন্ডের প্রথম ভাগে—

লোণা বা লোণিকা চৈব বৃহৎ লোণীতি সামতা।
সা চ রূক্ষা স্মৃতা গুর্ব্বী বাতশ্লেষ্মহরী পটুঃ।
অর্শোঘ্নী দীপনী চাম্লা মন্দাগ্নি বিষনাশিনী॥

অর্থাৎ যে শাকটির নাম লোণী অথবা লোণিকা অথবা কারোর ভাষায় বৃহল্লোণী, সেটি স্বভাবতঃ একটু গুরুপাক, এবং রূক্ষ কিন্তু বাতশ্লেষ্ম রোগ দূর করায় খুব পটু। তবে এটা ঠিক যে এই শাকটি অর্শোরোগ দূর করে, অগ্নির উদ্দীপন করে, এবং মন্দাগ্নি ও বিষরোগ (খাদ্যের বিষক্রিয়া ও বিষ, আবার চর্মে আগন্তুক বিষস্পর্শও (বিষ রোগ) দূর করে।

এইসব প্রামাণ্য উক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে বাংলার প্রাচীন বৈদ্যগণ যেসব লোকায়তিক যোগ লিপিবদ্ধ ক'রেছেন সেগুলিও খুবই মূল্যবান। এসব যথাসময়ে গোচরীভূত করা হবে।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ—ইহা শীতগুণসম্পন্ন ও দেহের কোমলতাকারক, স্বাদে ঈষৎ লবণাক্ত, বাত-পিত্ত নাশক, ক্ষুধাবর্ধক, ধারক ও মূত্রকারক।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— পাতার রস পিত্তবিকৃতিতে, তৃষ্ণা নিবারণে, বমনরোধে, রক্তোৎ-কাসে ও প্লীহাযকৃতের পক্ষে হিতকর। এভিন্ন উক্ত পাতা ইন্দোচীন ও নাইজেরিয়াতে সাধারণ ফোলা নিবারণের জন্য বাহ্য প্রয়োগ দেখা যায়।

কচিকান্ডের রস সাধারণ ক্ষতে, হাঁপানীতে, মূত্ররোগে, চর্মগত ব্যাধিতে ও রক্তাতি-সারে হিতকর। এছাড়া কচি কান্ডের রস হাত-পায়ের জ্বালায় ও বিষাক্ত কীটাদির হুল্ ফটুলে সেইক্ষেত্রে লাগালেও উপকার পাওয়া যায়।

বীজ ক্রিমিনাশক। কারো কারো মতে উক্ত বীজ স্কার্ভিরোগে, যকৃতের পীড়ায়, গণোরিয়া রোগে ও রক্তোৎকাসে হিতকর। এটি স্নিগ্ধকারকও বটে, তাই জামাইকা দেশে অতিরিক্ত গরম নিবারণের জন্য এর সেবনের বিধি আছে।

পরিচিতি

হিমালয়ের ৫০০০ ফুট উঁচু পর্যন্ত স্থানে এবং ভারতের সর্বত্র অলপবিস্তর জন্মে। সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পতিত জমিতে, খালের ধারে হয়ে থাকে। বর্ষজীবী রসাল গুল্ম। কান্ড ১০/১২ ইঞ্চি হয়, কান্ড থেকে সরু ছোট ছোট শাখা বেরোয়। সমগ্র কান্ড ও শাখা-প্রশাখা লালচে। পাতা পরস্পর বিপরীত দিকে সমান্তরালভাবে

থাকে, পাতা সরু, ১—১½ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতার মাথার দিকটা গোলাকার, বোঁটার দিকটা ক্রমশঃ সরু। ছোট ছোট ফুলগুলি পাতার কোলে লেপটে থাকে, সাধারণতঃ বর্ষাকালে দেখা যায়, তারপর ফল, পাকে শীতকালে। ফলের মধ্যে কালো রঙের বহু বীজ থাকে।

এটিকে সংস্কৃতে লোণিকা, বাংলায় বড় লোনিয়া, বড় নুনিয়া, মেদিনীপুরের অঞ্চল বিশেষে নুনিয়া, হিন্দীতে খুরসা, কুল্‌ফা, উড়িষ্যার অঞ্চল বিশেষে পুরনিশাক বলে। এর বোটানিক্যাল নাম Portulaca oleracea Linn. বলে। ফ্যামিলি Portulacaceae. এছাড়া আকারে ছোট এক প্রকারের লোণিকা পাওয়া যায়, সেটির গাঁটে গাঁটে শিকড় বেরোয়, এর বোটানিক্যাল নাম Portulaca quadrifida Linn.

ঔষধার্থে ব্যবহার্য অংশ—সমগ্র গাছ ও বীজ।

লোকায়তিক যোগ

১। **তোতলামিতে—** সব তোতলামি এক জাগয়া থেকে হয় না অর্থাৎ মুখে সব বর্ণ তো এক জায়গা থেকে উচ্চারিত হয় না, যেমন কতকগুলি আছে ওষ্ঠ বর্ণ, ঠোঁট যদি না থাকে, তবে সেটা উচ্চারণ করা যায় না; কতকগুলি আছে দন্ত্যবর্ণ, সেগুলি দাঁত না থাকলে উচ্চারণ স্পষ্ট বেরোয় না; কতকগুলি আছে মূর্ধা বর্ণ, সেগুলি জিহ্বা মূলীয় বর্ণ বিসর্গ, ছ, জ, এইসবে আটকে যায়, থেকে থেকে উচ্চারিত হয়; এই ধরনের বর্ণ যাঁদের আটকে যায়, তাঁরা যদি এই নুনে শাকের রস ২ চা-চামচ মুখে ধ'রে খানিকক্ষণ ক'রে ব'সে থাকেন, তাহ'লে উচ্চারণে ঐ বর্ণটা আটকাবে না। তবে এটা করা যদি অসুবিধে মনে হয়, তাহ'লে প্রত্যহ খানিকক্ষণ ক'রে নুনেশাক চিবিয়ে ফেলে দিলেও একই কাজ হবে, রসটা গলাধঃকরণ করলে ক্ষতি নেই। এইভাবে অন্ততঃ মাসখানেক ক'রলে জিহ্বামূলের ওই জড়তাটা কেটে যাবে এবং কথাটাও পরিষ্কার হবে।

২। **প্রমেহ রোগে—** প্রমেহ তো এক প্রকার নয়, ২০ প্রকার, তবে সব প্রমেহের একটি লক্ষণ প্রায় সমান—প্রস্রাবটা ঘোলাটে হবে ও পিপাসা থাকবে। এসব ক্ষেত্রে নুনেশাক ১০ গ্রাম ৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ২ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, ঠান্ডা হলে সকালে ও বৈকালে দু'বারে ওটাকে খেতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—উপরিউক্ত অসুবিধেগুলি চলে যায়। যেসব ক্ষেত্রে রক্তে সোমধাতুর বিকৃতি যোগ (Blood sugar) আছে, সেসব ক্ষেত্রে যে যে উপসর্গ দেখা যায়, যেমন অধিক পিপাসা, হঠাৎ কেটে-ছিঁড়ে গেলে শুকোতে চায় না, সেগুলিরও উপশম হয়। বর্তমানে নব্য-বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করা প্রয়োজন—নুনেশাক ব্যবহার করলে রক্তে অর্থাৎ শোনিত-সোমের যোগ হলে তা স্বাভাবিক হয় কিনা এবং মধুমেহ (Diabetes Mellitus) রোগ সারবে কিনা।

৩। **শিশুদের কাসিতে—** নুনে শাকের রস একটু গরম ক'রে ঠান্ডা হলে সেই রস ১০/১৫ ফোঁটা ও মধু ৪/৫ ফোঁটা একত্রে মিশিয়ে সারাদিনে ২/৩ বার খাওয়ালে ২/১ দিনের মধ্যেই অনেকটা উপশম হবে, কয়েকদিন খাওয়ালে ওটা আর থাকবে না।

৪। **শিশুদের অতিসারে ও আমাশায়—** শিশুদের দুধ খাওয়া বয়সে, তা মায়ের দুধ হোক্ আর বেবীফুডেই হোক্, পেটের দোষ মাঝে মধ্যে দেখা দেয়। যেসব শিশু মায়ের দুধ খায়, সেক্ষেত্রে মায়ের অতিসার, আমাশা বা অম্ল হ'লে তার দ্বারা সন্তানও সে দোষে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, সেও অতিসার, আমাশা বা অম্ল রোগগ্রস্ত হয়; আবার স্তন্য ছাড়ার বয়সে ও দাঁত ওঠার সময়েও পেটের দোষ প্রায় হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে পাতলা দাস্ত, ছাড়া ছাড়া মল, মলের রঙ কখনো সাদাটে, কখনো বা হলদে,

তার সঙ্গে আম থাকে, পেটেও বায়ু জমে। তখন নুনেশাকের রস অল্প একটু গরম ক'রে ঠাণ্ডা হলে বয়সানুপাতে ৫—১৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ২।৪ ফোঁটা মধুসহ খাওয়ালে ধীরে ধীরে পেটের দোষটা চলে যায়।

বাহ্য-প্রয়োগ

৫। **চোখ উঠায়—** একে আয়ুর্বেদ মতে 'নেত্রাভিষ্যন্দ' বলা হয়। এতে চোখ লাল হয়, করকর করে, জল পড়ে, চুলকোয় এবং চোখটা ফুলে যায়। এক্ষেত্রে নুনেশাক থে'তলে ন্যাকড়ায় পুঁটুলি ক'রে সেই পুঁটুলিটা দিয়ে চোখ মুছলে চোখ উঠার উপশম হয়। যেক্ষেত্রে চোখ খুব লাল হয়, সেক্ষেত্রে নুনেশাকের স্বচ্ছ রস ১ ফোঁটা ড্রপারে ক'রে প্রত্যহ একবার চোখে দিলে ২/৩ দিনের মধ্যেই উপশম হবে। অনেক ক্ষেত্রে চোখ রগড়ানোর ফলে চোখের পাতা লাল হয়ে ফুলে যায়, এটা শিশু ও কিশোরদের বেলায় বেশী ঘটে, এ অবস্থায় নুনেশাক বেটে অল্প গরম ক'রে চোখের উপর ও নিচে প্রলেপ দিলে ওটা চলে যায়। তবে প্রলেপ দেওয়ার অসুবিধা থাকলে নুনেশাকের রস বের ক'রে সেটাকে অল্প গরম ক'রে ন্যাকড়ায় ভিজিয়ে বার বার ঐ স্থানগুলোতে লাগাতে হবে।

৬। **বিষাক্ত পোকামাকড়ের বিষে—** বোলতা বা মৌমাছি হুল ফোটালে, পি'পড়ে কামড়ালে এবং শুঁয়োপোকা লাগলে যে যন্ত্রণা হয় এবং ফুলে যায়, সেসব ক্ষেত্রে নুনেশাক বেটে অল্প গরম ক'রে প্রলেপ দিলে ওসবের উপশম হবে। তবে ভীমরুল বা কাঁকড়া বিছের বেলায় এটা কতটা কাজ করবে, সেটা কিন্তু পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

৭। **বিছুটি লাগলে—** এমন ধরনের যদি কোন ফলের বা পাতার রোঁয়া গায়ে লেগে ফুলে ওঠে এবং চুলকোয়, সেক্ষেত্রে নুনেশাক বেটে একটু গরম ক'রে লাগালেও ফুলো এবং জ্বালা দু'টোরই উপশম হবে।

নিবন্ধটা শেষ করার সময় ভাবছি—এত তো লিখছি, শেষকালে এটা সেই টেষ্ট-টিউবের বেবীর পর্যায়ে প'ড়ে যাবে না তো? কারণ, জনপদে বনসম্পদ যদি ধ্বংস হ'য়ে যায়, তাহ'লে নুনেশাককে আর খুঁজে পাওয়া যাবে? মনে পড়লো একদিন এক বাবাজীকে জিজ্ঞেস করা হ'য়েছিলো—তোমার ছেলেপুলে কয়টি? উত্তরে ব'লেছিল—ও বাব্বা,—হ্যাঁপা সামলায় কে? তাই ওদিকে আগড় দিইছি।

যেভাবে জঙ্গল ধ্বংস হ'য়ে জনপদ গ'ড়ে উঠছে, তাতে অদূরে ভবিষ্যতে এই বনৌষধির কুলুচিনামা ভৃগুর বিচারের ছকের মত হ'য়েই রইবে।

CHEMICAL COMPOSITION

Pertulaoa oleraceae

1. (a) Protein 2.4%, (b) Ether extract 0.6%, (c) crude fibre 1.3%, (d) carbohydrates 2.9%, (e) Moisture 90.5%, (f) Mineral matter 2.3% [calcium, magnesium, sodium, potassium and copper], (g) Sulphur 63%, (h) chlorine 63%. 2. Vitamins (mg/100 g) : (a) Thiamine 0.10. (b) Riboflavin 0.22, (c) Nicotinic acid 0.7, (d) vitamin C 29. 3. l-noradrenaline dopamine [4(2-aminoethyl) pyrocatechol] 4. DOPA [3(3, 4-dihydroxyphenyl) alanine]. 5. Unidentified catechol.

বার্তাকু [বেগুন]

"বলা মুখ আর চলা পা" সবই এগিয়ে যায় প্রদেশ থেকে দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে। দেশান্তরে গেলেই প্রাকৃতিক অবস্থানও বদলে যায়, যার জন্য ফিজিওলজিকাল পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ দৈহিক গঠনেরও তারতম্য ঘটে, তার জন্য উচ্চারণেরও পার্থক্য হ'তে বাধ্য।

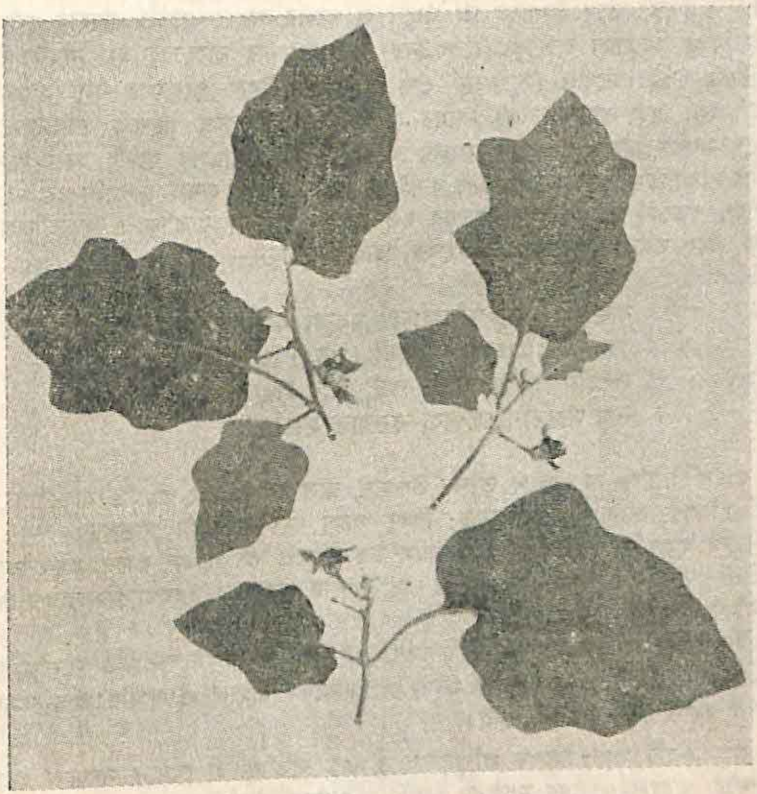
আপনি দুই/এক পুরুষ আসামে থাকুন, তারপর দেখবেন আপনার সন্তানদের এই নদীয়া শান্তিপুরের আখের টিক্‌লির মত মিষ্টি কথা আর বেরুচ্ছে না, তখন জিভ মোটা হ'য়ে গিয়ে গোটা সুপারি গালে রেখে কথা কইলে যে রকম উচ্চারণ হয়, সেইরকম হ'য়ে বেরুচ্ছে।

এ তো গেল উচ্চারণের পরিবর্তন, সেটা তো প্রকৃতিগত। আর দ্বিতীয়তঃ বৈদিক ভাষার কোনটা ভেঙ্গে, কোনটা জুড়ে যে একটা পদ্ধতি ও সুসংস্কৃত ভাষা জন্ম নিয়েছিল, সে হ'লো সংস্কৃত; আর সেটাকে ধ'রে রাখার মত অধ্যবসায়ও মানুষের যেমন থাকছে না এবং নেইও, সেইরকম মগজে ধ'রে রাখার ক্ষমতাও হ্রাস হ'য়েছে। তাই ভাষার সৌকর্যও নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। তাই না বিদ্যাসাগর মহাশয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ব'লেছিলেন—ও'হো, তুমিও লিখেছ—"এ কার্য করিতে আমি সক্ষম নহি"। কেন? "সমর্থ নহি" একথা লেখাই কি উচিত ছিল না? ক্ষমার সহিত বর্তমান থাকলেই সক্ষম হয়—তাই তিনি এই গলদটা ধ'রে দিলেন। এই রকম "উচ্চার" শব্দের একটি অর্থ বিষ্ঠা, যদি বলা যায়—তিনি এ বিষয়ে "সোচ্চার" হইলেন, তাহ'লে সেটা পণ্ডিতি বিচারে কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো?

এমনি অনেক শব্দ আমাদের কাছে সচল হ'য়ে যায়, যার প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিচারে তার কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই যেমন সৌহার্দ, সার্বজনীন এই রকম অনেক প্রচলিত শব্দ পণ্ডিতি গাড্ডায় প'ড়ে আছে।

তাই বলছি এককালে এই বার্তা তো ছিল "সমাচারের" আদি রূপ, আবার অ-রোগেরও মান্যভাষা ছিল "বার্তাক", কালে ঐ বার্তাক এই শব্দটির পিছুতে একটি স্বরবর্ণ "উ" গ্রস্ত হ'য়ে সেটা হ'য়ে গিয়েছে "বার্তাকু"।

আজ অরোগ কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, তার স্থলে এসেছে "আরোগ্য"। এখন পন্ডিতি ভাষ্য হ'লো, রোগাভাব তো অরোগ? তাহ'লে আরোগ্য এর অর্থ কি হবে? রোগমুক্তির প্রতিশব্দ কি আরোগ্য হয়? আর বার্তাক বা বার্তাকু ব'ললে কে বুঝছে অরোগ? সবাই বোঝে বার্তাক বা বার্তাকু মানে বেগুন।



এখন যাঁরা আরবি, ফারসি বা উর্দু শব্দ একটু-আধটু রপ্ত ক'রেছেন, তাঁরা কি ব'লবেন না যে, যার কোন গুণ নেই সেইই বেগুন! যদিও এখানে ণ ও ন এই দুটি বর্ণের ফারাক আছে। এখানে না হয় বর্ণের পার্থক্য আছে, কিন্তু যেখানে বে-হায়া, বে-আদব, বেদানা এই রকমই! কিন্তু আয়ুর্বেদ বিচারক গোষ্ঠীর সমীক্ষায় এটি রোগহর সমীক্ষিত হ'য়ে তবেই না তাঁদের সংহিতাগ্রন্থ চরক-সুশ্রুতে তাকে স্থান দেওয়া হ'য়েছে।

বৈদ্যকের নথি

বে-গুণ নয় তার নজির

চরক সংহিতার সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে এটি দু'বার উল্লেখিত হ'য়েছে, এর দোষ-

গুণ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্র। উভয় স্থানে বলা হ'য়েছে—এই ফল বাতঘ্ন এবং জঠরাগ্নির দীপক।

তারপর সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের ২৮২ শ্লোকে বলা হ'য়েছে—বার্তাক বা বার্তাকু ফল কফ এবং বায়ু বিকারে হিতকর, রুচিকর ও অগ্নিদীপক; তাছাড়া বিশেষ উক্তি—ফলটির পক্কাবস্থায় ক্ষারধর্মিতাও হয় এবং পিত্তবর্ধকও। যাঁরা মনে করেন এই বার্তাক বা বার্তাকু ফলটি প্রকৃতপক্ষে বৃহতীর ফলকে (Solanum indicum) বোঝাতেই এই উক্তি—তাঁদের সেই সন্দেহ দূর করার জন্য ২৮০ শ্লোকে পূর্বেই বলা আছে—বৃহতীফলের নাম বার্তাকু থাকলে অবশ্য বুঝতে হবে, ও ফলের রস কটু (ঝাল) ও তিক্ত। তবে বিপাকে তা লঘু। ও ফলের পক্কাবস্থাতেও ব্যবহার যোগ্যতা আছে কিন্তু আলোচ্য বার্তাকুর (বেগুনের) সে অবস্থায় ব্যবহারই হয় না। তাছাড়া বাগ্‌ভটের উক্তির মধ্যেও (সূত্রস্থান ৬ষ্ঠ অধ্যায়) দুইবার পরিষ্কার বলা হ'য়েছে—বৃহতী ফল এবং বার্তাকু এক নামের হ'লেও এবং উভয়ের পত্রশাক প্রায় সমদোষ সমগুণ সম্পন্ন হ'লেও উভয়ের ফলের রসের দোষগুণ বিশেষ ধর্মের জন্য পৃথক; তথাপি সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ যদিই বা থাকে, তাদের জন্যই চক্রপাণি দত্ত মহাশয় (একাদশ শতকে) তাঁর দ্রব্যগুণ গ্রন্থের ২৬ ও ২৭ শ্লোকে বার্তাকু ও বৃহতীফল যে পৃথক এবং তাদের দোষগুণ যে পৃথক, তাই ব'লেছেন—

বার্ত্তাকং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণং মধুরং কফবাতজিৎ।
রোচনং বহ্নিজননং জীর্ণং (পক্কং) চ পিত্তলং মতম্॥
ফলানি বৃহতীনাং তু কটু তিক্ত লঘূনিচ।
নাম সাম্যানি গ্রন্থেষু কফবাত হরাণিচ॥

অর্থাৎ বার্তাকু বা বেগুন তীক্ষ্ণ উষ্ণগুণ, রসে মধুর এবং কফ ও বাতরোগ দূর করে, রুচিকর, জঠরাগ্নির দীপ্তকর; কিন্তু পাকা ফল নয়, ওটা পিত্তকর।

গ্রন্থে বৃহতীফল ও বার্তাকু সমনামে উক্ত হ'লেও তা পৃথক, কারণ বৃহতীফলের রস তিক্ত; তবে লঘু পাক এবং কফ ও বায়ু বিকার দূর করে; অবশ্য পক্কাপক্কের ক্ষেত্রে বৃহতীফলে তারতম্য হয় না।

অতএব আমরা সুপ্রাচীন অরোগকর এই পরিভাষার উদ্দেশ্যটির সার্থক রূপ সাধনকারী এই বার্তাকু বা বার্তাক ফলই যে আমাদের আহার্য ও পথ্যের পক্ষে অন্যতম সহায়ক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আর একটি তথ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, এই বার্তাকু বা বেগুন সম্পর্কে ষোড়শ শতাব্দীর ভাবপ্রকাশকারের মন্তব্যে উল্লেখিত হ'য়েছে, "বার্ত্তাকুরেষঃ গুণ সপ্ত যুক্তঃ" অর্থাৎ এই বার্তাকু বা বেগুন অন্ততঃ ৭টি গুণের অধিকারী। সেই ৭টি গুণ হ'লো—(১) অগ্নিপ্রদঃ, (২) মারুত নাশকশ্চ অর্থাৎ বায়ুনাশক, (৩) শুক্রপ্রদ, (৪) শোণিত-বর্দ্ধকশ্চ অর্থাৎ রক্ত বৃদ্ধিকারক, (৫, ৬, ৭) হৃল্লাস কাসা-রুচি নাশকশ্চ বার্ত্তাকুরেষঃ গুণ সপ্তযুক্তঃ।

এ সম্পর্কে আরও একটা বক্তব্য আছে, এই বার্তাকু যে বৃহতীফল নয়, সেটা চক্রদত্তের মতই ভাবপ্রকাশকারও ব'লেছেন, কিন্তু চক্রদত্তের সঙ্গে ভাবপ্রকাশের বক্তব্যে একটা পার্থক্য সৃষ্টির ভাষাও তার জন্য নিরূপিত করা হ'য়েছে। প্রচলিত ভাষায় বেগুনকে বার্তাকু বলা হবে, আর বৃহতীফলের নাম বার্তাকী। অবশ্য বার্তাকীফলও বহুগুণের অধিকারী এবং বহু কঠিন রোগের সহজসাধ্য ভেষজ।

তা যাক্, আমাদের আলোচ্য বার্তাকু বা বেগুন যে বহু প্রাচীন সংস্কৃত বার্তা থেকে এসেছে অর্থাৎ অ-রোগ এই কথাটি বোঝাতে অরোগ নামকরণ যে করা হ'য়েছে, তার স্বপক্ষে এই যুক্তি, প্রমাণগুলি এখানে উল্লেখ ক'রলাম।

নব্যের সমীক্ষায়

বেগুন ঘর্মকারক, উষ্ণ ও মূত্রকারক। পাতায় Narcotic গুণ আছে। পত্রের মাদকতা ও বীজের উত্তেজক শক্তি রয়েছে।

পরিচিতি

ভারতের প্রায় সর্বত্রই ব্যাপকভাবে বেগুনের চাষ হয়। কম-বেশী কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ, কোন কোন প্রজাতির পাতাতেও কাঁটা থাকে। সাধারণতঃ গাছগুলি ৩/৪ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, তবে জোরালো জায়গা হ'লে ৫/৬ ফুট পর্যন্তও হতে দেখা যায়। নীলাভ-বেগুনি রঙের ফুল, কোন কোন ক্ষেত্রে পাশাপাশিও ২/৩টি ফুল হয়। সারা বৎসর ফুল ও ফল হয়ে থাকে। কোন কোন গাছ ২-৩ বৎসর বাঁচে। বিভিন্ন আকারের বেগুন হয়, যেমন গোল, লম্বা প্রভৃতি, এবং রঙও বহু প্রকারের—সবুজাভ, শ্বেতাভ, রক্তাভ, কৃষ্ণ-রক্তাভ, বেগুনী আভাযুক্ত। যেসব বেগুন আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি, সেগুলির নাম ভিন্ন ভিন্ন, যেমন—কাঁটা বেগুন, কুলি বেগুন, মাকড়া বেগুন, নুড়াকি (সবুজাভ বেগুন) মুক্তকেশী, আউশ প্রভৃতি। বেগুনকে সংস্কৃতে বৃন্তাকী, বার্তাকু; বাংলায় বেগুন, উৎকলে ভণ্টা ও হিন্দীতে বইগন বলে। এর বোটানিক্যাল নাম Solanum melongena Linn., ফ্যামিলী Solanaceae.

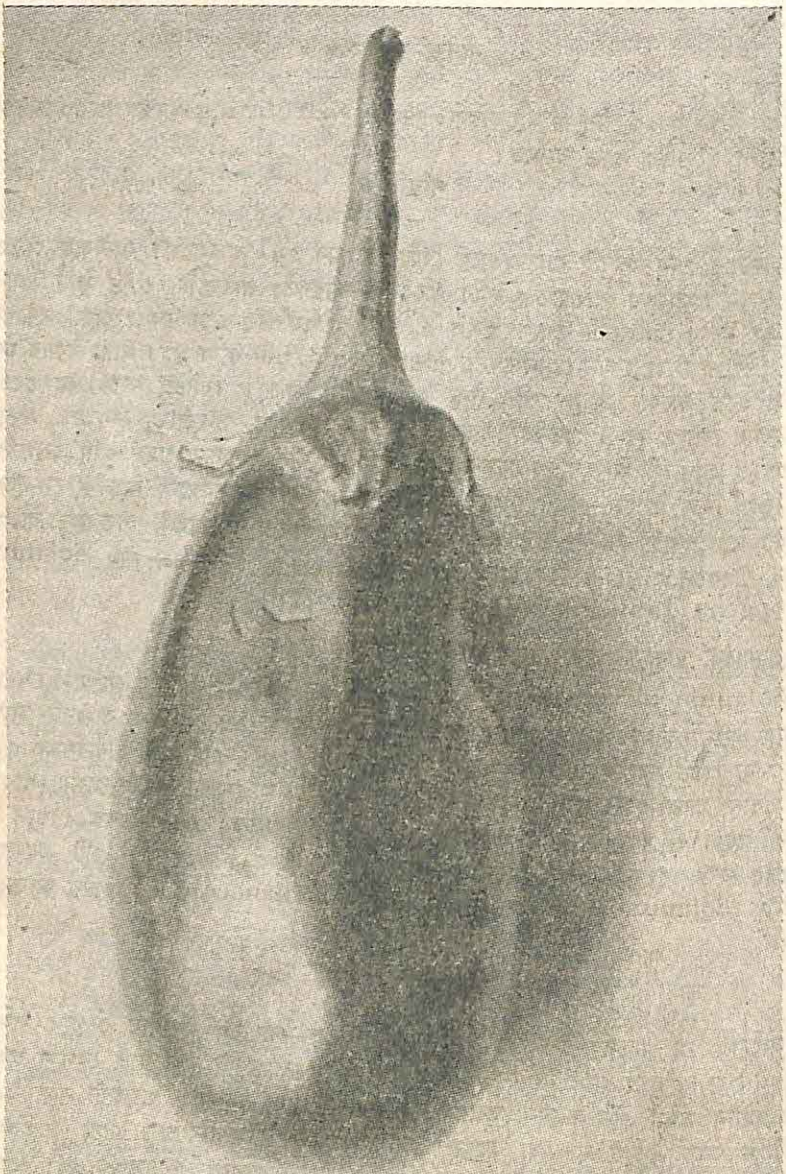
ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়—পাতা, ফল ও বীজ।

Solanum torvum Swartz নামে একটি গাছ পশ্চিম বাংলার যেখানে সেখানে রাস্তার ধারে, কোথাও কোথাও জঙ্গলের ধারে হতে দেখা যায়, এটিকে বাংলায় গোষ্ঠ-বেগুন বা গোঠ বেগুন এবং সংস্কৃতে গোষ্ঠবার্তাকু বলে। এর গাছ সাধারণতঃ ৫/৬ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ফুল সাদা রঙের, ফল থেকে থোকা থোকা সবুজ রঙের, পাকলে হলদে। ফুল ও ফল বৎসরের প্রায় সব সময়ই হয়ে থাকে। এর বীজকে বেগুন বা বৃহতীর বীজ থেকে পৃথক করা অসম্ভব। গুণাগুণের দিক থেকে এটি অনেকটা বৃহতীর (Solanum indicum) সমতুল্য। এটিও Solanaceae ফ্যামিলীর অন্তর্ভুক্ত গাছ।

লোকায়তিক যোগ

বার্তাক বা বার্তাকু সম্বন্ধে আলোচনা করছি—সাধারণ ধারণায় বেগুন শব্দটি গুণেরই তো অস্তিত্ব রাখে না, বে-গুন, এটা সাধারণ লোকেরই কথা বটে, বেগুন অর্থাৎ যে গুণহীন, যাঁরা এটা ভাবেন, তাদের নত্ত্ব-সত্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়ই ধারণাটা কম, কারণ একটি ণ আর একটি ন। যা হোক্, আয়ুর্বেদীয় ভৈষজ্যবিদগণ একে এককথায় ব'লেছেন—"বার্ত্তাকুরেষা গুণসপ্তযুক্তা" অথবা "বার্ত্তাকুরেষঃ গুণসপ্তযুক্তঃ" অর্থাৎ বার্তাকু অর্থাৎ প্রচলিত ভাষায় বেগুন এটি সাতটি গুণের অধিকারী—অগ্নিপ্রদঃ, মারুত নাশকশ্চ, শুক্রপ্রদঃ, শোণিতবর্দ্ধকশ্চ, হৃল্লাস-কাসারুচি=নাশকশ্চ বার্ত্তাকুরেষঃ গুণসপ্তযুক্তঃ। সবকয়টি গুণই প্রকাশ করে প্রধানভাবে সাতটি কলা বা সাতটি স্রোতে। অগ্নিবল বাড়ায়, বায়ুর উন্মত্ততা কমায়—এগুলো রসবহ স্রোতের উপর কাজ করে,

তৃতীয় শুক্রবহস্রোতে শুক্রপ্রদ, চতুর্থ শোণিতবহ স্রোতে শোণিত বর্ধক, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম গা বমি-বমি, কাসি ও অরুচি দূর ক'রে।



এই বার্তাকু সম্বন্ধে ভৈষজ্যবিদ্‌দের মহলে একটা ধাঁধা আছে যে, বৃহতী ফলেরই অপর নাম বার্তাকু—সেটা চক্রদত্তের মত ব'লে পাওয়া যায়, কিন্তু ভাবপ্রকাশ ঐকথা ব'লে সেইসঙ্গে ব'লেছেন যে, যেখানে বার্তাকী থাকবে, সেখানে বৃহতীফল আর

যেখানে বার্তাকু সেখানে বেগুন। এটার সংস্কৃত অর্থ কিন্তু বার্তা থেকে এসেছে, বার্তা শব্দটি দুই রকম অর্থ প্রকাশ করে—একটি অরোগ, আর একটি অর্থ সাংবাদিকতা।

ভৈষজ্যবিদ্‌গণ অরোগিতা এই অর্থ গ্রহণ ক'রেছেন এই ফলের এবং তার পাতার যোগগুলির সম্পর্কে। এটা কিন্তু চরক সুশ্রুতাদি সংহিতাগ্রন্থের মতকে অনুসরণ ক'রেই এগুলিকে সংযোজন করা হ'য়েছে; তাই এটা চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য, এটা ঠিক বলা যায় না।

১। **কফজ কাসিতে—** প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি—এই যে এত প্রকার বেগুন আছে—যেমন কাঁটা বেগুন, মুক্তকেশী, মাকড়া, আউস, আমন আরও কত রকমের বেগুন তো আছে, এগুলিকে কিন্তু ব্যবহার করা হয়নি; এই বার্তাকুর যখনই ব্যবহার ক'রেছেন, তখনই গোষ্ঠ বেগুনের ব্যবহার ক'রেছেন, এটির বোটানিক্যাল নাম Solanum torvum Swartz., যে বেগুনগুলো দেখতে আকারে মার্বেলের মত তাকেই গোষ্ঠ বেগুন বলে। এই বেগুন অল্প জল দিয়ে থেঁতো ক'রে রস ক'রতে হয়। এই রস যখনই ব্যবহার ক'রতে হবে তখনই গরম ক'রে খেতে দিতে হবে। তবে আধ চা-চামচ ব্যবহার ক'রলেই চলে। এর সঙ্গে ১০/১৫ ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ার বিধি। এটা কিন্তু চরকোক্ত ব্যবস্থা, এটি আছে চরকের চিকিৎসাস্থানের ২২ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকে। এই কফজ কাস সম্বন্ধে একটু জানার আছে, এ কাসে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গা বমি-বমি এবং গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠা অর্থাৎ শিহরণ আর সর্দিও ওঠে থোকো থোকো; আর বিশেষ লক্ষণ থাকবে—কাসের সময় বুকে ব্যথা, এইটিকে কফজ কাস বলা হয়।

২। **পাথুরীতে—** চিরঞ্জীবের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে এর উৎপত্তির কারণ ও কোথায় হয়ে থাকে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হ'য়েছে। তবে এই মুষ্টি-যোগটি প্রথমাবস্থায় উপযোগী, দীর্ঘদিন হ'য়ে গেলে সেটাকে দ্রবীভূত করিয়ে দেওয়া খুবই দুঃসাধ্য। তবে এই পাথুরী শুক্রজন্যও হ'তে পারে, আবার প্রমেহ জন্যও হ'তে পারে; এক্ষেত্রে এই গোষ্ঠ বেগুনের গাছের মূলের ছাল চূর্ণ ক'রে এক গ্রাম মাত্রায় প্রত্যহ দু'বেলা কুলত্থ কলাই ভিজানো জল দিয়ে খেলে কয়েকদিনের মধ্যেই মূত্ররোগের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে, তবে যেটা খুবই বড় হ'য় গিয়েছে সেটা আস্তে আস্তে ক্ষয় হ'য়ে তবেই বেরিয়ে যাবে। কুলত্থ ৫—১০ গ্রাম পর্যন্ত নেওয়া চলে, একে রাত্রে ১ গ্লাস গরম জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে, পরের দিন ঐ জল দিয়ে খেতে হবে, আর সকালে ভিজিয়ে রেখে বৈকালের দিকে সেই জলের সঙ্গে খেতে হবে। পূর্বদিন রাত্রে ভিজিয়ে রাখা জল পরের দিন বৈকালে খাওয়ালে চ'লবে না। এই যোগটা ব্যবহারে আর একটা কাজও হবে। সেটা হ'লো, পাথরের মত শক্ত পদার্থটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হয়ে বেরিয়ে যাবে।

৩। **শিশুদের দুধ তোলায়—** এই ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠ বেগুনের রস ২ ফোঁটা ও মধু ১০/১২ ফোঁটা মিশিয়ে প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে দিলে দুধ তোলাটা ক'মে যাবে।

৪। **বিষক্রিয়ায়—** কোন ক্রমে দেহে বিষ সঞ্চার হ'লে অর্থাৎ কোন প্রকার পোকা-মাকড় পেটে গিয়ে শরীর ফুলে যাওয়া, বমনভাব বা বমন হওয়া, শরীরে জ্বালা, অক্ষুধা প্রভৃতি বিষক্রিয়ার এইসব উপসর্গ দেখা দিলে, এক্ষেত্রে সাদা বেগুন হ'লেই ভাল হয়—যেগুলি দেখতে হাঁসের ডিমের মত, তা না হ'লে এই গোষ্ঠ বেগুনের অথবা যেকোন প্রকার বেগুনের পাতার রস একবেলা এক চা-চামচ ও ওবেলা এক চা-চামচ রস একটু গরম ক'রে খেলে পরে খাদ্যে বিষক্রিয়ার দোষগুলি অপসারিত হবে।

৫। **জননম্বারের চুলকানিতে—** এটা খুবই কষ্টদায়ক, শুধু কষ্টদায়কই নয়—বড়ই লজ্জাজনক; এভিন্ন আর একটি লক্ষণও অনুভূত হয় যে ভিতরটা যেন অসাড়; এক্ষেত্রে ঐ গোষ্ঠবেগুনকে কুচিয়ে শুকিয়ে সেটার ধোঁয়া লাগালে সেরে যায়। সব থেকে সুবিধে হয় একটা বেতের চেয়ারে ব'সে ধোঁয়া লাগানো।

৬। **সায়েটিকা রোগে—** যাকে আয়ুর্বেদে গৃধ্রসী রোগ বলে। গোষ্ঠবেগুন ৪/৫টি, সিদ্ধ ক'রে জলটা ফেলে দিয়ে সেই বেগুনগুলোকে এরন্ড তেলে ভেজে সেইটা কয়েকদিন একবার ক'রে খেলে কয়েকদিনের মধ্যেই ঐ সায়েটিকার উপশম হয়।

৭। **সংগ্রহ গ্রহণীতে—** এই রোগটি সম্পর্কে চিরঞ্জীবের দ্বিতীয় খন্ডে বিশেষভাবে বলা হ'য়েছে। এই রোগনিদানে বলা আছে—দিবা প্রকোপমায়াতি রাত্রৌ শান্তিং ব্রজেৎ-চ-সা—অর্থাৎ দিনের বেলায় দাস্ত বেশী হয়, আর রাত্রিবেলায় এর উপদ্রব থাকে না।

এখানে আয়ুর্বেদের মতবাদ হ'লো—এক্ষেত্রে পিত্ত ক্ষয় হ'য়ে গিয়ে শ্লেষ্মাটা প্রধান হ'য়ে গিয়েছে। এটা পুরাতন আমাশয়েও হয়। এক্ষেত্রে যেকোন বেগুনই হোক না কেন, তার মূল চূর্ণ ক'রে ১ গ্রাম মাত্রায় ঘোলের সঙ্গে মিশিয়ে একবার ক'রে খেলে দুই/তিন দিনের পর থেকে গ্রহণীর উপদ্রবটা ক'মে যাবে। এটা সিদ্ধ বৃন্দের যোগ। পূর্বে নবপ্রসূতির এই গ্রহণীরোগ হ'লে সাধারণে ব'লতো সূতিকা হ'য়েছে, আর এই বেগুনের মূল চূর্ণ ক'রে ঘোলের সঙ্গে খাওয়ানো হ'তো। তখন এসব দৈব ব'লে চালানো হ'তো।

৮। **মেদহ্রাসে—** প্রথম বয়সে ছিল দেহের সাধারণ গড়ন; তারপর বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাংস ধাতু দ্রুত পুষ্ট হতে থাকলে মেদধাতুটাও বেড়ে যেতে থাকে। এই ধাতুটা বাড়ার প্রথম লক্ষণ হবে উদরটি ক্রমশঃ বেশ নিটোল হ'তে থাকে, তারপর পেটে থাক্ নামতে থাকে, তারপর দুটি নিতম্ব বেশ ভাঙ্গা কলসীর তলার মত হ'য়ে ওঠে, এবং কোমরটা বেশ ভরভরান্তি হয়; গাল দুটিও ভারী হ'য়ে যায়। প্রথম প্রথম দেখতে বেশ ভাল লাগে, কিন্তু ক্রমেই ভিতরটায় হৃদরোগের শিকড় গেড়ে বসে। সেই সময় কর্তব্য হ'লো যে—সামান্য নুন (লবণ) দিয়ে কিছুদিন বেগুন পোড়া খাওয়া। কিছুদিন খেতে পারলে ঐ বাড়-বাড়ন্তটা ক'মে যাবে। তবে আর একটা কথা জানিয়ে রাখি—এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকার পেতে হ'লে আলু, চিনি অথবা যেকোন মিষ্টি খাওয়া একেবারে বন্ধ ক'রতে হবে এবং একবেলা ভাত আর একবেলা কড়া সেঁকা রুটি (পাঁপরের মত) খেতে হবে। এর দ্বারা মেদটা আস্তে আস্তে অবশ্যই ক'মে যাবে।

৯। **অগ্নিমান্দ্যে—** ভাল ক্ষিধে হ'চ্ছে না, খাওয়ার রুচি নেই, সেক্ষেত্রে বেগুনের পাতা ১০ গ্রাম বেটে ঘন্টের মত রান্না ক'রে খেলে ওটা ক'মে যায়। কোন কোন প্রাচীন বৈদ্য ওটাকে সিদ্ধ ক'রে ওই জলটা খেতে দিতেন। এটা পরীক্ষিত।

১০। **রক্তের স্বল্পতায়—** যাকে ব'লবো রক্তধাতুটার বৃদ্ধি হ'চ্ছে না। এটার প্রধান উপসর্গ হ'তে দেখা যায়, দেহটা মোটা হ'লে হবে কি, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল, গায়ে (ত্বকে) চিক্কণতার অভাব, পিত্তবৃদ্ধি, বুকের স্পন্দন হঠাৎ হঠাৎ ক'মে যায়, কিছুদিন বাদে পা-দুটো একটু ফুলতে থাকে; এক্ষেত্রে কুলি বেগুন ১০/১২ গ্রাম কুচিয়ে ৩।৪ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ওই জলটায় সামান্য লবণ মিশিয়ে প্রত্যহ একবার খেলে রক্তকণিকা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে বলাধান হয়।

বেগুনের গুণপনা কীর্তন ক'রে বিরতি ঘোষণা করবো, এমন সময় এক এঁড়ে পন্ডিতের সাক্ষাৎ মিললো। প্রশ্ন হচ্ছে—বেগুন কথাটা শব্দকান্ডের আবর্তে প'ড়ে সেটা

কোথায় পৌঁছে গেছে শুনুন—আমরা তো দিন-রাতই গনেশের আরাধনা ক'রে চলেছি—এককালে বেদের যুগে গণেশ নামটি হয়েছিল, তখন গণ+ঈশ অর্থাৎ গণই সমস্ত শক্তির প্রতীক, তারপর সেটা পালটে গিয়ে হ'লো—গণানাং ঈশ; তখন থেকেই একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'লো অর্থাৎ বহু লোকের যিনি কর্তা, তারপর আরও সহজিয়া হয়ে গেল—গণ+ঈশ=গণেশ। সেইরকম বার্তাক শব্দটির অর্থ হ'লো অরোগ, বার্তাকু—তবুও তার অর্থবোধের ধারাটা কিছু ছিল; তারপর যখন বেগুন হ'লো, তখন সেটা তার উল্টোই হ'লো অর্থাৎ যার গুণ নেই। এ যেন রাম রাম বলতে বলতে মরা মরা হয়ে গেল, তাহ'লে এখন আমরা কি গঙ্গাযাত্রী?

CHEMICAL COMPOSITION

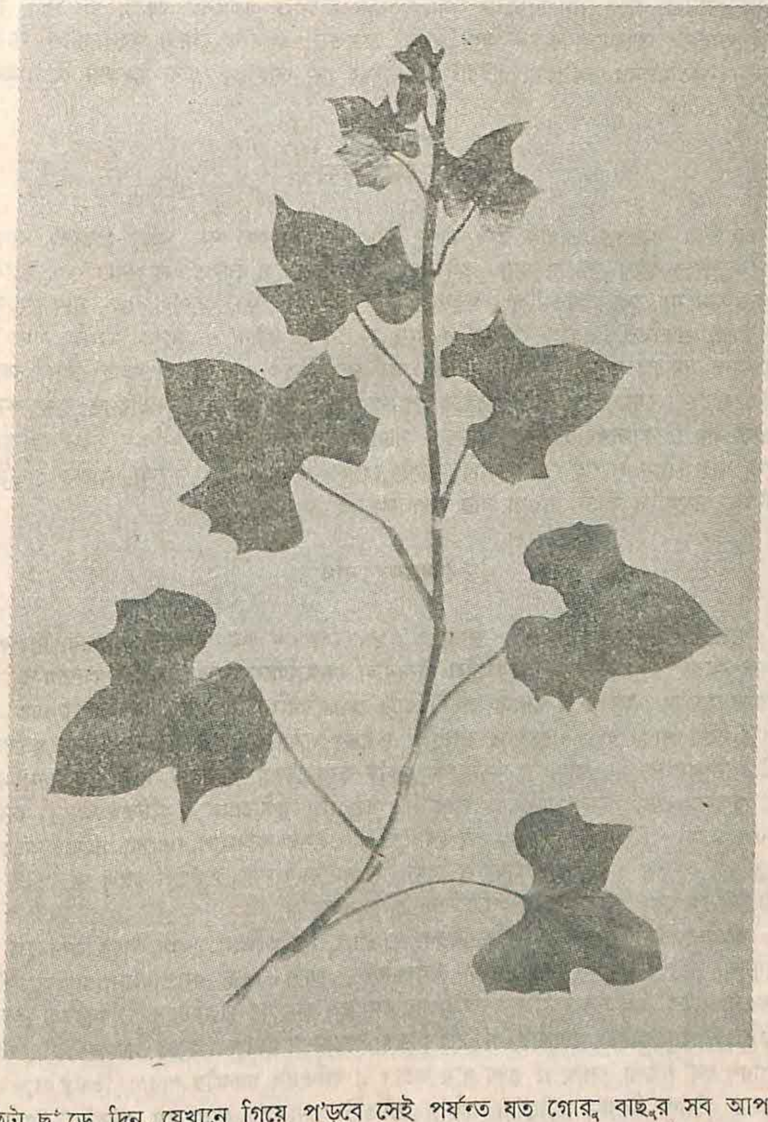
Solanum melongena

1. (a) Protein 1.4%, (b) Fat 0.3%, (c) Minerals 0.3%, (d) Fibre 1.3%, (e) Moisture 92.7%, (f) other carbohydrates 4.0 mg/100 g.
2. The mineral constituents present are :— (mg/100 g edible matter). Calcium 18, Magnesium 16, Phosphorus 47, Iron 0.9, Sodium 3, Potassium 200, Copper 0.17, Sulphur 44, Chlorine 57.
3. Vitamins present are :— Vitamin A, thiamine, riboflavin, nicotinic acid; Vitamin C, Chlorine.
4. Main pigments :— Delphinidin 3-bioside (anthocyanin), (Nasunin, Lycoxanthin).
5. Bitter principle :— Solasonine, Arginine glycoside.
6. Phenolic compounds : (a) Chlorogenic acid, (b) Neochlorogenic acid, (c) Scopoletin, (d) Caffeic acid. 7. (a) 5-hydroxy tryptamine, (b) Hydrocyanic acid (bases).

সুকন্দ [মিষ্টিআলু]

বৈদিকযুগের আদিতে (ঋক্‌বেদের আমলে) আর্যরা যে মাটি খুঁড়ে খাবার (খাদ্য) সংগ্রহ ক'রতেন না এটা আজকের প্রাচীন নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রমাণ ক'রেছেন, কারণ মাটি খোঁড়ার কাজ চাষ-আবাদেরই একটা বিশেষ অঙ্গ। তাঁদের সংজ্ঞাও কোথায়ও মুনি বা ঋষি কর্তৃক উল্লিখিত হয়নি; কিন্তু ভারতীয় কাব্য-মহাকাব্যগুলিতে, যেমন, রামায়ণ-মহাভারত রচনার যুগে মুনি আর ঋষিদের ঘন ঘন সাক্ষাৎ লাভ হয়, আর বিবাহ, ছেলেপুলে নিয়ে সংসারও যে তাঁরা ক'রতেন, এরও নজির ঢের, গৃহী ছিলেন প্রায় সবাই, কিন্তু বিত্তবান ছিলেন কম। প্রসঙ্গতঃ রামায়ণের একটি উপাখ্যানের কথা বলি। সময়টা ছিল রামের বনবাসের মুখোমুখি অর্থাৎ তখনও দশরথের রাজত্ব, অবশ্য (রামরাজত্ব তার ঢের পরে) রাম চৌদ্দ বৎসরের জন্য নির্বাসিত হ'লেন বনে, সঙ্গে লক্ষ্মণ সীতাও যাবেন। যাওয়ার আগে তাঁর ব্যক্তিগত অনেক সম্পত্তি বহুলোককে দান ক'রে যাচ্ছেন অর্থাৎ যে যা চাচ্ছেন তিনি তাকে দান ক'রে যাচ্ছেন; চারদিকে সে খবর ছড়িয়ে প'ড়লো। ঐ অযোধ্যার প্রান্তের বনে বাস ক'রতেন এক ব্রাহ্মণ, তাঁর নাম পিঙ্গল ত্রিজট অর্থাৎ কটাসে তাঁর গায়ের রং আর তিনটি জটা ছিল, তাই বলা হ'য়েছে—তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যঃ ত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ। ইনি ছিলেন গর্গ গোত্রীয় (এই গোত্রের ব্রাহ্মণ যজুর্বেদীয়) এঁর জীবিকা ছিল বন থেকে মূল আর ফল সংগ্রহ করা অথচ তাঁর ছিল তরুণী ভার্যা—নিজে ছিলেন বৃদ্ধ, সর্বদা হাতে থাকতো কোদাল, শাবল এবং কাঁধে থাকতো লাঙ্গল। যেখানে যা পেতেন সংগ্রহ ক'রতেন। অনেক সন্তানও ছিল তাঁর। বৃদ্ধ স্বামীর তরুণী গৃহিণী বললেন—হ্যাঁগো, এই যে শুনছি, রাম বনে যাওয়ার আগে যে যা চাচ্ছে তাকে তাই দান ক'রছেন; তুমিও যাও না। গৃহিণীর কথা শুনে পতি দেবতাটি সত্বর প্রস্তুত হ'লেন, তাঁর শাবল কোদাল ফেলে রেখে একখানা ছেঁড়া কাপড় কোনরকমে গায়ে জড়িয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা ক'রে সোজা রামচন্দ্রের সম্মুখে হাজির হলেন এবং

বললেন—রাজপুত্র! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ অথচ অনেকগুলি সন্তান; এদিকে জীবিকা ব'লতে বন থেকে কন্দ মূল সংগ্রহ করে তাদিকে খাওয়ানো আর নিজেরও তাই আহার্য। রাম তাঁর কথা শুনে মুচকি হাসলেন (হয়তো এই ভেবে যে, এদিকে ভিক্ষুক কিন্তু গৃহিণী আর বহু সন্তানের সংসার নিয়ে বাস করার ব্যবস্থাটি পাকা) এবং পরে বললেন, ঐ যে সরযূ নদীর পারে আমার গরুগুলি চ'রছে, এখান থেকে আপনার ঐ



লাঠিটা ছুঁড়ে দিন, যেখানে গিয়ে প'ড়বে সেই পর্যন্ত যত গোরু বাছুর সব আপনি নিয়ে যান। ব্রাহ্মণ তো খুশীতে ডগমগ হ'য়ে শরীরটাকে কোন রকমে বাগিয়ে কোমরে ছেঁড়া কাপড়টা শক্ত করে বাঁধলেন আর এঁকেবেঁকে লাঠিটাকে ছুঁড়লেন। লাঠিটা যেখানে

পড়লো, সেই পর্যন্ত যত গোরুবাছুর ছিল সেগুলিকে নিয়ে রামের জয়গান ক'রতে ক'রতে আশ্রমের দিকে রওনা হ'লেন। এটা রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের ৩২ অধ্যায়ে (২৯ শ্লোকের পরে) লেখা হ'য়েছে।

উপাখ্যানের অন্তরালে

মহাকাব্যের যুগে সমাজচিত্রটি সমালোচনার হ'লেও এখানের বক্তব্য, বনবাসী বহু মুনিই তাহ'লে তৎকালে বনের কন্দ খুঁড়ে খেতেন, এমনকি গোটা সংসারটাও পালন ক'রতেন। বর্তমানের সমীক্ষায় এইটাই মনে হবে যে, তাহ'লে তাঁরা উৎকৃষ্ট ভিটামিনই খেতেন।

কন্দ অর্থে কি

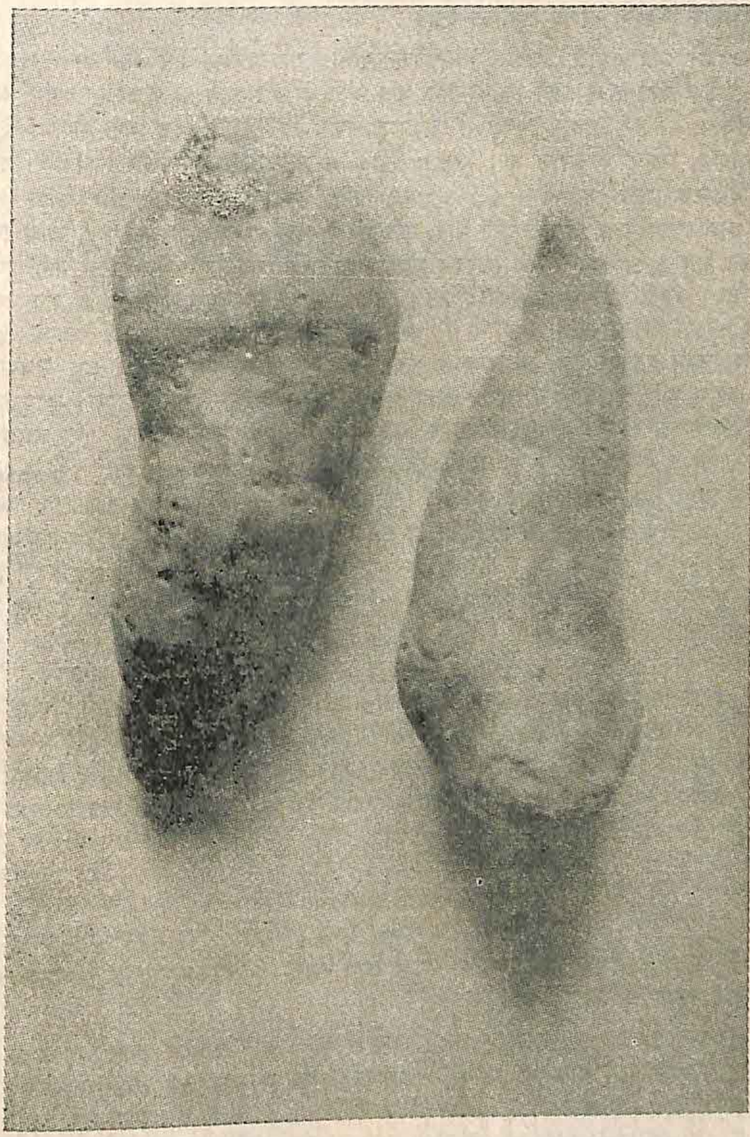
ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় কন্দ মানে কন্দ্ (অন্বেষণে) অ (ঘঞ্ প্রত্যয়) অর্থাৎ যাকে অন্বেষণ ক'রে পাওয়া যায়। এই কন্দ আর কন্দমূল কিন্তু এক নয়। কন্দ মূলের সংখ্যাও কম নয়, যেমন শতমূল (Asparagus recemosus) মৃণাল, ওল, মাণ যেকোন কচু আলু প্রভৃতি। এগুলি ভেষজ ও আহার্য কিন্তু কাঁচা ও অপক্ব খাওয়া যায় না, আর কন্দ সমতল ভূমিতে বেশী পাওয়া যায় না; এসব পার্বত্য অঞ্চলেই বেশী জন্মে এবং খেতেও যেমন সুস্বাদু তেমনি পুষ্টিকর; তবে সমতলে সাধারণতঃ যে কয়টি পাওয়া যায় তার মধ্যে কয়েকটি আমরা সচরাচর ব্যবহার ক'রে থাকি—যেমন পেঁয়াজ, মিষ্টি আলু (সে সাদাই হোক আর লালই হোক) শাঁক আলু, মুলো, গাজর প্রভৃতি। মোটকথা, যেগুলি কাঁচা খাওয়া যায় সেগুলিকেই কন্দ বলা হয়।

বৈদ্যকের নথি

সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ে ৩২৮ শ্লোকে এই কন্দ ও মূলের বিশ্লেষণ পৃথক করেই বলা হ'য়েছে। যেগুলি কন্দমূল সেগুলিকে কৃতান্নবর্গের অন্তর্গত করা হ'য়েছে অর্থাৎ রান্না করে খাবার জন্য। আর চরক সংহিতায় ওভাবে না ক'রে এক এক বর্গের মধ্যে শাকবর্গের অন্তর্গত যেগুলি তাদের মধ্যে আলুকেও নিবদ্ধ করা হ'য়েছে। এটি সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ে আলুকে একটি কন্দমূলের সাধারণ সংজ্ঞা নির্বাচন ক'রে বলা হ'য়েছে যে, "আলুকানি চ সর্ব্বাণি সপত্রাণি কুটিঞ্জরঃ" (কুটিঞ্জর মানে তামাটে রং-এর মুলো) টীকাকার অরুণ দত্ত (বাগ্‌ভট) এইসব কন্দমূল (এদের সংজ্ঞা আলুক) মধুর রস সম্পন্ন এবং শীতবীর্য ও বিষ্ঠা নিঃসারক অর্থাৎ গুট্‌লে রাখে না, তাই বলা হ'য়েছে—"মধুরং শীতবীর্য্যঞ্চ পুরীষস্য চ ভেদনম্"।

অতএব পলাণ্ডু, গাজর, মিষ্টি আলু, শঙ্খালু (শাঁখ আলু) এগুলিকে কন্দমূল বলা যাবে না, এগুলি কন্দ, এরা কাঁচা অবস্থাতেও খাদ্য। এরা রসপ্রাধান্যে মধুর, বীর্য-প্রাধান্যে শীত, এইজন্য আময়িক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কারোর প্রকৃতিতে রুচিকারক, কারোর প্রকৃতিতে বায়ুকারক, কারোর বা দাহকারক অথবা দাহনাশক হ'য়ে থাকে। এই কন্দের সাধারণ ধর্ম হ'লো, শোথ ও তৃষ্ণা দূর করা। এ অভিমত চরকীয় ধারার, কিন্তু সুশ্রুতের দ্রব্যগত পদার্থ বিচারের বক্তব্যে অর্থাৎ প্রতিটি পদার্থের মধ্যে যে রসবীর্য বিপাকের অস্তিত্ব রয়েছে তাতে আলু সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত কন্দও মূল, অর্থাৎ কন্দমূলের স্বভাবই হ'লো এগুলি পার্থিবশক্তির আধার। এরা সান্দ্র অর্থাৎ এদের অবয়বের গঠনই হ'লো

নিবিড়, কঠিন হ'য়েও কোমল এবং গন্ধ প্রাধান্যে বিশেষ তারতম্যে নির্মিত। আর একটি বৈশিষ্ট্য এদের রস ও বীর্যের শক্তিটি পুষ্টি আনে, আর পরিপাকান্তে তারা সান্দ্র (যাকে বলে আঁট-সাঁট হ'য়ে থাকে) অবয়বগুলি অধোগমনশীল অর্থাৎ বিরেচকও নয়, ভেদকও



নয়, সহজেই তারা অধোভাগে সরিত হয়। সেইজন্যই পার্থিবধর্মী কন্দমূল স্বভাবতই সেইসব স্থানেই ফলপ্রদ যেখানে ঊর্ধ্ব বা অধোগত রক্তপিত্তের প্রয়োজক হয় বায়ু-পিত্ত ও কফের একক বা সম্মিলিত শক্তি। তাছাড়া এরা বীর্যবত্তায় শৈত্য ব'লেই একটু গুরুপাক,

কিন্তু শুক্রবহ স্রোতে দ্রুত বর্ধনকারক হয় শুক্রের। আর নারীর স্তন্যগ্রন্থিতেও এদের সমান ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ স্তন্যবর্ধক।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টিতে কন্দজাতীয় দ্রব্যে শর্করা প্রাধান্য থাকে বলেই অর্থাৎ যেখানেই শোথ রোগের সূচনা বা প্রকাশ থাকে সেখানেই কন্দদ্রব্যের আহার্যত্ব এবং পথ্যত্ব নিষিদ্ধ বলেই ঘোষিত হয়।

এখানে আর একটি প্রসঙ্গও অনুশীলনযোগ্য, সেটি হ'লো কন্দ এবং কন্দমূল থেকে মদ্য প্রস্তুত করা হলে সেটা কি অন্যান্য মদ্য অপেক্ষা হীনগুণ বা গুণহীন হয়? অথবা বিকৃতগুণ হয়? এক্ষেত্রে কন্দদ্রব্য যেহেতু মধুর রস সেই হেতু মদ্য উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু কন্দজাত মদ্য সম্বন্ধে চরক ও সুশ্রুতের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। চরকে বলা হ'য়েছে (চরক সূত্রস্থান ২৫ অধ্যায়) ধান্য, ফল, মূল, সার, পুষ্প, ডাঁটা, পাতা এবং ছাল থেকে মদ্য প্রস্তুত করা যায়, তাছাড়া শর্করা থেকেই উৎকৃষ্ট মদ্য জন্ম নেয়। অতএব মদ্য ৯ প্রকার। কিন্তু চরকের মধ্যে স্পষ্টোক্তি নেই যে, কন্দ থেকে মদ্য উৎপন্ন হয়। তবে একটা কথা স্পষ্ট বলা হ'য়েছে যে, যে উপাদান থেকে মদ্য উৎপন্ন হয় তাদের মৌল শক্তিটিকে অতিক্রম করে না। এক্ষেত্রে সুশ্রুতে (সূত্রস্থান ৪৫ অধ্যায় ১৭৮ শ্লোক) বলা হ'য়েছে যে, যে কন্দ ও যে কন্দমূল থেকে মদ্য উৎপন্ন হয় অথবা যে ফল থেকে মদ্য উৎপন্ন হয় তার রসের গুণ বীর্য পরিপূর্ণ থাকে মদ্যে; তবে কোন মদ্যই ভাল নয়। আর একটি উপদেশ, কন্দ থেকে উৎপন্ন মদ্যকে মদ্য বলা যাবে না, ওর সংজ্ঞা পৃথক, ওকে শুক্ত বলা হবে; আবার ওই শুক্তকে শর্করা, গুড়, মধুযুক্ত ক'রলে এবং যথাবিধি আসূত ক'রলে (চোঁয়ালে) তা হবে আময়িক প্রয়োগের অর্থাৎ রোগের ক্ষেত্রের প্রয়োগের উপযোগী। অতএব কন্দ থেকে জাত মদ্যকে আবার শর্করা শুক্ত ক'রলে তা রুচিপ্রদ হবে ঠিকই, কিন্তু তার উপাদান যে মধুর রসপ্রধান সেটা সে ত্যাগ ক'রবে না, অতএব সোমরোগে কন্দ শুক্ত ব্যবহার করাও অনুচিত। কিন্তু তিক্ত ও কষায় রসপ্রধান মূল, ডাঁটা, পাতা থেকে জাত—যেমন কিরাততিক্তা (চিরতা), শাঁই, হরীতকী প্রভৃতি থেকে জাত মদ্য শর্করাযুক্ত ক'রলেও সোমরোগে তা ব্যবহার্য; কিন্তু মধুর রসপ্রধান কন্দ থেকে জাত মদ্য (এমনকি কিসমিস, খেজুর, ফলসা, মিষ্টি কুল প্রভৃতি) কখনই নয়। এই মিষ্ট আলু বাতপিত্তের বিকারেই প্রযোজ্য কিন্তু বাতশ্লেষ্মায় বা শ্লেষ্মাবাত বিকারজাত কোন ব্যাধিতেই প্রয়োগ করা চলে না, এইজন্যই বাংলায় এই মিষ্টি আলু, রাঙা আলু বা মৌ আলুকে (সাদা আলু) নিয়ে যেসব যোগ ব্যবহার করা হয় সেগুলিকেই এখানে উল্লেখ করা হবে।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণ— এর শিকড় বিরেচক। কন্দমূল রসে স্বাদু ও শীতগুণসম্পন্ন, কামোদ্দীপক, কফ-বাতবর্ধক (আয়ুর্বেদ মতে)।

ঔষধার্থ প্রয়োগ— কন্দমূল মেদোবর্ধক। কোন কোন প্রদেশে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এর সরবত তৈয়ারী করে খাওয়া হয়। এছাড়া উক্ত মূল মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ও অগ্নিদাহে হিতকর।

পরিচিতি

লতানে উদ্ভিদ, মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে চলে, এর গাঁট থেকে মাটিতে শিকড়

প্রবেশ করে এবং সেই শিকড় থেকেই মাটির নিচে আলু জন্মে। পাতার গঠন অনেকটা কল্মী শাকের (Ipomoea reptans) পাতার মত, তবে আকারে কিছুটা বড়। গাছের ডগা ও পাতা ভাঙ্গলে দুধের মত আঠা বেরোয়। পাতার গোড়া থেকে বেগুনে রঙের এবং অনেকটা কল্কের মত ফুল হয়। সাধারণতঃ লাল ও সাদা এই রঙের আলু দেখা যায়। এরা দেখতে লম্বাটে ও এবড়ো-খেবড়ো। স্বাদে মধুর, এটি কাঁচাও খাওয়া যায়, রান্না করেও খাওয়া যায়। শীতকালে ফুল হতে দেখা যায়।

সন্দেহ করা হয় এটি বহিরাগত উদ্ভিদ এবং আমেরিকা থেকে এদেশে বহুকাল পূর্বে এসেছে! বর্তমানে কমবেশী ভারতের সর্বত্রই এর চাষ হয়, তবে দোআঁশ বা বেলে মাটিতে আলু ভাল হয়।

এর আয়ুর্বেদীয় নাম সুকন্দ, বাংলায় ও হিন্দীতে রাঙাআলু বলে। বোটানিক্যাল নাম Ipomoea batatus Lam. ও ফ্যামিলি Convolvulaceae.

ঔষধার্থ ব্যবহার্য অংশ— আলু ও শিকড়।

লোকায়তিক যোগ

এই আলু ব্যবহারের প্রতিক্রিয়াটি কিন্তু রসবহ স্রোতে হয়। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, এই লতাগাছটির একটি বিশিষ্ট শক্তির কথা—এর মূলটি বিরেচক, আর যেটা আমরা খাই সেটা হ'লো কন্দ, সেইটাই আলু ব'লে পরিচিত। এই লতাগাছের গায়ে যেসব সরু শিকড় থাকে সেগুলি কিন্তু ভেষজ।

১। **তৃষ্ণা রোগে**— এই রোগটির উৎপত্তি, তার প্রকারভেদ যাবতীয় তথ্য এবং জ্ঞাতব্য এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩২৫ ও ৩২৬ পৃষ্ঠায় বেশ বিস্তৃতভাবে উল্লেখিত হ'য়েছে, অতএব সেটা এখানে আর বলা হ'লো না। এই রোগটিতে আক্রান্ত হ'লে মিষ্টি আলু (লাল) অথবা মৌ-আলু (সাদা), মূল (শিকড়) ৭/৮ গ্রাম অল্প জল দিয়ে থেঁতো ক'রে সেই রসটা নিংড়ে আধকাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে ১০/১৫ মিনিট অন্তর কয়েকবার খাওয়ালে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তৃষ্ণা রোগের উপশম হয়।

২। **দাহ রোগে**— এই রোগটি সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠায়। তবুও মোটামুটি জানিয়ে রাখি—যে অবস্থায় চোখেমুখে জলের ঝাপ্টা দিলে, কিম্বা সেই স্থানে (যেখানে দাহ হ'চ্ছে) শীতল জল সেচন ক'রলে আরাম হয়। তাছাড়া এইসব লক্ষণ থাকলে রাঙা (লাল) আলু গাছের শিকড় (আলু নয়) ৭/৮ গ্রাম বেটে সেটা জলসহ খেতে দিতে হবে, আর শুষ্ক হ'লে ৩/৪ গ্রাম নিলেও চ'লবে। এর দ্বারা শরীরের যেকোন জায়গায় জ্বালা হোক্ না কেন, ক'মে যাবে। তবে ওটি যদি প্রকৃতিগত হয়, তাহ'লে তার স্বাভাবিক গতিকে স্তব্ধ করা কঠিন; শুধু তাই নয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোন কাজ ক'রতে গিয়ে অন্য কোন উপসর্গ না আসে তার জন্য বিশেষ বিচার ক'রে তার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন ক'রতে হবে। তবে এটি প্রয়োগ ক'রলে উপকার ছাড়া অপকার কখনও হবে না।

৩। **শোথ রোগে**— এ সম্পর্কে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ৩২৩ পৃষ্ঠায় বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মোটকথা, রোগেরই উপদ্রবে শোথ হয়, মূলতঃ শোথ ব'লে মৌলিক কোন রোগ হয় না। শোথ হ'লো আর একটি রোগের উপসর্গ, সেটাকেই আমরা মনে করি প্রধান রোগ। যাক্ এটি যখনই হয় তখন কফ-পিত্তের বিকার থাকাটাই স্বাভাবিক। সেই সময় মিষ্টি আলু পুড়িয়ে চটকে নিয়ে শোথের উপর প্রলেপ দিলে ফুলোটা শুকিয়ে যাবে।

৪। **প্রবল অতিসারে—** এই রোগ সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩৩৯ পৃষ্ঠায়। বলা হ'য়েছে, গ্রন্থোক্ত ওই লক্ষণ প্রকাশ পেলে মিষ্টি আলু অল্প জল দিয়ে থেঁতো ক'রে বা তার রসটা নিংড়ে ছেঁকে নিতে হবে, সেই রস ১ চা-চামচ একটু জল মিশিয়ে ১৫/২০ মিনিট অন্তর কয়েকবার খাওয়ালে ওটার উপশম হবে।

৫। **অপুষ্টিজনিত কৃশতায়—** শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী, প্রসূতি যিনিই হোন, তা যে কোন কারণেই হোক না এবং বীর্যহীন খাদ্য গ্রহণের ফলে (তা প্রচুর খেলেও শরীর কিন্তু অপুষ্ট থাকে। এই ক্ষেত্রে মিষ্টি আলু (সে লাল অথবা সাদা যাই হোক না কেন) পাতলা চাকা চাকা ক'রে কেটে রোদ্রে শুকিয়ে, তাকে গুঁড়ো ক'রে, ছেঁকে নিতে হবে এবং তার ১৬ ভাগের এক ভাগ চুণের জল মিশিয়ে তাকে আবার পুনরায় শুকিয়ে নিয়ে রাখতে হবে। সেটাকে চূর্ণ করে রেখে দিতে হবে। তা থেকে এক বা দেড় চা-চামচ প্রত্যহ সকালে জলসহ খেলে এক সপ্তাহের পর থেকেই দেখা যাবে যে, এ'র কৃশতা ক'মে যাচ্ছে। তবে একটা কথা জেনে রাখা ভাল—যাঁদের রক্তে বা প্রস্রাবে শর্করা (সুগার) এসে গিয়েছে তাঁদের এটা খাওয়া সমীচীন নয়, তবে এই আলু কচি থাকা কালে একে তুলে চাকা চাকা ক'রে কেটে শুকিয়ে নিলে এর শর্করা ভাগ ততটা বেশী জন্মে না।

আমরা সাধারণে ভাবি যে আলুটা না হয় মিষ্টি কিন্তু এই লতা গাছের পাতা তো আর মিষ্টি নয়; সেটাকে শাক ক'রে খেতে দোষ কি? তাঁদের জানিয়ে রাখি—এর পাতাশাক খেলেও রক্তে বা প্রস্রাবে সুগার বেড়ে যায়।

এই নিবন্ধের শেষ অধ্যায়ে যেটা লিখতে ব'সেছি সেটা হ'লো—আমার কৈশোরকালে বাবা ব'লতেন—লেখাপড়া না শিখলে মৌ-আলুর (মিষ্টি আলুর) ডাঁটা চুষতে হবে। বৈদ্যকজীবনের প্রথম স্তরে এ ডাঁটা যে চুষিনি তা নয়, তারপর মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে দেখলাম যে এর নীচে যে মিষ্টি আলু; আজ তাই ভাবি, ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রথমটা যেন মৌ-আলুর ডাঁটা, খুঁড়লেই তবেই পাওয়া যাবে, নইলে ওই মাঠে ব'সে মৌ-আলুর ডাঁটাই চুষতে হবে। আজ বৈদ্যক সম্প্রদায় মাঠেই ব'সে আছে—তাই নয় কি?

CHEMICAL COMPOSITION

Epomoea batatas

1. (a) Moisture 68.5%; (b) Protein 1.2%, (c) Fat 0.3%, (d) carbohydrates 31.0%, (e) Mineral matter 1.0%. 2. Vitamins (Mg/100 g) (a) Thiamine (0.09-0.14), (b) Riboflavin (0.05-0.10), (c) Vitamin C (16-22). 3. Enzymes:— (a) Amylase, (b) Protease, (c) Invertase, (d) Catalase, (e) laccase, (f) arabinase, (g) galactanase, (h) Polygalacturonase, (i) peroxidase, ,Monophenolase, (k) catecholase (l) cytochrome C-oxidase; (m) Phosphonylase, (n) Phosphases. 4. Ipomocamarone. 5. Furan 3-carboxylic acid. 6. Trans-cinnamic acid. 6. Batatic acid.

রাজমাষ [বরবটী]

যে আহার্য ও ভেষজের নিবন্ধটি লিখতে ব'সেছি তা কা'দের আমলের, সেটা আমার কাছে ধোঁয়াই র'য়ে গেল, কারণ বেদে এই নামের কোন আহার্য বা ভেষজ খ'ুজে বের করা গেল না। তবে এটা তো প্রমাণিত যে, পৌরাণিক স্মার্ত মতের প্রবর্তক যাঁরা, তাঁরা ভেষজটিকে নাড়াচাড়া ক'রেছেন।

এখন এ প্রশ্ন এসে যায় যে, সেটা কোন্ কালে, কবে এবং কোথায়?

এ বিষয়টা ব'লতে গেলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রটার ইতিহাস একটু ব'লতে হয়।

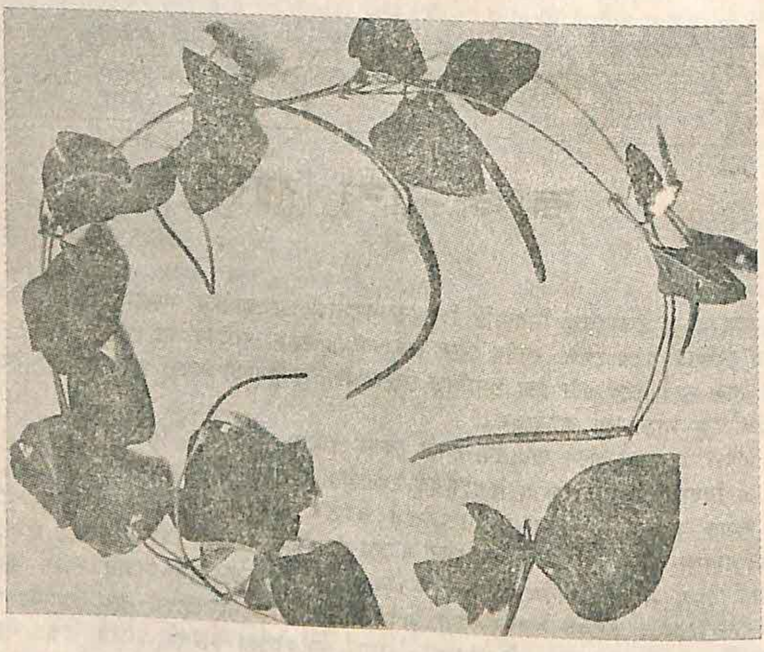
সমাজ সংস্কারার্থ যাঁরা স্মৃতিশাস্ত্রের প্রবর্তন ক'রেছিলেন, তাঁরা পর্ণনর দাহের একটা ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছেন, এর ক্ষেত্র হ'লো—যেকোন কারণেই হোক, যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গেল না, সোজাকথা বস্তুর অভাব, সেখানে লতা-পাতা-ফলের সঙ্গে একটা দেহ তৈরী ক'রে তাকেই শব কল্পনা, এবং তাকে পোড়ানো, একেই বলে পর্ণনর দাহ অথবা কুশপুত্তলিকা দাহ। এই "কুশপুত্তলিকা" নামকরণের কারণটা হ'লো, লতা, পাতা, ফল দিয়ে দেহের আকার আনতে কুশকে বাঁধার কাজে লাগানো হয়, তাই তার আর একটি নাম "কুশপুত্তলিকা"।

দেখুন "কল্প" একটি শব্দ—এর অর্থই তো কল্পনা, সেটায় উপসর্গ জুটে গেলেই তো অনু"কল্প" অথবা বি"কল্প" হ'লো; তাহ'লে আসল আর রইলো কি?

এদিকেও ভেবে দেখুন, আমাদের দেশে যে আচারপ্রথা তা প্রধানভাবে চারিটি—(১) বেদাচার (২) স্মার্তাচার (স্মৃতিশাস্ত্র লিখিত আচার) (৩) তন্ত্রাচার (৪) লোকাচার। এই লোকাচারটা আবার দেশভেদে বিভিন্ন, কারণ প্রাক্-আর্য প্রবর্তিত মিশ্র আচার ও অন্যতম সেইটাই লোকাচার।

বর্তমানে এই পর্ণনরের বা কুশপুত্তলিকার সঙ্গে আমাদের স্মার্তমতের অনুচর

যাঁরা তাঁদের আরও পরিচয় যে আছে সেটা নজরেই পড়ে না, তাঁরা একে শিকেয় তু'লে দিয়েছেন, কিন্তু রাজনীতিকগণ এই বস্তুটিকে প্রায়ই আমাদের সামনে হাজির করেন; তখন মনে করি, তাই তো স্মৃতিশাস্ত্র তো এক্ষেত্রে এখনও বেঁচে আছে! তবে তৈরীর সাজ-সরঞ্জামের হেরফের হ'য়েছে। বর্তমানে দেখি এটি তৈরী ক'রতে লাগে বিচালি (ধানের খড়) ও পাটের দড়ি—এই দুটি হ'লেই তৈরী হ'য়ে যায়; আর তখন লাগতো অনেক জিনিস—পলাশের ডাল লাগতো ৩৬০টি এবং কোথায় কতগুলি ডাল দেহটাকে তৈরী ক'রতে লাগবে তারও ভাগ ব'লে দেওয়া আছে; এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক উপকরণ লাগবে, যেমন মাথা তৈরী হবে নারকোল দিয়ে, মাংসের জন্য যব বাটা, দেহের নীচের দিকে থাকবে দুটি বেগুন আর একটি গাঁজর আর পেটটা জড়ানো হবে রাজমাষের বা বরবটী লতা দিয়ে; লাউও কিন্তু লাগে—আর সোনা, রূপো, পিতল, তামা, পারদ, হরিতাল—লাগে না এমন জিনিস নেই; অবশ্য সবই সংস্কৃত শ্লোকাকারে গরুড় পুরাণের উত্তর কাণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে বলা আছে।



তবে বলা যায় পৌরাণিক বা স্মার্তদের ব্যবস্থাগত কুশপুত্তলিকার যেখানে লাউ, নারকোল (নারিকেল), রাজমাষ (বরবটী) প্রভৃতি দিয়ে শব নির্মাণ, সেটা যেন দক্ষিণ-ভারত ও পূর্ব ভারতেরই যোগসাজসে। কারণ নারকোল তো এই দু'টি ভূখণ্ডেই জন্মে। যদিও তাদের মধ্যে লাউ ও রাজমাষ (বরবটী) নামক ২টি লতাফল সারা ভারতেই জন্মে। লাউ বৈদিকদের চিহ্নিত ভেষজ। তাহ'লে কি হবে—পরবর্তীকালেই তো পুরাণ গ্রন্থ রচিত হ'য়েছে সুতরাং এটিকে গ্রহণ করা তো স্বাভাবিক।

বৈদ্যকের নথি

এই রাজমাষ বা বরবটী ফলটি আহার্য ও ভেষজও বটে।

চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই রাজমাষের বা বরবটীর উল্লেখ আছে। রাজমাষ, নিষ্পাব, রাজশিম্বি এই তিনটি নামই উক্ত গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত। তবে বলা যায় চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে বলা হ'য়েছে—

রাজমাষঃ সরোরুচ্যঃ কফ শুক্রাম্লপিত্তকৃৎ।
স্বাদুশ্চ বাতলো রুক্ষঃ কষায়ো বিপাকে গুরুঃ॥

অর্থাৎ রাজমাষ আহার্য। এটি সারক, রোচক, কফকারক, শুক্রকারক এবং অম্লপিত্ত রোগে অহিতকর। এটি রসে স্বাদু, বাতবৃদ্ধিকর, রুক্ষ ও কষায়।

এ সম্বন্ধে সুশ্রুতের বক্তব্যে দেখা যায় সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ে, সেখানে মন্তব্য করা হ'য়েছে—

কষায় ভাবাৎ ন পুরীষভেদী ন মূত্রলো নৈব কফস্য কর্ত্তা।
স্বাদুর্বিপাকে মধুরোঽলসান্দ্র সন্তর্পণঃ স্তন্য রুচিপ্রদশ্চ॥

অর্থাৎ রাজমাষ বা বরবটী মধুর রস এবং মধুর বিপাক, স্তন্য এবং রুচিবর্ধকও নয়, আবার কফকারকও নয়। সুশ্রুতের বস্তু সমীক্ষাদি চরকের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে না, কারণ স্বাদুতা প্রকাশে উভয়ের মত অভিন্ন কিন্তু কষায় রসের ব্যক্ততায় চরকের অভিমত—এই বরবটী কফকারক, কিন্তু সুশ্রুতের সমীক্ষায় স্পষ্ট বলা হ'য়েছে এটি কফকারক নয়। তাছাড়া সুশ্রুতের বক্তব্যে আর একটি স্পষ্টতা যে, বরবটী রসেও মধুর, বিপাকেও মধুর।

উভয়ের দৃষ্টি তারতম্যের মীমাংসা এইভাবে করতে হবে।

চরকের দ্রব্যবিচার সামান্য পদ্ধতিতে অর্থাৎ আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় বলা যায়, চরকের বক্তব্যটি ইন্‌ডাক্‌টিভ মেথডে আর সুশ্রুতের বক্তব্যটি ডিডাক্‌টিভ মেথডে। সেইজন্যই চরকের সামান্য বা সাধারণ বিচারে যেহেতু কষায় রস অতএব সর্বধাতুরই শোষণ কাজ এর দ্বারা হয়। আর সুশ্রুতের বিশেষ পদ্ধতিটি হ'লো, যেহেতু চরক সম্প্রদায়ের বৈদ্যদের সঙ্গে সুশ্রুতের সম্প্রদায়েরও এই বরবটী মধুর রসসম্পন্ন, তখন অবশ্যই দেখতে হবে মধুর রস মাত্রেই তো বফবর্ধক হয় না, কারণ মধু, মিশ্রি, পুরাতন চাল, যব, মুগ এরা মধুর রসপ্রধান দ্রব্য হ'য়েও যখন কফবর্ধক হয় না, তখন কষায় রসের যোগ এবং বিপাকে মধুর রস হওয়ায় বরবটীর বিশেষ সমীক্ষা হ'লো এটি কফকারকও নয়, এবং কষায় রসের সামান্য ধর্মিতায় (সম+অন্য=সামান্য) জন্য মূত্রকারকও নয়।

এইজন্যই সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের ৬৬ অধ্যায়ে বলা হ'য়েছে—

রসৈঃ ধাতু মলৈঃ দোষা যান্ত্যসং জোজয়তাং পুনঃ।

অর্থাৎ রসের সাঙ্কর্য থাকার জন্য রসেরও অংশাংশ পরীক্ষা করা দরকার, তারই দ্বারা জানা যায় রসের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ না হওয়ায় তা অসংখ্য তো বটেই, এবং ফল লাভের দ্বারাও বোঝা যায় রসের অংশাংশ পরিকল্পনা।

এ ভিন্ন বাগ্‌ভটের সূত্রস্থানের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজমাষ বা বরবটীর নাম নিষ্পাব ও রাজশিম্বীর উল্লেখ। তারপর চক্রদত্ত তাঁর দ্রব্যগুণে যেটি ধ'রেছেন সেটি সুশ্রুতেরই শ্লোক, তবে সুশ্রুতের ছন্দ উপজাতি আর চক্রদত্তের ছন্দ অনুষ্টুপ।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণ— ইহা উষ্ণ, রুক্ষ, বলকারক, কামোদ্দীপক, স্তন্যজনক ও মৃদুবিরেচক।

ঔষধার্থ প্রয়োগ— বীজ বলকারক, তাই এটি অনেকে রান্না করে খেয়ে থাকেন। এভিন্ন উক্ত বীজ মূত্রকারক, ক্রিমিনাশক, ক্ষুধাবর্ধক ও স্তন্যবর্ধক। আয়ুর্বেদ মতে এটি গুরুপাক ও উদরাধ্মান কারক।

কাম্বোডিয়াতে বরবটীর ডাল পিত্তনাশক দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এভিন্ন এটি পাণ্ডুরোগে ও যকৃতের পীড়ায় ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন।

পরিচিতি

বর্ষজীবী লতানো উদ্ভিদ্, কাণ্ড মসৃণ, এতে কোন আকর্ষ (আকড়ি বা শুঁড়) না থাকলেও কোন গাছে বেড়ায় অথবা মাচায় প্রসারিত হয়। পাতার গড়ন দেখতে অনেকটা আলকুশী লতাগাছের (Mucuna prurita) পাতার মত ত্রিপত্র বিশিষ্ট। পাতার ডাঁটা (পত্রবৃন্ত) ও মূলকাণ্ডের সংযোগস্থল থেকে নূতন কাণ্ডশাখা বাহির হয়, উক্ত কাণ্ডশাখা ও মূলকাণ্ড থেকে ফুল ও শুঁটী হয়। ফুলের পাপ্ড়ি হলদে কিংবা লালচে রং-এর হয়ে থাকে। শুঁটী কনিষ্ঠাঙ্গুলির মত মোটা ও লম্বা প্রায় এক ফুট পর্যন্ত হতে দেখা যায়। ঐ শুঁটীর দুইটি বীজের মাঝখানে ঈষৎ চেপ্টা, তাছাড়া এই শুঁটী অনেক বীজবিশিষ্টও। সবুজ বর্ণের শুঁটী তরকারি হিসেবে রান্না করে খাওয়া হয়। এই শুঁটি পেকে গেলে রং-টা একটু হলদে হয়ে থাকে। বীজ থেকে নূতন চারা হয়। এর মূল সরু ও গুচ্ছাকার। ভারতের সর্বত্রই সবজি হিসেবে এর চাষ হয়ে থাকে। এর সংস্কৃত নাম রাজমাষ, বাংলা নাম বরবটী ও হিন্দী নাম লোবিয়া। বোটানিক্যাল নাম Vigna cylindrica Skeels ও ফ্যামিলি Papilionaceae.

ব্যবহার্য অংশ—শুঁটী ও বীজ।

লোকায়তিক যোগ

১। স্তন্য বৃদ্ধিতে— বরবটীর বীজ কাঁচা অবস্থায় দেহে অনুকূল হয় না। এই স্তন্য বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে একটু বক্তব্য রাখছি।

স্তন্যদুধ আপ্যধর্মী, এর বৃদ্ধির জন্য যে আহার্য ও ভেষজের প্রয়োজন তা যেন আপ্যধর্মী হয়, পূর্বেই আলোচনা করা হ'য়েছে যে সুশ্রুতের এবং চরকের বস্তু-সমীক্ষায় এটি মধুর বা স্বাদু রস, অতএব এই বরবটী দ্রব্যটি যখন তদ্ধর্মী, তখন এটির ব্যবহার স্তন্যের বৃদ্ধিতে খুবই কার্যকর। তবে শুষ্ক বীজকে সিদ্ধ ক'রে সেই সিদ্ধ জলটি খেতে হবে—মাত্রা কমপক্ষে ১০ গ্রাম হওয়া দরকার।

২। তরল দাস্তে— এ'দের পিত্তশ্লেষ্মার ধাত হ'লে সেই ক্ষেত্রেই কার্যকরী। দেহের বাহ্য আকৃতিতে বোঝা যায় না অথচ প্রত্যহই খুঁতখুঁতে মন, মল বেশ আঁট হয় না, প্রতিবারই নরম হয়, অল্প আমও থাকে, তাঁদের উচিত বরবটীর বীজ বালিতে ভেজে, ভেঙে, খোসাটা বাদ দিয়ে মিহি গুঁড়ো ক'রে নিতে হবে, সেই গুঁড়ো সকালে ও বৈকালে দু'বার ১ গ্রাম করে জলসহ খেতে হবে। এটা কিছুদিন খেলে (ঠাণ্ডা জলসহ) ওই অস্বস্তিটা চ'লে যাবে; মলও বেশ আঁট হবে। ৫/৭ দিন খাওয়ার পর উপকার বেশ বোঝা যায়।

৩। **সর্দির ধাতে—** যাঁদের স্বল্প ঠাণ্ডায় সর্দি হাঁচি দুইই হয়, তাঁদের উচিত বালিখোলায় ভাজা বরবটীর বীজ অল্প ভেঙে বার্লির মত রান্না ক'রে ছেঁকে সেই সিদ্ধ জলটা খেতে হবে। ১০ গ্রাম নিয়ে সিদ্ধ ক'রতে হবে। একবার ক'রে কয়েকদিন খাওয়ার পর যদি এটার পরিবর্তন না হয় তাহ'লে সকালে বৈকালে দু'বার খেতে হবে।

৪। **শুক্রের স্বল্পতায়—** খুব সংক্ষেপে বলি যে দ্রব্যের দ্বারা কামোত্তেজনা বাড়ে সেটা শুক্র বৃদ্ধির উপযোগী নয়, কিন্তু সৌম্যগুণ সম্পন্ন আপ্যধর্মী মধুর রসই শুক্র-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক। বরবটীর বীজ বালিতে ভেজে খোসা ছাড়িয়ে তাকে ভেঙে নিয়ে ৮/১০ গ্রাম নিতে হবে। তার সঙ্গে ১ কাপ দুধ ও ৩ কাপ জল মিশিয়ে সিদ্ধ ক'রে সেইটা প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে হবে। এইভাবে সপ্তাহখানেক ব্যবহার ক'রলে শরীরের উদ্দীপনা যে আসছে সেটা বোঝা যাবে এবং শুক্রের পরিমাণ যে বাড়ছে সেটা কার্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যাবে।

৫। **উর্ধ্বজত্রুগত কফে—** গলায় প্রায় শ্লেষ্মা জড়িয়ে যায়—তাঁদের পক্ষে বালি-খোলায় ভাজা বরবটী খোসা বাদ দিয়ে ভেঙে নিয়ে, তা থেকে ৫/৬ গ্রাম নিয়ে ১ কাপ গরম জলে রাত্রে ভিজিয়ে রাখতে হবে, পরের দিন সকালবেলা ওটাকে ছেঁকে ওই জলটা খেতে হবে—এই রকম ২/৪ দিন খেলে গলায় শ্লেষ্মা জড়ানোটা চ'লে যাবে।

বাহ্য প্রয়োগ

৬। **শোথে—** এই রোগ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে আলোচিত হ'য়েছে; তবুও সংক্ষেপে বলি যে, যে দ্রব্যের ক্বাথ, কিম্বা প্রলেপ দিয়ে ব্রণের ফুলো দূর হয় সেইটাই এখানে বক্তব্য, এই বরবটীর বীজ (কাঁচা) বেটে লাগালে যেকোন প্রকারের ব্রণের ফুলো কমিয়ে দেয়, শুকিয়ে দেয়। এটি কিন্তু আভ্যন্তরীণ শোথের জন্য নয় কিম্বা হৃদ্‌রোগ, মূত্ররোগ, অথবা শ্লেষ্মাজন্য পাণ্ডুরোগজনিত শোথের ক্ষেত্রে উপযোগী নয়।

নিবন্ধের বক্তব্য রাখা শেষ হ'লো; আর যেটুকু বলার আছে সেটা হ'লো—এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে ভেষজগুলিকে নব্যের সমীক্ষায় এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ আলোকে এসে যে বিচার পদ্ধতিটি স্থাপন করা হ'চ্ছে, তাতে কেউ বা উন্নাসিক কেউ বা অবজ্ঞা-দৃষ্টি আবার কেউ প্রসন্নচিত্ত; কিন্তু একটা কথা কেন যেন বার বার স্মরণে আসে। এই ভারতেই তো মহাভারত রচিত হ'য়েছিলো এবং সে গ্রন্থের বিপুলায়তন হৃদয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কত প্রাচীন কত নবীনের অভিজ্ঞতাকে বাণী রূপে লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে, আর সেসব বাণীর মধ্যেই তো পাই (মহাভারত শান্তিপর্বের অন্তর্গত আপদ্ধর্ম পর্ব ১৪২ অধ্যায়) ভীষ্মের বাণী সেটা শোনাচ্ছেন যুধিষ্ঠিরকে—

বিজ্ঞাতমর্থং বিদ্যানাং ন সম্যগিতি বর্ত্ততে।
নিন্দয়া পরবিদ্যানাং স্ববিদ্যাং খ্যাপয়ন্তি চ॥

অর্থাৎ আমরা যা জেনেছি, সব জানা হ'য়ে গিয়েছে, এর বেশী আর জানার কিছু নেই, এ অভ্যাস কু-অভ্যাস। ওতে সম্যক্ জ্ঞান হয় না, আর ওর বিদ্যেতে তেমন উৎকৃষ্ট পাবার কিছু নেই মনে ক'রে নিন্দে ক'রে নিজের বিদ্যে জাহির ক'রতে গেলে বিদ্বান-বুদ্ধিমান লজ্জিত হন, কারণ তাদিকে নিয়েও যে সমাজে থাকতে হবে, অথচ ওই তো তাদের বিদ্যে! এরা কিন্তু কাঁঠালের ভুতুড়ির মত সমাজের ভুতুড়ি।

CHEMICAL COMPOSITION

Vigna cylindrica

1. The pods contain (a) Moisture 85.3%, (b) Protein 3.5%, (c) Fat 0.2%, (d) Fibre 2.0%, (e) other carbohydrates 8.1%, (f) Mineral matter 0.9%; Calcium 72; Phosphorus 59; Iron 2.5; Carotene 0.564; Thiamine 0.07, Riboflavin 0.09, Niacin 0.9, and Vitamin C; (14 mg/ 100 g). 2. Enzymes :— (a) Hydrolysase, (b) proteinase, (c) Pectin-methyl esterase. 3. Fatty acids :— (a) Palmitic acid 33.4%; (b) Stearic acid 7.1%; (c) Arachidic acid 0.9%, (d) Behenic acid 4.0, (e) Lignoceric acid 1.1%, (f) oleic acid 12.2%, (g) Linoleic acid 27.4%, (h) Linolenic acid 12.3%. 4. Ribonucleic acid. 5. Hydroxylamine.

শিম্বী [শিম]

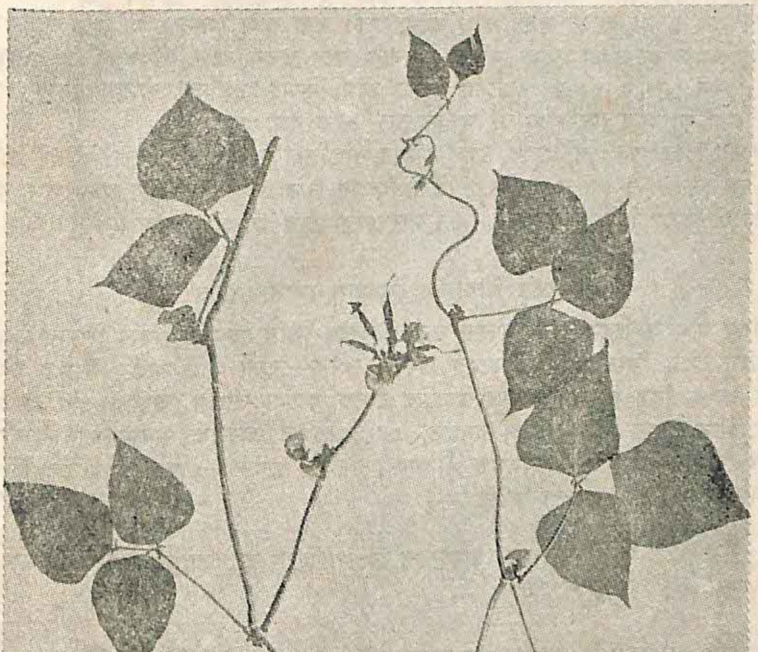
শিম্বীকে লিখতে ব'সে ভাবছি কাকে উপমা দিয়ে এর রূপের বর্ণনা করি; অবশ্য তার রূপটা সকলেরই দেখা থাকলেও বোধ হয় তলিয়ে দেখা কারও হয়নি; সেইটাকে তলিয়ে দেখতে গিয়ে আমার ভাঙ্গা-গড়া জীবনের অধ্যায়গুলি পরিক্রমা আরম্ভ ক'রলাম (অবশ্য মানসপটে)।

প্রথমেই দেখা পেলাম আমার খুড়োকে, খুড়ো রূপের তুলনাতে শিমকে হাজির ক'রতো—"ওকে দেখতে অনেকটা হিজড়ে মেয়েমানুষের মত, যেন শিম (অবশ্য তার অঙ্গ সৌষ্ঠবের দিক থেকে।)

দ্বিতীয় পরিক্রমায় মনে এলো আমরা যে মা সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্রে ব'লে থাকি— কুচভর নমিতাঙ্গী অর্থাৎ তিনি যেন স্তনভারে নুয়ে পড়ছেন—এও তো নারীর রূপের আখ্যান। তাই না কোন এক কবির কলমে নারীর সৌষ্ঠবের তুলনামূলক হ'য়ে উপস্থিত হয়েছে এই শিম্বী বা শিম। সেটা হ'লো—

মূর্খো নিন্দতি বিদ্বাংসং সতীংচ গণিকা তথা।
শুষ্ক শিম্বীস্তনী নারী কূর্পাসশোভনাং তথা॥

অর্থাৎ মূর্খ তো বিদ্বানকে নিন্দাই ক'রে থাকে, আর, যারা গণিকা তারা তো কুলবতী সতীকে দেখতেই পারে না, আবার শুকনো শিমের মত যে নারীর বুকের গড়ন, তাকে কাঁচুলী আঁটা দেখলে রাগ তো হবেই।



তাই বলছিলাম, শিমের রূপ যাই থাক, গুণ যে নেই তা নয়, আবার দোষও নেই তাই বা বলি কি ক'রে।

এইবার সেই সম্পর্কে আলোচনা করি। এটি যে বেদোক্ত ভেষজ সেটা নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না, তবে চরক সংহিতায় এটার উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে বলা হ'য়েছে—

শিম্বী রূক্ষ কষায়া চ কোষ্ঠে বাত প্রকোপনী।
ন চ বৃষ্যা ন চক্ষুষ্যা বিষ্টম্ভ্য চ বিপচ্যতে॥
(চরক সূত্রস্থান ২৭ অঃ ২৬/২৭ শ্লোক)

অর্থাৎ শিম যেমনি গুরুপাক, তেমনি বলহ্রাসকারী, আবার রুক্ষ স্বভাবের এবং কষায়ও বটে, আর উদরে গিয়ে বায়ুর প্রকোপ সৃষ্টি করে, এটা বৃষ্যও নয়, চাক্ষুষ্যও নয়, অর্থাৎ চোখের হিতকারীও নয়; এর আরও দোষ, পেটে গিয়ে অজীর্ণ, বায়ু, দুই করে। যদিও এটির রসাস্বাদ মধুর, এবং শীতবীর্য। তবে ওসব খুব বলবানের ভোজ্য।

এখন চরক সংহিতার মত প্রামাণ্য গ্রন্থে যদি শিম সম্পর্কে এমনি উক্তি থাকে, তবে তার ধারেকাছে কি যেতে ইচ্ছে হয়? এর গুণ সম্পর্কে গ্রন্থে বিরূপ মনোভাবের বক্তব্য রাখা হ'য়েছে। অথচ চরক ও সুশ্রুত দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থেই বলা হয়েছে যে, জগতে এমন দ্রব্য নেই যেটা ওষুধ নয়। তবে ব্যাধি দূর করার প্রয়োজনকে লক্ষ্য ক'রেই বিশেষ বিশেষ সংযোগ এবং বিয়োগ দ্বারাই তা করা যায়। এটা আরও পরিষ্কার ক'রে ব'ললে এই বলা যায় যে, দেহে দোষ-গুণ বিবেচনা করা হয় যে লক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা, দ্রব্যের মধ্যেও তেমনি কাল, ক্রিয়া, ফল প্রভৃতির অনুসরণে প্রতিটি দ্রব্যই ভেষজ; তাই দ্রব্যগুলি যে সময় কাজ করে, সেটা তার কাল (সময়), যা করে তা কর্ম, যে শক্তি দ্বারা করে, তা হ'লো বীর্য; যেক্ষেত্রে করে তাকে বলে অধিকরণ, যে প্রকারে করে (যেমন চূর্ণের দ্বারা, পাচনের দ্বারা কাথ, কষায় প্রভৃতির দ্বারা) তাকে বলে উপায় এবং যা করে (সুস্থতা বা অসুস্থতা) তাকে বলা হয় ফল।

অতএব দ্রব্যের গুণ, দোষ, ক্ষেত্র, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিবেচনা ক'রেই প্রতি দ্রব্যই যে ভেষজ এ বিষয়ে প্রবীণ দুটি সংহিতার উক্তি একই। তথাপি চরক সংহিতায় শিমকে এইভাবে চিহ্নিত করাটার মধ্যে সন্দেহের প্রচুর অবকাশ থাকবেই।

চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস সেনের বক্তব্য

শিম গুণগত হিসেবে উত্তরোত্তর ভালো, কারণ তিনি যে চার প্রকার শিমের উল্লেখ ক'রেছেন সেটা শিমের গায়ের রঙের তফাত থেকে—যেমন লাল রঙের শিমের থেকে হলদে রঙের শিম ভালো, আবার হলদের থেকে কালো ভালো, আবার তার থেকেও ভালো সাদা রঙের শিম। কারণ রসগত, এবং পাকগত তারতম্য থাকায় তার বীর্যগত অর্থাৎ যেটি উষ্ণবীর্য সেটি রসগত ও পাকগত থেকে প্রধান। এক্ষেত্রে শিবদাসেরই এই ব্যাখ্যায় শেষে তিনি মন্তব্য ক'রেছেন—

> "যে শিম্ব যেন প্রকারেণ রস পাকয়ো রুদিতাস্তে তথা আর্দ্রাজ্ঞেয়া, ন তু শুষ্কা"।

অর্থাৎ রসগত শক্তি অপেক্ষা যে দ্রব্যের বীর্যবত্তা আছে সেইটি লক্ষ্য রেখেই এখানে শিমের সম্বন্ধেও অভিমত প্রকাশ ক'রেছেন, তবে এটা ঠিক যে শিম কোন সময়ে শুষ্ক ভাল নয়, কাঁচাই ভাল।

এতক্ষণে শিমের প্রসঙ্গটি পরিষ্কার হ'লো যে, সাদা শিম অন্যান্য শিম অপেক্ষা খুবই উপকারী। সাদা শিমেরই একটা নাম "শ্বেত নিষ্পাব"। এই শিমেরই ভৈষজ্য প্রাধান্য, তবে অন্যান্য শিমের ক্ষেত্রেও সাত্ম্য অসাত্ম্য বিবেচনা ক'রে, তার রসের, বীর্যের বিপাকের তথ্য জানা যাবে।

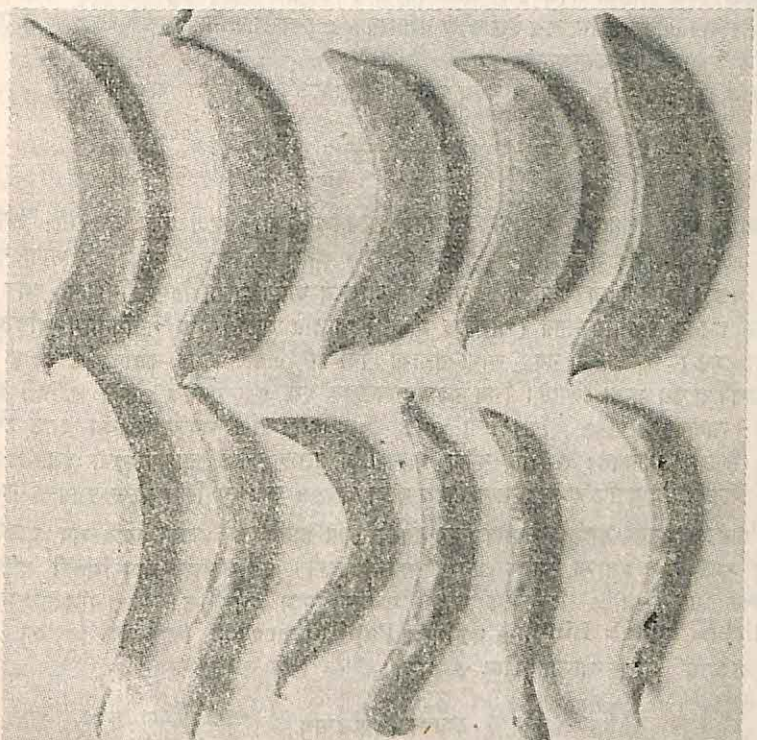
এখন প্রশ্ন এই যে—মহামতি চক্রপাণি দত্ত ও শিবদাস সেন মহাশয় যে সাদা শিমের গুণগত, রসগত ও বীর্যগত তথ্যটি বিচার ক'রেছেন, এ সম্বন্ধে আরও প্রাচীন গ্রন্থের বক্তব্যকে উপস্থাপিত ক'রলে সেটাই তো বেশী প্রামাণ্য হয়? শিম সম্বন্ধে তেমন উক্তি কোথায়? এ সম্বন্ধে সুশ্রুতে উক্ত আছে—

কটুর্বিপাকে মধুরস্তু শিম্বঃ প্রতিন্নবিন্‌মারুত পিত্তলশ্চ।
সিতাসিতাঃ পীতকরক্তবর্ণা ভবন্তি যেহনেক বিধাসশিম্বাঃ
যথোদিতাস্তে গুণতঃ প্রধানাজ্জ্ঞেয়া কটূষ্ণা রসপাকয়োশ্চ॥

(সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬/৪৩-৪৪ শ্লোক)

এই শ্লোকোক্তি থেকে এখন দেখা যাচ্ছে যে, চক্রপাণির টীকাকার শিবদাস সেনের বক্তব্যটি সুশ্রুত সংহিতারই এবং তাঁর টীকাটিও আচার্য ডল্বনেরই বক্তব্য।

এইবার এই শিমের প্রসঙ্গে আরও একটু তথ্য দিয়ে প্রসঙ্গটির উপসংহার ক'রছি। শিমের এক নাম নিষ্পাব, আবার বরবটীরও এক নাম নিষ্পাব। যদিও বরবটীর আরও



নাম আছে, তথাপি শিম ও বরবটী শ্রেণীগত হিসেবে একই। যাই হোক্‌, শিমকে কেন নিষ্পাব বলা হ'য়েছে, অভিধানকার ক্ষীরস্বামী (ইনি অমরকোষের টীকাকার) ব'লেছেন—

"নিষ্প্রূয়তে তুষাদ্যাপনয়নেন শোধ্যতে শূর্পাদিবায়ৌ তেন নিষ্পাবঃ"

অর্থাৎ এই শিমের বীজ শুকিয়ে, ওর খোসা ছাড়িয়ে কুলোয় ঝেড়ে শুদ্ধ করা বা পরিষ্কার করা হয়। এবং সেই বীজশস্যেরও ভৈষজ্যশক্তি আছে বীর্য ও বিপাকগত

হিসেবে। শিমের বীজের ডাল থেকে যে বেসন তৈরী হয় সেটি শুক্রগত দুর্বলতায় তেজস্বিতা আনে। তাছাড়া শিম বীজ (সাদা শিম) রক্তশ্রুতিরও নিবারক।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ—উষ্ণ, রুক্ষ ও স্বাদে ঈষৎ অম্ল, মূত্রকারক, বীজ জ্বরনাশক, ক্ষুধাবর্ধক, মেদের জনক, কামোদ্দীপক, আক্ষেপনিবারক, মৃদুবিরেচক ও রক্তের পক্ষে অহিতকর।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— প্রচন্ড ঠান্ডায় কান ও গলা ফুলে গেলে ও তজ্জনিত জ্বালা-যন্ত্রণায় শিমের পাতার রসের সহিত সামান্য লবণ মিশিয়ে ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। চীন দেশে উক্ত পাতার রস রজঃনিসারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কেউ কেউ শিমের বীজ শ্লেষ্মানাশের জন্য ও নাক থেকে রক্তস্রাব রোধে ব্যবহার করে থাকেন। এভিন্ন চীনদেশে উক্ত বীজ বলকারক ও কোষ্ঠগত বায়ুনাশক ঔষধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ইহা স্তন্যজনকও বটে।

শাক হিসেবে কচি পাতা ও বীজ ডালের পরিবর্তে রান্না করে খাওয়া যায়।

পরিচিতি

বাংলাদেশে শিমগাছ সম্পর্কে বর্ণনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না; তবুও বলি, এটা বর্ষজীবী লতানে গাছ। কোন কিছুকে অবলম্বন করে ওপরে ওঠে, সাধারণতঃ মাচা (মঞ্চ) ও ভারা বেঁধে দিলে তার ওপর লতিয়ে যায়। পাতা ত্রিপত্র বিশিষ্ট, আকারে দেখতে অনেকটা পারিভদ্রের (পালুতে মাদার) পাতার মত কিন্তু পত্রবিন্যাস শাঁকালু-পাতার মত। পুষ্পদন্ড বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট এবং তাতে রক্তাভ, শ্বেতাভ ও গোলাপী রঙের ফুল ফোটে। শিম বহু আকারের হয় এবং কয়েক প্রকার রঙেরও হয়ে থাকে; সাধারণতঃ ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা ও ১ থেকে ১½ ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া হতে দেখা যায়। শিমে সাধারণতঃ ৫-৭টি বীজ থাকে। বর্ষান্তে বীজ রোপণ করা হয়, শরতে গাছ বেড়ে ওঠে, কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ফুল হয় ও তৎপরে শিম হতে আরম্ভ করে।

ভারতের প্রায় সর্বত্রই সবজি হিসেবে শিমের চাষ হয়ে থাকে, তবে সব প্রদেশেই একই সময়ে চাষ হয় না, কারণ এটা ঋতুকালাপেক্ষী। এর সংস্কৃত নাম শিম্বী, বাংলায় প্রচলিত নাম শিম ও হিন্দীতে সেম, নিষ্পাব নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Dolichos lablab Linn. ও ফ্যামিলি Papilionaceae.

ব্যবহার্য অংশ—পাতা, বীজ ও মূল।

লোকায়তিক যোগ

লোকায়তিক ব্যবহারের মাধ্যমে অদ্যাবধি শিমের যে উপকারিতা দেখা যায়, সেগুলি সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। তবে সুশ্রুত, চক্রপাণি, ভাবপ্রকাশ, রাজনিঘণ্টুকারগণ শিমের দোষ ও শিমের গুণ সম্বন্ধে যত ব'লেছেন সবই কিন্তু শিমের বীজের বহিরাবরণ ও আভ্যন্তরীণ তথ্য নিয়ে। অর্থাৎ শিমের বীজেরই ভৈষজ্যশক্তি আছে রস ও বীর্যগত। শিমের বহিরাবরণটা দেহের অনুকূল হয় না।

১। জ্বরে— এ জ্বরটা কিন্তু পিত্তশ্লেষ্মা না হ'লে শিমের বীজের ব্যবহার ক'রবেন না। অর্থাৎ যে জ্বরে জিভে একটা চট্‌চটে প্রলেপ প'ড়ে থাকবে, মাঝে মাঝে

ঝিমুনি, অরুচি, অথচ পিপাসা, আবার মাঝে মাঝে শীত ক'রবে। এই রকম উপসর্গ দেখলে শিমের বীজ বালিতে ভেজে, ভেঙ্গে, খোসা বাদ দিয়ে চূর্ণ ক'রে নিতে হবে; সেই চূর্ণ ৫০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় এক কাপ গরম জলে ভাল ক'রে নেড়ে, মিশিয়ে নিয়ে দিনে অন্ততঃ ৩ বার খেতে হবে।

২। **অগ্নিমান্দ্যে—** অগ্নিমান্দ্য অনেক কারণেই হয়, আর অনেক রকমও হয়। তবে যে অগ্নিমান্দ্যে বমি বমি ভাব, আর যে রসের খাদ্য (টক, তিতো ও মিষ্টি) খেয়ে সেই রসেরই আস্বাদে ভরা ঢেকুর ওঠে আর দেহটা ভারী হ'য়ে থাকবে, সেই অজীর্ণে শিমবীজ চূর্ণ ৫০০ মিলিগ্রাম সকালে বৈকালে **২** বার আধ কাপ গরম জলসহ খেলে অগ্নিমান্দ্যটা ক'মে যাবে এবং শরীরটা সামলে যাবে।

৩। **রক্তস্রুতিতে—** নাক দিয়ে রক্ত পড়া, এটা সাময়িকও হয় এবং ঊর্ধ্বগত রক্তপিত্তের লক্ষণ থাকলেও হয়। যাই হোক্, ওসময় শিমবীজ চূর্ণ (এটা ভাজা নয়) সকালে ও বৈকালে দু'বার ৫০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় ঠাণ্ডা জলসহ খেলে রক্তস্রুতি বন্ধ হয়ে যাবে।

৪। **সম্ভোগের অপূর্ণতায়—** যারা সহজে ও সুলভে কিস্তিমাত ক'রতে চান, তাঁদের জন্যে এটা লেখা হ'লো—কিছু শিমের বীজ রাত্রে দুধে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকালে ওগুলির খোসা তুলে ফেলতে হবে। দুধটা ফেলার দরকার নেই, ওর সঙ্গে আরও খানিকটা দুধ ঢেলে দিতে হবে। তারপর ওই শিম বীজগুলি শিলে বেটে ওটাকে গাওয়া ঘিয়ে ভেজে নিতে হবে। একটু লাল্চে আভা হলে নামাতে হবে। তারপর বীজের দ্বিগুণ মাত্রায় চিনি মিশিয়ে পাক ক'রে নামাতে হবে। এর সঙ্গে একটু জায়ফল চূর্ণ মেশাতে হবে। এই হালুয়া এমন পাক হওয়া উচিত যেন নষ্ট না হয়। প্রত্যহ ৫ গ্রাম মাত্রায় দুধসহ একবার অথবা দুইবার সকালে ও বৈকালে খেলে চাহিদাটা মিটে যাবে। ৫-৭ দিন খাওয়ার পর এটার অনুভূতি হয়।

শিমের নিবন্ধ শেষ হ'লো। এই ভেষজটিকে নিয়ে লেখাটির প্রারম্ভে খুড়ো আর পণ্ডিতের তীক্ষ্ম শ্লেষ হয়তো কারো কারো মনঃপূত হয়নি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার ক'রতে হ'চ্ছে, বৈদ্যকসম্প্রদায়ের পরিণতি সেই চিম্সে শিমের মত। এখন ভাবতে হচ্ছে কেন, এ অবস্থা আজ অর্ধশতাব্দী ধরেই চ'লছে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও যে হয়নি তা নয়। আরও আপশোশ কি জানেন? কেউ যদি ভালোবেসে বৈদ্যকের সঙ্গে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় অথবা প্রেমে পড়ে, তাহ'লে বান্ধবীদের শ্লেষে তাকে জর্জরিত হ'তেই হবে। আঃ মরণ প্রেমে পড়ার আর লোক পেলিনি?

আচ্ছা, কেন এমন হ'লো? এরাও তো একদিন জীবন রক্ষাই ক'রতো? তাহ'লে এ গলদ কবে থেকে হ'লো?

এ সম্বন্ধে আমার সমীক্ষা হ'লো, এটা সেইদিন থেকে আস্তে আস্তে সমাজে দানা বেঁধেছে, যখন থেকে শুয়ে প'ড়ে পা দিয়ে চালের ভাঁড়টা নেড়ে দেখতে আরম্ভ করেছি, চাল আছে কিনা? যাকে ব'লে অনুশীলন নেই এবং চেষ্টাও নেই, তাই গতিশালিতাও আজ স্তব্ধ।

CHEMICAL COMPOSITION

Dolichos lablab

1. Analysis of green material :— (a) Moisture 79.9%, (b) Organic matter 17.8%, (c) Ash 2.3%, (d) Nitrogen 0.71%, (e) lime 0.43%, (f) Potash 0.3%, (g) Phosphoric acid 0.18%. 2. Analysis of dry pulse:— (a) Moisture 9.6%, (b) Protein 24.9%, (c) Fat 0.8%, (d) Mineral matter 3.2%, (e) Fibre 1.4%, (f) Carbohydrates 60.1%, (g) Calcium 0.066%, (h) Phosphorus 0.45%. 3. The chief protein of the bean is globulin, dolichosin.

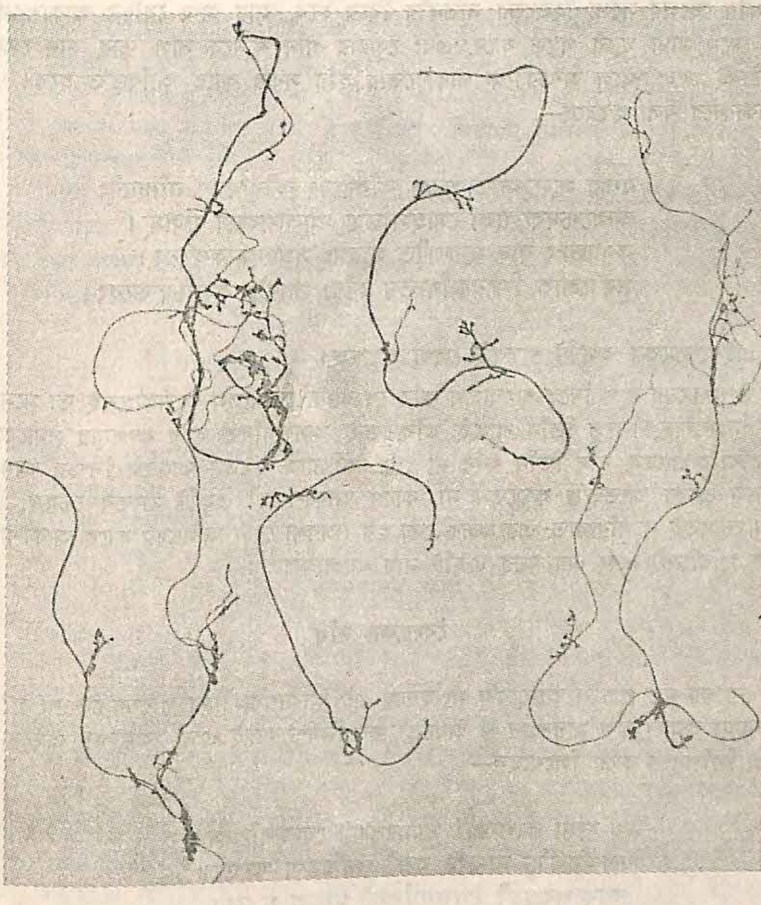
আকাশবল্লী

গুলমার্গের রাস্তায় এক আস্তিক ও নাস্তিকের বিতণ্ডা চ'লছে। নাস্তিক ব'লছে—দ্যাখো, তোমাদের দেবদেবীগুলো সবই আকাশবেলের মত (আকাশবল্লী প্রচলিত নাম), এর জড় (মূল) খুঁজে পাওয়া যায় না। আর আস্তিক ব'লছে—তুমি কি তাহ'লে “বাওয়া ডিমের” প্রতীক? বাওয়া ডিম কি রকম? কেন? জান না? মোরগের সঙ্গে কোন সংসর্গ নেই, অথচ মুরগী ডিম তো পেড়েই যাচ্ছে; এ ডিমে কি আর বাচ্চা হয়? নাস্তিকের সংবিৎ ফিরে এলো; তার মনে প'ড়ে গেল এক বৈদ্যরাজের কথা, তিনিই তো ব'লেছিলেন—আমার ওষুধ তৈরী হয় জলের গুঁড়ো, রোদ্দুরের (রৌদ্রের) শিকড় আর ঢেঁকির ভস্ম দিয়ে; তাই এটা মৃতসঞ্জীবনী বুটি। এইটা শুনে আস্তিক্যবাদী একটা গল্প ফাঁদলো, তবে সেটা একটা পুরাণের কাহিনী।

এখন আপনি যদি শ্রোতা হন তাহ'লে আস্তিক আর নাস্তিকের ডেফিনিশন্ (Definition) না জানলে গল্পটা গলাধঃকরণ ক'রলেও রসাস্বাদের উপলব্ধি হবে না, তাই ব'লছি, আস্তিক আর নাস্তিক এই ধরনের দুটি সংস্কৃতি আজও অটুট।

যাঁরা ঈশ্বরে আস্থা না রেখে বাকী সবেতেই আস্থা ও সত্যবোধ পোষণ ক'রে থাকেন তাঁদিকে বলা হয় নাস্তিক। পূর্বে তাঁদেরই বলা হ'তো দৈত্য।

এমনি একটি ঘটনার নায়ক ভক্ত প্রহ্লাদ। এ উপাখ্যান অনেকের জানা থাকলেও, আসল কথাটা হয়তো অনেকেরই জানা নেই, সেটা হ'লো, এমনি এক দৈত্য ছিলেন হিরণ্যকশিপু, (হিরণ্য মানে সুবর্ণ বা সোনা আর কশিপু হ'লো বস্ত্র ও খাট-পালঙ্ক



অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু ও তাঁর পুত্র প্রহ্লাদের বংশ এত ধনী যে সোনার খাট-পালঙ্কও ছিল এবং সোনার জরির কাপড়-চোপড়ও ব্যবহার ক'রতেন, তাই তাঁর এই নাম) হ'লে কি হবে, তিনি কিন্তু কোন ঈশ্বর মানতেন না। পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন বিপরীত—শ্রীহরিই তাঁর উপাস্য; এটা ছিল তার স্বভাব প্রকৃতি; অতএব পিতা ও পুত্রের স্বভাবটাই ছিল বিপরীতমুখী। পিতা এমন পাঠশালায় প্রহ্লাদকে প'ড়তে দিয়েছিলেন, যে পাঠশালার

গুরু হিরণ্যকশিপুর ভয়ে অর্থাৎ রাজশাস্তির শঙ্কায় প্রহ্লাদের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। ওই হরিভক্ত ছেলেটি অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে হরিনাম চর্চা যেন না করে। হ'লে কি হবে, এ তো নাম প্রচারের জন্যই শ্রীহরির প্রেরিত দূত।

এই নাম উচ্চারণও যাতে না করে, তার জন্য সব রকম চেষ্টা ক'রেও নিরস্ত ক'রতে পারেন নি, তাই অগত্যা তাকে মেরে ফেলার সঙ্কল্প নিলেন। তার জন্য চেষ্টাও ক'রেছিলেন সর্ব প্রকারে; এমনকি হাতির পায়ের তলায়, আগুনে, সমুদ্রে ফেলেও তাকে মেরে ফেলা গেল না, তারপর একদিন পিতা গিয়েছেন পুত্রের কাছে, এই কথা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ব'লতে—এ নাম যেন সে না করে। কিন্তু সেটাও যখন হ'লো না, তখন রেগে গিয়ে ব'লছেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর হরি সেই দিনই দেখা দেবে, যেদিন বন্ধ্যার নাতনীর ছেলের সঙ্গে হিজড়ের নাতনীর বিয়ে হবে, আর অন্ধ যেদিন আকাশবল্লীর ফল দেখে মাথা ঘুরে প'ড়ে যাবে, এবং বোবার গান শুনবে সাপ তার কান পেতে, সেইদিনই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে থাকা তোর হরি সবার কাছে আবির্ভূত হবে। তাই শ্লোকাকারে বলা হ'য়েছে—

বন্ধ্যা সূনু-সুতাঙ্গজঃ পরিণয়েৎ ক্লীবাত্মজা নন্দিনীং
অন্ধশ্চেদবলোক্য মোহপতিত আকাশবল্লী ফলম্।
কর্ণাভ্যাং যদি মূকগীত মুরগঃ সানন্দমাকর্ণয়েৎ।
সর্বালোক শিরোমণিস্তব হরিঃ স্পষ্টঃ কদাচিদ্ ভবেৎ।

এই শ্লোকের অর্থটি পূর্বেই লেখা হ'য়েছে।

উপাখ্যানের রূপ দিতে গল্পাংশে কবি যে বক্তব্য রেখেছেন অনেকাংশেই তা মনোহর এটা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তিনি শুধুই কবি, তাই অসম্ভাবিত বস্তু কল্পনার সমাবেশেই চিত্রকাব্য ক'রেছেন, যদি তিনি কবি না হ'য়ে কবিরাজ হ'তেন তাহ'লে নিশ্চয় আকাশ-বল্লীকে এদের অন্তর্ভুক্ত ক'রতেন না, কারণ আকাশবল্লী একটি বাস্তব ভেষজ, এবং সারা ভারতেই সুপরিজ্ঞাত, এর ফলও তো হয় (অবশ্য যেটা আমাদের কাছে আকাশবল্লী ব'লে পরিচিত) এবং এর আর একটি নাম অলোকলতা।

বৈদ্যকের নথি

চরকের মত প্রাচীন আয়ুর্বেদ সংহিতায় এই আকাশবল্লীটির পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে বৃক্ষরুহা বলে (চরক সূত্রস্থান ৪ অধ্যায়), রাজনিঘণ্টুকারই একে স্বগ্রন্থের গুড়ুচ্যাদি-বর্গে লিপিবদ্ধ ক'রে লিখেছেন—

খ-বল্ল্যা কাশবল্লী স্যাদষ্পর্শা ব্যোমবল্লিকা।
স্বর্ণবল্লীচ নামানি বল্লী পর্য্যায়গা স্মৃতা॥
আকাশবল্লরী পিত্তনাশিনী মধুরা চ সা।
রসায়নী চ বৃষ্যাসা কটুকা বলবর্দ্ধনী।
গ্রাহিণী পিচ্ছিলা তিক্তা হৃদ্যাগ্নি বলবর্ধনী॥

তবে এইটুকু বলা যায় যে, লতাটির মধ্যে ব্যক্তরস তিক্ত-কষায়, আর অব্যক্ত রস মধুর। বিপাকে কটু আর রোগনিবারণী শক্তিটি বীজেই বেশী, আর কোন কোন বৈদ্য

মূদু বিরেচনের জন্য এর গাছের রসও ব্যবহার করেন, তবে গাছটির ব্যবহার বাহ্য-রোগ দূরীকরণেই লক্ষ্য করা হয়। এক কথায় বলা যায়, এটি ওষধির সংজ্ঞা হিসেবে ওষধি নয়, এটি গুল্ম। ভারতীয় নিঘণ্টু গ্রন্থের বর্গ নিরূপণের মধ্যে এটি গুড়ূচ্যাদি বর্গে গৃহীত হ'য়েছে কিন্তু চরকীয় ধারায় সেভাবে দ্রব্য নিরূপণ হয় না। চরক সংহিতার অভিমত, যথা—বহূনাং কর্মণাং করণে পুরুষঃ সমর্থোভবতি, তদ্বদ্ ঔষধ দ্রব্যমপি—অর্থাৎ একই ব্যক্তি যেমন বহু কাজ ক'রতে পারে, তেমনি একই ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন কাজ ক'রতে পারে ব'লেই, তাকে কর্মসংজ্ঞাই দেওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোন বিশেষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যায় না। এই আকাশবল্লীটির ক্ষেত্রেও এটি যখন বৃষ্য কাজ করে তখন এটি রসায়ন এবং যখন অগ্নিবর্ধনের কাজ করে তখন দোষ শমন। নিঘণ্টুকার এর পরিপাকে ব'লেছেন, এটি বিপাকে কটু। কথাটা পরিষ্কার ক'রে ব'ললে হয়তো বোঝা যাবে, যে ওষধি দ্রব্যের মধ্যে যে গুণ থাকে বিপাকেও তাই হয়; দ্রব্যটি পিচ্ছিল, এটাও একটা গুণ, অতএব গুণগত বিপাকে গুরু। গুণ এবং রস এ দুটির ক্ষেত্রেও বক্তব্য যে, রসের প্রাধান্য তার কর্মগত, সেই কার্যশক্তির পরিণামই বিপাক, আবার বিপাক গুণ-নিষ্ঠও। সেক্ষেত্রে পিচ্ছিলতাও তার গুণগত বৈশিষ্ট্য।

এদিকে রসগত স্বভাবে মুখ্যতঃ যখন তিক্ত কষায় অতএব এটিতে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বায়বীয় শক্তি, পার্থিব ও আকাশীয় শক্তি অবশ্যই আছে। আকাশবল্লীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়, এটি চটকালেই পিছল পিছল হয়।

পিচ্ছিল দ্রব্যকে আয়ুর্বেদ সংহিতার উপদেশ—

"পিচ্ছিলস্যোপলেপন-পূরণ-বৃংহণ সংশ্লেষণ বাজীকরণানি"

(সুশ্রুত সূত্র ৪১)

অর্থাৎ যে দ্রব্য চটকালে পিছল হয়, সেটি পূরণ (ক্ষতপূর্তি) বৃংহণ, সংশ্লেষণ (জুড়ে দেওয়া) এবং বাজীকরণের কাজ করে। আর বিশদ কাজে থাকে লঘুবীর্যতা এবং পিচ্ছিল দ্রব্যে থাকে গুরু বীর্যতা।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— স্বাদে তিক্ত, ধারক, বলকারক, পিত্ত ও কফের নাশক, শ্লেষ্মানিঃসারক, ঘর্মকারক, রক্তদুষ্টি পরিষ্কারক, বিরেচক ও পেটের বায়ুনাশক।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— ডাঁটা পিত্তজনিত রোগে বিরেচনার্থ ব্যবহৃত হয়। পাতার রস দূষিত ক্ষতাদি ধোয়ার জন্য কেউ কেউ ব্যবহার করেন। বীজ ক্রিমির উপদ্রব নিবারণের জন্য, পেটের বায়ুনাশেও খাওয়ানো হয়। এভিন্ন সিন্ধু ও পাঞ্জাবের চিকিৎসকেরা উক্ত বীজ সারসাপেরিলার সাথে রক্তদুষ্টিতে ও খোস-পাঁচড়া প্রশমনের জন্য প্রয়োগ করে থাকেন। তাছাড়া কারো কারো মতে এই বীজ পাণ্ডুরোগে, পক্ষাঘাতে ও মাংসপেশীর ব্যথায়, যকৃত ও প্লীহারোগে এবং রজঃনিসারক হিসেবে ও হিক্কায় এবং মূত্রকারক ঔষধ রূপেও ব্যবহৃত হয়।

পরিচিতি

পরজীবী হ'লদে (সোনালী রঙের) নরম সরু লতা, এতে পাতা হয় না বটে, কিন্তু শাখা-প্রশাখা হয়। এগুলি সাধারণতঃ বেড়ার ধারে ও অন্যান্য গাছের গায়ে জোঁকের

মত ব'সে যায়, এর কিন্তু মূল খ'ুজে পাওয়া যায় না। ছোট ছোট সাদা ফুল হয়, মনে হয় বোঁটা নেই, কিন্তু আছে, সেটা খুব ছোট, এবং গুচ্ছাকারে হ'তে দেখা যায়, পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবন্ধ ফুল ও ফল হয়। সাধারণতঃ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ফুল ও এপ্রিল-মে মাসের দিকে ফল হয়। সারা ভারতের সমতল ভূমিতে তো হয়ই, তাছাড়া হিমালয় অঞ্চলের প্রায় আট হাজার ফুট উ'চু জমিতে দেখা যায়। এর সংস্কৃত নাম আকাশবল্লী, যেহেতু এরা মাটির সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে কেবল পরাশ্রয়ী হয়ে বে'চে থাকে বলে এর নাম আকাশবল্লী। বাংলায় প্রচলিত নাম অলোকলতা বা স্বর্ণ-লতা ও হিন্দীতে আকাশবেল নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Cuscuta reflexa Roxb. ও ফ্যামিলি Convolvulaceae.

ব্যবহার্য অংশ— বীজ ও সমগ্র লতা।

লোকায়তিক যোগ

এটি সাধারণভাবে কাজ করে রসবহ স্রোতে।

প্রথমেই বলে রাখি, এই লতা-ফল শুকিয়ে রাখতে চাইলে একে অল্প ভাপ (ষ্টীম্) দিয়ে তারপর রৌদ্রে দিলে তবে শুকোয়।

১। পেট ফাঁপায়— এখন আর পেট শব্দ নিয়ে শব্দ বিচারটা নিরর্থক। এই কথাটাই তো সারা ভারতের দেশীয় শব্দ। প্রকৃতপক্ষে ওটা কোন মৌলিক সংস্কৃত ভাষাই নয়। পেটকে উদরই বুঝে থাকি। আবার ফাঁপা শব্দটির ক্ষেত্রেও তাই, এর আদি রূপ ছিল স্ফীত। তা গড়াতে গড়াতে কি এক অদ্ভুত রূপ নিয়েছে ফাঁপা। আসলে পেট ফাঁপা মানে উদরাধ্মান। উদরাধ্মান রোগটির সম্বন্ধে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩০৮ পৃষ্ঠায় এবং ৩৩১ পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে। এই ক্ষেত্রে আকাশবল্লীর বীজ বেটে (১ গ্রাম আন্দাজ) একটু গরম জলসহ খেলে ওটা ক'মে যায়। এমনকি ওর বীজ সিদ্ধ ক'রে পেটের চারদিকে প্রলেপ দিলেও ক'মে যায়।

২। রক্তদুষ্টিতে— এর সম্বন্ধে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে (পিত্তজনিত ব্যাধিতে) বলা হয়েছে। তেমন অবস্থা হ'লে আকাশবল্লীর বীজ বেটে সরবত ক'রে খেলে (এক গ্রাম) ওটার অসুবিধেগুলি দূর হয়। তবে এটা ১০/১৫ দিন না খেলে উপকার পাওয়া যায় না। এমনকি এর মূল বেটে খেলেও কাজ হয় কিন্তু আকাশবল্লীর মূল কি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে? তাই এর নাম আকাশবল্লী।

৩। ঘুস্‌ঘুসে জ্বরে— দীর্ঘকাল ধরে ঘুস্‌ঘুসে জ্বর চ'লতে থাকলে আকাশ-বল্লীর মূল ১/১½ গ্রাম জলে বেটে কয়েকদিন একবার ক'রে খেলে ঐ জ্বর কয়েকদিনের মধ্যেই নিরাময় হয়।

৪। ক্রিমিতে— এটি শরীরে কিভাবে এবং কতপ্রকারে জন্ম নেয় সেটা এই গ্রন্থের প্রতিখণ্ডেই লেখা হ'য়েছে। যাঁরা স্বল্পায়াসে এই ক্রিমির জড় (মূল) বিনষ্ট ক'রতে চান তাঁরা আকাশবল্লীর বীজ প্রত্যহ সকালে ১ গ্রাম মাত্রায় জলে বেটে খেয়ে দেখতে পারেন। কোন কোন বৈদ্য সমপরিমাণ যোয়ান নিয়ে একসঙ্গে বেটে ছোট ছোট বড়ি ক'রে রেখে থাকেন; সেটা সকালে ১টা এবং বৈকালে একটা জলসহ খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন।

৫। যকৃতের ব্যথায়— লিভারে ব্যথা বললেই মনে ক'রতে হবে, এটি প্রায়শঃ সংযোগবিরুদ্ধ আহারের দোষে দেখা দেয়, প্রস্রাবটা ক'মে যায়, এবং মাঝে মাঝে কুন্‌কুনে

ব্যথাও হয়। এ সময় ওটাকে উপেক্ষা ক'রলে এবং সাবধান না হ'লে পরিণামে অনেকেরই যকৃতে আরও কঠিন রোগ হয়। এই লক্ষণ দেখা দিলেই আকাশবল্লীর সোনালী লতা ১ গ্রাম মাত্রায় নিয়ে বেটে জলসহ সরবত ক'রে খেতে হবে।

বাহ্য ব্যবহার

৬। **আঘাত লাগলে—** যেকোন স্থানে আঘাত লেগে বেশ ব্যথা হ'য়েছে, কিছুতেই ব্যথা ক'মছে না, এই সময় আকাশবল্লীর লতা বেটে গরম করে প্রলেপ দিতে হয়। এটা ২/৩ দিন লাগালেই ব্যথাটার উল্লেখযোগ্য উপশম হয়।

৭। **ক্ষত ধোতে—** অলোকলতার ডাঁটা সিদ্ধ ক'রে সেই জল দিয়ে ক্ষত ধুলে ওটা তাড়াতাড়ি পুরে ওঠে। কাঁচা ৫/৭ গ্রাম নিয়ে সিদ্ধ ক'রে সেই জলটা ছেঁকে ব্যবহার ক'রতে হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য— এই দ্রব্যটি প্রত্যহ বেটে সরবত ক'রে খাওয়ার অসুবিধে হওয়াটা স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে এর বীজ গুঁড়ো ক'রে রেখে দিলেও চ'লবে। তখন ৫০০ মিলিগ্রাম (৭/৮ গ্রেণের মত) গুঁড়ো জলসহ খেলেও হয়।

আকাশবল্লীর ভৈষজ্য শক্তি বিস্তৃত ক'রে লেখা হ'লো—কিন্তু কেন যেন মনে হ'চ্ছে, আমাদের (বৈদ্যক সমাজের) অবস্থা ঠিক যেন আকাশবল্লীর মত। কেন ব'লছি? সেই একই ভেষজ, একই ধাতু—সেগুলি অবলম্বন ক'রেই বহু চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্ববন্দিত হ'য়েছেন ও হচ্ছেন, আর আমরা কিন্তু সেই আকাশবল্লীর মতই হ'য়ে আছি।

CHEMICAL COMPOSITION

Cuscuta reflexa Roxb.

The stem contains:— Cuscutin and cuscutalin. The seed contains:-- the pigments amarbelin; cuscutin; wax (esters); greenish yellow semi drying oil (linolenic 9·9%, linolic 17·2%, oleic 25.5%, stearic 27·2% and palmitic acid 11·5%) and unsapnifiable substance (phytosterol).

বন্ধুজীব [বন্ধুক]

আমাদের দেশের বহুল প্রচলিত কথা—"রথ দেখা আর কলা বেচা"; কিন্তু এ ভাব-ধারায় আমরা সর্বদাই তো চ'লে থাকি।

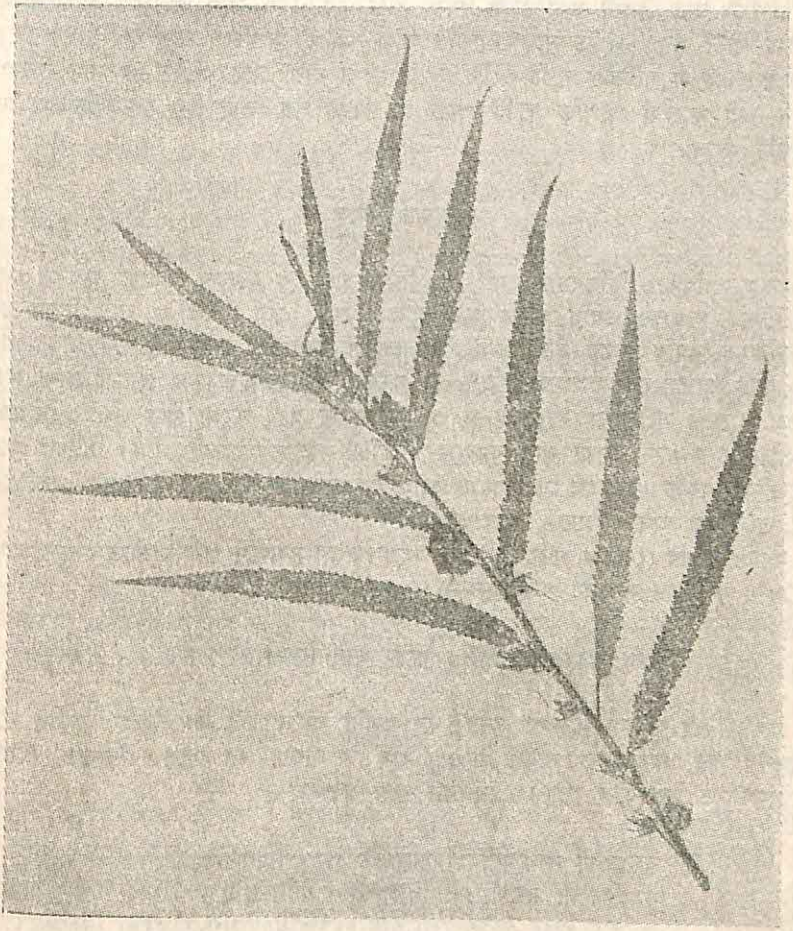
কেন বলছি? আমরা কি শুধুই তীর্থ দর্শন ক'রে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য যাই? দেশভ্রমণ বিলাসটা তারই একটা প্রচ্ছন্ন বাসনা নয়? আজ আমার বনৌষধি নিবন্ধ লেখাও সেই ধরনের প্রচ্ছন্ন বাসনাকে সামনে রেখে।

দেখুন, আমাদের বর্তমান কর্মবহুল জীবনে সাতকান্ড রামায়ণ পড়ারও সময় নেই, আর অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত ওল্টাবার ধৈর্যও নেই; এভিন্ন, অষ্টাদশ পুরাণের কাহিনী তো পর্বতপ্রমাণ, তাই প্রাচীনকালে এইসব কাব্যিক ঘটনাগুলোকে গল্পচ্ছলে একটু ঝালিয়ে রেখে যাচ্ছি, অবশ্য ক্ষেত্র বুঝে।

এই বন্ধুজীব বনৌষধিকে রামায়ণে হাতড়ে পাওয়া গেল, সেখানকার পরিবেশটার উপাখ্যানাংশ এখানে তুলে দিলাম।

লঙ্কাধিপতি রাবণ অপহরণ ক'রেছেন জনকদুহিতা রামগৃহিণীকে। তারপর থেকেই রাম নিজেকে খুবই অসহায় মনে ক'রে একেবারে ভেঙ্গে প'ড়েছেন, মনের দিক থেকেই বেশী, অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে থাকলেও এই অপরিচিত দেশে কি ক'রতে পারেন? ঘটনা পরম্পরায় হনুমানের সঙ্গে পরিচয়, সেই পরিচয় গাঢ় সৌহৃদ্য ও বিশ্বস্ততার কারণ হ'য়ে পড়ে আর সেইজন্যই তারই সুযোগে সুগ্রীবের সাহচর্য লাভ হ'য়েছিলো। সুগ্রীবেরও সেই একই দশা, কারণ তাঁরও পত্নীকে হরণ ক'রেছিলেন দুর্ধর্ষ রাজা বালী। প্রখর বুদ্ধি-শক্তির জোরে এবং রামের সহায়তায় সুগ্রীবের পত্নীকে ফিরিয়ে এনেছিলেন বালীকে নিহত ক'রে, তার জন্য সুগ্রীব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমিও আমার সাম্রাজ্যের সৈন্যবল ও অর্থবল দিয়ে আপনার পত্নীকে রাবণের কবল থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার

সমস্ত প্রয়াস ক'রবো। প্রতিশ্রুতি দিয়েও কিন্তু তা দ্রুত পালন ক'রতে পারেন নি, যেহেতু সে সময়টা ছিল বর্ষাকাল, কারণ বর্ষাকালে সংগ্রাম করা যায় না, শরৎকাল এলেই সম্ভব হবে। অগত্যা রাম লক্ষ্মণ মাল্যবান পর্বতে কুটির বেঁধে বর্ষাকাল অতিবাহিত ক'রতে বাধ্য হ'লেন।



অবিশ্রান্ত বর্ষার ধারার মত বিরহী রামের হৃদয়ও উদ্বেল হ'য়ে উঠছিলো। যে পর্বতে রামের কুটির ছিল সেখানকার বনজপুষ্পের বর্ণনায় বন্ধুজীব পুষ্পের উল্লেখ। সেখানে বলা হ'য়েছে—

অসনাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
দৃশ্যন্তে বন্ধুজীবাশ্চ শ্যামাশ্চ গিরিসানুষু॥

(রামায়ণ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৩০।৬২)

এই বন্ধুজীবের কথাই ভাবছিলাম, কি সুন্দর নাম! এই নামের অর্থ-রহস্যটিও

সুন্দর। এদিকে দেখা যায় বন্ধু শব্দটিও বৈদিক (ঋক্ ১।১৫৪।৪ সূক্ত) বন্ধু মানেই স্নিগ্ধ বন্ধন—"অত্যাগ সহনো বন্ধুঃ"—ভাবার্থ হ'লো যে, পরস্পর ত্যাগ সইতে পারে না। এই বন্ধুজীব নামকরণের একটা তাৎপর্য প্রায়ই দেখা যায়, সেটা হ'লো, এক বোঁটায় দু'টি ফুল; মনে হয় তাই এর নাম দেওয়া হ'য়েছিলো বন্ধুজীব, এভিন্ন একে বলা হয় দ্বিবৃন্ত অর্থাৎ দু'টি বোঁটা। এই বৃন্ত শব্দটাই ভ্রষ্ট হ'য়ে বোঁটা হ'য়েছে।

এখানে আর একটা কথা ব'লে রাখি, আর এক রকম ফুল এই বর্ষাকালে আমরা দেখতে পাই, তার চল্‌তি নাম দোপাটি ফুল—এটাও অপভ্রংশ নাম দ্বি থেকে "দো" হ'য়েছে। এই ফুলটিরও দু'টি বোঁটা হ'তে দেখা যায়, সেই অর্থে এর নাম দোপাটি হয়নি—এই ফুলের পাপড়ি দু'টি পাটে বা স্তরে হয়, তাই এর লোকপ্রচলিত নাম দোপাটি ফুল।

সংহিতার কালে

চরক সংহিতার চিকিৎসাস্থানের বিষ চিকিৎসায় এক ধরনের ঔষধের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেটা মুখ্যতঃ ওষধি সংযোগে প্রস্তুত ঘৃত। এটা খেলে ও নস্য নিলে বহু দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি সেরে যায়, এবং বিষোদ্বেগে মৃতপ্রায় ব্যক্তিরও পুনর্জীবন লাভ হয়। সেই ঘৃতের নাম "অমৃত ঘৃত", এই ঘৃতের মধ্যে বন্ধুজীবের প্রয়োগ দেখা যায়। এভিন্ন সুশ্রুত সংহিতায় সূত্রস্থানের ৩৯ অধ্যায়ের ২০ গুচ্ছে প্রায় ৩০টি ভেষজের নামোল্লেখ। সেখানে দেখা যায় বাংলায় পরিচিত বহু ফুলেরই নাম। তাদের মধ্যে বন্ধুজীবও একটি। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে সংহিতার কালে এ ফুল তাঁদের নজরে এসেছিলো এবং তা নিয়ে অনুশীলিতও হ'য়েছিলো।

ভাবপ্রকাশের (ষোড়শ শতকের গ্রন্থ) পূর্বখণ্ডের দ্রব্যগুণ পরিচিতিতে (পুষ্পবর্গে) বন্ধুজীব কুসুমের সম্বন্ধে ব'লেছেন—

বন্ধুকো বন্ধুজীবশ্চ রক্তো মাধ্যাহ্নিকোঽপি চ।

অর্থাৎ এই বন্ধুক পুষ্পের আরও যে কয়টি পর্যায়বাচী নাম আছে, তাদের মধ্যে বন্ধুজীব, রক্ত, মাধ্যাহ্নিক নামও পাওয়া যায়। আবার এর চেয়েও বিস্তৃত পরিচয় রাজনিঘণ্টুতে (করবীর বর্গে)। সেখানে বলা হ'য়েছে—

বন্ধুকো বন্ধুজীবঃ স্যাদোষ্ঠ পুষ্পোঽর্ক বল্লভঃ।
মধ্যন্দিনো রক্তপুষ্পো রাগপুষ্প হরিপ্রিয়ঃ॥
অসিত সিত পীত লোহিত পুষ্পবিশেষেশ্চতুর্বিধো বন্ধুকঃ।
জ্বরহারী বিবিধ গ্রহশমনং বিষহরঃ প্রসাদনঃ সবিতুঃ স্যাৎ॥

অর্থাৎ একটি ফুলের নাম বন্ধুজীব (এটা চরক, সুশ্রুত ও রামায়ণের নাম) ওষ্ঠ-পুষ্প, অর্ক বল্লভ, মধ্যন্দিন, রক্তপুষ্প, রাগপুষ্প ও হরিপ্রিয় এগুলি পুষ্পটির পর্যায় নাম।

বৈদ্যকের অনুশীলন

প্রতিটি ভেষজেই ভৌতিকশক্তি, কর্মশক্তি, মলশক্তি এবং ধাতুশক্তি আছে। মৌলতঃ

এই বিচারই দেখা যায়। এই ভেষজফুলটি একটু চটকালেই পিচ্ছিল অর্থাৎ হড়হড়ে বা পিছল পিছল। তাই বলা হ'য়েছে, "যস্য লেপনে শক্তিঃ স পিচ্ছিলঃ" অর্থাৎ যেটি লেপন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাই পিচ্ছিল। ভাবপ্রকাশে বলা হ'য়েছে, "পিচ্ছিলো জীবনো বল্যঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলঃ গুরুঃ"। অর্থাৎ পিচ্ছিল দ্রব্যের এইটাই মুখ্য কাজ যে, ওই দ্রব্য জীবনীশক্তির সহায়ক, বলকর এবং সন্ধানকর (জুড়ে দেওয়ার শক্তি যার আছে)। তবে এইসব দ্রব্য একটু শ্লেষ্মকর হয় অর্থাৎ সর্বদৈহিক কার্যে কফবর্ধক, কিন্তু স্বয়ং বা সংযোগী হ'য়ে ব্যবহৃত হ'লে মলোৎসর্গ করে অর্থাৎ দাস্ত পরিষ্কার করায়; আর ভূতশক্তির মুখ্যত্বের দিক থেকে এটি পার্থিব শক্তিসম্পন্ন। এই পার্থিব শক্তিটি থাকার জন্যই জীবনীশক্তির বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

অতএব সহজেই নির্ণয় করা যায় অদ্যাবধি যে গোপনীয় টোটকা হিসেবে (ধাতু-বর্ধনের জন্য) বন্ধুক পুষ্পকে (বাঁধুলি ফুলটিকে) শুক্রবর্ধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তার কারণ ফুলটিতে পার্থিব শক্তি মুখ্য এবং জলধাতু অন্তঃশক্তিতে সর্বদাই প্রকটিত। কারণ আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্ত—"পৃথিব্যাপাং গুণৈর্যুক্তাং জীবনীয়মিতি স্থিতিঃ", অর্থাৎ যা পার্থিব ও জলীয়শক্তি সম্পন্ন তাই জীবনীয়, আরও স্পষ্ট ক'রে বললে ব'লতে হয়, প্রত্যহ যে আহার্য দ্রব্যটি আমাদের দেহে পরম্পরাক্রমে সর্বধাতুরই পুষ্টিতা সাধন করে, তাই জীবনীয়। আধুনিক ভাষায় এইটাই ভাইটালিটি। দুগ্ধ সর্বপ্রকার জীবনীয় দ্রব্যের মধ্যে উত্তম কিন্তু অন্যান্য মধুর রসও সহযোগী জীবনীয়। এই অনুশীলনের দ্বারা স্থির করা হয় দোপাটি ফুলের রস মধুর আর পার্থিব ও জলীয় শক্তিসম্পন্ন।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— উষ্ণ, গুরুপাক, ত্রিদোষের প্রশমক, জ্বরনাশক ও পিচ্ছিল।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— ফল গুরুপাক ও কোষ্ঠবদ্ধতাকারক। চরকের মতে এটা সাপের বিষে হিতকর। সাঁওতালরা এর মূল অনেকক্ষেত্রে ঔষধার্থ ব্যবহার করে থাকে।

পরিচিতি

অল্প শাখাবিশিষ্ট উদ্ভিদ্। সাধারণতঃ ২—৫ ফুট উঁচু ও কান্ডের গায়ে নরম রোম আছে। পাতা ৩—৫ ইঞ্চি লম্বা ও কিনারা করাতের ন্যায় খাঁজকাটা। মূলকান্ড ও পাতার সংযোগস্থল থেকে একসঙ্গে ১—২টি ফুল বের হয়। এদের বর্ণ লাল, কিন্তু বহিশ্ছদ রোমশ। সাধারণতঃ দুপুর ১২টার সময় এরা ফুটে থাকে, তাই তো এদের আর এক নাম "দুপুরেমণি"। বীজাধারে ৫টি প্রকোষ্ঠ আছে ও প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে ৮—১২টি বীজ থাকে। আগষ্ট থেকে অক্টোবর মাসে ফুল ও নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল হয়। সাধারণতঃ ভারতের উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে, বিশেষতঃ পাঞ্জাব ও বম্বে প্রদেশে বেশী হয়, কিন্তু বাংলায় ও উড়িষ্যায় যে হয় না তা নয়। পতিত জমিতেও এর চাষ হয়, অনেকে বাগানেও এই গাছ লাগিয়ে থাকেন। এর সংস্কৃত নাম বন্ধুক, বন্ধুজীব, বাংলায় প্রচলিত নাম বাঁধুলি। হিন্দীতে দুপুরিয়া নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Pentapetes phoenicea Linn. ও ফ্যামিলি Sterculiaceae.

ব্যবহার্য অংশ—ফুল ও মূল।

লোকায়তিক যোগ

১। **ত্রৈকালিক জ্বরে** (তিন দিন অন্তর জ্বরে)— জ্বর সম্পর্কে যত জ্ঞাতব্য তথ্য আছে, এত তথ্য অন্য রোগে নেই। কোন জ্বর ২ দিন অন্তর, কোন জ্বর দিনে দু'বার, কোন জ্বর দিনে ৩ বার ওঠা-নামা করে; আবার কোন জ্বর ৪ বা ৫ দিন অন্তরও আসে, এটাও দেখা যায় মাসে দু'বার জ্বর আসে। কিন্তু এমন বিপর্যয়ে পর্যায় বা পালাক্রমে আসে কেন? আয়ুর্বেদের সূক্ষ্ম অথচ সরল অভিমত হ'লো—

"সন্ততং রসধাতুস্থঃ ততশ্চ রক্তধাতুতঃ
দোষঃ ক্রুদ্ধঃ ততো জ্ঞেয়ঃ বিপর্য্যয়ে বিপর্য্যয়াৎ"

অর্থাৎ যখন দেখা যাচ্ছে যে, জ্বর ছাড়ছে না তখন বুঝতে হবে, রসবহ স্রোতে রসধাতুর দোষে আবার আসছে, থাকছে, ছাড়ছে, আবার হ'চ্ছে—বুঝতে হবে রক্তগত কারণ, তারপর পর্যায়ক্রমে মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র ধাতুর যেকোন সংখ্যা ধাতুর সঙ্গে বায়ু-পিত্ত-কফের প্রবল আক্রমণ ঘ'টলে ঠিক সেই সংখ্যা অনুযায়ী জ্বর হবে, অর্থাৎ ত্রৈকালিক বা তিনদিন অন্তর জ্বর হ'তে থাকলে বুঝতে হবে, এটি মাংসগত জ্বর যেহেতু—প্রথম রসধাতু দ্বিতীয় রক্তধাতু তৃতীয় মাংসধাতু। এমনি অন্যান্যগুলিতেও এইসব ক্ষেত্রের যে কোন একটি ঘ'টলে বাঁধুলীফুল বেটে দিনে ৩ বার একটি ক'রে খেতে হবে—এটা চিবিয়েও খাওয়া যায়। এইভাবে ৩ দিন খেলেই রক্তগত বা অন্য সংখ্যার ধাতুগত জ্বরও ছাড়বে; জ্বর ছেড়ে গেলেও আরও কয়েকটা দিন দু-এক বার ক'রে খেতে হবে। দৈবজ্ঞ বলেন, এটা দৈবাদেশ। ফুল না পেলে এই গাছের মূলও এই কাজ করে।

২। **মূর্ছা রোগে** (মাসিকের দোষে)— লোকপ্রচলিত সংস্কার—'ভূতে ধরে'ছে'। এ ভূতে ধরা রোগটা মাসিক হওয়ার বয়সের আগেও হয় না, মাসিক বন্ধ বয়সেও অর্থাৎ যথাসময়ে বন্ধ হওয়ার বয়সের পরেও হয় না। এটা সাধারণতঃ ৪৫/৪৬ পর্যন্ত থাকে, স্বাস্থ্য ভাল হ'লে আরও বেশীদিন থাকে। এই অবস্থা হ'লে বাঁধুলী-ফুলের শিকড় ৩ গ্রাম বেটে সরবত ক'রে খালি পেটে খেতে হবে।

বাহ্য প্রয়োগ

৩। **কাটা ছে'ড়ায়**— বাঁধুলী ফুলের পাতার রস লাগালে সেরে যায়।

৪। **বিছের হুলের যন্ত্রণায়**— বাঁধুলী ফুলের গাছের মূল এবং ফুল একসঙ্গে বেটে হুল ফোটানো জায়গায় লাগালে কিছুক্ষণের মধ্যে যন্ত্রণার উপশম হয়।

৫। **মচ্‌কে গেলে**— বা ভেঙ্গে গেলে যে রকম যন্ত্রণা সেই রকম হ'তে থাকলেও এই গাছের পাতা ও মূল বেটে অল্প গরম ক'রে প্রলেপ দিলে ব্যথা এবং যন্ত্রণা দুই-ই ক'মে যাবে, তবে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা লাগিয়ে রাখা চাই।

৬। **দাগে**— কোন কারণে গায়ে দাগ হ'য়ে আছে, যাচ্ছে না, (অবশ্য বেশী গভীরের দাগ হ'লে কাজ হবে না) সেক্ষেত্রে এই ফুল বেটে লাগালে দাগটা মিলিয়ে যায়।

এই নিবন্ধটি লেখা শেষ হ'লো, এখন ভাবছি, হোক্ না আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তবুও বেলা ১২টায় এ ফুল ফুটবেই, তাই সাহেবরা বলেন, "Twelve o'clock" (টুয়েলভ্

ও' ক্লক্); এর আর একজন সঙ্গী আছে, তার ফোটার সময় বেলা চারটে; তাই তার নাম "Four o'clock" (ফোর্ ও' ক্লক্), এর ডাকনাম কৃষ্ণকলি। প্রকৃতির নিয়মাধীন এরা, তাই ঘড়ি ধরে এরা হাসে-কাঁদে। এ দেখেও তো আমরা শিখি না যে, প্রকৃতির নিয়মে চ'ললে স্বভাবমৃত্যু হয়। আমরা দেখেও শিখবো না, ঠেকেও শিখবো না—তবে, সে দিব্য দৃষ্টি হবে কি শিখা ওঠার পরে? হায় শ্রেষ্ঠ জীব!

কেমূক [কেঁউ]

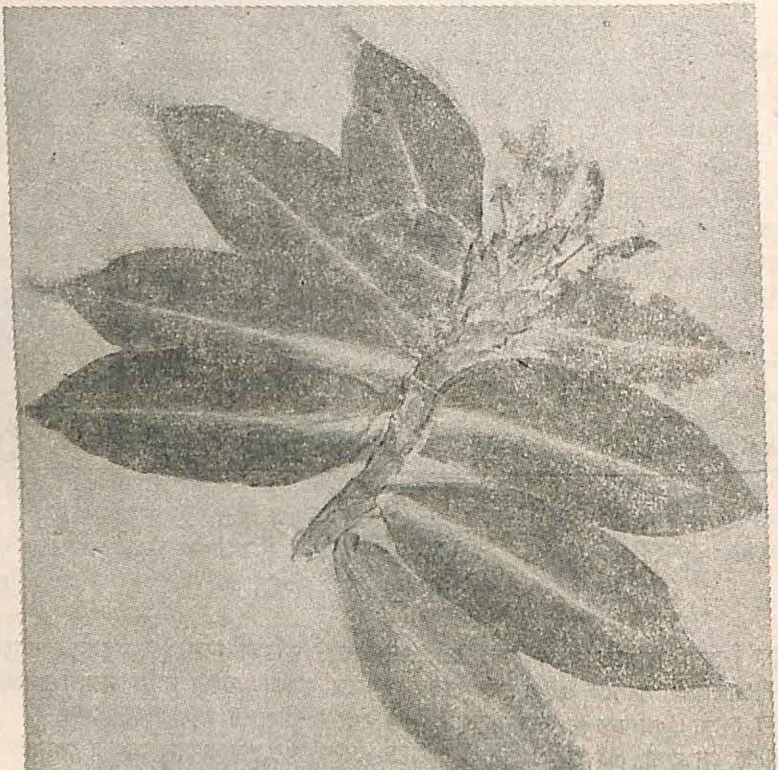
কেমুক নিবন্ধ লিখতে ব'সে ভোজ প্রবন্ধের একটি কবিতা মনে প'ড়ে গেল। টোলে পড়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এই ভোজ প্রবন্ধ প'ড়তে হ'তো। বইটা নাকি বল্লাল সেনের আমলে লেখা। পন্ডিতগণ বলেন, এটা দশম থেকে দ্বাদশের মধ্যে।

যাক্ সে কথা, এই কেঁউ প্রসঙ্গ আসাতে ভোজ প্রবন্ধের একটি কবিতা শোনাই—ধারা নগরীর রাজা ছিলেন ভোজ, তিনি খুব দাতা ছিলেন, দেশ-বিদেশ থেকে পন্ডিতরা আসতেন দান নিতে, তার বিনিময়ে তাঁকে ভালো ভালো স্বরচিত কবিতা শোনাতে হ'তো। তাই এক বিদ্বান ভিক্ষুক পন্ডিত শুনিয়েছিলেন—

> ক্ষুৎক্ষামাঃ শিশবঃ বনেঽপি বিরলং কেমুক মূলং সখে
> লিপ্তা ঝর্ঝর খর্থরী জতুলবৈর্নোমাং তথা বাধতে।
> গেহিন্যাত্রুটিতাংশুকং ঘটয়িতুং কৃত্বা স কাকুস্মিতং
> কুপ্যন্তী প্রতিবেশ্ম লোকগৃহিণী সূচিং যথা যাচিতা॥

এই কবিতাটির অর্থ হ'লো—আমার বাড়িতে শিশুগুলি ক্ষুধায় আধমরা হ'য়ে

আছে, তাতেও তেমন কষ্ট পাই না, বাড়ির আশেপাশের বনে যে কেঁউ মূল তুলে এনে সিদ্ধ ক'রে খাওয়াতাম, তাও বিরল হ'য়েছে, এতেও কষ্ট হয় না, বাড়ির ফুটোফাটা থালা-বাটিগুলির ছ্যাঁদা বন্ধ ক'রতে গালা দিয়ে এঁটে চালাই, তাতেও কষ্ট হয় না, তবে কষ্ট হয় কখন জানেন? যখন দেখি আমার গৃহিণীর শতচ্ছিন্ন শাড়ীটি শেলাই ক'রে পরার জন্য যখন প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে একবার কিছুক্ষণের জন্য একটি ছুঁচ চেয়েও ফিরে এসে বলে—"নাঃ, পেলাম না, তাঁরা দিলেন না।" বরং বাঁকা চোখের কোণে অবজ্ঞা আর কোপ প্রকাশ ক'রে বৌকে ফিরিয়ে দেয় ছুঁচ পাবে না ব'লে।



এই কবিতাটির মধ্যে একটা ভেষজ এমনভাবে লুকিয়ে আছে যে সহজে তাকে ধরা যায় না। এখানকার বক্তব্য হ'লো যে—অমন প্রাচীন গ্রন্থেও আমরা কেমুক বনৌষধির সন্ধান পাই, এমনকি আহার্য হিসেবেও যে সেটা গ্রহণ করা হ'তো তার ইঙ্গিত তো আছেই।

ভূত চতুর্দশীর দিন চৌদ্দশাক খাওয়ার যে বিধি তার মধ্যেও কেমুকের পাতা ব্যবহারের নির্দেশ—এ তো গেল লোকব্যবহার।

বৈদ্যকের দৃষ্টিকোণ

দেখা যাচ্ছে চরক সংহিতার সূত্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চাশত মহাকষায়ের মধ্যে এটিকে "কৃমিঘ্ন" ভেষজ ব'লে চিহ্নিত করা হ'য়েছে। এটি কন্দমূলপ্রধান ভেষজ, যেমন শঠী, বনহলুদ, আমআদা প্রভৃতি, কিন্তু ক্রিয়াশক্তিতে এটি সজনে, বিড়ঙ্গ, আপাং, থানকুনি প্রভৃতির মতই।

এখানে আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে রাখি—চরকের কৃমিঘ্ন এই স্বল্প কথার তাৎপর্যটির অনুশীলন ক'রলে পাওয়া যায়, যে দ্রব্য বাহ্য ও আভ্যন্তর ক্রিমি বিনষ্ট করে তারই নাম কৃমিঘ্ন অর্থাৎ অন্তঃকৃমিঘ্ন, বাহ্যকৃমিঘ্ন বললে যা বোঝা যায়, এটা কিন্তু তেমন কৃমি নিঃসারক বলার তাৎপর্য থেকে পৃথক। অন্তঃকৃমিঘ্ন বললে বুঝতে হবে যে দ্রব্য শরীরে প্রবেশ ক'রে অন্ত্রস্থিত ক্রিমিকে দূর করে অর্থাৎ তাদের মৃত্যু ঘটাতে পারুক আর নাই পারুক, তাদিকে ক্রিয়াহীন ক'রে দেয়। তবে তাতে শরীরের অন্যান্য ধাতুগুলি কিন্তু প্রতিক্রিয়ামুক্ত হবে বলা যায় না, সেইজন্য ওক্ষেত্রে বিরেচনই শ্রেয়। আর বাহ্য ক্রিমিঘ্ন বললে বুঝতে হবে যে দ্রব্য শরীরের মহাস্রোতে প্রবেশ ক'রে ক্রিমি বিনষ্ট করে; এক্ষেত্রে তীক্ষ্ন এবং মাদকদ্রব্যই তা পারে। আর ক্রিমি নিঃসারক বললে বুঝতে হবে যে দ্রব্য ক্রিমিকে বাহিরে এনে দেয়; অর্থাৎ বমনের দ্বারা আমাশয়স্থ কৃমির নিঃসরণ হয়, বিরেচনের দ্বারা অন্ত্রস্থ ক্রিমি দূর হয়, আস্থাপনের দ্বারা মলাশয়স্থ ক্রিমি দূর হয়।

তাহ'লে প্রশ্ন আসে কেমুক নামক ভেষজটি কোথাকার ক্রিমি দূর করে?

তার উত্তরে বলা যায়—এটি অন্ত্রস্থিত ক্রিমির মৃত্যু ঘটায় অথবা তাদের নিষ্ক্রিয় ক'রে দেয়।

ভাবপ্রকাশের বক্তব্য

কেমুকং কটুকং পাকে, তিক্তংগ্রাহি হিমংলঘু।
দীপনং পাচনং হৃদ্যং ক্রিমি কুষ্ঠাদি নাশনম্॥

অর্থাৎ এই কেমুক বা কেঁউ নামের ভেষজটি পাকে (জীর্ণ হ'লে পরে) কটু রস সৃষ্টি করে, যেহেতু তিক্তরস, তবে গ্রাহি এবং লঘু; এটি দীপন, পাচন ও হৃদ্য অর্থাৎ হৃদ্‌রোগের উপকারক এবং ক্রিমি ও কুষ্ঠ রোগ দূর করে।

নব্যের সমীক্ষায়

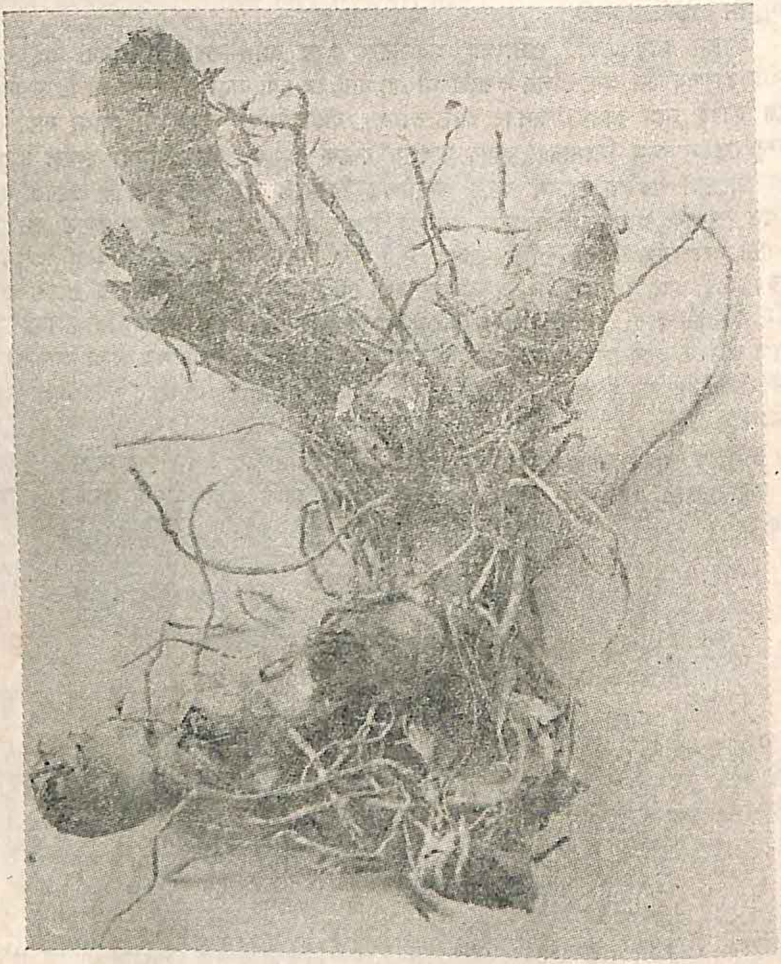
গুণঃ— এটি স্বাদে তিক্ত ও ঝাঁঝালো গন্ধবিশিষ্ট, কফ-বাত ও জ্বর নাশক এবং প্রদাহ-নিবারক।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— কেমুকের মূলের রস শক্তিদায়ক, কামোদ্দীপক ও ক্রিমিনাশক। এটি রক্তবর্ধক হিসেবে ও বাতব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদ মতে হিক্কায় হিতকর। এভিন্ন সাঁওতালরা মজ্জাগত ব্যথা বেদনায় (অর্থাৎ মজ্জাগত বায়ুতে) ব্যবহার করে থাকে।

পরিচিতি

কন্দমূলোদ্ভব উদ্ভিদ। পত্রময় কাণ্ড, সাধারণতঃ ৩—৪ ফুট উচ্চ হতে দেখা যায়।

পাতা ই—১ ফুট লম্বা ও অগ্রভাগ সরু, নীচের দিকে পশমের মত লোম আছে। ফুল সাদা রঙের। বীজাধার চ্যাপ্টা, লম্বাটে ও লালবর্ণ। সাধারণতঃ বর্ষার শেষে ফুল ও তৎপরে ফল হয়। বঙ্গদেশের স্যাঁৎসেঁতে পতিত জমিতে এটি জন্মে থাকে। এর সংস্কৃত নাম কেমুক, বাংলা ও হিন্দীতে প্রচলিত নাম কেঁউ বা কেমক ও মালাবারে পেংবা নামে



কেমুক মূল

পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Costus speciosus (Koen) Sm. ও ফ্যামিলি Zingiberaceae.

ব্যবহার্য অংশ— মাটির নীচের কান্ড।

লোকায়তিক যোগ

ব্যবহার্য অংশ কন্দমূল। এই মূলটি প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ স্রোতে।

১। **ক্রিমি রোগে—** পূর্বেই আলোচিত হ'য়েছে যে, কোন্ ধরনের ক্রিমিতে কে'উ মূলের ব্যবহার ফলপ্রদ হয়। অর্থাৎ অন্ত্রস্থ ক্রিমি রোগে প্রায়ই বমি হয়, মুখে লোনা জল ওঠে, মাঝে মাঝে চোখ দুটি যেন কোটরে ঢুকে যায় কিম্বা চোখের চারদিকে যেন কালো দাগ পড়ে, সেই ক্ষেত্রে কে'উ মূলের রস সকালে এক চা-চামচ ও বৈকালে এক চা-চামচ ২/৩ চামচ জল মিশিয়ে ৩/৪ দিন খাওয়ার পর কোন একটা মৃদু জোলাপ খাওয়ালে ক্রিমি প'ড়ে যায়—সে জীবন্ত পড়ুক আর মৃতই পড়ুক, প্রায় ক্ষেত্রেই বেরিয়ে যায়। না বেরুলেও তার উপদ্রব ক'মে যাবেই।

২। **প্রমেহ রোগে—** এ রোগটি যে শ্লেষ্মাবিকারপ্রধান তা বিস্তৃত ক'রে বলা হ'য়েছে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩৭০-৩৭১ পৃষ্ঠায়। ওই রকম অবস্থা এলে কে'উ মূলের রস (একটু তেতো/তিক্ত) এক চা-চামচ ক'রে সকালে বৈকালে দু'বার প্রত্যহ ৩-৪ দিন খেলে কত সহজেই এর থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

৩। **সর্দিজ্বরে—** এখানে এ নিয়ে আর বিশদ ক'রে বলার কিছু নেই। এই জ্বর গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি সব ঋতুতেই হয়। ওই সময় সব চেয়ে বেশী কষ্ট জ্বরের তাপটায় আর সব থেকে বেশী কষ্ট হয় মাথা ধরায়, তার সঙ্গে গায়ে-হাতে ব্যথা; ক্ষিধে তো থাকেই না। এক্ষেত্রে কে'উ মূলের রস গরম ক'রে সকালের দিকে একবার এবং বৈকালের দিকে একবার এক/দেড় চা-চামচ করে খেতে হবে, তবে গরম করার পূর্বে ওই রসটাতে ৪-৫ চা-চামচ জল মিশিয়ে গরম করাই ভাল, অল্প রস কিনা তাই গরম করার আগেই জল মিশাতে হয়। এর দ্বারা একদিন পরেই খাওয়ার প্রবৃত্তি আসবে, যেহেতু অগ্নিমান্দ্য ক'মে যাবে। গায়ের হাতের কামড়ানি ক'মে যাবে। দু-তিন দিন খেলে জ্বর নিরাময় হবে।

৪। **সঙ্গমে ব্যর্থতায়—** "যাকে বলে আছে গরু না বয় হাল"—দাম্পত্য জীবনে এ অবস্থা কারও কারও আসে, অথচ আকাঙ্ক্ষার অভাব নেই, এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, "ফিজিকাল্ আন্‌ফিট্" অর্থাৎ মনে উত্তেজনা আছে কিন্তু দেহে নেই। ওই অবস্থা এলে ১৫ গ্রাম মূল সিদ্ধ ক'রে (আলুসিদ্ধ খাওয়ার মত) খেতে হয়; কয়েকদিন খেলেই ওই অসুবিধেটা আস্তে আস্তে চ'লে যায়।

৫। **লাবণ্যের অভাবে—** খাওয়ার ক'মতি নেই অথচ দুর্বলতা কাটে না, দেহে কোন জৌলুস নেই। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ ভিটামিন খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। এমন যে ক্ষেত্র, সেখানে কে'উ মূলের রস ২/৩ চা-চামচ সমপরিমাণ জল মিশিয়ে একটু গরম ক'রে প্রত্যহ সকালে অথবা বৈকালে একবার ক'রে খেয়ে দেখুন। দেশগাঁয়ের বৈদ্যগণের এইই ছিল দেশী ভিটামিন।

৬। **অগ্নিমান্দ্যে—** এটা প্রায়ই হয় শ্লেমার সম্বন্ধ থাকলে (এটার দ্বারা পাকস্থলীতে যে ক্লেদক শ্লেষ্মা আছে, সেখানেই বিকার ঘটে) তার উপসর্গ হয় পেটটা ভার, ক্ষিধে লাগে না। এই ক্ষেত্রে কে'উ মূলের রস ১/১½ চা-চামচ অল্প জল মিশিয়ে গরম ক'রে দু'বেলা খেতে হয়। পর পর দুই-তিন দিন খেলেই এই অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

বাহ্য ব্যবহার

৭। **চর্ম রোগে—** চামড়ার ওপর দাদ, খোস, চুলকানি হ'য়েই থাকে অনেক কারণে। এক্ষেত্রে কে'উমূল রস ক'রে গায়ে মাখলে ওই সব অসুবিধে চ'লে যাবে। তবে গায়ে মেখে কিছুক্ষণ থাকার পর ধুয়ে ফেলতে পারেন। আর বেশী জায়গায় হ'লে তার সঙ্গে সমান পরিমাণ জল মিশিয়ে গায়ে লাগালেও হবে।

নিবন্ধ লেখার শেষে গজাপণ্ডিতের একটা বুক্‌নি মনে প'ড়েছে, এটা একদিন গাঁয়ের সব্যসাচী খুড়োকে ঝেড়েছিলো—

দ্যাখো খুড়ো, মূর্খ শিষ্যকে উপদেশ দিলে আর ব্যাদ্‌ড়া বউ-এর ভরণ-পোষণ ক'রলে এবং দুষ্টু মানুষের মতে মত দিয়ে কাজ ক'রলে পণ্ডিতের কপালে দুর্গতির সীমা থাকে না। এখন দেখছি এ বুক্‌নিটা শুক্রনীতিসারের।

আমি তো এত বক্তব্য রেখে যাচ্ছি, জানি না এসব বানের জলে ভেসে যাচ্ছে বা যাবে কিনা। তাই বর্তমান সমাজের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে যাই।

CHEMICAL COMPOSITION

Costus speciosus koen.

The rhizome contains:— Starch and fibre.

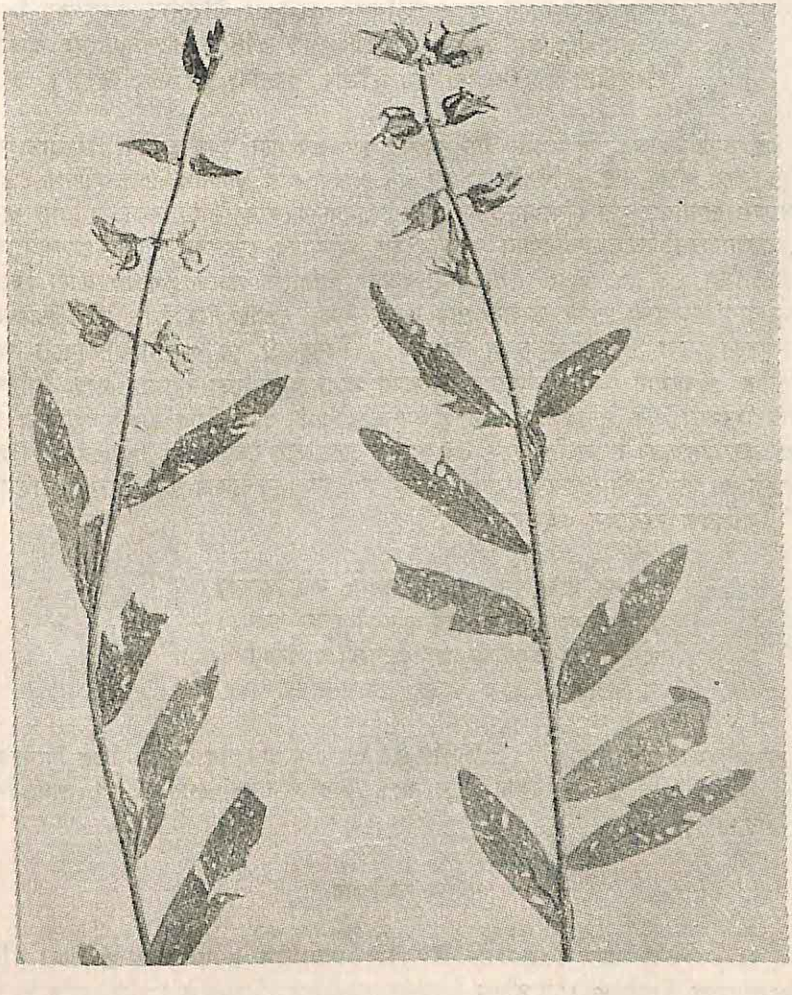
শণ

শণ লিখতে ব'সে বিম্‌লী ঠাকুমার কথা মনে পড়ে গেল; তাঁর বিশেষণই ছিলো, "শণচুলো" বুড়ি অর্থাৎ তাঁর চুলগুলো শণের মত রঙ।

এখন এই রঙের বিচার ক'রতে ব'সে ভাবছি যে, এই শব্দটা তো কখনো বিশেষণ, আবার কখনও বিশেষ্য।

এই ধরুন না রং-বাজী, রং-তামাসা—এতেও রং আছে, এর দ্বারা আপনার মনে কী রং ধ'রলো? কিন্তু উপমা দিতে এই রং শব্দ অনেকদিন আগেই আমাদের কাব্যে প্রবেশ ক'রেছে।

এই রামায়ণের কথাই ধরা যাক—কিন্তু সে প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় মহাভারতের বনপর্বের ২৮৩ অধ্যায়ের ২৮।২৯ শ্লোকে; সেখানের বর্ণনায় লেখা রামের অনুচর বাহিনী যখন লঙ্কায় প্রবেশ ক'রেছে, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাল্মীকি লিখছেন, প্রতিটি দলের মধ্যে কিন্তু যে শ্রেণীতে যে রঙের সেনা আছে তাদের মধ্যে অন্য বর্ণের কোন সেনা নেই, অর্থাৎ এক এক শ্রেণীর এক এক রঙ। কোন কোন দলের রঙ পাকা শালী-ধানের মত, কোন দলের রঙ শিরীষ ফুলের মত, আর একটি বাহিনীর রং ভাস্বর-মূর্তির রঙের মত (পূর্ব অরুণোদয়ে যে রঙের খেলা দেখা যায়), আবার একটি বাহিনীর সেনাদের রং একেবারে শণের মত শুভ্র এবং গৌরবর্ণ, তাই লেখা হ'য়েছে—



"তরুণাদিত্য সদৃশৈঃ শণগৌরৈশ্চ বানরৈঃ"।

তা'হলে অবশ্যই ভেবে নিতে হয় এই শণ কত প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে এক প্রকারের সাদা রঙের উপমার বস্তু হ'য়ে আছে; তাছাড়া শণটি আবার ভেষজ হিসেবেও

বহু প্রাচীন। এই হিসেবে মনে করা যেতে পারে যে এটির সন্ধান অথর্ববেদেই পাওয়া গিয়েছে।

শণ ত্বং অন্তরিক্ষং সংরভধ্বমুত্তিষ্ঠত।
অত্র জহীমো রাজানঃ অশ্মন্বতী রীয়তে॥

(অথর্ববেদ বৈদ্যকল্প ২।১১।৬৭)।

মহীধর এই সূক্তটির ভাষ্য ক'রেছেন—

শণ ইতি দানে, ত্বং অন্তরিক্ষং ভুবোর্ধং উত্তিষ্ঠত সংরভধ্ব শির-উন্নময়ত, অত্র অশ্মন্বতী যা ধাত্রী রীয়তে=গচ্ছতি তাং গৃহাণ, শিরোবিকারং রক্ষস্ব তব বীজাৎ, রাজানঃ ত্বাং উজ্জীহতে।

এই ভাষ্যটির অনুবাদ হ'লো—দান অর্থেই শণ এই নাম, তুমি ভূঊর্ধ্বে শিরোভাগকে উন্নীত করে থাক, এই পৃথিবী যে যে রস ধারণ করে এমনকি প্রস্তরাদিরও, তুমি তাদিকেও প্রসারিত কর (বিরেচিত?), তুমি তোমার বীজকে শিরোবিকারের জন্য ধারণ কর, রাজন্যবৃন্দ তোমাকে সন্ধান করেন। শণ আমাদের দেশের অন্যান্য প্রদেশগুলির মধ্যে তামিল, তেলেগু এবং মালয়ালাম্ ভাষায় পরিচিত তাদের পৃথক ভাষা দিয়ে; কিন্তু বাকী অন্যান্য প্রধান ভাষায় প্রায় একই নাম; ভেষজ হিসেবেও সারা ভারতের বৈদ্যবৃন্দের মধ্যে প্রবাহক্রমে চ'লে আসছে; কিন্তু ঐ যে গুরুমুখী বিদ্যে আর গুপ্তমন্ত্র শেখানোর নেশা আমাদের বৈদ্যদের মধ্যে আজ তো রয়েছে, তাই লিখিত-পঠিত হিসেবে এর প্রচার নেই, কিন্তু অন্ততঃ ১৫ শতাব্দীতে রাজনিঘণ্টুকার তা সংগ্রহ ক'রেছিলেন। হ'লে কি হবে, এই শণের এবং তার ভৈষজ্যেরও যে একটা ইঙ্গিত বেদে পাওয়া যায় সেটা অনেকের চোখে পড়ে না। রাজনিঘণ্টুকার তার গ্রন্থে শতাহ্বাদি বর্গে লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে—

শণস্তু মাল্যপুষ্পঃস্যাদ্ বমনঃ কটুতিক্তকঃ।
নিশাবনো দীর্ঘশাখস্ত্ব ক্যারী দীর্ঘপল্লবঃ।
শণস্ত্বম্লঃ কষায়শ্চ মলগর্ভাস্র পাতনঃ।
বান্তিকৃৎ বাত-কফনুজ্ জ্ঞেয়স্তীব্রাঙ্গমর্দজিৎ।

শণের পর্যায়বাচী নাম ৮টি (প্রত্যেকটি পর পর)। মুখ্য গৌণ রস কটুতিক্ত বিরেচক। বমনও করায়, বায়ু ও কফবিকার হরণ করে, আর অঙ্গমর্দ (গা-হাত-পা কামড়ানি) দূর করে।

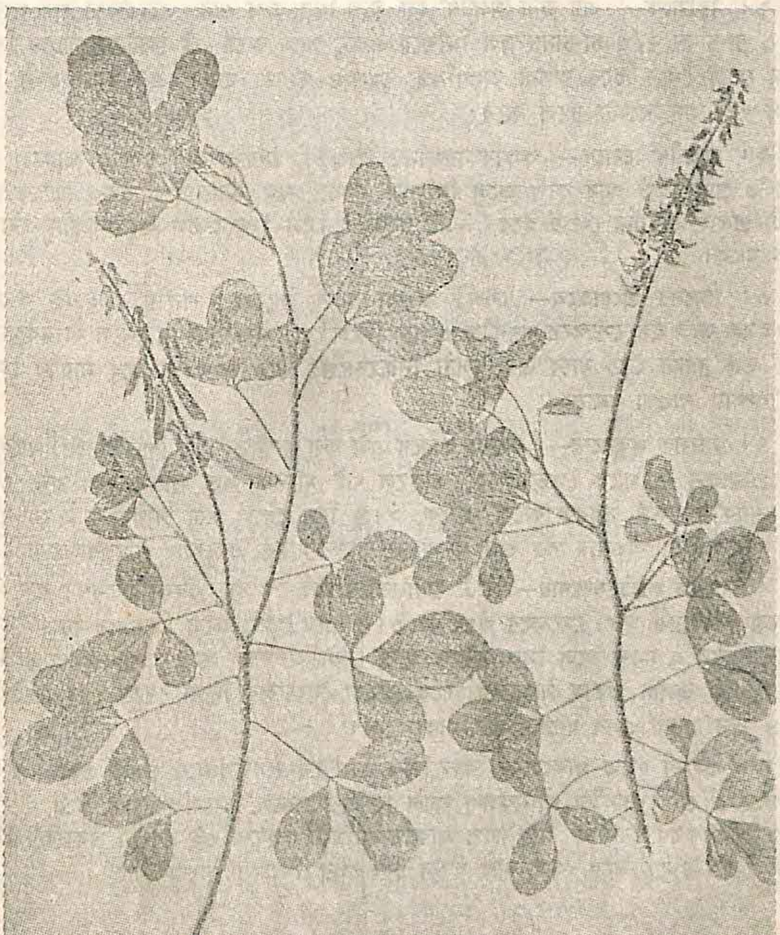
নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— পাতা স্বাদে তিক্ত-মধুর, উষ্ণবীর্য, বমনকারক ও কফ-বাত প্রশমক। বীজ শীতগুণসম্পন্ন, ধারক ও গুরুপাক।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— পাতা বেদনানাশক; বিরেচক ও গর্ভপাতকারী। ফুল—রক্ত-দুষ্টিতে, সোরিয়াসিসে (Psoriasis) ও প্রদর রোগে হিতকর। বীজ—রজঃনিঃসারক। রক্ত পরিষ্কারক হিসেবেও এর ব্যবহার কম নয়। আয়ুর্বেদমতে চর্মগত রোগে হিতকর।

পরিচিতি

বর্ষজীবী উদ্ভিদ। পাতা সাধারণতঃ ১১/২ থেকে ৩ ইঞ্চি লম্বা, ধূসরবর্ণ ও পশমের ন্যায় রোমযুক্ত। শাখা ও মূলকাণ্ডের অগ্রভাগে পুষ্পদণ্ড বের হয়, তাতে ১০ থেকে ২০টি পীতবর্ণের ফুল হয়। ফুলের বহির্বাস রোমযুক্ত। শুঁটি ১/১১/২ ইঞ্চি লম্বা ও রোমশ, এতে ১০-১৫টি বীজ হয়। এই গাছের আঁশ থেকে দড়ি প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ



Crotalaria striata

বর্ষায় ফুল ও শীতে ফল হয়ে থাকে। ভারতের সর্বত্র জন্মিলেও প্রধানতঃ বঙ্গদেশে ও বিহারে এর চাষ হয়। এর সংস্কৃত নাম শণ, বাংলায় প্রচলিত নাম শণপাত, ঘোরসান, ও হিন্দীতে সান বলে। বোটানিক্যাল্ নাম Crotalaria juncea Linn. ও ফ্যামিলি Papilionaceae.

ঔষধার্থ ব্যবহার্য অংশ— মুখ্যতঃ বীজ, ফুল ও পাতার ব্যবহার দেখা যায়।

লোকায়তিক যোগ

এর বীজ কাজ করে রক্তবহ স্রোতে। ফুল ও পাতার রস শরীরের স্থানিক চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। তবে বাহ্য ব্যবহার বেশী।

১। **ক্রিমিতে—** এর জন্য অজীর্ণ হয়, মুখ দিয়ে জল ওঠে—এই ক্ষেত্রে শণ পাতার রস ১ চা-চামচ ২/৩ চা-চামচ জল মিশিয়ে একটু গরম ক'রে ওই রসটা সকালের দিকে খালি পেটে খেতে হবে অথবা অল্পকিছু খেয়েও খাওয়া যায়। এই রকম ২-৪ দিন খেলে ওই অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

২। **অজীর্ণ দোষে—** কফবিকারজনিত অজীর্ণ দোষে কষ্ট পেতে থাকলে শণ ফুল ৩ গ্রাম বেটে আধ কাপ জলে মিশিয়ে একটু গরম করার পর তাকে ছেঁকে ওই জলটা প্রত্যহ একবার খেতে হবে। এই রকম দু-তিন দিন খেলে ওই অজীর্ণ দোষটা চ'লে যাবে।

৩। **বমনের প্রয়োজনে—** বেশী খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে, শরীর আইঢাই ক'রছে, বমি হ'লে ভাল হয়, সেক্ষেত্রে শণবীজ ৩ গ্রাম শিলে বেটে সরবত ক'রে খেলে খানিকক্ষণের মধ্যে ভুক্ত দ্রব্যটা উঠে যাবে এবং সেটা নিরুদ্বেগেই উঠে যাবে। তবে নারীর ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় খাওয়া নিষেধ।

৪। **মাসিক ঋতুবন্ধে—** অনেক কারণে এটা বন্ধ থাকতে পারে (গর্ভজন্যও) যাহোক, যদি প্রয়োজন না থাকে (গর্ভরক্ষার) তাহ'লে ওই মাসিক ঋতু পরিষ্কারের জন্য ৩/৪ গ্রাম শণবীজ বেটে, সরবত ক'রে, ছেঁকে, ২।৪ দিন খেলে ওটা পরিষ্কার হ'য়ে যায়। তবে ২।৩ দিন খাওয়ার পর ওটা না হ'লে বীজ আরও এক-আধ গ্রাম বাড়ানো যায়।

৫। **গাঁঠে গাঁঠে যন্ত্রণায়—** এটা প্রধানভাবে বাত-শ্লেষ্মার বিকারে বেশী হয়, এটা বাতরক্ত বিকারেও হয়। সেক্ষেত্রে শণবীজ ৩।৪ গ্রাম অল্প জলে ভিজিয়ে রেখে, তাকে থেঁতো ক'রে ২ কাপ জলে সিদ্ধ করতে হবে, সেটা আন্দাজ আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, ওই জলটা প্রত্যহ সকালের দিকে অথবা বৈকালের দিকে খেতে হবে; এইরকম ২।৪ দিন খেলে ওসব যন্ত্রণা আর থাকবে না।

৬। **ফোড়া হ'তে থাকলে—** রক্তদুষ্টির জন্য যেখানে-সেখানে প্রায়ই ফোড়া হ'চ্ছে, সেক্ষেত্রে ৫ গ্রাম শণবীজ খানিকক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখে, তাকে থেঁতো করে ২ কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আন্দাজ আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে ওই ক্বাথটা সকালের দিকে খালি পেটে খেতে হবে, অসুবিধে হ'লে বৈকালের দিকেও খাওয়া যায়।

বাহ্য ব্যবহার

৭। **চুলকানিতে—** শণপাতা বেটে সেটাতে অল্প জল মিশিয়ে, গায়ে মেখে, দেড়-দু ঘণ্টা বাদে স্নান ক'রতে হয়, এই রকম ২-৩ দিন ক'রলে চুলকণা সেরে যায়।

৮। **ছুলি রোগে—** সংস্কৃত ভাষায় চর্ম শব্দের সঙ্গে "চর্মচ্ছবি" একটি শব্দের যোগ আছে অর্থাৎ চামড়ার ওপরে খুব পাতলা একটা পরদা আছে, শরীরের রসধাতু, রক্তধাতুর স্বচ্ছতা থাকলে ও ছবিটি পরিষ্কার নজরে পড়ে। চলতি কথায় আমরা বলি

ছাল, ছালের পরেই চামড়া বা চর্ম। এই রোগটি হয় ওই ছল্লি বা ছালের ওপর। তাই নাম তার ছল্লিরোগ। এই ছল্লিই লোকভাষায় ছুলি হ'য়েছে।

এই ক্ষেত্রে (ছুলি হ'লে) শণের বীজ বেটে, চন্দনের মত করে, ওই ছুলিতে মেখে বেশ কিছুক্ষণ (দেড়-দু ঘণ্টা) রাখতে হয়, তারপর তাকে ধুয়ে ফেলতে পারা যায়। এইভাবে ২-৩ দিন মাখলে ছুলি আর থাকে না।

শনের নিবন্ধ লেখা শেষ হ'লো। এখানে একটা বক্তব্য রাখছি—এটা তো দেখা যায় যে, অনেক রোগের লক্ষণ এক, এবং উপসর্গও এক, আবার অনেক রোগের ঔষধ একই, কিন্তু মৌল চিন্তায় গভীর মনোনিবেশ না থাকলে ওই সব রোগে এবং ভেষজে সেই চিরাচরিত পদ্ধতিতে ব্যবহার ক'রলে ফল হয় কি? সেইজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই সন্দেহ, দ্বন্দ্ব বা সংশয় না জাগিয়ে কোন চিকিৎসকই সফলকাম হন কি? কিন্তু আজ হতশক্তিক আয়ুর্বেদপন্থীদের মধ্যে দেখা যায় কেমন এক জড়তা পেয়ে ব'সেছে, মৌল চিন্তায় অভিনিবেশ না ক'রে, সন্দেহের অবসর মাত্র না এনে, গতানুগতিক পথে চ'লতে চান অথচ প্রাচীনগণ এ বিষয়টি আমাদের উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন; এটা আছে মহাভারতের বিরাটপর্বের ৪ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে। সেখানে বলা হ'য়েছে—

অর্থানাং তু পুনর্দ্বৈধে নিত্যং ভবতি সংশয়ঃ।
অন্যথা চিন্তিতোহ্যর্থঃ পুনর্ভবতি চান্যথা॥

অর্থাৎ কোন বিষয়ে এক প্রকার লক্ষণ, এক প্রকার অর্থ হবেই এটা ভাবতে নেই, দ্বৈধ আছে ব'লে মনে ক'রতে হয়, সর্বদা সংশয়ও আনতে হয়—কোন বিষয় এক প্রকার অবধারিত হ'লেও তার অন্যথা হয়, হয়ে থাকে এবং হবেই। একথা বলেছেন দুর্যোধন—যেসময় বিরাট রাজার আশ্রয়ে ছদ্মবেশে পঞ্চপান্ডবরা বাস ক'রছিলেন, সেই সময়েই দুর্যোধন প্রভৃতি বিরাট রাজের গোরু চুরি ক'রতে যান।

CHEMICAL COMPOSITION

Crotalaria juncea Linn.

Analysis of raw sunn hemp: Ash ·61%; fat and wax ·55%; Water (hydroscopic) 9·6%; cellulose 80%; aqueous extract 2·82% and pectin bodies 6.14%. Fodder contains:— Moisture 14.39%; ether extract 1.12%; albuminoids 11.31%; woody fibre 28%. Soluble carbohydrates 35·85%; mineral matter 6·42% and food units 66·9%. Seed contains:- Moisture 8·6%; crude protein 34·6%; fat 4·3%; starch 41·1%; fibre 8.1%; ash 8.3%; food units 13.8%; nutrient ratio 1:1.5 and an alkaloid, carchorin.

পাষাণভেদ

বিংশ শতাব্দীর কবি-রাজ পাষাণ ভেদ ক'রতে "পাষাণভেদের" সন্ধানে এক দোকানে গিয়ে দ্যাখে পাষাণগর্দভের (এক প্রকার রোগ, এটা মুখে হয়) জ্বালায় বুকে পাষাণ বেঁধে পাষাণ ভাঙ্গতে ব'সেছে।

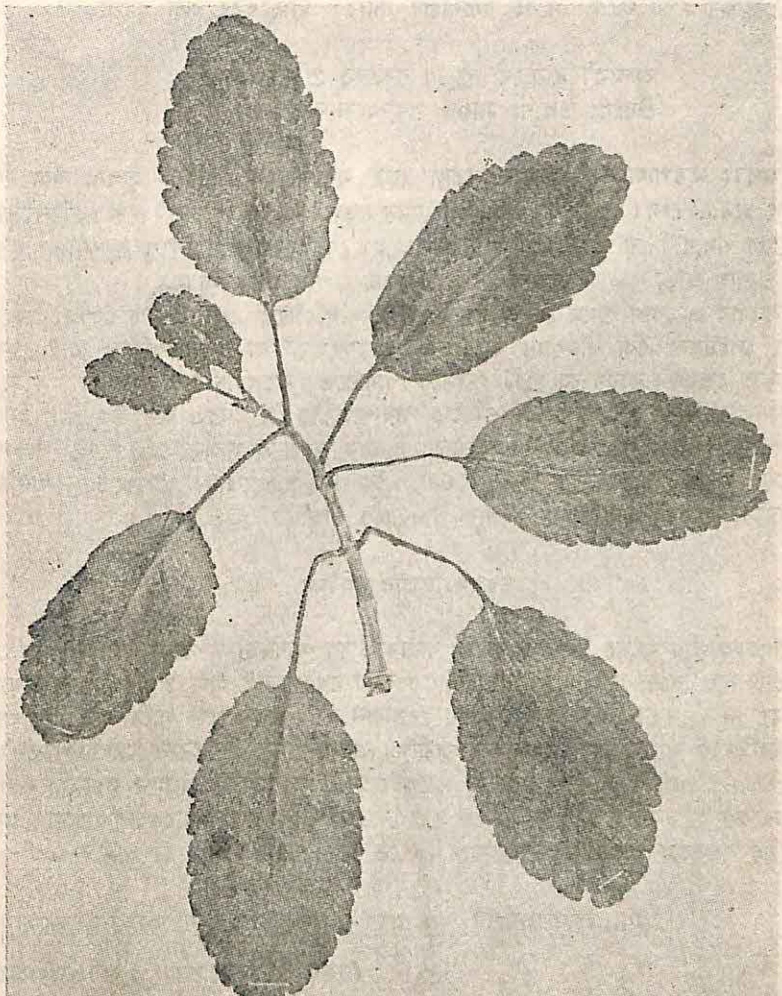
এদিকে পাষাণী হ'য়ে ছুটে এসে মুখের মত ওষুধ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে, এমন সময় রাজ-কবির সঙ্গে দেখা, তিনি ব'লে উঠলেন—

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পক দলৈঃ স বিধায় ধাতা
কান্তে কথং ঘটিত বানুপলেন চেতঃ॥

হ্যাঁগা, তোমার মুখখানা ফোটা কমলের মত, চোখ দুটিও কমল ফুলের পাপড়ির মত, ঠোঁট দুটি একেবারে কচি পাতার মত, দাঁতগুলি যেন কুন্দকুসুম, আর সারা অঙ্গটি চাঁপার রং, আঙ্গুলগুলি তো চাঁপার কলি। তোমার সারা দেহটিই তো নানান ফুল দিয়ে গ'ড়েছেন বিধাতা, কিন্তু হৃদয়টিকে কেন পাষাণ দিয়ে গড়েছেন? হায় এত ক'রেও তোমার হৃদয়-আবেদন পেলাম না?

কেন? তুমি জানো না, শাক্ত উপাসকরা তো ব্যর্থ কান্নায় হতাশ হ'য়ে ব'লেছেন, "পাষাণহৃদয়া শ্যামা" অথবা "পাষাণ-তনয়া তুমি"। কবির সংবিৎ ফিরে এলে ভাবছে—হ্যাঁ ঠিকই তো, ভাগবতের সেই হিরণ্যকশিপুর কাহিনীটি—প্রহ্লাদের সেই আকুল প্রার্থনায় কাতর হ'য়ে নারায়ণকে স্মরণ ক'রতেই পাষাণস্তম্ভ বিদীর্ণ ক'রে নৃসিংহ

মূর্তিতে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। এখন কবির মন-কাননে পাষাণের ছড়াছড়ি। এইবার বাস্তব জগতে ফিরে গিয়ে বৈদ্যকের "পাষাণভেদের" আলোচনা ক'রতে বসি।



বৈদ্যকের নথি

আয়ুর্বেদীয়গণ প্রত্যক্ষ ক'রে থাকেন মানুষের দেহেও পাষাণের জন্ম হ'লে আয়ুর্বেদীয় ভেষজের দ্বারা তা চূর্ণ হ'য়ে যায়।

কথাটা এই যে, মাছ যেমন জলে থেকেও, কোমল মাংসল দেহ পেয়েও তাদের মাথায় পাথর জন্মে, সেই রকম মানুষের হয় পিত্তের থলিতে, বৃক্কে (কিড্‌ণীতে) আর মূত্রের বস্তিতে (থলিতে); এভিন্ন বালুর মতও পাথরের গুঁড়ো এই মূত্রের থলিতে হয়। তার নাম শর্করা—এর বড়গুলি অশ্মরী বা পাথুরী। এটি বায়ু, পিত্ত, কফ বিকারেও

হয় আবার শুক্র জন্যও হয়, এ রোগ যখন জন্মে তখন বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

দুটি রোগেই মূত্রাল্পতা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, কটিতে ব্যথা, বমি, অগ্নিমান্দ্য, হৃদরোগ, শূল, মূর্চ্ছা হ'য়ে থাকে। খুবই যন্ত্রণাপ্রদ ব্যাধি। আয়ুর্বেদে বলা হ'য়েছে—

অশ্মরী দারুণো ব্যাধি রন্তকঃ প্রতিলোমতঃ।
ঔষধৈঃ তরুণঃ সাধ্যঃ প্রবৃদ্ধশ্ছেদমর্হতি॥

অর্থাৎ মূত্রপাষাণ বা অশ্মরী রোগ বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, এটিকে তুলনা করা যায় সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে। তবে বলা যায়, এটি যখন নতুন হয় অর্থাৎ বেশী শক্ত (কঠিনীভূত) না হ'লে ওষুধ দিয়ে তাকে ভেঙ্গে (ক্ষয় করে) বের হ'য়ে যায় কিন্তু বেশীদিন হ'লে শস্ত্র প্রয়োগ ছাড়া অর্থাৎ অপারেশন করা ছাড়া উপায় থাকে না।

অতএব এ রোগ প্রথম দেখা দিলেই যে বনৌষধিটিকে বাংলার বৈদ্যকবৃন্দ ব্যবহার করেন, সেইটাকে এরা নামকরণ ক'রেছেন "পাষাণভেদ" বা "পাথরকুচি"। এটি কিন্তু বিতর্কিত ভেষজ। কারণ যে দুটি গুল্মকে পাষাণভেদ ব'লে চিহ্নিত করা হয়, সে দুটি গুল্মজাতীয় ঠিকই, কিন্তু ভৈষজ্যশক্তিতে পাষাণভেদীর যে আরও অন্য কি শক্তি আছে সে পার্থক্য পরে লেখা হবে। পাষাণভেদীটি চরক সুশ্রুত সম্মত তো বটেই, তাছাড়া চক্রদত্তেরও ব্যবহৃত। এখন প্রশ্ন হ'লো চরক বা সুশ্রুতোক্ত পাষাণভেদ কোনটি? পাহাড়ীয়া বটপত্রী গাছটি না বাংলার পাথরকুচি গাছটি?

চরকসংহিতার সমীক্ষা

চরকের সূত্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে পাষাণভেদের গুণবত্তা সম্পর্কে বলা হ'য়েছে যে, ভেষজটি মূত্র বিরেচনীয়। মূত্র বিরেচনীয় শব্দটি সেইখানেই অর্থ প্রকাশ করে, যেখানে বস্তিশোধন ও মূত্রল এই উভয় কার্যের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে মূত্রল কাজটির জন্য চাই জলীয় ও আগ্নেয়ধর্মী ভেষজের প্রয়োগ। এইজন্য মূত্র প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শীতবীর্য এবং উষ্ণবীর্য এই দুই শক্তি যেখানে থাকে তেমনি ভেষজেরই প্রয়োগ করা বিধেয়।

চরকের অভিমত হ'লো, যে ভেষজ মূত্র বিরেচন করে অর্থাৎ মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রয়োগ করা হয় সেই ভেষজই অশ্মরীভেদে প্রয়োগ করতে হয়। তাই বলা হ'য়েছে—

ক্রিয়া হিতাত্বশ্মরী শর্করাভ্যাং কৃচ্ছ্রে যথৈবোৎকফানিল্যভ্যাম্।

(চরক চিকিৎসাস্থান ২৬।৫২ সূত্র)

চরকে এই ভেষজটির দুটি নামকরণ করা হ'য়েছে—পাষাণভেদ ও অশ্মকভেদ। প্রধানভাবে মূত্রকৃচ্ছ্রে ও অশ্মরীরোগেই প্রয়োগে নির্দেশ। সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ের দ্রব্য সংগ্রহণীয় অধ্যায়ে পাষাণভেদের উল্লেখ। ওখানের উল্লেখিত ভেষজগুলিকে বলা হ'য়েছে সবই অশ্মরী ও শর্করা দূর করে।

প্রত্যক্ষ ফলবেত্তা চক্রপাণি দত্ত মহাশয়, তাঁর গ্রন্থে ("চক্রদত্ত") মূত্রকৃচ্ছ্র মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগে কয়েকবারই এই পাষাণভেদ ভেষজটির ক্বাথ এবং ঐ ক্বাথমিশ্রিত ঘৃতের দ্বারা বস্তিগত রোগগুলির চিকিৎসার প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন। সবই তাঁর দৃষ্টফল। চক্রদত্তের গ্রন্থেও এই ভেষজটির শিলাভেদ, উপলভেদ, পাষাণভেদ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।

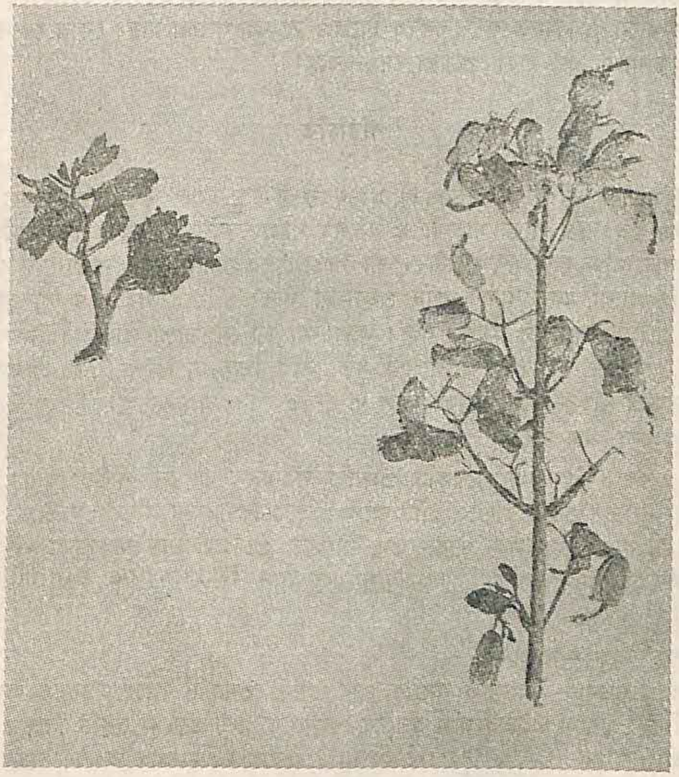
পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজনিঘণ্টুতে এই ভেষজটির ১০টি নামের উল্লেখ দেখা যায়। এইসব বিভিন্ন নামের উল্লেখ থাকায় পরিষ্কার বোঝা যায়।

রাজনিঘণ্টুকার ব'লেছেন—

"পাষাণভেদো মধুরস্তিক্তো মেহ বিনাশনঃ।"

আর ষোড়শ শতকের ভাবপ্রকাশকার ব'লেছেন—

"অশ্মভেদো হিমস্তিক্ত কষায়ো বস্তিশোধনঃ।"



পাষাণভেদ ফুল

উভয় বৈদ্যের অভিমতের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, দ্বিতীয় মতে এটি তিক্ত-মধুর তো বটেই, তাছাড়া অধিকতর বৈশিষ্ট্য, এটি কষায় রসসম্পন্ন। এর দ্বারা বোঝা যায়, রাজনিঘণ্টুতে এই ভেষজটির রস, বীর্য যেভাবে আলোচিত ও নিরীক্ষিত হ'য়েছে, ১৬ শতকের ভাবপ্রকাশের কালে এসে আরও অগ্রসর। আর একাদশ শতাব্দীর দ্রব্য-বিজ্ঞানীয় গ্রন্থাবলীতে (চক্রদত্ত কৃত) এবং পঞ্চম শতাব্দীর ধন্বন্তরী ও নিঘণ্টুতেও এর রসবীর্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচিত হ'য়েছে। তা যতটুকু আলোচিত হ'য়েছে, তার দ্বারাই বোঝা যায় পাষাণভেদ নামের ভেষজটি মূত্রবহ স্রোতেই কাজ করে।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— রসে তিক্ত, পিচ্ছিল, কোমলতাকারক, ক্ষতনিবারক ও কীটনাশক।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— পাতার রস চা-চামচের দু' চামচ ও তার সঙ্গে এক চা-চামচ পরিমাণ ঘি মিশিয়ে খেলে আমাশা রোগের উপশম হয়ে থাকে। তাছাড়া এই রস ঘি ও রসুন সহযোগে খেলে কাসরোগের প্রশমন হয়। বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্রণ ও ক্ষতে, মাংসপেশী থেঁতলে গেলে ও বিষাক্ত কীটাদির বিষনাশে পাতা আগুনে ঈষৎ গরম করে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। এছাড়া দেহের কোন স্থানে কাটা গেলে তজ্জনিত ব্যথা-বেদনায় ও ফুলায় উক্ত পাতার সেঁক ফলদায়ক। হাড় ভেঙ্গে গেলে পাতা বেটে তথায়, ব্রণস্থানে ও দূষিত ক্ষতে বেঁধে দিলেও সুফল পাওয়া যায়। কোন কোন প্রদেশে চোখের যন্ত্রণায়ও এর বাহ্য প্রয়োগ দেখা যায়।

পরিচিতি

গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণতঃ ১½-২ ফুট উঁচু হতে দেখা যায়, অঞ্চল বিশেষে ৩-৪ ফুটও হয়। এর পাতা মাংসল ও মসৃণ। পাতা দেখতে অনেকটা ডিম্বাকৃতি কিন্তু কিনারা গোল খাঁজ কাটা (পদ্মকাটা)। এর পাতা থেকেই গাছ হয়। পাতাগুলি সাধরণতঃ ৩—৬ ইঞ্চি লম্বা, অন্য আর একটি প্রজাতির পাতা ১ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা যায়, সেইগুলির অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। মূল কাণ্ডের অগ্রভাগে গুচ্ছবন্ধ নিম্নাভিমুখী ফুল হয়। দেখতে অনেকটা আঙ্গুরের মত, তবে ভিতরটা ফাঁপা, এরা লম্বায় ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পের বহিরাবরণে সবুজ, লাল ও শ্বেতবর্ণের দাগ থাকে, শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়ে থাকে।

এই গণের (Genus) কয়েকটি প্রজাতি বর্তমানে এখানে পাওয়া যায়। ভারতের উষ্ণ অথবা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এটি জন্মে। তবে দেখা যায় কাঁকুরে মাটিতে গাছগুলি ভাল হয়। এর সংস্কৃত নাম পাষাণভেদ, বাংলায় প্রচলিত নাম কফপাতা ও হিন্দীতে জ্যাক্‌মুহায়াৎ নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Kalanchoe pinnata Pers. ফ্যামিলি Crassulaceae.

ব্যবহার্য অংশ—পাতা।

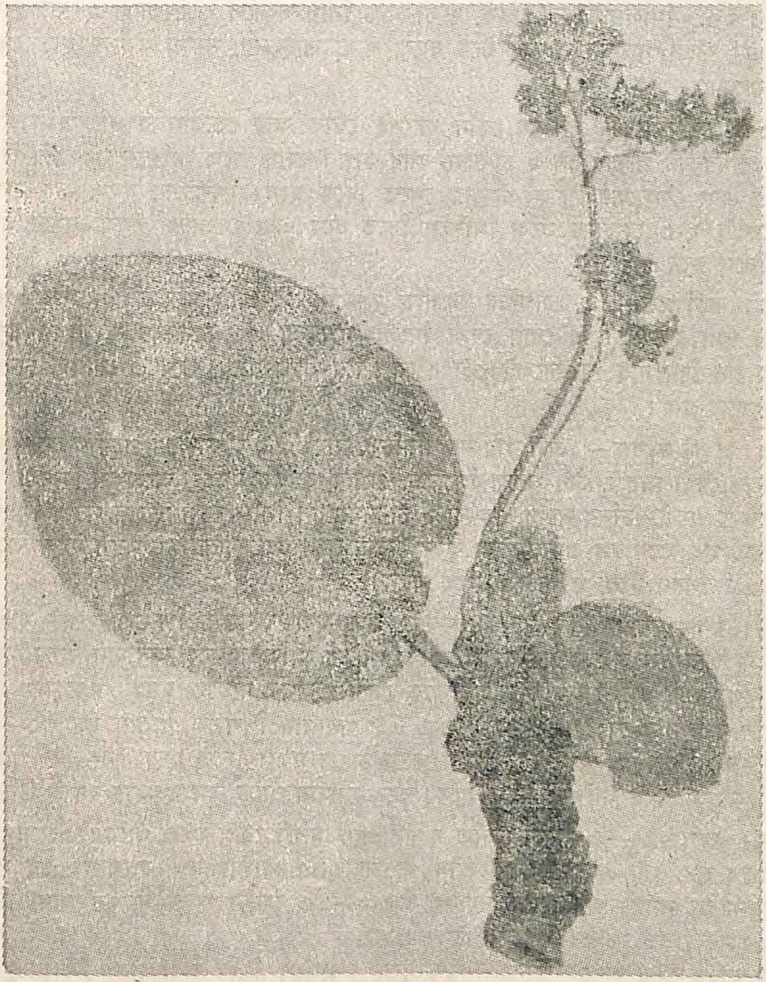
বিশেষ জ্ঞাতব্য— সংস্কৃত নামের পাষাণভেদ ভেষজটি নিয়ে মতভেদ আছে। এর তাৎপর্য বিচার করলে এইটাই মনে হয় যে, শরীরের অভ্যন্তরে কয়েকটি বিশেষ আশয়ের অশ্ম অর্থাৎ পাথর (Calculas or Stone) তাকে ভিন্ন করে অর্থাৎ ভেঙ্গে দেয়—তাই কি এর নাম পাষাণভেদ? অথবা এটি কাঁকরপ্রধান বা পাথুরে মাটিকে ভেদ ক'রে ওঠে বলেই এর নাম পাষাণভেদ? যাই হোক, বাংলার বৈদ্যকসম্প্রদায় পাষাণভেদ ব'লে উপরিউক্ত গাছটাকে ব্যবহার করে আসছেন কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ, যেমন ইউনানী, এঁরা এটাকে পাষাণভেদ বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা এই নামের ভেষজটিকে বলেন "পাখান বেইদ্"। সেই গুল্মটির মূলই ব্যবহার হয়। এটি হিমালয়ের ৭,০০০ থেকে ১০,০০০ ফুট উচ্চতার মধ্যেই সব অঞ্চলেই পাওয়া যায়, তবে কাশ্মীর থেকে ভুটানের মধ্যে বেশী পাওয়া যায়। এর বোটানিক্যাল নাম Berginia ligulata Wall. ও ফ্যামিলি Saxifragaceae. এরই সমর্থনে আর একটি বক্তব্য এখানে রাখছি যে, ভাবপ্রকাশে এর একটি পর্যায় নাম করা হয়েছে "বটপত্রী"। এই গাছের পাতা অবিকল বটের মত। তাই মনে হয়, এইটাই প্রকৃত শাস্ত্রোক্ত পাষাণভেদ। তবে সমগুণসম্পন্ন গাছ

যে থাকতে পারে না, তাও তো নয়, নিবন্ধোক্ত লোকায়তিক যোগগুলি বাংলায় প্রচলিত যে পাষাণভেদ, তাকেই অবলম্বন করে লেখা হ'লো।

লোকায়তিক যোগ

এটি প্রধানভাবে কাজ করে—

১।—মেহ রোগে— এই রোগের ইতোবৃত্ত বেশ বিশদ ক'রেই বলা হ'য়েছে এই



Berginia ligulata

গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের ৩৭০ পৃষ্ঠায়। যদি মধুমেহ ও প্রমেহ না হয়ে থাকে (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ঐখানে) তবে পাষাণভেদ পাতার রস এবেলা ওবেলা এক চা-চামচ ক'রে খেয়ে দেখুন, ৫-৭ দিনের মধ্যেই বিশেষ উপশম হবে।

২। **সর্দিতে—** যে সর্দি পুরনো হ'য়ে গিয়েছে, সেই ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ উপযোগী। নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, সর্দি শব্দটির যে অর্থ তা আয়ুর্বেদীয় নয়; তবে আয়ুর্বেদে ছর্দি আছে, তার অর্থ বমন বা বমি, কিন্তু আমরা এমন অর্থ করে নিয়েছি যে, সর্দি মানে কফ, ঠাণ্ডা লেগে শ্লেষ্মা। সংস্কৃত বা আয়ুর্বেদের সর্দিতে কফ আছে আর এই ফারসী ভাষায় সর্দিটির অর্থ কফ। যাই হোক্, কফ-বিকারে (পুরাতন) পাথরকুচি পাতা রস ক'রে সেটাকে একটু গরম ক'রতে হবে এবং গরম অবস্থায় তার সঙ্গে একটু সোহাগার খৈ মেশাতে হবে (৩ চা-চামচ রস হ'লে অন্ততঃ ২৫০ মিলিগ্রাম) তা থেকে ২ চা-চামচ নিয়ে সকালে ও বৈকালে ২ বার খেতে হবে, এর দ্বারা পুরনো সর্দিটা উঠে যাবে, শুধু তাই নয়, সর্বদা কাসির হাত থেকে বাঁচা যাবে।

৩। **মূত্র রোধে—** সে যে কোন বয়সেই হোক আর যেকোন আকস্মিক কারণেই হোক, পাথরকুচি পাতার রস ২ চা-চামচ আধ কাপ ঈষদুষ্ণ জলে মিশিয়ে সকালের দিকে একবার এবং বৈকালের দিকে একবার খেতে দিতে হবে। শিশুদের হ'লে ১৫ থেকে ৩০ ফোঁটা ২-৩ চা-চামচ জলে মিশিয়ে দিতে হবে এবং দেওয়ার পূর্বে রসটা গরম করে নিতে হবে।

৪। **রক্তপিত্তে—** এ রোগটির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩৫০ পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে। এ রোগ দেখা দিলেই দু'বেলা এক চা-চামচ ক'রে পাথরকুচি পাতার রস দিন দুই খাওয়ালেই ওটা ধীরে ধীরে ক'মে যাবে, তবে এ রোগ একেবারে বন্ধ ক'রতে নেই।

৫। **পেট ফাঁপায়—** এটা কার না পরিচিত, যদিও এর কার্যকারণ প্রচুর আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় পেটটা ফুলে গিয়েছে, প্রস্রাব আটকে যাচ্ছে, অধোবায়ু স'রছে না, সেই ক্ষেত্রে একটু চিনির সঙ্গে এক বা ২ চা-চামচ রস সিকি কাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়, তবে রস একটু গরম ক'রে নিতে হয়। এর দ্বারা মূত্র সরল হবে, অধোবায়ুরও নিঃসরণ হবে, ফাঁপাটাও ক'মে যাবে।

৬। **শিশুদের পেট ব্যথায়—** অন্ততঃ দেড়-দুই বৎসরের শিশুও স্পষ্ট ব'লতে পারে না তার কি হ'চ্ছে, চিকিৎসক অথবা বাড়ির অভিভাবককে অনুমান ক'রে নিতে হয়, শুধু তাই নয়, কোথায় হাত দিচ্ছে সেটাও লক্ষ্য ক'রতে হয়। যাহোক্ যদি অনুমান করা যায় যে পেটে ব্যথা হ'চ্ছে, এই অবস্থায় শিশুকে পাতার রস ৩০—৬০ ফোঁটা পর্যন্ত দেওয়া যায় কিন্তু গরম ক'রে ঠাণ্ডা হ'লে দিতে হবে এবং ওই পাতার রসটা (কাঁচা) পেটে লাগিয়ে দিতে হবে। তবে বয়সানুপাতে কম ব্যবহার করাই উচিত।

৭। **অপস্মারে—** আমরা চলতি কথায় একে মৃগী রোগ ব'লে থাকি। এ রোগটির কি লক্ষণ হয়, এটা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩১৫ পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে। ওই সময় (রোগাক্রমণের সময়) পাথরকুচি পাতার রস ২—১০ ফোঁটা ক'রে মুখের মধ্যে দিতে হবে, একটু পেটে গেলেই রোগের উপশম হবে।

নিবন্ধের শেষ কথাটা জানাই—পাষাণভেদ নামকরণ যিনি ক'রেছিলেন, ব'লতে হয় তাঁর দূরদৃষ্টি অসাধারণ। কালের বিবর্তনে অধিকাংশ বৈদ্যবৃন্দের সামনে সমগ্র আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানটিই এখন হ'য়েছে প্রশ্নবোধক? অর্থাৎ পাষাণভেদ?

দীর্ঘকাল এই আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের অনুগ্রহে কত লক্ষ কত কোটি মানবের উপকার হ'য়েছে, তবে সেটা কি হ'য়েছে আয়ুর্বেদের ভৈষজ্যবিদ্যার অমোঘ প্রভাবে? অথবা সেইসব হ'য়েছে মুষ্টিযোগ আর সিদ্ধযোগের দরুণ?

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের মৌল রহস্য কি, তা কি এখন আমরা অধ্যয়ন অধ্যাপনার মাধ্যমে করি? আর হবেই বা কি করে, খুড়ো ব'লতো "কালি, কলম, মন" লেখে তিন জন। আজ আয়ুর্বেদেরও সেই তিনের অভাব তো আছে, আর অভাব গোষ্ঠের "রাখালের", তাই সমগ্র আয়ুর্বেদশাস্ত্রটাই একখণ্ড পাষাণ।

CHEMICAL COMPOSITION

Kalanchoe pinnata

Leaves contain :— Malic acid; isocitric acid and citric acid.

Bergenia ligulata

Root contains :— 1. Gallic acid 2. Tannic acid (14.2%) 3. Glucose (5.6%) 4. Mucilage 5. Wax.

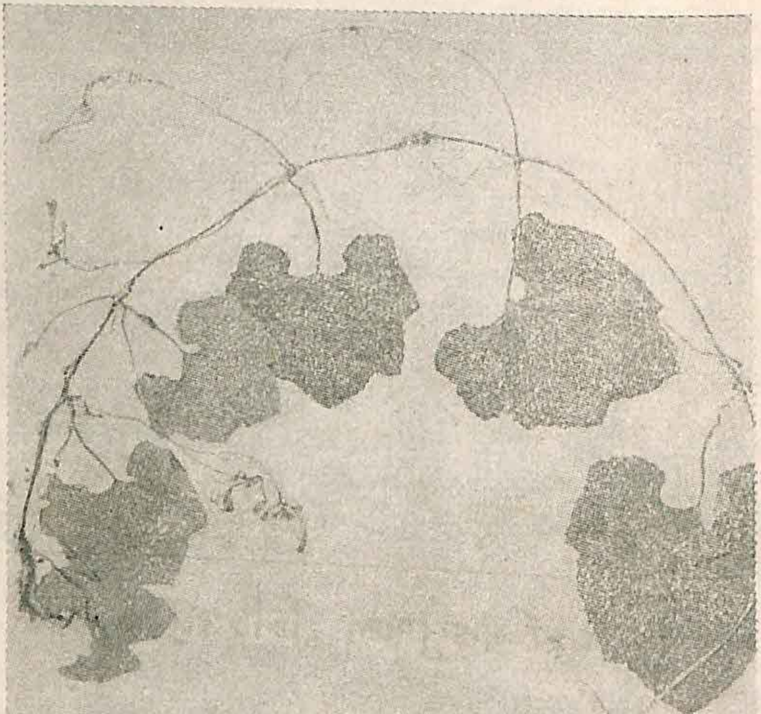
দধিপুষ্প [চিচিণ্ডা]

কথায় বলে "মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।" কথাটার সারার্থ হ'লো, ওখানে গিয়ে নিরাকার ব্রহ্মের খোঁজ করার অভিলাষ বা চিন্তাধারা নিবদ্ধ থেকেই যায়। আবার সেই রকম আমরাও কি ধর্মকর্মের বেলায় এটা ভাবি না? যে আমাদের রক্ষয়িত্রী মা শীতলা, কালী, তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, বদ্রিনাথ, কামাখ্যা—এ'রা উত্তরোত্তর বেশী ভারীক্কি, যাকে বলে জবরদস্ত, আরও সাধুভাষায় ব'লবো—জাগ্রত জাগ্রতা দেবদেবীর আখড়া। আমি কিন্তু গোদা বাংলার লোক, "গোপাল ভাঁড়ের দেশের লোক"; আমি আজও উঠনের মাঝখানটায় খুঁটি পুতে যদি ভাবি যে এইটাই পৃথিবীর মাঝখান, তবে সেটা হ্যাঁ বা না, এ যুক্তি দেওয়ার লোক ক'টা আছে? সুতরাং আমিও ওই প্যাঁচে প'ড়ে আছি।

মন্দিরের পাশ দিয়ে যাই আর নাক-কান ম'লতে ম'লতে যাই। আসলে নাক কান তো মলি, ম'লছি কেন? কোথায়? কার কাছে? এ'রা কতদিনের সে বিচার কি করেছি না করার মানসিকতা আছে! মনে হয় নেই, তাই তো ধরিয়ে দেওয়ার বিধি হ'লো চিরন্তন প্রথা। আফিং তো খাই, এ বিচার কি কখনও করেছি—এটা এলো কোথা থেকে? আর কারা এনেছে? এবং কবে এসেছে? সেই রকম অনেক বিদ্যে আছে, যেটা না দেখিয়ে বা শিখিয়ে দিলে শেখা যায় না।

পুরনো কাসুন্দি

ব'লছি কি, ভারতে পুজো-পার্বণের মাধ্যমেও আমাদের যে সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছিলো, সেটাতে প্রধানতঃ দুটি ধারা দেখা যায় (আমি কিন্তু ব'লছি সবই পণ্ডিতি ভাষ্য)—একটি বৈদিক ধারায় আর একটি তান্ত্রিক ধারায়। এই দুটি ধারা মিশে গিয়ে



যাকে ব'লে 'মার্জ্' ক'রে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে একটি সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠলো এবং সেটা হ'লো পৌরাণিক ধারা—এইটাই হ'লো "পুরোহিততন্ত্র"বাদ; কারণ বেদে কোথাও পুজার্চনার ঘটাপটা নেই, আর বৈদিক সংস্কৃতির আবহাওয়া মনে জাগাতে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য ছাড়া আর তো কেউ পুজনীয় ব'লেও তাঁরা জানতেন না, এইসব নাম কিন্তু আমাদের সৃষ্টির অর্থাৎ জাগতিক সৃষ্টির মৌল কারণ, যে পঞ্চ মহাভূত

ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ, ব্যোম্—এদেরই প্রতীক।

পরবর্তী স্তরে রাম, কৃষ্ণ এঁরা এসেছেন অবতারবাদে। ওদিকে তান্ত্রিকদের মতবাদে দুর্গা, কালী, এবং যত নারীমূর্তি, শৈব সম্প্রদায়ের ধারায় শিব। তাও অবতারবাদে। এই দুটি ধারার সঙ্গে 'মার্জ' ক'রে শিব-দুর্গার বিয়ে হ'য়ে গেল।

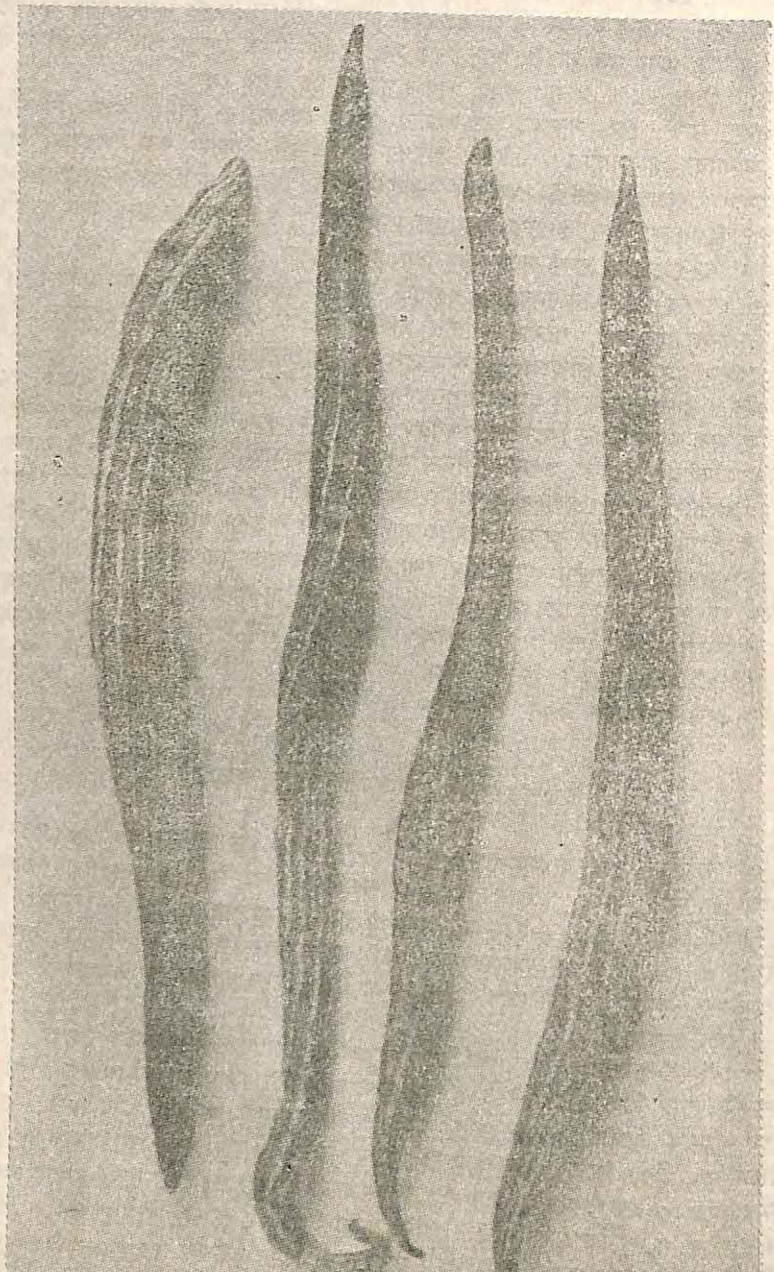
যাক্, মর্তে এসে সকলেই ঘর-সংসার পেতে ফেলেছেন আমরা ধ'রে নিয়েছি। এটা আমাদের মানসবৃত্তি। এইবার তাঁদের সেবাযত্নের ব্যবস্থা করা, সনাতন ধর্মে আতিথেয়তা বজায় রাখাটাই সমাজধর্ম, তাই আমরাও তার জন্য উপচার সংগ্রহে ব্যস্ত হয়েছি; তবে দেখা যায়, উপচার জন্য যত ফুল, দূর্বা, বেলপাতা ব্যবহার করা হ'য়েছে, সবই আমাদের ভেষজ বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদির অঙ্গবিশেষ, আবার কতক আছে, আহার্য নৈবেদ্য হিসেবে। বর্তমান নিবন্ধের বক্তব্যটি সেই খাদ্যৌষধি, যেটির নাম "দধিপুষ্প"। এটি বৈদিকযুগের নয়, পরবর্তীকালের সমীক্ষায় এটি সমাজে স্থান পেয়েছে ঔষধ এবং আহার্য হিসেবে, তা'হলেও খুব নূতন নয়। সুশ্রুতেও তো আছে।

এইবার বাস্তবাভিমুখী হ'য়ে আপনাদের জানাই—'ত্রিলিঙ্গ' দেশে গিয়ে, খেতে ব'সে যদি জিজ্ঞেস করেন এটা কিসের তরকারি? তাঁরা যদি বলেন "লিঙ্গ পটোলম্" অর্থাৎ লিঙ্গ পটোলের তরকারি, তখন আপনার খাওয়াটা কোথায় গিয়ে উঠবে! (এই ত্রিলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ হ'য়ে তেলেঙ্গানা, তা থেকে তেলেঙ্গী, পরে তেলেগু), আবার বিহারে খেতে ব'সে যদি জিজ্ঞেস করেন, এটা কিসের তরকারি? তাঁরা যদি বলেন, এটা হোঁপা। এই হোঁপার অর্থ জিজ্ঞেস ক'রে যদি শোনেন যে দেখতে সাপের মত একটা জিনিস, তা'হলে আপনার খাওয়া তো প'ড়ে মরুক, ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম। আবার বাংলায় এসে নরকোল কোরা দিয়ে ঘণ্টটা জ'মে যেতেই যদি জিজ্ঞেস করেন, এটা কিসের? যদি গৃহিণী বলেন, সেই চিচিঙ্গে গো, তা'হলে এখন বুঝলেন সেই লিঙ্গ পটোল কোথায় এসে ঠেকলো! এখন এটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্।

বেদোত্তরকালে দেবদেবীর পূজোপচার

এই নিবন্ধের প্রথমেই আলোচনা করেছি—আমাদের মত সনাতনপন্থীদের বর্তমান উপাস্য দেবদেবী কাঁরা। তাঁদের পূজোর বেলাতেও ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতির প্রচলন ছিল এবং এখনও আছে—এই যেমন ফুলের বেলায় কারোর জবা প্রিয়, কারোর বা ধুতরোফুল, কারোর চাঁপা, কারোর কুন্দ, এইরকম আকন্দ, ঘেঁটু, অপরাজিতা, মাধবী, বকুল, টগর, কলকে, করবী, কাঞ্চন এমনি এক একটি দেবদেবীর এক এক রকম ফুলে অর্চনা করা প্রশস্ত।

প্রথমেই বলি, ভারতে তো শিবলিঙ্গ পূজোটি এসেছে দক্ষিণ ভারত থেকেই, তবে স্মরণাতীতকালে ছিল সুদূর উত্তর-পশ্চিম ভূখণ্ডে। সেটা বৌদ্ধ সংস্কৃতিরও ঢের আগে, অবশ্য পুরাণে এসেছে অনেক পরে। সেই পুরাণ থেকেই জানতে পারা যায় শিবের আরাধনাতেও ছিল বারোমাসের পূজোর বিধান; সেও আবার এক এক মাসে এক এক রকমের ফুল ও এক এক নৈবেদ্যের উপচার—যেমন অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষে মল্লিকাকুসুম আর ধুস্তুর পুষ্প (ধুতরো ফুল); পৌষ মাসে বিল্বপত্র, চন্দন, আর চালের গুঁড়োর পিঠে (পিষ্টক)। মাঘে কুন্দ কুসুম (কুঁদ ফুল), ফাল্গুনে মরুবক-পুষ্প এবং শর্করাসহ মণ্ডের নৈবেদ্য, যাকে বলা হয় চিনির লাড়ু (লড্ডুক), তারপর চৈত্রে কর্পূর ও নৈবেদ্য পিঠে, বৈশাখে অশোকের ফুল, আর গুড়ান্ন নৈবেদ্য, জ্যৈষ্ঠে চাঁপা ফুল, আষাঢ়ে অগুরু কাঠ ও অপামার্গ শীষ্ আর শ্রাবণে—



শ্রাবণে করবীরৈশ্চ 'শম্ভবে শূলপানয়ে'।
সদ্যোজাতৈঃ ভাদ্রপদে বকুলৈ র্দধিপুষ্পকৈঃ।
গন্ধর্বাশো মদনজ মাশ্বিনেচ সুরাধিপম্।
খাদিরং দন্ত কাষ্ঠংচ কার্ত্তিকে রুদ্র মর্চয়েৎ॥

(গরুড় পুরাণ, পূর্বখন্ড ১১৭ অধ্যায়)

এখানেই দেখা যাচ্ছে, ভাদ্র মাসে শিবের অর্চনায় বকুল ফুল আর "দধিপুষ্পের" নৈবেদ্য অর্থাৎ চিচিন্ডার বা চিচিঙ্গার নৈবেদ্য। এইভাবে বারোমাস পুজো করার পর ব্রত উদ্যাপন ক'রতে হবে। এইটাই হ'লো মদন ত্রয়োদশী ব্রত।

এখন পৌরাণিক ব্রতের উপচার দধিপুষ্পের সন্ধান পাওয়া গেল; তাই বলে তার ভৈষজ্যগুণ নেই এ কখনও হ'তেই পারে না, কারণ হ'লো দেবোদ্দেশ্যে যেকোন জিনিসই উৎসর্গ করা হোক না কেন, সে মানব-কল্যাণে লাগবেই।

দধিপুষ্পের ভৈষজ্যচিন্তা

রাজনিঘণ্টুকার ব'লেছেন, দধিপুষ্পের নয়টি নাম—

দধিপুষ্পঃ কটুমধুরো শিশিরঃ সন্তাপপিত্তদোষঘ্নঃ।
বাতাময় দোষকরঃ গুরুস্তথাঽরোচকঘ্নশ্চ॥

(মূলকাদি বর্গ)

এভিন্ন নিঘন্টুরত্নাকরে এই দধিপুষ্পের সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে ওকে বলা হ'য়েছে "চিচিন্ড"।

চিচিন্ডো বাতপিত্তঘ্নো বল্যঃ পথ্যঃ রুচিপ্রদঃ।
শোষিণোঽতি হিতঃ কিঞ্চিদ্ গুণৈর্ন্যূন পটোলতঃ॥
দধিপুষ্পঃ পিত্তহরঃ বন্যশ্চাপি ত্রিদোষনুৎ॥

অর্থাৎ চিচিন্ড ফলটির অপর নাম দধিপুষ্প, এটি পটোলের চেয়ে গুণগত শক্তিতে ন্যূন, তবে শোষরোগীর পক্ষে হিতকর; এটি বাতপিত্তবিকার দূর করে, আর বন্য চিচিন্ডও ত্রিদোষ বিকার দূর করে। এরই দ্বারা বোঝা গেল বাংলার চিচিঙ্গা, বিহারের হোঁপা, তেলেঙ্গানার লিঙ্গপটোল নিতান্ত হেলাফেলার জিনিস নয়। তাছাড়া ভৈষজ্য গুণের বিবেচনাও নিতান্ত নবীনও নয়। এই প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য রাখছি—সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের পঞ্চম গুচ্ছের টীকার ভাষ্য লিখতে একটি চমৎকার প্রসঙ্গের অবতারণা করা হ'য়েছে—

"একমেব হি দ্রব্যং নানা দেশেষু নানা শব্দৈরভিধীয়তে যথা বহবোন্নং ভক্তং আহুঃ দাক্ষিণাত্যায়স্তু কুরমিতি" অন্নং সমতল বাসিনঃ। অতঃ ধান্যানি নানাদেশ কৃষি-বলেভ্যঃ। মৃগাস্তু ব্যাধেভ্যঃ। শাকুনিকেভ্যঃ পক্ষিণঃ। কন্দমূল ফলানি বনেচরা দিবভ্যঃ। শাকানি গ্রাম্যারণ্য বাসিভ্যঃ কৃতান্নানি সূদেভ্যঃ। ভেষজ দ্রব্যানি বণিক্ভ্যঃ—

অর্থাৎ একই দ্রব্য নানা দেশে নানা শব্দের দ্বারাই পরিচিত হয়ে থাকে।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— ইহা শীতল, ক্রিমিনাশক, বিরেচক ও বলকারক।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— এর ফল বিরেচনে ও ক্রিমির উপদ্রব নিবারণে হিতকর। ফিলিপাইনে এটিকে বমনকারক ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া এটি বলকারক, তৃষ্ণা ও পিত্তের প্রশমক। কেউ কেউ এর বীজ ও মূল উদরাময়েও প্রয়োগ করে থাকেন।

ইউনানী চিকিৎসকদের মতে এর বীজ ক্ষুধাবর্ধক।

পরিচিতি

বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ। লতার গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোম এবং গাঁট আকর্ষযুক্ত, এই আকর্ষ দ্বারাই মাচায়, বেড়াতে ও অন্য গাছকে আঁকড়িয়ে ধরে ওপর দিকে ওঠে। পাতা ৫টি কোণ বিশিষ্ট এবং উভয়দিকে কোমল রোম আছে, লতা ও পাতা উভয়ই নরম। লাউ কুমড়ার মত পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় শ্বেত বর্ণের ফুল একই গাছে জন্মে। পুরুষ জাতীয় ফুলের বোঁটা লম্বা ও স্ত্রী জাতীয় ফুলের বোঁটা ছোট, এই স্ত্রী জাতীয় ফুল থেকেই ফল হয়। ফল প্রায় ৩-৪ ফুট পর্যন্ত লম্বা ও ব্যাস ১-১½ ইঞ্চি হতে দেখা যায়। এর গায়ে সাদা ও সবুজ রঙের ডোরাযুক্ত চিত্রিত দাগ থাকে। এতে ডিম্বাকৃতি, চেপ্টা ও কিনারা ঢেউ খেলানো মেটে রঙের বহু বীজ থাকে। চিচিঙ্গা বনচিচিঙ্গা অপেক্ষা লম্বা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বীজ পোতা হয়, বর্ষায় ফুল তৎপরে ফল হতে শুরু করে। এর আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, তবে বর্তমানে ভারতের সর্বত্র সবজি হিসেবে অল্পবিস্তর চাষ হয়ে থাকে।

এর সংস্কৃত নাম চিচিন্ডা, বাংলায় প্রচলিত নাম চিচিঙ্গা ও হিন্দীতে চেচিণ্গা নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Trichosanthes anguina Linn. ও ফ্যামিলি Cucurbitaceae.

ঔষধার্থ ব্যবহার্য অংশ—পাতা, ফল ও বীজ।

লোকায়তিক যোগ

এটি রসবহস্রোতে কাজ করে।

১। **মাসিক ঋতু বন্ধে—** যাঁদের মাসিক ঋতু আর হ'চ্ছে না, হয়তো বা শরীরে মেদ বেড়ে যাওয়াতে ক'মতে ক'মতে বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে চিচিঙ্গার ডাঁটা-পাতার রস ১ চা-চামচ সম-পরিমাণ জল মিশিয়ে অল্প গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে দু'বার খেতে হবে; কয়েক দিন খেলেই মাসিক ঋতুটা হ'য়ে যাবে।

২। **চর্মরোগে—** যে চর্মরোগ পুরনো হ'য়ে গিয়েছে, সারছে না—সেক্ষেত্রে ডাঁটা ও পাতা একসঙ্গে রস ক'রে, ছেঁকে, সমপরিমাণ জল মিশিয়ে, একটু গরম ক'রে, ২ চা-চামচ নিয়ে সকালের দিকে একবার খেতে হবে। তবে প্রয়োজনবোধে দু'বারও খাওয়া যায়। আর ওই রসে জল না মিশিয়ে ব্যাধিতস্থানে একবার লাগাতে হবে, আধঘণ্টা বাদে ওটা ধুয়ে ফেলতে হবে, এইরকম ২-৩ দিন লাগালে উপকার পাওয়া যাবে।

৩। **অরুচিতে—** চিচিঙ্গে সিদ্ধ ক'রে, অল্প লবণ মিশিয়ে ও মরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে খেতে হয়। এটাতে অরুচি সেরে যায়।

৪। **অগ্নিমান্দ্যে—** চিচিঙ্গে ফলের রসকে একটু গরম ক'রে, তা থেকে এক-দেড় চা-চামচ নিয়ে তার সঙ্গে একটু চিনি মিশিয়ে সকালের দিকে একবার ক'রে খেতে হবে। দরকার হ'লে বৈকালের দিকেও একবার খাওয়া যায়।

৫। **ক্রিমিতে—** চিচিঙ্গার বীজ চূর্ণ ৫০০ মিলিগ্রাম প্রত্যহ সকালে একবার ক'রে খেতে হবে। তবে পাকা ফলের বীজ হওয়া চাই।

৬। **অতিসার রোগে—** চিচিঙ্গা মূলের রস ১ চা-চামচ, তার সঙ্গে ২ চা-চামচ জল মিশিয়ে অল্প গরম ক'রে, ছেঁকে প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে হবে। এর দ্বারা অতিসার রোগের নিরাময় হবে।

সবশেষে জানাই যে—নিবন্ধোক্ত ভেষজটির নাম লিঙ্গপটোলম, চিচিঙ্গে, হোঁপা প্রভৃতি। এসব কিন্তু বৈদিকদের নাম নয়, প্রাক্-আর্যদের নাম। উড়ে এসে জুড়ে ব'সে আসল বাসিন্দাদের কোণঠাসা ক'রেছে যেমন আর্যরা। পরবর্তীকালে ভালো ভালো উপচার বা দ্রব্যগুলিকে সমাজে কুলীন ক'রে নিলেন পুরোহিততন্ত্রের ধারক যাঁরা, এই যেমন—তুলসী, চন্দন, বিল্বপত্র এই ধরনের; কিন্তু লিঙ্গপটোলকে দেবতার ভোগে লাগানো হ'লো না, এর কারণটা নিশ্চয় কোথাও আছে, তবে এককালের মাননীয়, পরবর্তীকালের মান্য এবং বৈদ্যক সম্প্রদায় পুরোহিততন্ত্রের যে মানহীন ক্রীড়নক হ'য়ে প'ড়ে ছিলেন সেইটাই কি কারণ? তাই তখনকার বৈদ্যকপ্রতিভা স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো। তাঁদেরই উত্তরসূরী তো আমরা? তাই কোন শুভ অনুষ্ঠানের জন্য কোনকিছু লেখার প্রয়োজন হ'লে প্রারম্ভিক শব্দ "সিদ্ধি" লিখি। শুধু লিখি না, দশ পয়সার কিনে আনি। সুতরাং আমাদের এ দশা হবে না তো হ'বে কাদের?

CHEMICAL COMPOSITION

Trichosanthes anguina

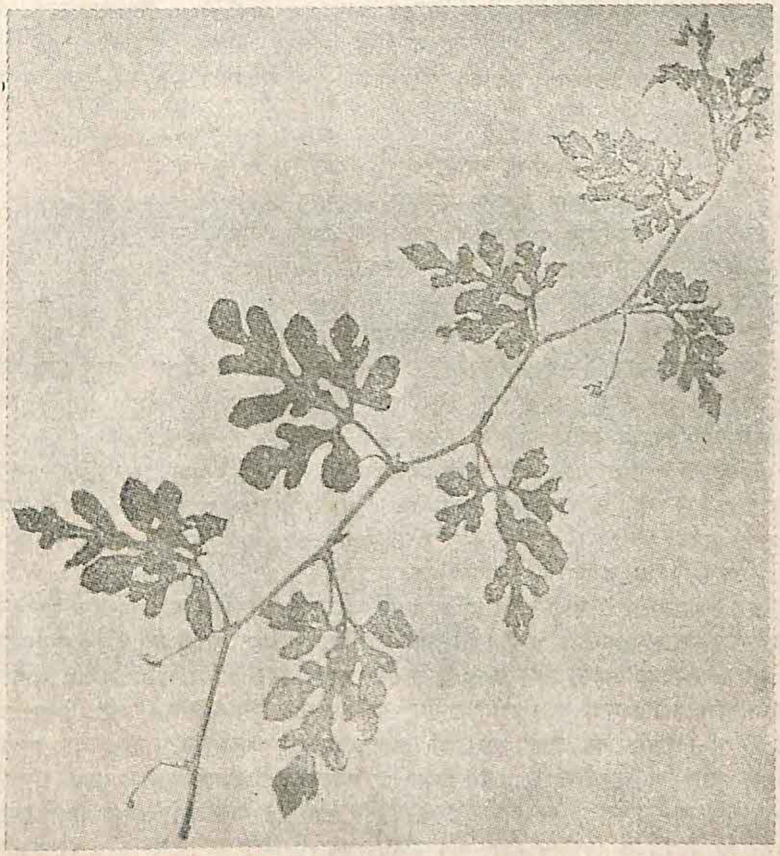
1. The analysis of fruits (per 100 g of edible matter): — (a) Moisture 94.6%, (b) Protein 0.5%, (c) Fat 0.3, (d) Fibre 0.8 (e) other carbohydrates 3.3, (f) Mineral matter 0.5 [Calcium, Iron, Sodium, Potassium, Copper], (f) Oxalic acid 34.0 (g) Phosphorus 20.0, (h) Chlorine 0.3. 2. Vitamins : — Thiamine 0.04, (b) Riboflavin 0.06, (c) Nicotinic acid 0.3. 3. Carotene (96 ug). 4. Free amino acids. 5. Glucose and Fructose. 6. Enzymes (a) Elaterase, (b) Esterase. 7. Chondrillasterol. 8. Fatty acids, (a) Trichosanic acid 40.2%, (b) Linoleic acid 15.4%, (c) Oleic acid 26.0%, (d) Palmitic acid 2.8%, (e) Stearic acid 9.5%.

কালিঙ্গ [তরমুজ]

কালিঙ্গ লিখতে ব'সে একটা আজগুবি চিন্তা মাথায় ঢুকে গেল।

আচ্ছা! বৈদিকযুগে তো দেবদেবী ছিল না, তাই ব'লে কি তাঁরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন? তাই বা বলি কি ক'রে? কারণ তাঁরা সূর্য, অগ্নি, বায়ু, জল, বৃক্ষ এ'দের তো পুজো ক'রতেন—তাহ'লে আদিবাসিরা যে সাপ, ময়ূর প্রভৃতির পুজো ক'রতো তাদের সঙ্গে তফাৎ কি? আর ক'রতোই বা কেন? আজও তো করে। তাহ'লে মূলতঃ যে তাঁরা বস্তুবাদের উপাসক, এটা তো অস্বীকার করা যায় না, তবে তাঁরা পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের উপাসক না হ'লেও সৃষ্টিতত্ত্বের মূল উৎসের রূপকে শ্রদ্ধা ক'রতেন এবং তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতাও জানাতেন। যখন থেকে এই পৃথিবীর সমাজ-জীবন গ'ড়ে উঠতে সুরু ক'রেছে, তখন থেকেই দ্রব্যের নামকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হ'য়েছে, সেটা গড়ে ওঠে আঞ্চলিক ভিত্তিতে, তাই উপাস্য দেবতার নামও পৃথক; সমাজজীবনে প্রয়োজনীয় অভিন্ন সব দ্রব্যেরই নাম পৃথক পৃথক হ'য়ে গিয়েছে, সেই বিপাকে প'ড়ে ভৈষজ্যগুলিরও নাম পৃথক হ'য়েছে, তবে এই নামকরণের পদ্ধতিটা সেই বৈদিকযুগ থেকেই প্রচলিত, যত দিন গিয়েছে ততই তার নামের বহর বেড়ে গিয়েছে; বিভিন্ন প্রান্তের মনীষীগণ তার দেহতত্ত্ব, গুণপনা, তার উপযোগিতার সমীক্ষা ক'রে তার এক-একটি নাম রেখে গিয়েছেন। আজ আমি যে দ্রব্যটির অবতারণা ক'রছি সেটির আদি নাম কালিঙ্গ; তারপর তার রূপের বিচার ক'রে তার কয়েকটি কাব্যিক নাম দেওয়া হ'য়েছে, যেমন চিত্রফল, চিত্রবল্লী ফল, বৃন্তফল, সবই কিন্তু এর রূপবাচক নাম। এই ফল সিন্ধুদেশের লোকের কাছে কিরবুট্ নামে পরিচিত। সেই সিন্ধুদেশের সিংহগুপ্তের পুত্র বৈদ্যশিরোমণি বাগ্ভট (পঞ্চম/ষষ্ঠ শতাব্দী) তাঁর লেখা প্রসিদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থ "বাগ্ভট" সেই গ্রন্থের মধ্যে 'চির্ভিট' নামের উল্লেখ, এই গ্রন্থের সূত্রস্থানের ষষ্ঠ

অধ্যায়ের ৮০ শ্লোকে বলা হ'য়েছে—"এর্বারু চির্ভটম্" অর্থাৎ এর্বারু এবং চিরভিট্ কিন্তু এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৫ পৃষ্ঠায় এর্বারু মানে যে "কাঁকুড়" বলা হ'য়েছে তাকে বৈদিক সূক্তি ও কাব্যের দ্বারা এবং লোকায়তিক ভাষার দ্বারাও প্রমাণিত করা হ'য়েছে; তাহ'লে ওই ফলটির নাম তো কিরবুট্ বা চিরভট নয়। তাহ'লে চির্ভট মানে কি?



তারপর দেখা যাচ্ছে—ঐ বাগ্ভটের এক প্রখ্যাত টীকাকার অরুণ দত্ত এই চিরভটের ব্যাখ্যায় অনেকটা সুবিধে ক'রে দিয়েছেন, অরুণ দত্ত ব'লেছেন—

> চরক মতানুসারিণস্তু এবং আচক্ষতে তুম্বং রুক্ষতরং কালিঙ্গৈ-র্বারু চির্ভটম্/কালিঙ্গং পৃথক্, ক্বচিৎ কর্চরং এর্বারুঃ কর্কটিকা চির্ভটং ডংগরং মালবেষু প্রসিদ্ধং, জালন্ধরাদিষু চ।

অর্থাৎ যাঁরা চরক মতানুসারী তাঁরা বলেন, অলাবু রুক্ষ আর কালিঙ্গ ও চির্ভট এগুলি পৃথক। তবে কালিঙ্গকে কোথাও কর্চরও বলে আর এর্বারু তো কর্কটিকাই

অর্থাৎ কাঁকুড়। কিন্তু চির্ভট? এটা মালবের প্রসিদ্ধ ফল আর জালন্ধরে (সিন্ধুদেশ) তো বটেই।

এখন দেখা যাচ্ছে যে, জালন্ধরে বা সিন্ধুদেশে (বাগ্‌ভটের জন্মভূমিতে) যার নাম কিরবুট সেইটাই চির্ভট, কিন্তু কালিঙ্গ নামটি যে ফলের, সেটি পৃথক। পরবর্তীকালে এদুটি পৃথক, এটা ধারণা হওয়াতে পাশ্চাত্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা এর একটি নাম বললেন Musk Melon এবং আর একটির নাম দিলেন Water Melon—এইটাই কালিঙ্গ। অতএব কালিঙ্গ ও চির্ভটের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব থাকলেও এক নয়। ভৈষজ্যগ্রন্থের মধ্যে চরক সংহিতাতেই প্রথম এই দুটি নামের দুটি ফলেরই উল্লেখ দেখা যায়, এই দুটি আহার্যও বটে এবং ভেষজও। চরকের সূত্রস্থানের ২৭ অধ্যায়ের ৮৩/৮৪ শ্লোকে বলা হ'য়েছে—

ত্রপুষৈর্বারুকং স্বাদু গুরু বিষ্টম্ভি শীতলম্।
মুখপ্রিয়ঞ্চ রুক্ষঞ্চ মূত্রলং ত্রপুষংত্বতি।
এর্বারুকংঞ্চ সম্পক্কং দাহতৃষ্ণা ক্লমার্ত্তিনুৎ।
কালিঙ্গং চির্ভিটংচৈব তদ্বর্চো ভেদহিতেতু তে॥

অর্থাৎ ত্রপুষ (শসা) ও এর্বারুক (কাঁকুড়) এ দুটি ফল স্বাদু, তবে গুরুপাক, এবং পেটে বায়ু করে, কিন্তু শীতবীর্য, আর এ দুটি ফল মুখপ্রিয় কিন্তু রুক্ষ, তবে শসা (ত্রপুষ) ফলটি মূত্রকরও বটে। তাছাড়া যেটি এর্বারুক বা কাঁকুড় সেটি পাকলে ওর আময়িক প্রয়োগ করা হয় দাহ, তৃষ্ণা এবং ক্লান্তি দূর করতে।

এর পরই বলা হ'য়েছে, ওই দুটি ফলের মত আর দুটি ফল, সেদুটিও পাকলেই ব্যবহার করতে হয়, তবে যাদের ভেদ অর্থাৎ দাস্ত হ'চ্ছে, তার সঙ্গে দাহও আছে, সেক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রদ। ওসময় ব্যবহার ক'রলে ভেদ, দাহ, তৃষ্ণা, ক্লান্তি সবই দূর হবে। একটির নাম কালিঙ্গ, একটির নাম চির্ভিট।

তবে এখানে একটা কথা ব'লে রাখি, এখন মানুষের অগ্নিবল যে অবস্থায় পেঁ'চেছে, সেটা বিচার ক'রে, এখনকার প্রাচীন বৈদ্যগণ এটা দিতে সাহস করেন না, যদিও কালিঙ্গের রস ২।৪ চা-চামচ একটু জল মিশিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু পাকা চির্ভিট অর্থাৎ কাঁকুড় পেকে গেলে যেটার নাম বলা হয় "ফুটি", সেটা দেওয়া উচিতই নয়; তবে গ্রন্থপ্রণেতা যেটা নিয়ে লিখেছিলেন সেটা মনে হয় পশ্চিমাঞ্চলের "খরমুজই" হবে। এ সম্পর্কে ১৫দশ শতাব্দীর রাজনিঘণ্টু এবং প্রায় ঐ শতাব্দীরই কৈয়দেব নিঘণ্টুর উক্তিতেও পাওয়া যায় না—কালিঙ্গ এবং চির্ভিট এ দুটির প্রচলিত নাম কি? অথচ উভয় গ্রন্থেই কলিঙ্গ ও চির্‌ভিট এবং তাদের পর্যায়বাচী শব্দের উল্লেখ। তারপর ১৬ শতাব্দীর ভাবপ্রকাশ, এ গ্রন্থে এসে সব এলোমেলো হ'য়ে গেল। এই গ্রন্থটির মধ্যে "আম্রাদি ফলবর্গের" ৪১।৪২ এবং ৪৩ শ্লোকমালায় এসে দেখ্‌ছি ভাবপ্রকাশকার চরকের কলিঙ্গকে কালিঙ্গ ব'লেছেন, তবে রস-গুণ-বীর্য হিসেবে কালিঙ্গ, কলিঙ্গ দুই-ই এক। চির্ভিটকে ব'লেছেন ওটা গোরক্ষ কর্কটি, আর ত্রপুষকে কণ্টকীফল বলা হ'য়েছে; অবশ্য এ কথাটা সার্থক নয় এটা বলা যায় না, কারণ শসার গায়ে তো ছোট ছোট দানার মত কাঁটা হয় কিন্তু কণ্টকীফল ব'লতে রূঢ় অর্থে কাঁঠালকেই উপযুক্ত বলা যায়। অবশেষে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের নিঘণ্টু রত্নাকর ও শালিগ্রাম নিঘণ্টুর পাদটীকাকারগণ ব'লেছেন—

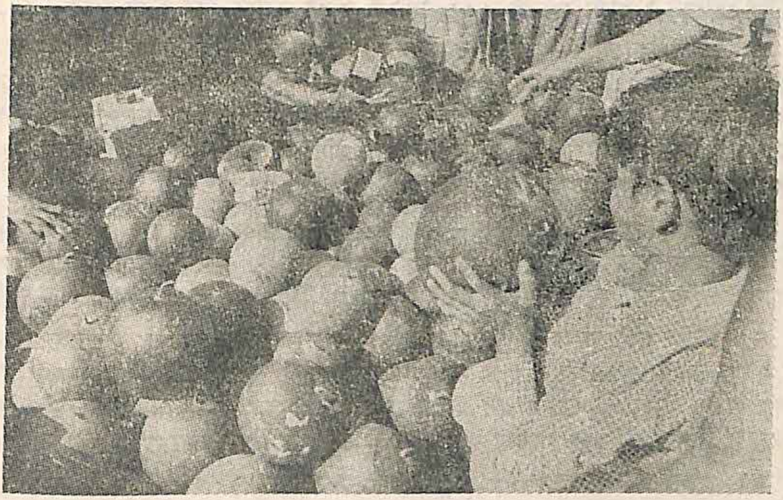
কালিঙ্গং তরমুজং চির্ভিটম্ খর্বুজং

নিঃসন্দেহ হবারই কথা, কারণ ১৪।১৫দশ শতাব্দীর পরই ফারসীভাষা তরবুজ এবং খরবুজ এদেশে এ নাম ব্যাপক প্রচলিত হ'য়েছে।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— ফলের রস মধুর, শীতগুণসম্পন্ন, শক্তিদায়ক, মেদোকারক, কামোদ্দীপক, পিত্ত বৃদ্ধিকারক ও গুরুপাক।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ—আয়ুর্বেদমতে পাতা তিক্তরস ও রক্তবর্ধক। কাঁচা ফল পাণ্ডুরোগে হিতকর। পাকা অবস্থায় এর রস স্বাদু, কফ-বাত প্রশমক, শ্লেষ্মানিঃসারক, মূত্রকারক, ক্ষুধাবর্ধক, তৃষ্ণানিবারক ও রক্তের পক্ষে হিতকর। কেউ কেউ তরমুজের রস টাইফয়েড্ রোগেও প্রয়োগের উপদেশ দিয়ে থাকেন। এভিন্ন পূর্বে এটা কোন কোন প্রদেশে বিরেচনার্থ, শোথরোগে ও কোষ্ঠপরিষ্কারক হিসেবেও ব্যবহৃত হ'তো।



বীজ বলকারক, মেদোজনক, কামোদ্দীপক ও মূত্রকারক। এই বীজের তেল বাদাম-তেলের পরিবর্তে ভোজ্য তেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ইউনানী চিকিৎসকেরা উক্ত বীজ মস্তিষ্কের হিতার্থে ব্যবহার করে থাকেন।

পরিচিতি

ভূমি প্রসারিণী লতা, শীতের শেষে ক্ষেতে বীজ বসানো হয়, বসন্তে এর বৃদ্ধি, লতাগুলি আকর্ষ ও শিরাযুক্ত। বেলেমাটিতে এই গাছের বাড় বৃদ্ধি এবং ফলও ভাল হয়, সেইজন্যই সাধারণতঃ নদীর চরে এর চাষ বেশী হয়, গ্রীষ্মে গাঢ় সবুজ অথবা পীতাভ সবুজ বর্ণের ফল হয়। অপক্কাবস্থায় ভিতরে সাদা, পাকলে লাল হয়। বীজের রং কালো অথবা লাল্চে, আকারে চেপ্টা।

বর্তমানে এই বাংলার ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে বহু পরিমাণে এর চাষ হচ্ছে। পূর্বে ফরাক্কাবাদ ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকেই বৃহৎ আকারের তরমুজ কলকাতায় আসতো।

বর্তমানে নিকটবর্তী এলাকায় চাষ হওয়াতে সেইগুলি খুব কম আসে। তাছাড়া উত্তর-ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলেও এর চাষ হয়।

এর সংস্কৃত নাম কালিন্দ, বাংলা নাম তরমুজ। হিন্দী নাম সমঙ্কা, ও গুজরাটে কারিঙ্গা নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Citrullus vulgaris Schrad. ও ফ্যামিলি Cucurbitaceae.

ব্যবহার্য অংশ— ফল ও বীজ।

লোকায়তিক যোগ

প্রথমেই ব'লে রাখি, এটি রসবহ স্রোতেই কাজ করে।

১। **ক্লান্তি দূরীকরণে—** শ্রমজনিত ক্লান্তি যতই আসুক তরমুজের শাঁস চটকে সেইটাই ছেঁকে ঐ রসটা খেলেই ৫।৬ মিনিট পরেই ক্লান্তি দূর হ'য়ে যাবে।

২। **অপুষ্টির দোষে—** কাঁচা তরমুজের শাঁস কুচিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে, তারপর তাকে গুঁড়ো ক'রে নিয়ে রেখে প্রত্যহ ১ কাপ গরম দুধে দু-এক চা-চামচ গুঁড়ো মিশিয়ে সকালে অথবা বৈকালে খেলে ১০/১৫ দিনের মধ্যেই দেহপুষ্টির বিকাশ হবে। তবে অন্য কোন শারীর ক্রিয়ার বিপর্যয় যদি অপুষ্টির কারণ হয়, তবে সেটার চিকিৎসা পূর্বেই ক'রতে হবে।

৩। **হৃদ্‌রোগজনিত পিপাসায়—** এক্ষেত্রে পাকা তরমুজের রস আধ কাপ বা এক কাপ নিয়ে তার সঙ্গে ২/৩ টিপ জীরের গুঁড়ো ও একটু চিনি মিশিয়ে খেলে পিপাসাটাও ক'মবে, হৃদরোগেরও উপশম হবে।

৪। **টায়ফায়েড্ জ্বরে—** শরীর যখন আন্‌চান্ ক'রছে, মাথা লোটাচ্ছে, প্রস্রাব কম হ'চ্ছে অথচ পেটটা নরম হ'য়ে মাঝে মাঝে পাতলা দাস্ত হ'চ্ছে, এই অবস্থা হ'লে আধপাকা বা কাঁচা তরমুজের রস ২ চা-চামচ ক'রে বারে বারে (অন্ততঃ ৩/৪ বার) খাওয়ালে সুন্দর উপকার পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, জ্বরের বেগও ক'মে যাবে।

৫। **প্রস্রাবের স্বল্পতায়—** খোসা ছাড়ানো তরমুজের বীজ বেটে ঠাণ্ডা জলে গুলে একটু চিনি মিশিয়ে সরবত ক'রে খেতে হবে (খোসা ছাড়ানো বীজ অন্ততঃ ৫-৬ গ্রাম হওয়া চাই); সরবত ক'রে অন্ততঃ ২ কাপ হওয়া চাই। এটা খেলে কিছুক্ষণ বাদে প্রস্রাবে আর জ্বালা থাকবে না, এমনকি প্রস্রাবের কৃচ্ছ্রতার জন্য শোথ হ'লেও এই যোগটিতে খুবই উপকার হবে।

৬। **সন্তর্পণে—** এই পরিভাষাটিও আয়ুর্বেদিক। যাঁরা উপবাস, অনিদ্রায়, অপুষ্টি-কর আহারে বৃক্কের (কিড্‌নী) শুষ্কতায় কষ্ট পাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ্রতাও আসছে, তাঁরা প্রত্যহ ১ গ্লাস তরমুজের রস খেয়ে দেখতে পারেন। কাঁচা ও পাকা তরমুজে গুণের পার্থক্য একেবারে যে নেই তা নয়, তবে সেটা গৌণ। সম্ভব হ'লে ওর সঙ্গে একটু কাঁচা দুধ মিশিয়ে খাওয়া ভাল।

৭। **বৃষ্যের প্রয়োজনে—** বৃষ্য শব্দটি আয়ুর্বেদের নিজস্ব পরিভাষা। জীবনের অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় শুক্রের বৃদ্ধি এবং শুক্রের স্রুতির, তবে একসঙ্গে দুটি কাজ করার দক্ষতা তো সব ভেষজের থাকে না, কিন্তু তরমুজের বীজের সে শক্তি আছে। খোসা ছাড়ানো তরমুজের বীজ অন্ততঃ ৫ গ্রাম নিতে হবে, তাকে জ'লে বেটে দুধসহ (১ কাপ) খেতে হবে, এর দ্বারা অসুবিধেটার সম্মুখীন হ'তে হবে না।

নিবন্ধের শেষে জানাই—ভাষাকে সমৃদ্ধ ক'রতে গেলে সব দেশের ভাষাকেই আত্মসাৎ ক'রতে হয় জানি, কিন্তু আত্মসাৎ ক'রতে ক'রতে খিচুড়ি এখন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেল, সে যে কালিন্দ ছিল সেটা তো আর আমাদের জানাই নেই, এখন তার ফার্সী ভাষা নাম "তরমুজ" ব'লেই আমাদের কাছে পরিচিত। আমরা আত্মভোলা হ'য়ে ওমর খৈয়মের ভজনা বহুদিন থেকেই ক'রছি; এই তো কিছুদিন আগে আমাদের গলার উত্তরীয় ছাড়িয়ে পাঞ্জাবী পরিয়েছে আরব দেশের লোকেরা। তাহ'লে আর ভাষায় দোষ কি? কেন? এখনও আমরা প্যাণ্ট প'রে শ্লোগান দিচ্ছি—"ইংরাজী হটাও"। খুড়ো ঠিকই ব'লতো, "মাথা নেই—মাথা ব্যথা"।

CHEMICAL COMPOSITION

Citrullus vulgaris Sehrad

Analysis of fruit:— Moisture 95.7%; protein .1%; fat .2%; mineral matter .2%; carbohydrates 3.8%; carotene (traces); pectine (rich); amino acid γ-amino β- (pyrazolyi-N)-propionic acid. Analysis of seed:— moisture 7·1%; protein 34·3%; fat 44%; carbohydrate 4·8%; ash 2·7%; fibre 6·7%; nitrogenous matter (glutelin 9·4%; peptones 1·1%); oils 20-40% (myristic ·2%; palmitic 7·6%; stearic 0·1%; oleic 35·5% and linoleic 48·7%); enzyme and an amino acid. Analysis of seed cake:— moisture 8.6-10·1%; protein 28-59%; fat 7%; carbohydrate 8-14%; fibre 12-39%; ash 4-5%. Juice contains:—Citrulline 0·17%; Pro-vitamin-A (trace) and vitamin-C (trace).

কুকুন্দর [কুকুরশোঁকা]

এক-একটা ভেষজের নাম অনেক উপাখ্যান ও উপমার প্রতীক হয়, উপরিউক্ত ভেষজটিও তার মধ্যে একটি।

কৈশোরে আমার গাঁয়ের জীবনে দেখেছি, খুড়ো এই বনমূলোর গাছ হাতে ক'রে হনহন ক'রে যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করাতে খুড়ো বললে যে, জানিস, ওদের বাড়ীর ঘেঁটুর পেচ্ছাবটা (প্রস্রাব) আটকে গেছে, তাই দেখছি এটা শুঁকালে পেচ্ছাব হয় কিনা।

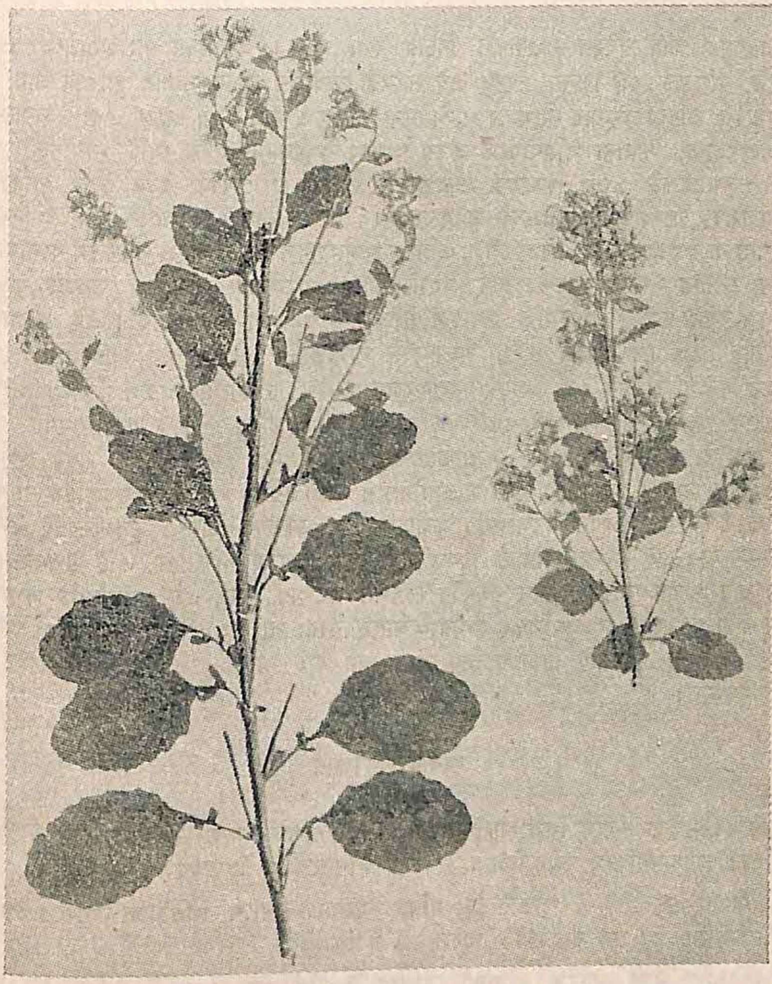
খুড়োর গবেষণায়—কুকুর যখন ঐ গাছ শুঁকলেই পেচ্ছাব করে, তখন ওতো ক'রতে পারে! কেন—আমার শ্যামা ঠান্‌দি তো ব'লতো, কুকুরের গায়ে পা দিতে নেই, ওর পূর্বপুরুষরা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে স্বর্গে গিয়েছিলো। তারপর আরও উপমা আছে—"কুকুর কুণ্ডলী" এবং তা নিয়ে একটা রসালো কবিতাও আছে। বিশেষতঃ শীতেই কুকুর এই কুণ্ডলীটা পাকায়, তাই বৈষ্ণব মহলের একটি চুট্‌কী শুনুন—কোন গোঁসাই-গুরু শীতের রাতে শিষ্যবাড়িতে এসে প্রথমটা খুব বাহাদুরী দেখিয়ে গা খোলা হ'য়ে টান্ টান্ হ'য়ে ঢেঁকির মত শুয়ে প'ড়লেন, তারপর যত রাত্রি বাড়ে, ততই তাঁর অবস্থার হাল বদলায়—সেই চুট্‌কীটা হ'লো—

প্রথম প্রহরে প্রভু "ঢেঁকি অবতার"
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু "ধনুকে টঙ্কার"
তৃতীয় প্রহরে প্রভু "কুকুর কুণ্ডলী"
চতুর্থ প্রহরে প্রভু "বেনের পুঁটুলী"।

এইবার লেখাপড়ায় উঁচু মহলের চুট্‌কী শুনুন—"কুক্কুরো লেঢ়ি জিহ্বায়" অর্থাৎ একগলা জলে কুকুর ডুবে থাকলেও সে তার নিজের স্বভাবেই চেটে চেটে জল খায়।

তারপর গাঁয়ের পণ্ডিতের উপমা, "মূর্খের গোঁ ফেরানো, আর কুকুরের ল্যাজে (লেজে) ঘি-মাখন মাখিয়ে টেনে সোজা করার চেষ্টা, এ দুই-ই সমান।" তাই সংস্কৃতে বলা হয়— "বক্রতাং নোজহাতি"।

এইবার মহাভারতের কালে আসুন, সেখানে দেখবেন—"অশুচিঃ কুক্কুরৈর্দৃষ্টা", অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য অন্য কোন প্রাণী দেখলে অত দূষিত হয় না, কুকুরের দৃষ্টি প'ড়লে যতটা হয়।



এই কুকুরের দৃষ্টিতেই তো মহাভারতের অত বড় যজ্ঞকাহিনীর সূত্রপাত।

এমনি কতই না উপমা দেওয়া হ'য়েছে এই কুকুরকে নিয়ে—যেমন "কুকুরে ঘুম", কুকুরে কান, কুকুরে মাছি, "মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল", কুকুরে আলু, কুকুর ছড়া দাঁত, "কুক্করীর যৌবন"—এত উপমা এই কুকুরকে সামনে রেখে। এখনও বৈদিকের ঝাঁপি খুলিনি, সে আর এক পর্ব।

যাক্, আলোচ্য ভেষজের নামকরণ নিয়েও একটু বিতণ্ডা আছে। পণ্ডিত বুলেটিনে বেরুলো যে, "কুক্কুরাঘ্রেয়ঃ" এর নাম। সেই কুক্কুরাঘ্রেয়ই পরবর্তী স্তরে হ'য়েছে, "কুকুরশোঁকা"; ব্যাকারণের পণ্ডিতরা বলেন, এই ভেষজটির পাতার গন্ধটা যেন কুকুরের গায়ের গন্ধ, আবার কেউ (কেহ) ব্যাখ্যা ক'রেছেন, কুকুর এর গন্ধ শুঁকে নিজের শরীর সুস্থ আছে কিনা সেটা বিচার করে।

বৈদ্যকের নথি

এইবার আয়ুর্বেদের মতবাদটা বিচার করা যাক্। আমাদের সংহিতাগ্রন্থ চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট এই তিনটি গ্রন্থে এই নামের ভেষজের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, তবে হিন্দি ভাষায় কুকুন্দর নামে যে গুল্মটিকে পরিচিত করা হ'য়ে থাকে, এবং মহারাষ্ট্রের প্রচলিত ভাষায় সামান্য পরিবর্তিত হ'য়ে অর্থাৎ কুকুরোন্দা হ'য়ে যেটি পরিচিত, সেই বনজ গুল্মটিকেই ১৬শ শতকের ভাবপ্রকাশ (ভাবমিশ্র প্রণীত—ইনি উত্তর প্রদেশের মথুরাবাসী) গ্রন্থে এটি সন্নিবেশিত হ'য়েছে। অনুবাদকগণ ব'লেছেন, এই কুকুন্দরই কুকশিমা বা কুকুরশোঁকা। এ তো গেল, এদিকে শব্দরত্নাবলীতে কুলাহল নামে যে বনৌষধির উল্লেখ, সেটির সম্বন্ধে "শব্দস্তোম্ মহানিধি"কার ব'লেছেন, কুলাহল ভেষজই কুকুরশোঁকা। কুলং ভূমিং আহলাতি কুলাহল ইতি কুকশিমা বা কুকুরশোঁকা। এই কুলাহল শব্দটির উল্লেখ দেখা যায় ৫/৬ শতাব্দীর বাগ্ভটে। এই গ্রন্থের সূত্রস্থানের ১৫ অধ্যায়ে সুরসাদিগণের ৩১ শ্লোকে কুলাহলের উল্লেখ। টীকাকার অরুণ দত্ত কুলাহলকে ব'লেছেন "ভূকদম্ব" (Sphaeranthus indicus) অথচ এই সুরসাদিগণের প্রায় ভেষজের তালিকাটি বহুপূর্বে সুশ্রুতগ্রন্থের সূত্রস্থানের ৩৮ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে উল্লেখিত হ'য়েছে। সেখানেও ওটি সুরসাদিগণে উক্ত। কিন্তু কুলাহল ভেষজটির ব্যাখ্যায় সুশ্রুত টীকাকার ডল্বন ব'লেছেন "কুলাহল" মুণ্ডিতিকা (এটিও ভূকদম্বেরই একটি পর্যায় নাম)। এই কুকুন্দর নামটি কিন্তু সুশ্রুতের শারীর পরিচয়ের, এটি উপমাবোধক নাম। এর পত্রের আকৃতি যেন রমণীর গোপন অঙ্গের ন্যায়, এই নামশব্দটি সম্পর্কে টীকা করা হ'য়েছে, কুং=কুৎসিতং কুন্দরং=আবর্ত্তাকারং স্ত্রীণাং এব কামিনা। কথা আরও আছে, তাহ'লেও জানাই প্রদেশেভেদে তার নাম যাই থাক্, গুণ তো একই—সেইটাই জানা দরকার।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— ইহা স্বাদে তিক্ত, ক্রিমিনাশক ও জ্বরনাশক। মূল উষ্ণ, ঝাঁঝালো ও তিক্তরসান্বিত, বেদনানাশক, রক্তদুষ্টিতে ও শ্বাসজনিতরোগে হিতকর ও মূত্রকারক।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— পাতার রস মরিচ সহযোগে রক্তার্শে খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়, তাছাড়া এর রস রক্তরোধক হিসেবেও কাজ করে।

মরিচসহ মূল সেবনে 'কলেরা' রোগের নিবৃত্তি হয়ে থাকে।

পরিচিতি

ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। ১½—২ ফুট উঁচু হতে দেখা যায়, কাণ্ড রোমশ। এটি সরল, তবে পাতা ও কাণ্ডের সংযোগস্থল থেকে ছোট ছোট শাখাও বের হয়। পাতা

ডিম্বাকার কিন্তু বোঁটার দিকটা ক্রমশঃ সরু, কিনারা ঢেউ খেলানো, সূক্ষ্ম রোমশ, মনে হয় যেন পশম দিয়ে তৈরী, কিন্তু এতে একটা গন্ধ আছে এবং সেটি কুকুরের খুব প্রিয়, তাই এই গাছ শুঁকলেই মূত্রত্যাগ করে, এইজন্যই এর প্রচলিত নাম "কুকুরশোঁকা"। গুচ্ছবন্ধ ফুল হয়, ভেতরটা একটু হলদে, পরে সেটা বীজকোষে পরিণত হয়, এই বীজগুলি দেখতে অনেকটা সোমরাজী (Centratherum anthelminticum.) বীজের মত, এবং এর ছোট পুচ্ছ হয়, যার জন্য সে প্যারাস্যুটের মত উড়ে যেতে পারে, এইভাবেই সে তার বংশবিস্তার করে।

এই গণের প্রায় ৬০টি প্রজাতি সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় বর্তমান। এটি বন্যগুল্ম, তবে বিশেষভাবে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও সিঙ্গাপুরে দেখতে পাওয়া যায়। এর সংস্কৃত নাম কুকুন্দর, বাংলায় প্রচলিত নাম কুকুরশোঁকা, বনমূলো ও হিন্দীতে কুকুরোয়ান্দা নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Blumea lacera Dc. ও ফ্যামিলি Compositae.

ব্যবহার্য অংশ— সমগ্র গাছ।

লোকায়তিক যোগ

প্রথমেই ব'লে রাখি, এই কুকুশিমার রস রসবহ স্রোতেই দ্রুত কাজ করে।

তবে আর একটা কথাও জানিয়ে রাখি, সব থেকে অসুবিধে কি জানেন—কোন্ প্রজাতির কুক্‌শিমার গাছটা ব্যবহার করা উচিত সেটাকে চিনে নেওয়া, কারণ পাশ্চাত্ত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে এই ধরনের ১৮ প্রকার গাছ দেখা যায়, সেটার পার্থক্য জনসাধারণের বিচার ক'রে নেওয়া একরকম অসম্ভবই বলা যেতে পারে। তবে গাঁয়ের লোকের ধারণা, যে গাছটাকে শুঁকে কুকুরে প্রস্রাব ক'রে সেইটাই কুকুরশোঁকা বা কুকশিমার গাছ; কথাটা কিন্তু ঠিকই।

১। **পুরাতন পেটের দোষ, কিম্বা পুরাতন আমাশায়—** এর বিশেষ লক্ষণ হ'লো, মলের সঙ্গে আম সর্বদা প'ড়বে না, আবার পেটের দোষও তেমন বোঝা যায় না, কিন্তু তাঁদের উপসর্গ হয়, ভোরের দিকে মুখটা শুকিয়ে যায়, আর একটু ক'রে জল খেতে হয়, এটা কিন্তু পিপাসার জন্য তাঁরা জল খান না, মুখটা শুকিয়ে যাচ্ছে, তাই এক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে তাঁর রসবহস্রোত বিকারগ্রস্ত হ'য়েছে এবং শোষণ আসছে। এক্ষত্রে কুকশিমার শিকড় ৪-৫ গ্রাম (কাঁচা) (শুষ্ক হ'লে ৩ গ্রামের) একটা টুক্‌রো নিয়ে মুখে রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে একটু চিবিয়ে ওই রসটা গ্রহণ ক'রতে হবে। এর দ্বারা মুখের শোষণটা ক'মে যাবে। তাছাড়া ওই রসটা পেটে গেলে পুরনো আমাশা ও পেটের দোষটা কেটে যাবে।

২। **অজীর্ণ দোষে—** এই অজীর্ণ রোগটা প্রকৃতপক্ষে কোন মৌল রোগ নয়, বায়ু, পিত্ত এবং কফের এক একটিকে প্রধান ক'রে অগ্নিমান্দ্য হ'লে তবে এই রোগটি উৎপন্ন হয়। এই রোগটি ঠিক যেন গঙ্গাসাগরের মত। কোথাকার কোন্ নদীর জল যে এতে মিশেছে তার ঠিক নেই, অর্থাৎ এই রোগটি পিত্তজন্য অগ্নিমান্দ্য হ'লেও হবে, কফজন্য অগ্নিমান্দ্য হ'লেও হবে। তাছাড়া বায়ুর জন্য অগ্নিমান্দ্য হলেও হবে। আবার ঋতুবিকারের কারণে যে অগ্নিমান্দ্য দেখা দেয় সেটা থেকেও অজীর্ণ রোগ এসে যায়। তাই ব'লছি, এ যেন সাগরসঙ্গম। এটা তো গেল একটা দিক, এর আর একটা দিকও আছে—যেমন অনিয়মিত আহার চ'লছে, শরীরের অপুষ্টি আছে, তার উপর অত্যধিক পরিশ্রম ক'রতে হ'চ্ছে, এ অবস্থাটা চ'লতে থাকলে অজীর্ণ যে আসবে না এটা ভাবা

উচিত নয়—আসবেই। অনেকে এ সময় ওই কষ্টটা লাঘব করার জন্য, একটা পান মুখে রেখে কষ্টটা লাঘব ক'রতে সচেষ্ট হয়ে থাকেন। উদ্দেশ্য এর দ্বারা পেটে একটু লালা যাবে তো, তার দ্বারা ক্লান্তিটা একটু দূর হবে। এক্ষেত্রে এইটাই ধরে নিতে হবে যে, এর রসবহ স্রোত আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। এমনি ক্ষেত্র উপস্থিত হ'লে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত; এটা অবশ্য সাধারণতঃ পড়ন্তি বয়সেই হয়।

আর একটা কথা জানিয়ে রাখি— এই জাতীয় অজীর্ণদোষ পেটে পুষে রাখলে এ'রা প্রায়ই রক্তপিত্ত রোগে আক্রান্ত হ'য়ে প'ড়ে থাকেন। এর পূর্বরূপ হবে, গলায় আঙ্গুল দিয়ে গলাটা পরিষ্কারের চেষ্টা, জিভটা যাতে পরিষ্কার থাকে তার জন্য তৎপর হওয়া। এইসব লক্ষণ দেখা দিলে, মূলসমেত কুক্‌শিমার গাছকে থেঁতো ক'রে রস নিংড়ে, তাকে গরম ক'রে তা থেকে এক চা-চামচ রস সকালের দিকে একবার এবং বৈকালের দিকে একবার খেতে হবে, তবে একটু দুধ মিশিয়ে খাওয়াই ব্যবস্থা। প্রথমে একবার ক'রে খাওয়াই ভাল। আর একটা কথা জানা দরকার যে, কোন সময় গরম অবস্থায় কোন জিনিসই খাওয়া সমীচীন নয়। পান খাওয়ার অভ্যাস থাকলে সেটা ত্যাগ করাই উচিত, তবে যদি রক্তপিত্ত দেখা দেয় তাহ'লে বন্ধ ক'রতে হবে, নইলে নয়।

৩। **চোখে ঠাণ্ডা লাগায়—** যাঁদের চোখে ঠাণ্ডা লেগে চোখ কর্‌কর্‌ ও টন্‌টন্‌ ক'রে লাল হয়, ফুলে যায়—এক্ষেত্রে ওই কুক্‌শিমা গাছের হলদে ফুল অল্প গরম জলে ধুয়ে নিয়ে, সেটা হাতে র'গড়ে তা থেকে এক ফোঁটা রস চোখে দিতে হবে। আর ওই গাছ সমূল মিহি ক'রে বেটে তা থেকে নিংড়ে রস নিয়ে সেই রস চোখের চারিপাশে লাগালে চোখের লাল হওয়াটা কেটে যাবে।

৪। **শোথে—** পা ঝুলিয়ে রাখলে অনেকের পা ফুলে যায়, তখন বুঝতে হবে যে রক্তবহ স্রোতগুলির তাপ ক'মে যাচ্ছে, যার জন্য রসবহ স্রোতের তাপটা মন্দীভূত হওয়াতে রসটাকে দ্রুত সঞ্চারিত ক'রতে পারছে না; তাই পা দুটো ফুলে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে কুক্‌শিমার শিকড় বেটে, একটু গরম ক'রে পা দুটিতে প্রলেপ দিলে ওই ফুলোটা আর হবে না।

৫। **চুলকানিতে—** এ রোগে যাঁরা আক্রান্ত হ'য়েছেন তাঁরা ধ'রে নিতে পারেন যে, তাঁদের রক্তদুষ্টি আসছে, কারণ এটা এক ধরনের চর্মরোগ। এক্ষেত্রে কুক্‌শিমার সমগ্র গাছটিকে মিহি ক'রে বেটে সেটাকে গায়ে মাখতে হবে। ঘণ্টাখানেক বাদে সেটা ধুয়ে ফেলতে পারেন। এইরকম ৪-৫ দিন গায়ে মাখলে ওটা সেরে যাবে।

নিবন্ধের শেষে আগড় টানতে গিয়ে কুকুন্দর বা কুকুরশোঁকার নামের তাৎপর্যটা মনে এসে গেল। এককালে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত চোগাচাপকান্‌ পরা বৈজ্ঞানিকগণ একে তার নামের মহিমার মর্যাদা দিয়েই চ'লছিলেন, কিন্তু আজ দেখছি তাকেই তুলে নিয়ে বিচার ক'রে দেখছেন যে—এটার আর্‌গট্‌ প্রপার্টি আছে। এখন আজ না হয় কাল সে জাতে উঠবে কিন্তু যাঁরা এর ধারক-বাহক তাঁরা একে আর কাজে লাগাতে পারবেন না—তখন ভেষজ নিয়ামকের সম্মতি চাই, তাই খুড়ো ব'লতো—"যার ধন তার ধন না, নেপোয় মারে দই"।

CHEMICAL COMPOSITION

Blumea lacera

The herb gives 0·085% of essential oil containing Blumea camphor-

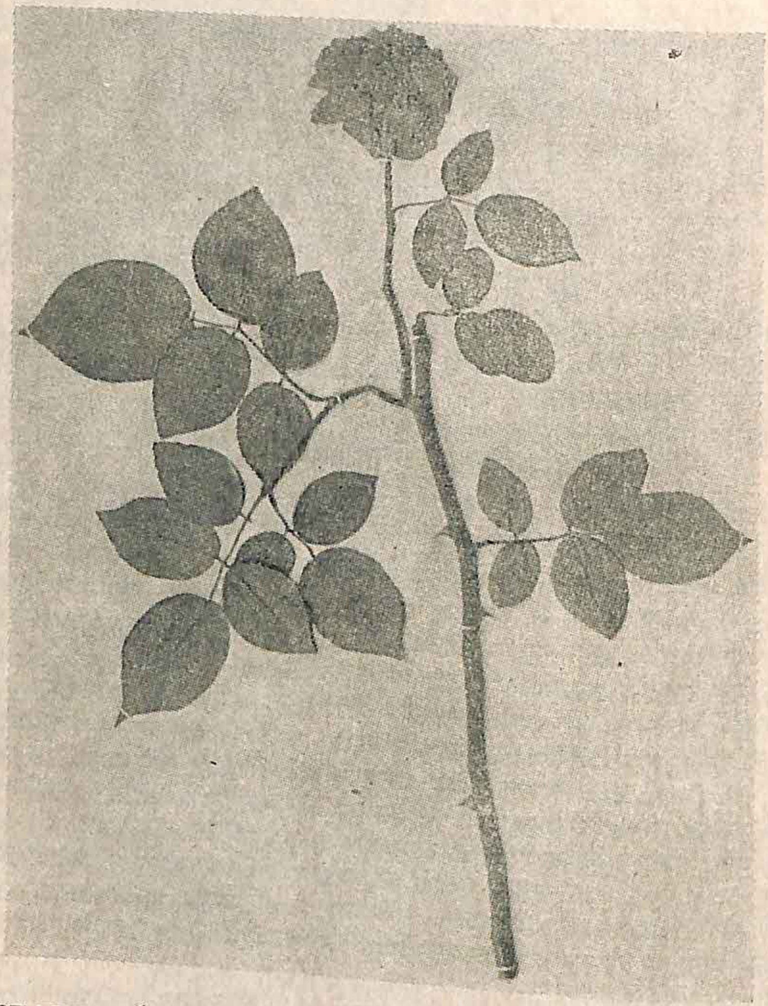
শতপত্রী [গোলাপ]

এটা তো ঠিক যে, চল্‌তি ভাষারও যেমন কোন জাত নেই তেমনি নামেরও। কেন সেটা ব'লছি—এই দেখুন না, আমাদের কাছে "গোলাপ" মরুদেশে "গুলাব"। আমরা বলি এটা ভারতের ফুল নয়, বহিরাগত, তাই পুরোহিত ব্রাহ্মণরা এ ফুল ঠাকুরের পায়ে অর্ঘ দিতে নিষেধ করেন, কিন্তু বংশপরিচয় নিলেই দেখা যাবে, ওমা, এ তো আমাদেরই দেশের। এই যেমন জয়পুরের কালীবাড়ির পুরোহিত বংশ—ধামার মত পাগড়ী, আর পায়ে টিকিওয়ালা নক্‌শাই নাগরা জুতো, রাজপুতের মত চেহারা—দেখে কে ব'লবে ৫।৬ পুরুষ আগে এঁরাই এই ভাটপাড়ারই বৈদিক বামুন। সেই রকমই আমাদের এই গোলাপ। এর হাঁড়ির খবর নিতে নিতে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে, এটা হ'লো বুনো শতপত্রী, যার অপভ্রংশ নাম "শেউতি"; আবার তারই রাশ (রাশি) নাম সুমন। এটা পার্বত্য হ'লেও মরু অঞ্চলে বেশী হ'তো, তাই ওসব অঞ্চলে বেশী পরিচিত ছিল, শুধু তাই কেন, মাটি, আবহাওয়া, জলের গুণে তার গন্ধ হয় মনোরম, দেখতেও হয় বড়, এবং রঙের জৌলুস ফেরে, তাই বুনো গোলাপ আর শেউতী থাকে না।

এই ধরনের আরও একটু পুরনো গল্প করি, আমাদের পঞ্চসতীর মধ্যে দৌপদীর বাপের বাড়ির দেশের রাজধানীর নাম ছিল "কাম্পিল্ল নগর", সেই কাম্পিল্লনগরটি এখনকার উত্তর পাঞ্চাল, আবার কেকয়ীর বাপের বাড়ি ছিল এখনকার মুলতানে, তখনকার দিনে তার নাম ছিল "কেকয় দেশ", আবার পরবর্তীকালে সেই শিশুপালের চেদী-রাজ্যটা, এখন সেটা জব্বলপুরের আশপাশ। এককালের প্রসিদ্ধ দেশ "অবন্তী"-র এখনকার নাম মালব। এই-ই তো কালের বিবর্তন।

মহাভারতের কালে

মহাভারতের বনপর্বের ৩৮ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে শতপত্রী ব'লে যে একটি ফ্বলের নাম পাওয়া যায় সেই শতপত্রীই ভাষার আবর্তনে বিবর্তনে হ'য়েছে "শেউতি"। তবে হ্যাঁ, এটাও ঠিক যে, শতপত্র নামটি পদ্মফ্বলেরও আছে, কিন্তু শতপত্র নামটির পর্যায়-বাচী শব্দগ্বলির মধ্যে কোথাও সুমনঃ শব্দ নেই। আয়ুর্বেদের নিঘণ্টুগ্রন্থের যেখানে



শতপত্র ফ্বলের পর্যায়ে সুমনঃ থাকে, সেখানে তার পর্যায়বাচী নাম কমল, পদ্ম, অরবিন্দ নাম নেই। আবার এদিকে শতপত্র নাম ময়ূরেরও আছে, তাছাড়া সারস পাখীরও, তাই ব'লে কি শতপত্র ব'ললে সারসকে ভাবা যায়?

তা যাক্, আমার বক্তব্য হ'লো শতপত্রই গোলাপ। আসলে ওটা ফার্সী ভাষা, নাম "গ্বলাও"। মহাভারতের যেখানে এই নামের উল্লেখ দেখা যায় নল-দময়ন্তীকে উপলক্ষ্য

ক'রে, সেখানকার উপাখ্যানাংশ হ'লো নল দময়ন্তীকে বনের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছেন, তখনই তাঁর বিলাপে এই নামের উল্লেখ। সেখানে বলা হ'য়েছে—

"ইমামসিত কেশান্তাং শতপত্রী নিভাননাম্"

অর্থাৎ সেই ঘন কালো চুলের মাথা আর ফোটা শতপত্রীর মত মুখ। এখানে মুখের তুলনা গোলাপেই মানায়। পদ্মের পাপ্‌ড়ির শোভা তো চোখে।

এরপর সুমন নামের খোঁজ পাওয়া যায় মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৯৮ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোক থেকে। ওখানের বক্তব্য, ভীষ্ম তখন মৃত্যুশয্যায়, শ্রীকৃষ্ণ সহ উপস্থিত হ'য়েছেন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি। অতবড় প্রবীণ ব্যক্তির কাছে তাঁর অতীত জীবনের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বহু তথ্য আহরণ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। একের পর এক প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রেছেন যুধিষ্ঠির, আর ভীষ্মও সেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন নানান ইতিহাসের মাধ্যমে, আর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন ক'রেছেন গৃহস্থের প্রতিদিনের কর্তব্য কি আর করণীয়ই বা কি কি। ভীষ্ম প্রায় সবই ব'লতে ব'লতে উপদেশ দিচ্ছেন। প্রসঙ্গত যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ! এই যে নানান উপহার দিয়ে দেব-আরাধনা, সেইসব উপহারের মধ্যে দেবতাদের উপহারে সর্বাধিক প্রিয় কি?

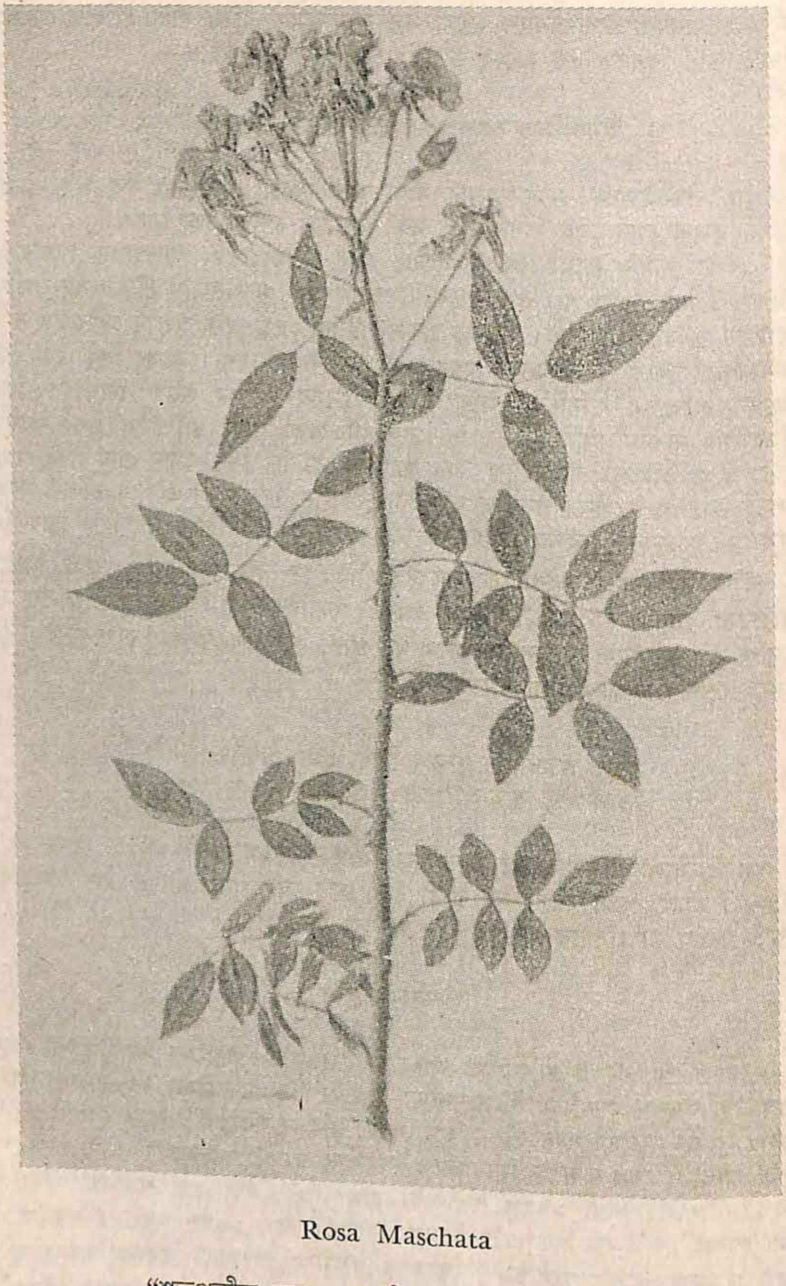
ভীষ্ম বললেন— দ্যাখো, দেবতাদের প্রীতি হয় অমৃত লাভে। সেই অমৃতের বহুপ্রকার ভেদ। তবে মর্ত্যলোকের অমৃত সর্বাধিক সুগন্ধি কুসুম; আবার সেই সুগন্ধি কুসুমের মধ্যে যে কুসুমের গন্ধে মন প্রসন্ন করে এবং অপূর্ব রূপ ফোটায়, সেই সুমনই শ্রেষ্ঠ। সেইটাই বলা হ'য়েছে—

মনো হ্লাদয়তে যস্মাৎ শ্রিয়ং চাপি দধাতি চ।
তস্মাৎ তু সুমনঃ প্রোক্তঃ নরৈঃ সুকৃত কর্মভিঃ॥

অর্থাৎ সুগন্ধি কুসুম অনেক আছে কিন্তু শুভকর্মশালী ব্যক্তিই সংগ্রহ করেন "সুমন"। তারই দ্বারা তাঁদের মন প্রসন্ন হয়। আর সেই প্রসন্ন মন হওয়ায় দেবতাবৃন্দ সুকৃত সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সর্বপ্রকার শুভ ফল দান করেন।

বৈদ্যকের নথি

মহাভারতের এই উক্তি থেকেই আমরা ধারণা করি, কুসুমের মধ্যে সুমন নামের কুসুমটিই সম্ভবত আমাদের চলিত ভাষায়—গোলাপ। কারণ প্রসন্ন রূপ, প্রসন্ন গন্ধের ফুলের সংখ্যা অনেক, যেমন চাঁপা, পদ্ম, যুঁই, মল্লিকা সকলেই, তবুও উৎকৃষ্ট জাতির একটি গোলাপ যেন সবারই শিরোভাগে অবস্থান করে। ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের নিঘণ্টুগ্রন্থগুলির মধ্যে ১৫দশ শতাব্দীর রাজনিঘণ্টু এবং ১৬ শতকের ভাবপ্রকাশ উভয় গ্রন্থেই দেখা যায় শতপত্রীর ভৈষজ্য বিবরণ। তবে ১৫দশ শতকের রাজনিঘণ্টু-কারই সুমনার উল্লেখ করেছেন। তারপর বর্তমান ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে ঐ গোলাপটির নাম যে বাংলায় কবিবৃন্দ শেউতি ব'লেছেন সে ভাষা তো আজও হিন্দীতে শেউতি গোলাপ, কর্ণাটে সেং বতিঙ্গে, গুজরাটে শেবতী অথবা কাঁটা শেউতি। সেই-জন্যই বলছিলাম, অনেক নাম হারিয়ে গিয়েছে তবে বস্তুটি হারায়নি। রাজনিঘণ্টুকার এই শেউতি বা গোলাপের সম্বন্ধে ব'লেছেন—



Rosa Maschata

"শতপত্রীতু সুমনা সুশীতা শিববল্লভা
সৌম্যগন্ধা শতদলা সুবৃত্ত শতপত্রিকা।
সুবৃত্তাহি হিমা তিক্তা কষায়া কুষ্ঠনাশনী।
মুখস্ফোট হরা রুচ্যা সুরভিঃ পিত্তদাহনুৎ॥"

এই গোলাপটির ভৈষজ্য শক্তিটিকে বৈদ্যবৃন্দ রসে, বীর্যে এবং বিপাকের ক্ষেত্রে যেভাবে ব্যবহার ক'রে আসছেন, সেটি খুবই সিদ্ধ ফলপ্রদ ব'লেই আজও সমভাবেই প্রচলিত। অর্থাৎ এটি রসগত স্বভাবে তিক্ত, বীর্যগত স্বভাবে শীতবীর্য আর বিপাকগত ক্ষেত্রে কষায়। আমরা রসগত প্রাধান্যমূলক দ্রব্যকে আহার্য করি, আর বীর্যগত প্রাধান্য থাকলে তাকে ভেষজরূপে ব্যবহার করি। যেখানে বীর্যপ্রাধান্য অর্থাৎ ভৈষজ্যগুণসম্পন্ন সেখানেও আমরা প্রয়োগ করি। (বর্তমানে আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও তাই করেন) একে একটু সহজ করে ব'লতে গেলে, যখন স্থানিক প্রয়োগ (Local application) তখন সে রসগত ক্ষেত্রের প্রয়োগ, আর যখন সর্বদেহ বা জেনারেল্ তখন বীর্যগত আর যখন স্পেসিফিক্ তখন বিপাক বা বিশিষ্ট শক্তি আছে জেনেই তা করি।

এই গোলাপটির ব্যবহার্য অংশ তার ফুলটিই। বাহ্য বা স্থানিক প্রয়োগে ওটি তার অব্যক্ত তিক্তরসের ক্রিয়া প্রকাশ করে। আর রসায়ন জন্য যখন প্রয়োগ করা হয় তখন সে কাজ করে তার বীর্যগত শক্তিতে এবং বিপাকে যেহেতু কষায় রস সেই হেতু বায়ুই তার মৌলগঠনে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, তখন এটি কফনিঃসারণের সহায়ক হয়, যেহেতু কষায় রস বায়ু ও পার্থিব শক্তির দ্বারা উদ্ভূত। অপরপক্ষে পিত্তেরও শমন হয় অর্থাৎ পিত্তকে স্বাভাবিক করে।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— রসে তিক্ত, ধারক, বলকারক, হৃদ্‌যন্ত্রের হিতকর, মৃদুবিরেচক, পিত্ত-প্রশমক ও মেদোজনক।

ঔষধার্থ প্রয়োগ— ফুল মাথার যন্ত্রণায়, চক্ষুরোগে ও অতিরিক্ত ঘর্ম নিঃসরণে হিতকর।

কচি মুকুল ধারক ঔষধ হিসেবে ও শিরঃপীড়ায় বহুল ব্যবহৃত হয়। অনেকের মতে এটা দেহের অতিরিক্ত সন্তাপ দূরীকরণে সহায়ক।

পরিচিতি

ঘন কাঁটাবিশিষ্ট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। পাতা দেখতে অনেকটা গোলাকার ও কিনারা করাতের মত খাঁজ কাটা। কচি কাণ্ডের অগ্রভাগে ঘন পাপড়ি বিশিষ্ট ফুল হয়, কোন কোন প্রদেশে জলবায়ু এবং মাটির গুণে ফুলের, গন্ধের ও আকারের তারতম্য ঘটে। বিভিন্ন রঙের গোলাপ হয়। ফল অনেকটা টোপা কুলের মত, তবে আর একটি কথা বলে রাখি, এর বীজেও গাছ হয়, তা কদাচিৎ কিন্তু কলমেই গাছ হয় এবং তাতেই ফুল হ'য়ে থাকে।

এই গণের (Genus) প্রায় ৩০টি প্রজাতি বর্তমান। এদের মধ্যে ৯টি প্রজাতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিহার, উত্তর প্রদেশ, অমৃতসর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে চাষ হয়ে থাকে। নিঘণ্টুকারদের মতে এর নাম শতপত্রী, বাংলায় প্রচলিত নাম গোলাপ ও হিন্দী এবং ইউনানীদের কাছে গুলাব্ নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল্ নাম Rosa damascena Mill. ও ফ্যামিলি Rosaceae.

ব্যবহার্য অংশ— ফুল।

লোকায়তিক যোগ

ঔষধার্থে ব্যবহার হয় ফুল। এটি প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ স্রোতে।

১। **অরুচি রোগে—** অরুচি কথাটি যেমন পরিচিত, রোগটাও তেমনি অনুভূতির। রোগটি যদি দেহে হয়, তবে সে রোগ মনে এবং হৃদয়েও হয়, যার ফলে হৃদ্‌রোগের সৃষ্টি হ'তে পারে। এই জন্যই অরুচি দেখা দিলেই ভিতরে ভিতরে একটি সূক্ষ্ম রোগেরও সৃষ্টি করে, সেটা হ'লো, মাঝে মাঝে গলার স্বরটা একটু চেপে যায়, এটা সর্বদা থাকে না। অতএব অরুচিকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। এক্ষেত্রে কাঁচা গোলাপ ফুল ৫—১০ গ্রাম জলে বেটে অল্প চিনি বা ২ চা-চামচ মধু মিশিয়ে এক গ্লাস সরবত করে প্রত্যহ একবার ক'রে খেতে হবে। এর দ্বারা ওই অসুবিধেটা চ'লে যাবে অর্থাৎ অরুচিটার উপশম হবে, অবশ্য কয়েকদিন খেতে হবে।

২। **পিত্ত বমনে—** জ্বরে, রৌদ্র লাগায়, অজীর্ণ হ'লে প্রায়ই বমি হয়। সঙ্গে গায়ে হাতে জ্বালাও থাকে, এই সময় গোলাপ কুঁড়ি (আধ ফোটা) বেটে সরবত ক'রে খেলে এটা ক'মে যাবে। ফুলের কুঁড়ি ৫।৭ গ্রাম হ'লেও চ'লবে।

৩। **কুষ্ঠের প্রথমাবস্থায়—** এর সাধারণ লক্ষণগুলি এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বলা হ'য়েছে; এইসব লক্ষণ দেখা দিলে গোলাপফুল ৭।৮ গ্রাম বেটে সরবত ক'রে সকালে একবার ও বৈকালের দিকেও একবার খেতে হবে। এইভাবে ১০।১৫ দিন খাওয়ার পর থেকে ঐ কুষ্ঠের প্রথমাবস্থার উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে চ'লে যাবে। এটা বেশ কিছুদিন খেলে আর অন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হবে না; যদি একটু বেশী হয়, তাহ'লে গোলাপ ফুল বেটে ওইসব জায়গায় লাগাতে হবে। কিছুদিন লাগালে ক্ষতগুলি শুকিয়ে যাবে।

৪। **বাতরক্তে—** এই রোগের উপসর্গগুলি কুষ্ঠের প্রথমাবস্থার লক্ষণের মত। এক্ষেত্রে গোলাপ ফুল বাটার সরবত কাজ করে।

৫। **অপুষ্টিতে—** তা শিশু, বৃদ্ধ, যুবক যে বয়সেরই হোক্ না কেন, গোলাপ পাপড়ির হালুয়া খেলে শরীর পুষ্ট হবে। মাত্রা ৫ গ্রামের মত ২ বার—এটা পূর্ণ মাত্রা। বয়সানুপাতে মাত্রা হিসেব ক'রে দিতে হবে; তবে একটা কথা ব'লে রাখি—একটু-আধটু বেশী খেলেও ক্ষতি হয় না।

হালুয়া প্রস্তুত বিধিটা এখানে ব'লে রাখি—এই হালুয়ার ইউনানি নাম "গুল্‌কন্দ্‌", হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে এই নামেই পরিচিত। কাঁচা গোলাপ পাপড়ি যত পরিমাণ (ওজনে) ততটা চিনি মিশিয়ে চটকাতে হবে, বেশ খানিকটা সময় চটকাবার পর রৌদ্রে দিতে হবে। সন্ধ্যার দিকে তাকে ভাল ক'রে ঢেকে রাখতে হবে, তার পরের দিন পুনরায় চ'টকে তাকে আবার রৌদ্রে দিতে হবে। এইভাবে তাকে ৭।৮ দিন শুকিয়ে নিলে "গুল্‌কন্দ্‌" তৈরী হয়। এটা গাজীপুর অঞ্চল থেকেই আমদানি হয়।

নিবন্ধ শেষ হ'লো— সমাপ্তি ঘোষণা ক'রবার পূর্বে মহাভারতের বিদুরনীতির একটা কথা মনে পড়ে গেল, সেখানে বলা আছে—

ষড়িমে ষট্‌সু জীবন্তি সপ্তমো নোপলভ্যতে।
চৌরাঃ প্রমত্তে জীবন্তি ব্যাধিতেষু চিকিৎসকাঃ।
প্রমদা কামুকেষ্বর্থা যজমানেষু যাজকাঃ।
রাজা বিবদমানেষু নিত্যং মূর্খেষু পণ্ডিতাঃ॥

অর্থাৎ এ সংসারে ছ'জন (৬ ধরনের লোক) দিব্যি বেঁচে থাকে— (১) যে দেশের লোক যত মাতাল হবে, চোরেরা তত ফুর্তিতে বেঁচে থাকবে। (২) রোগ যত বাড়বে, চিকিৎসকদের তত দীর্ঘ সুস্থজীবন লাভ হবে। (৩) ব্যভিচার যত বাড়বে, মেয়েদের

বাড়-বাড়ন্ত তত হবে। (৪) বুঝুক না বুঝুক পুজো-পার্বনের অনুষ্ঠান যত বাড়বে, পুরোহিত তত খুশীতে থাকবে। (৫) দেশে মত-বিরোধ যত হবে, রাজার রাজত্ব তত কায়েম হবে। (৬) দেশে নিরক্ষর যত বেশী থাকবে, পণ্ডিতদের দাপট তত বাড়বে।

সপ্তম নাই, কিন্তু বর্তমানে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকের ভূমিকা যেন শ্রাদ্ধবাড়ির তষ্টিদার ব্রাহ্মণের মত। বৃষকাষ্ঠ জড়িয়ে ব'সে থাকা, আর ঘণ্টা বাজানো এবং মৃতের স্বর্গলাভের জিগির দেওয়ার মত আয়ুর্বেদের গুণগাণ করা।

CHEMICAL COMPOSITION

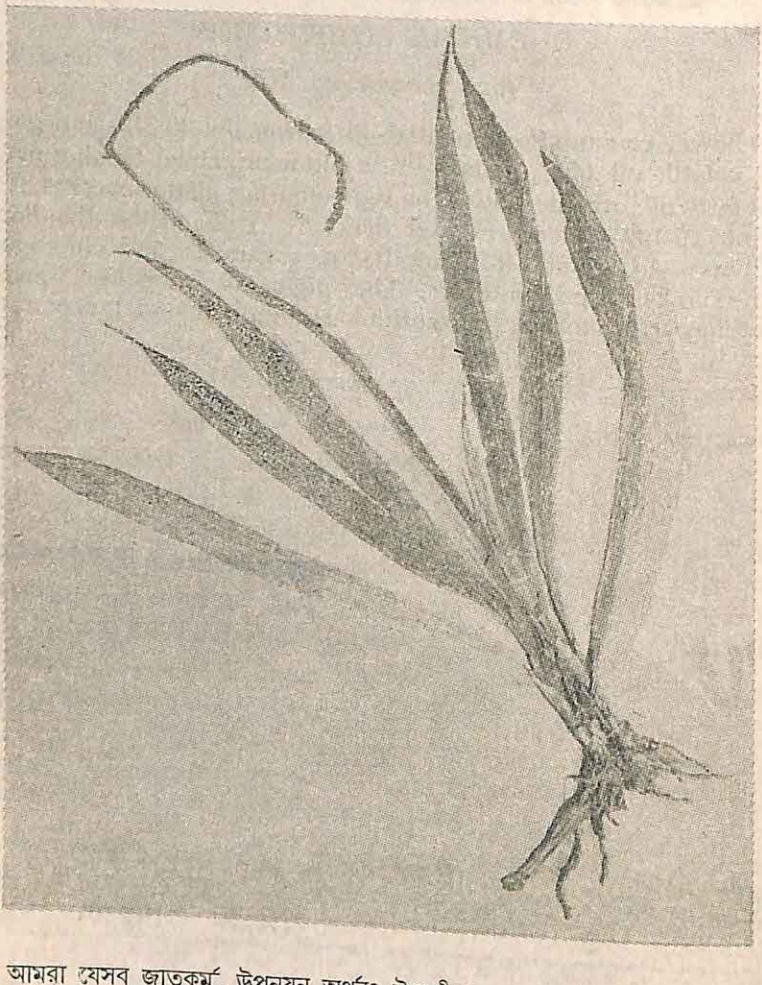
Rosa damascena Mill

The flower contains:— Essential oil (citronellol 45·51%; and geraniol); volatile oil .05%; ketone 1%; a bitter principle; tanning matter 23%; fatty oil; organic acids. The red colouring matter consists of:— Cyanin (9-10%); quercitrin and dyestuff. Pollen from the flower contains:— Carotene 0·76 mg/100 g; sugars 1% and chlorogenic acid (1·5%). Hips contains:—The pigments lycopene. α-and β-carotenes; rubixanthin; zeaxanthin; xanthophyll and taraxanthin.

মূর্ব্বা

“মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং”—অর্থাৎ অপ্রিয় হ'লে সত্য কথাও ব'লতে নেই—এই নীতি অনুসরণ ক'রতে ক'রতে আমাদের ভাষায় অথবা সংস্কারে কিংবা সমাজজীবনে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ব'সে আছি। তবুও আজ আমার ভূমিকা কিন্তু “কালাপাহাড়ী”।

সত্য কথা ব'লতে কি—ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র অনেক সংস্কারই গ্রহণ ক'রেছে জৈন বৌদ্ধদের কাছ থেকে। ধরুন, এই যে আমরা অন্নপ্রাশন এবং উপবীত ধারণে এবং মৃত্যু-কালে অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করার আগে মাথা মুড়িয়ে ফেলি, তা তো জৈন বৌদ্ধদের আচরণ থেকেই নেওয়া, তারপর পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরাত্রিক (আরতি) করা, সেও তো ওঁদের পঞ্চগ্রাস, পঞ্চতত্ত্ব, আত্মশুদ্ধির ভাবনা এমনি কতকিছুই তো ওঁদের কাছ থেকে আনা।



আর আমরা যেসব জাতকর্ম, উপনয়ন অর্থাৎ উপবীত ধারণ, মেখলায় সূত্রবন্ধন প্রভৃতি সংস্কার বিধান করি, এগুলো কিন্তু বৈদিক গৃহ্যসূত্র থেকে নেওয়া সংস্কার।

পরবর্তীস্তরে মনুসংহিতার বিধিবিধান হ'লো—

বৈদিকৈঃ কর্মভিঃ পুণ্যৈ র্নিষেকাদি র্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীর সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্যচেহ চ।

অর্থাৎ বেদপ্রোক্ত পবিত্র সংস্কারগুলি ক'রলে (চাতুবর্ণের জন্য) মানুষ ঐহিক ও

পারত্রিক শুভ লাভ করে। এ সংস্কার গ'ড়তে হবে গর্ভাধান থেকেই। এইসব সংস্কারের মধ্যেই আছে উপনয়ন, উপবীত ধারণ প্রভৃতি। এই উপবীত ধারণে কোন বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য) কি বস্তু ধারণ ক'রতে হবে তারও বিধি দেওয়া আছে; শুধু তাই নয়, মেখলাকে বেঁধে রাখার জন্য কি সূত্রের (সুতো) প্রয়োজন সেটাও বলা আছে। যেমন—ব্রাহ্মণের হবে মুঞ্জতৃণের সুতো, ক্ষত্রিয়ের হবে মূর্বার সুতো আর বৈশ্যের হবে শণের সুতো। এই মূর্বাই আমার নিবন্ধোক্ত ভেষজ। এটা কিন্তু বৈদিক অর্থাৎ বেদে এর নামোল্লেখ আছে; তাছাড়া বৈদিক সংহিতার পরবর্তীকালে এই মূর্বা ভেষজটি বহু প্রকারে অনুশীলিতও হ'য়েছে এবং তা চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতায় স্থান পেয়েছে বেশ উল্লেখযোগ্য স্থানে, এবং সেই অনুশীলনের পরে সারা ভারতেই কেবল একটি ক্ষেত্রেই নয়, বৈদ্যবৃন্দের ব্যবহৃত লোকায়তিক যোগের বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের অভিজ্ঞতায় মূর্বার কান্ড ও মূল ব্যবহার ক'রেছেন।

বেদ সমীক্ষায়

মূর্বে অপাং গম্ভন্ সীদ মা ত্বা হৃৎ শোণিতী।
অভিতাপ্সী হ্যগ্নির্বৈশ্বানর অছিন্নপত্রা অনুবীক্ষথ।

(অথর্ববেদ, বৈদ্যককল্প—৫।৫২।৭৭)

এই সূক্তটির মহীধর ভাষ্য ক'রেছেন—

মূর্বে মা নত্বং বনস্পতিঃ; অপাং গম্ভন্ জলানাং গম্ভনি গভীরে-স্থানে জাতাসি ত্বা হৃৎশোণিতী সীদ ইতি উপস্থাতারঃ আহ্বয়ন্তি, মা অভিতাপ্সি মা বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ ত্বা অভিসন্তাপ্তি। ত্বং অচ্ছিন্নপত্রা সততঃ অনুবীক্ষস্ব অনার্তা ভবসি।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তুমি মূর্বা, তুমি বনস্পতি নও, জলের কত গভীর স্থানের রস তুমি গ্রহণ করে জন্ম নাও। হৃদয় ও শোণিতেই অবস্থান কর, যারা উপস্থাতা তাঁরা এই বলেই তোমাকে আহ্বান করেন, তুমি অভিতপ্ত হও না, অগ্নিও তোমাকে অভিতপ্ত করে না, তুমি অচ্ছিন্নপত্রা হ'য়েই আর্তজনের আর্তি দূর কর।

বেদসূক্তির বক্তব্যে দেখা যায়, "তুমি হৃদয় ও শোণিতেই অবস্থান কর।"

সংহিতাকালের সমীক্ষায়

মূর্বা ভেষজটি চরক সংহিতার সূত্রস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে। মূর্বার অন্যতম দ্রব্য-শক্তিটি স্তন্য শোধনে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে, তাছাড়া চিকিৎসাস্থানের ১৫ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে অপস্মার রোগেও ব্যবহারের উপদেশ। এভিন্ন ওই স্থানের ২৩ অধ্যায়ে পিত্তজ বমনে কেবল আতপচাল ধোয়া জলের সঙ্গে মূর্বার মূল বেটে খাওয়ার উপদেশ।

সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের ৩৯ অধ্যায়েও বলা হ'য়েছে, যেকোন জ্বরে মূর্বামূলের রস খুবই উপযোগী। এইসব ক্ষেত্র ছাড়া একাদশ খৃষ্টাব্দের চক্রপাণি দত্ত প্রণীত চক্রদত্ত

নামক গ্রন্থে কফজ্বরে মূর্বামূলের রস ব্যবহার করার ব্যবস্থা দিয়েছেন। ১৫দশ শতাব্দীর রাজনিঘণ্টুকার এবং ষোড়শ শতকের ভাবপ্রকাশকার বিরেচনের ক্ষেত্রে এটিকে প্রয়োগ করেছেন; পরবর্তীকালে রাজনিঘণ্টুকারও বিরেচনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা এইটাই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এটিতে পার্থিব শক্তির গুণ বিকাশ হ'য়ে থাকে। তাছাড়া ঐ যে বেদে একটা ইঙ্গিত রয়েছে, "হৃৎ শোণিতী"— এটি যে বৈদিক রসায়নশালায় অর্থাৎ বেদের আমলের ল্যাবরেটরিতে ভালভাবেই পরীক্ষিত, তা নিঃসন্দেহ। কারণ লোকায়তিক ব্যবহারে প্রায়শঃ একে রক্তে বায়ুবিকার দেখা দিলে (হৃৎকম্পন, শরীরের উষ্ণতা, দমবন্ধ হ'য়ে যাওয়ার অবস্থা, আধুনিক ভাষায় যদি বলা যায় "বাত-পিত্ত-প্রধান ব্লাড্‌প্রেসার", হয়তো বা তাই হবে, সেই ক্ষেত্রে দেশীয় বৈদ্যগণ মূর্বামূলের ক্বাথ ব্যবহার ক'রে বিশেষ উপকার পেয়ে থাকেন।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— কফনাশক।

ঔষধার্থে প্রয়োগঃ— কাঁচ কাণ্ডের রস কফ নিঃসারক, বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে এটি উপকারী। ইহার মাংসল মূল থেকে প্রস্তুত খণ্ড জাতীয় ঔষধ চায়ের চামচের এক চামচ করে দিনে দুই বার চেটে খেলে পুরাতন ক্ষয়রোগ ও তজ্জনিত কাসের উপশম হয়।

কোন কোন প্রদেশে এর মূল ও পাতা সাপের কামড়ে প্রয়োগ হয়ে থাকে।

এভিন্ন এর পাতা থেকে একপ্রকার সুতো তৈয়ারী হয়, এটির নাম "মূর্বাসুতো"। ধনুকের গুণ (ছিলে), মাছধরার বড়শি বাঁধার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পরিচিতি

কাণ্ডবিহীন গুল্ম। পাতা লম্বায় ১—১½ ফুট ও গুচ্ছবিশিষ্ট, কিন্তু কোন কোন প্রজাতির পাতা এর থেকেও লম্বা হতে দেখা যায়। দেখতে অনেকটা ফিতার মত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ও সুচাল, উপরের দিক মসৃণ ও নীচের দিক খসখসে, এরা সংখ্যায় প্রায় ৬—৮টি। পুষ্পিত হওয়ার পূর্বে একটি দণ্ড বের হয়, তার অগ্রভাগে ফুল হয়। ফুল হরিদ্রাভ-শ্বেতবর্ণের, এরা সংখ্যায় ৪—৬টি ও একত্রে গুচ্ছবদ্ধ। ফল আকারে গোল, পাকলে আঙুরের মত রং হয়। বীজ একটি, এটি ডিম্বাকৃতি সাদা রঙের। ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই অল্পবিস্তর দেখা যায় এবং বাগানের শোভা বর্ধনের জন্য এটি লাগানো হয়। এর সংস্কৃত নাম মরুবা, বাংলা নাম মূর্বা ও হিন্দীতে মরুল নামে অভিহিত। বোটানিক্যাল নাম Sansevieria roxburghiana Schult ও ফ্যামিলি Haemodoraceae.

ব্যবহার্য অংশ—মূল।

লোকায়তিক যোগ

মূর্বা মূল কাজ করে রসবহ ও রক্তবহ স্রোতে।

১। **বিষম জ্বরে—** যাঁরা বাত-শ্লেষ্মার প্রকৃতি, তাঁদের জ্বর হওয়ার পর ভাল চিকিৎসা না হ'লে ভিতরে জ্বর থেকে যায়, শেষে অনিয়মে জ্বর আসে, মাথাটাও ধরে, কাঁধে ভার বোধ হয়, ওই সময় ১০-১৫ গ্রাম মূর্বা মূল (কাঁচা) একটু থেঁতো ক'রে

তারপর তাকে ২ কাপ জলে সিদ্ধ করার পর আন্দাজ এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ঐ ক্বাথটা সকালের দিকে অর্ধেকটা এবং বৈকালের দিকে অর্ধেকটা খেতে হবে। এইভাবে তৈরী করে ২।৩ দিন খেলে জ্বর কমে যাবে এবং ৫।৬ দিনের মধ্যে জ্বর ছেড়ে যাবে।

২। **বমনে—** পিত্তি প'ড়ে বমি হ'তে থাকলে এর কারণ থাকতে পারে ক্রোধ, উপবাস, তাপ লাগানো, শরতের রোদে ঘোরা, মাথায় রোদ, পায়ে জল বা ঠাণ্ডা লাগালে পিত্তবিকার হয়। তার জন্য উঁকি ওঠে, পরে কেবলই পিত্ত বমন হয়—ওই সময় মূর্বা মূল ১০ গ্রাম থেঁতো করে, তা থেকে রস নিংড়ে নিয়ে যে রস হলো, তার দ্বিগুণ আতপ চাল ধোয়া জল নিতে হবে, তারপর তাতে আধ চা-চামচ চিনি মিশিয়ে (চাল ধোয়া জলটা একটু বেশী ক'রে হওয়া চাই) মোট আধ কাপের মত হওয়া চাই; সেইটা আধ ঘণ্টা অন্তর দুই-তিন বারে খেতে হবে। এর দ্বারা বমিটার নিবৃত্তি হবে।

৩। **ক্ষয়জ কাসিতে—** (সে যে কোন বয়সেই হোক্) অনেক কারণেই তো শরীরের ক্ষয় হয়, তাতে রক্তের বল ক'মে যায়, ক্ষিধে মন্দা হয়, প্রস্রাবও ক'মে যায়, কফ ওঠে না। অথচ কাসি হ'তে থাকে, ওই সঙ্গে হাত-পায়ের তলায় জ্বালা হ'তে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে মূর্বা মূল (কাঁচা) ১০ গ্রাম, থেঁতো ক'রে তাকে ২ কাপ জলে ফুটিয়ে আন্দাজ এক কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, ওই ক্বাথটা সারাদিনে ৫-৬ বারে একটু একটু ক'রে খেতে হবে। এই রকম ২-৩ দিন খেলে কাসিটার উপশম হবে।

৪। **প্রমেহ রোগে—** রোগটির কথা এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে বহুবার বলা হ'য়েছে। তবুও বলি, একটু ঘোলাটে প্রস্রাব, কোঁথ দিলেই লালার মত পড়া, মেয়েদের হ'লে হড়হড়ে অবস্থা এবং যোনিস্থানে একটা সাদা পাতলা সরের মত পড়া, এ অবস্থায় মূর্বা মূল ১০ গ্রাম বেটে, তাকে নিংড়ে রস বের করে নিতে হবে এবং তার সঙ্গে আধ কাপ আন্দাজ জল ও একটু চিনি মিশিয়ে সরবতের মত খেতে হবে। ২-৩ দিনের মধ্যেই উপশম হবে। তারপর আরও কয়েকটা দিন খেতে হবে।

৫। **বুকে সর্দি ব'সে গেলে—** (এটা শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী) বুকে সর্দি ব'সে গিয়ে ঘং ঘং আওয়াজের সঙ্গে কাসি হ'তে থাকলে মূর্বা মূল ও কচিপাতা দুটোয় মিলে ৫-৬ গ্রাম নিয়ে একটু থেঁতো ক'রে সিকি কাপের মত জল দিয়ে ফুটিয়ে, ওই জলের আন্দাজ অর্ধেকটা থাকতে নামিয়ে ছেঁকে একটু একটু ক'রে কয়েকবারে খাওয়ালে দু-এক দিনের মধ্যেই শ্লেষ্মাটা তরল হ'য়ে উঠে যাবে। দাস্তটা পরিষ্কার হবে এবং কাসিটাও ক'মে যাবে।

৬। **ক্রিমিতে—** শিশুদের ছোট ক্রিমির উৎপাত কিছুতেই যাচ্ছে না—সেক্ষেত্রে এক টুকরো মূর্বা মূল আঙ্গুলের এক পাবের (পর্বের) মত আর আনারসের দুটো পাতার নিচের দিকের সাদা অংশটুকু কেটে নিয়ে একসঙ্গে থেঁতো ক'রে রস ক'রতে হবে, সেই রস ২-৪ দানা চিনি মিশিয়ে খাওয়াতে হবে; তবে আমার দেখা প্রাচীনেরা ওই রসে চিনি না দিয়ে এক চামচ চূণের জল মিশিয়ে খেতে দেওয়ার উপদেশ দিয়ে থাকেন। এই রকম এক দিন অন্তর ২-৩ দিন খাওয়ালে ক্রিমির উপদ্রব আর থাকে না।

৭। **হৃদ্‌রোগ জনিত শ্বাস কষ্টে—** যদিও এ রোগটির মূলোচ্ছেদ করা কষ্ট কিন্তু অনেক সময় হৃদরোগ ও শ্বাসকষ্ট একাকার হ'য়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্র হ'লে; মূর্বা মূল ১০-১২ গ্রাম এক কাপ জলে সিদ্ধ ক'রে আধ কাপ থাকতে নামিয়ে, ছেঁকে, সমস্ত দিনে ৩-৪ বারে ঐ জলটুকু খেতে হবে। এই রকম কয়েকদিন খেলেই ওটা প্রশমিত হবে; তবে ১০-১৫ দিন খেতে হবে।

মূর্বা নিবন্ধের শেষে এইটাই মনে প'ড়ছে—মূর্বা এককালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভেদ বৈশিষ্ট্য স্থাপন করার প্রয়োজনে কাজে লাগানো হ'তো; পরবর্তীকালে সেটা হ'য়েছিলো মৎস্য শিকারের ফাঁসের সুতো, কাল বিবর্তনে বর্তমানে সে এখন মরুবা অর্থাৎ মরুর বায়ুর সমান। আর যাঁরা তার অন্তঃশক্তিকে কাজে না লাগানোর জন্যে তাকে আঁকড়ে ধ'রেছিলেন, আজ তাঁরাও (সেই বৈদ্যকবৃন্দ) ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে মৃতপ্রায়। হ'লে কি হবে, "ম'রে যাবো তবুও মর্যাদা ছাড়বো না"—এই না আমাদের পণ? আজ নিদানের (হেতুসূত্র গ্রন্থ) সেই শ্লোকটার কথা মনে প'ড়ে—

"ক্ষীণে বলবতী নাড়ী, সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা"

অর্থাৎ ক্ষীণদেহের নাড়ী যদি বেগবতী হয়, সেটা প্রাণঘাতী হওয়ারই পূর্বলক্ষণ।

CHEMICAL COMPOSITION

Sansevieria roxburghiana Sehult.

The rhizome contains:— Sweetening substances and fibre.

অস্থিসংহার [হাড়জোড়া]

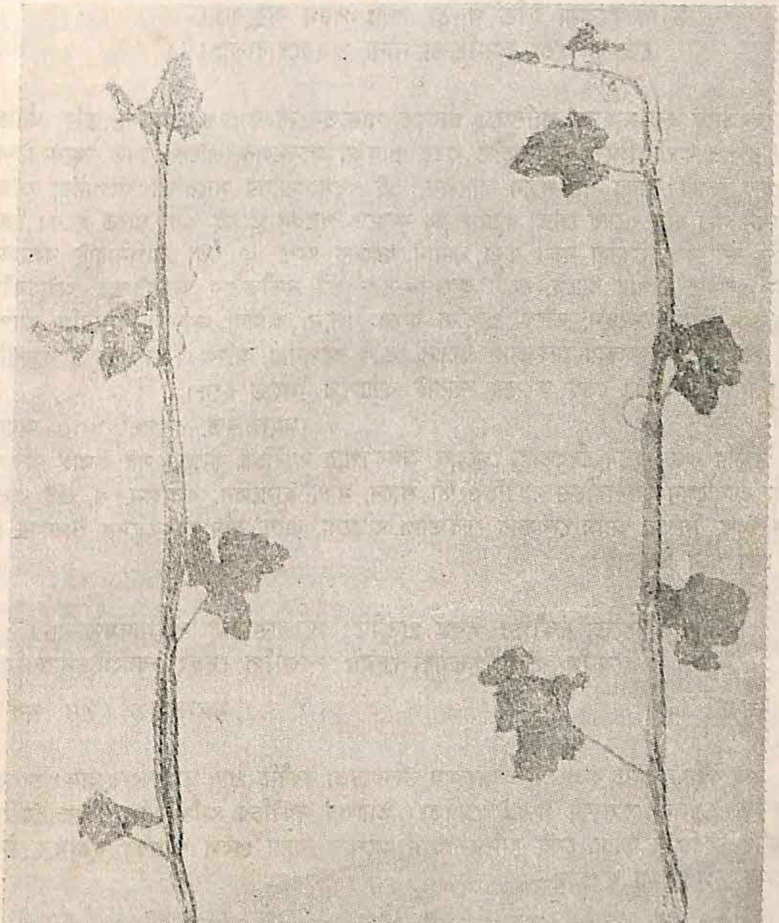
কথায় বলে—

পুরুষের রাগে ভাত হয়।
নারীর রাগে জাত যায়॥

এ কথাটা চালু, কিন্তু গজাপণ্ডিতের গবেষণা হ'লো দেবতাদের আমলে পুরুষ জাতিটা ছিল অকর্মণ্য ক্লীবের সমান, যখন কোন দৈত্য-দানবের কবলে প'ড়েছে তখনই

কৌশল ক'রে নারীকে লেলিয়ে দিয়ে তাদের ধ্বংস করিয়েছে। এই যেমন রণচণ্ডিকাকে খাড়া ক'রে দৈত্যকুলকে ধ্বংস করানো হ'লো, তারপর তার স্তব-স্তুতি করা হ'লো।

এ তো গেল একটা দিক—আবার সেই যুগেই এই পুরুষেরই মধ্যে একটি সম্প্রদায় ছিল—এ'রা কিন্তু "রেড্‌ক্রস্ সোসাইটি", তাঁদের ধর্মই হ'লো সৃষ্টির সংগঠন করা, কোনদিনই কোন ক্ষেত্রেই ধ্বংসটা তাঁরা মনেপ্রাণে চাননি বা চান না, তাঁদের বৃত্তিটাই ছিল জাগতিক মঙ্গলের প্রকৃষ্ট সরণী।



আজ এই অস্থিসংহার লিখতে ব'সে গজাপাড়িতের সেই কথাটা মনে প'ড়ে গেল। তবে এ কার্যে কোন নারীকে লেলিয়ে দেওয়া হয়নি, অন্য পন্থায় সেটা হাসিল করা হ'য়েছিলো।

এই অস্থিসংহার নাম শব্দটি কিন্তু ঋক্‌বেদের ১।১১৬।১২ সূক্তে উল্লেখ

আছে; এক প্রখ্যাত নাম-রহস্যের আখ্যান—তাকে ঘিরেই মহাভারতে, ভাগবতে আরও বিস্তৃত ক'রে আখ্যায়িত করা হ'য়েছে। আখ্যানের বিষয়বস্তু হ'লো—দধীচির অস্থি দ্বারা বৃত্রাসুরের সংহার। সেই পৌরাণিক ঘটনাটা সংক্ষেপে বলি—অথর্বা ঋষির পুত্র ছিলেন দধীচি, মায়ের নাম চিত্তি। কোন এক সময়ে দেবতাবৃন্দ বড় পীড়িত হ'তেন প্রচণ্ড শক্তিধর কয়েকজন দানবের কাছে, নাম তাদের কালকেয়—অর্থাৎ সেই দস্যুদের নাম ছিল "কালকেয়গণ"। এদের নেতার নাম বৃত্রাসুর। তাই সংস্কৃত শ্লোকে বলা হ'য়েছে—

কালকেয়া ইতি খ্যাতা গণাঃ পরম দারুণাঃ।
তে তু বৃত্রং সমাশ্রিত্য নানা প্রহরণোদ্যতাঃ।

দেবতারা এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে পারতেন না তাদের জ্বালায়, তাঁরা অতিষ্ঠ হ'য়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে স্তব-স্তুতি ক'রে প্রার্থনা জানালেন, এঁদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন, ওই কালকেয়দের সায়েস্তা আপনারা ক'রতে পারবেন না। যদি ওদের নেতা বৃত্রকে বধ ক'রতে পারেন তবেই ওরা শান্ত হবে। কিন্তু বৃত্রকে বধ করা সোজা নয়। তার নানান ধরনের অস্ত্র, এ তো আপনারাই বললেন। এখন একমাত্র উপায় আছে, সেটা হ'লো—সরস্বতী নদীতীরে অথর্বাপুত্র অটুটবীর্য-পুরুষ দধীচি রয়েছেন, তাঁকে প্রার্থনা ক'রে বলুন, আমরা জানতে পেরেছি আপনি যদি দয়া ক'রে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন, তবে আপনার অস্থি দিয়ে প্রচণ্ড বজ্রশক্তির অস্ত্র নির্মিত হবে। সেই অস্ত্রের দ্বারাই বৃত্রাসুর নিহত হবে।

(মহাভারত, বনপর্ব ১০০ অধ্যায়)

ব্রহ্মার কথা শুনে দেবতারা গেলেন অথর্বাপুত্র দধীচির কাছে। সব কথাই অকপটে তাঁরা জানালেন। উদারচিত্ত দধীচিও তা শুনে, মৃদু হাসলেন, বললেন, ও, এই কথা—বেশ বেশ, নিশ্চয় আমি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ ক'রবো, এতে যদি দেবতাদের উপকার হয়, তা তো খুব ভালোই।

ততো দধীচিঃ পরম প্রতীতঃ সুরোত্তমান্ স্বানিদমভ্যুবাচ।
করোমি যদ্বোহিতমদ্য দেবাঃ স্বঞ্চাপি দেহং স্বয়ংমুৎসৃজামি॥

মহাভারত ('বন পর্ব')

এই কথা ব'লতে ব'লতেই আনন্দময় উদারচেতা দধীচি প্রাণ ত্যাগ ক'রলেন। দেবতারা চমৎকৃত হ'লেন, মানবের মধ্যেই দেবতা। তারপর দধীচির অস্থিরাশি দিয়ে যে অস্ত্র নির্মাণ ক'রলেন তাঁরা, সেই অস্থিসংহার অস্ত্রের দ্বারা প্রবল শক্তিধর বৃত্রাসুর নিহত হ'লেন। তাই বলা হ'য়েছে—

"অস্থিসংহার বজ্রেণ বৃত্রাসুরো নিপাতিতঃ।"

দেখুন দধীচির অস্থি দিয়েই তো অস্থিসংহার অস্ত্রের আবিষ্কার হ'য়েছিলো ব'লে অনুমিত হয়।

এদিকে দেখা যাচ্ছে, অস্থিসংহার একটি ভেষজেরও নাম। শব্দটি এক হ'লেও তার ব্যাখ্যাটা কিন্তু পৃথক্। উপাখ্যানে যে অস্থিসংহার আছে, সেটির অর্থ হ'লো—অস্থিভিঃ সংহার অর্থাৎ অস্থিগুলির দ্বারা সংহার, আর ভেষজ অস্থিসংহারের ব্যাখ্যা হ'লো—

অস্থীনি সংহরতি=যোজয়তি, অর্থাৎ যে ভেষজে অস্থিগুলি সংযোজিত হয়। লোকায়তিক ব্যবহারের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হ'লো, এই ভেষজটির ব্যবহারে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে (যে কোন প্রাণীর); সেই হিসেবে এর লোক প্রচলিত নাম হাড়জোড়া ও হাড়ভাঙ্গা। এখন হাড় শব্দটি কি ক'রে হ'লো, এটি মৌল সংস্কৃত ভাষার হড্ড শব্দ থেকে এসেছে ব'লে অনেকে বললেও এরও পূর্বকার যে শব্দ সেটা তো হ'লো অস্থি। কারণ অস্+থি (ক্থিন) প্রত্যয়, এটা বৈদিক ভাষা, মনুসংহিতারও ভাষা অর্থাৎ যা শক্ত হ'য়ে অভ্যন্তরে থাকে। এই অস্থিই পরে আঁটি/ পরে হাটি/পরে হট্টি, ক্রমে হড্ডি বা হাড্ডি, তা থেকেই হাড় হ'য়েছে। তা যাই হোক্, হাড় ভেঙ্গে গেলে শল্যশালাক্য চিকিৎসকই তার বিধিবিধান ক'রে থাকেন, কিন্তু কায়চিকিৎসাবিদ্গণও অস্থিভগ্নের জন্য ভেষজের অনুশীলন ক'রেছিলেন এই অস্থিসংহার নাম এবং তার প্রত্যক্ষ ফলদাতৃত্ব দেখেই। যদিও ভেষজটি বহুক্ষেত্রেই অমোঘ ফলদ হ'য়ে আছে, কিন্তু অস্থিভগ্নের ক্ষেত্রেও ব্যবহার চমৎকারিত্ব আছে, এই অর্থেই আজও তার এই নাম।

প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি যে, এই নিবন্ধ লেখার মাঝে একটা ইঙ্গিত ক'রেছিলাম যে, দধীচির অস্থি দিয়ে অস্থিসংহার অস্ত্র প্রস্তুত হ'য়েছিলো। এই উপাখ্যানটার উপমাটি বর্তমান যুগের মারক নলদ অস্ত্র তৈরীর একটি উপমা স্বরূপ, এ কথাটা গবেষক পাণ্ডিতগণ মনে করেন। তাঁদের সমীক্ষায় এইহ'লো নালিকাস্ত্র অর্থাৎ বন্দুক। এইটি দধীচির অস্থির কাহিনী—এই দধীচি নামটিতেও একটা গবেষণার বিষয় রয়েছে। অদ্যাবধি "চি" এই অক্ষরটি চীন দেশে এখনও প্রচলিত। মিষ্ট ফল লিচু, লিচি। সেইরকম হো চি, চিয়াং এমনি চি বা চী শব্দের প্রাধান্য রেখেই চীন সংস্কৃতিতে আজও নামকরণ। দধীচি নাম ও নল সমন্বিত মারক অস্ত্রের আবিষ্কার চীন দেশেই। এখন দেখুন নাস্তিকের দধীচি কোথায় গিয়ে আটকে গেছে। তা যাক্, অস্থিসংহার বা হাড়জোড়া লতা ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকে সর্বভারতীয় বৈদ্যবৃন্দের কাছে পরিচিত, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লেখা বইগুলির মধ্যে একাদশ শতকের চক্রপাণি দত্তের প্রণীত "চক্রদত্তে" এটার প্রথম উপনিবেশ মনে হয়। এই লতাগাছটির নাম ভগ্নচিকিৎসায় দু'বার এবং কণ্ঠরোগের চিকিৎসায় একবার উল্লেখ ক'রেছেন। ভগ্নচিকিৎসায় ব'লেছেন, সন্ধিস্থলের হাড় ভেঙ্গে গেলে অস্থিসংহারের রস আর একটু দুধ ও ঘি মিশিয়ে খাওয়ার উপদেশ।

দ্বিতীয়বার লাক্ষা এবং হাড়জোড়া বেটে ওর সঙ্গে গুগ্গুলু মিশিয়ে সহ্যমত গরম ক'রে প্রলেপ দিয়ে বেঁধে রাখলে "সভগ্ন যুক্তাস্থি রুজং নিহন্যাদ্", ভেঙ্গে গুঁড়ো হ'য়ে গেলে এবং খুব যন্ত্রণা হ'লে ওই প্রলেপে সবদিক থেকে সুখকর হবে এবং ভগ্নাস্থিও জুড়ে যাবে। তারপর বলা হ'য়েছে "তত্রান্যতোঽপি দৃষ্টত্বাৎ" অর্থাৎ এটা অন্যান্য স্থানেও প্রয়োগ ক'রে ভাল ফল পাওয়া যায়, এটা প্রাচীন বৈদ্যগণের অভিমত।

তারপর তৃতীয়বার উল্লেখ ক'রেছেন নড়া দাঁত শক্ত ক'রতে হাড়জোড়ার প্রয়োজন হয়। কারণ এটির একনাম "বজ্রবল্লী" (ভাবপ্রকাশে "বজ্রাঙ্গী")। এ নামের সার্থকতা খুব, তাই অন্যান্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট ভেষজের মতই বজ্রবল্লীর ক্বাথ দিয়ে তেল পাক ক'রে সেই তেল মুখে ধারণ ক'রলে, কুল্লি ক'রলে নড়া দাঁত শক্ত হয়।

চক্রদত্তের আমলে নিশ্চয় হাড়জোড়ার লোকায়তিক শুধু নয়, ভৈষজ্য বিজ্ঞানের মৌলগ্রন্থের সন্ধানও পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সেই আমলের কোন নিঘণ্টু গ্রন্থের পৃষ্ঠায় এটির উল্লেখ দেখা যায় না। অর্থাৎ রাজনিঘণ্টুর ঢের আগে এমনকি চক্রদত্তের আগে ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু গ্রন্থেও এটির পরিচয় দেখা যায় না। সর্বশেষে ষোড়শ শতাব্দীর ভাবপ্রকাশেই একে দেখা যায়, অবশ্য চরক সুশ্রুতের কালে এটি অন্য কোন নামে পরিচিত

ছিল কিনা সেটা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। যাহোক্ ভাবপ্রকাশের উক্তি হ'লো—

গ্রন্থিমানস্থি সংহারো বজ্রাঙ্গী বাস্থি শৃঙ্খলা।
অস্থিসংহারকঃ প্রোক্তো বাত শ্লেষ্ম হরোঽস্থিযুক্॥

(ভাবপ্রকাশ গুড়ুচ্যাদি বর্গ)

জানি না চক্রদত্তের বহু আগে থেকেই কিনা বাংলার অধ্যাপক পরম্পরায় অদ্যাবধি হাড়জোড়ার আময়িক প্রয়োগ বড় কম নয়। ভাবপ্রকাশকার ব'লেছেন—এই ভেষজটি উষ্ণবীর্য, সারক, বৃষ্য, পাচক, তবে সামান্য পিত্তজনক। এর দ্বারা ক্রিমি ও অর্শেরও উপকার হয়। ভাবপ্রকাশকার যতটা ব'লেছেন, বাংলায় এর ব্যবহার আরও বিস্তৃত।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— কান্ড স্বাদে তিক্ত, উষ্ণ, মৃদুবিরেচক, ক্ষুধাবর্ধক, বলকারক, বেদনানাশক, ক্রিমিঘ্ন, কফ-বাত প্রশমক ও অস্থিসন্ধানকর।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— পাতা ক্ষুধাবর্ধক। কচি কান্ডের রস অজীর্ণরোগে, স্কার্ভি-রোগে, অনিয়মিত ঋতুস্রাবে, কর্ণ ও নাসারোগে হিতকর। এই কচি কান্ড বলকারক, তাই অনেকে এটি রান্না করে খেয়ে থাকেন। হাঁপানীরোগেও এর কান্ড বেটে খেলে উপকার পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এর বাহ্য প্রয়োগও দেখা যায়—যেমন অস্থিভগ্নে ও দূষিত ক্ষতে বেদনা উপশমের জন্য অস্থিসংহারের কচিকান্ড বেটে প্রলেপের ব্যবস্থা।

মূলের গুঁড়ো অস্থিভগ্নে হিতকর।

পরিচিতি

শৃঙ্খলাকৃতি মাংসল লতা। এর পর্বগুলির গঠন দেখতে অনেকটা কামরাঙ্গা ফলের মত। দুই পর্বের মাঝখানে যে গ্রন্থি সেইখানে আকর্ষ ও ছোট একটি পাতা হয়। সাধারণতঃ এইগুলি পাঁচিলের ওপর অথবা বেড়ায় শোভা বর্ধনের জন্য লাগানো হয় এবং শৃঙ্খলাকারে বৃদ্ধি হতে থাকে। পাতা ১—১½ ইঞ্চি লম্বা ও গোলাকার বা অনেকটা হৃৎপিন্ডাকৃতি। ছোট বোঁটায় সূক্ষ্ম রোমশ ফুলগুলি গুচ্ছাকারে থাকে ও পাপড়ির অগ্রভাগ সরু ও শ্বেতবর্ণ। পাকা লাল বর্ণের ফলগুলি আকারে মটরের মত। ডাঁটার একটি পর্ব মাটিতে বসিয়ে দিলে সেইটাই নূতন গাছে পরিণত হয়। এইজন্য এর অপর নাম "কান্ডবল্লী"। ভারতের উষ্ণপ্রধান ও নাতিশীতোষ অঞ্চলে এটা হয়। সংস্কৃত নাম অস্থিসংহার। বাংলা নাম হাড়জোড়া, হাড়ভাঙ্গা, হিন্দীতে হাড়্জোড়া নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Cissus quadrangularis Linn. ও ফ্যামিলি Vitaceae.

ব্যবহার্য অংশ— পাতা ও মাংসল ডাঁটা।

লোকায়তিক যোগ

এটি প্রধানভাবে কাজ করে রসবহ স্রোতে।

১। অগ্নিমান্দ্যে— যাঁদের পেটে বায়ু এবং দাস্ত পরিষ্কার হয় না, অতএব এটি

বায়ুপ্রধান অগ্নিমান্দ্য। বায়ুপ্রধান অগ্নিমান্দ্য হ'লে কি হয়, তা বিস্তৃত ক'রে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বলা হ'য়েছে। এই অসুবিধের ক্ষেত্রে রাঢ় দেশের বৈদ্য সম্প্রদায়ের একটি ঘরোয়া ওষুধ এখানে তুলে দিলাম—সেটা এই অস্থিসংহার থেকেই তৈরী হয়। পূর্বেই তো বলা হ'য়েছে যে, এটির লোক প্রচলিত নাম হাড়ভাঙ্গা বা হাড়জোড়া।

ওষুধ প্রস্তুত পদ্ধতি—হাড়জোড়ার ডাঁটার খোসা ছাড়িয়ে (এটাতে ওল কচুর রসের মত হাত চুলকোয়) সমান পরিমাণ ওজনে মাষকলাই মিশিয়ে একসঙ্গে বাটতে হবে (লঙ্কা বাটার মত সাবধানেই বাটতে হবে), তারপর তাকে একটু শুকিয়ে মটর পরিমাণে বড়ি ক'রতে হবে; তারপর তাকে আরও একটু শুকিয়ে নিয়ে তিল তেলে (তৈলে) ভেজে নিতে হবে। এমনভাবে ভাজতে হবে যেন কাঁচাও না থাকে আবার পুড়েও না যায় (মোটকথা ভিতরে যেন কাঁচা না থাকে), তারপর তাকে শিশিতে রেখে দিন। যে কোন প্রকারের পেটের বায়ুতে ওই বড়ি একটি ক'রে দু'বেলা ঠাণ্ডা জলসহ খেলে এটাতে বিশেষ উপকার হয়। তবে যাঁদের বেশী এলার্জি আছে তাঁরা অসুবিধে বোধ ক'রলে এটা খাবেন না।

২। **অম্লপিত্ত রোগে—** যাকে আমরা বলি "অম্বলপিত্তি", এ রোগের বিস্তৃত বর্ণনা এবং লক্ষণ এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ডেই দেওয়া হ'য়েছে। মোটকথা—এ রোগে যিনি আক্রান্ত হন, তার পরিণতিতে আসে গ্যাস্ট্রিক্ আল্সার, ডিয়োডিনাম্ আল্সার প্রভৃতি অন্ত্রক্ষত রোগ। এক্ষেত্রে হাড়জোড়ার কচি পাতা ও ডাঁটা কুচিয়ে শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে নিতে হবে; সেই মিহি চূর্ণ দু'টিপ্ নস্যির মত এবেলা ওবেলা দু'বার ঠাণ্ডা জল দিয়ে খেতে হবে। এর দ্বারা দুই-তিন দিনের মধ্যে খুব ভাল উপকার পাওয়া যাবে। তবে যাঁদের এলার্জি আছে তারা ২।১ দিন খাওয়ার পর অস্বস্তি বোধ হ'লে আর না খাওয়াই ভাল।

৩। **শ্বাস রোগে—** এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশই এর মূলোচ্ছেদ ক'রতে পারেনি, তবে সাময়িক যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্য বহু প্রক্রিয়া ও ঔষধের আবিষ্কার হ'য়েছে, এই রকম একটি সহজ যোগের কথা লিখছি। হাড়জোড়ার ডাঁটাগুলি কুচি কুচি ক'রে কেটে শুকিয়ে চূর্ণ ক'রে ছেঁকে নিতে হবে। ওই চূর্ণ একটিপ নস্যের পরিমাণ (৫০ মিলিগ্রাম আন্দাজ) নিয়ে জলসহ সকালে ও সন্ধ্যার পর দু'বার খেতে হবে। প্রথমে একবার ক'রে খেয়ে লক্ষ্য ক'রতে হবে যে কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা; তবে জলটি ঠাণ্ডা খাওয়া উচিত নয়। ঈষদুষ্ণ হওয়াই ভালো। এটাতে অনেকের এলার্জি হ'তে দেখা যায়, সুতরাং খুব সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত।

৪। **অনিয়মিত ঋতুতে—** যেসব মেয়ের অনিয়মিত ঋতু হয় অর্থাৎ মাসের দিনগুলি এগিয়ে পিছিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কচি হাড়জোড়া কুচিকুচি ক'রে কেটে, শুকিয়ে, গুঁড়ো ক'রে সেই চূর্ণ ২ টিপ নস্যির পরিমাণ জলসহ দু'বেলা খেতে হবে। এই রকম কিছুদিন খেলে ওটা স্বাভাবিক হবে।

৫। **কৃশতায়—** যেসব বালক পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে, তাদের একটিপ নস্যির পরিমাণ চূর্ণ দুধসহ খাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া আছে। এটা আমরা প্রাচীন বৈদ্যগণের মুষ্টিযোগের খাতায় দেখতে পাই। এখানে আমার বক্তব্য হ'লো, দ্রব্যটি ওল বা কচুর মত গাল চুলকোয়, সেক্ষেত্রে বিশেষ বিচার করে এটা ব্যবহার করা উচিত, অথবা অন্য প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা উচিত। আর একটি প্রক্রিয়ায় এটা ব্যবহার করা যেতে পারে, ওই চূর্ণগুলিকে ঘিয়ে অল্প ভেজে রেখে দিতে হবে। তা থেকে একটিপ নস্যির আন্দাজে ওই ঘিয়ে ভাজা গুঁড়ো প্রত্যহ দুধ বা জলসহ খেতে

হবে। দু'বারও খাওয়া যায়।

৬। **ক্রিমির উপদ্রবে—** ক্রিমির উপদ্রবে অনেকের দাস্ত পরিষ্কার হয় না, কোনদিন মল কঠিন হ'য়ে গেলে আবার কোনদিন পাতলা দাস্ত হ'লো, তার সঙ্গে মলদ্বারে অস্বস্তি, চুলকানি, তাঁরা উপরিউক্ত নিয়মে ঘিয়ে ভাজা অস্থিসংহার চূর্ণ ২-৩ টিপ নস্যির পরিমাণ মত এবেলা ওবেলা দু'বার জলসহ খেতে পারেন; তাঁদের এ অসুবিধেটা চ'লে যাবে।

৭। **বাত রোগে—** গা-হাত-পা ব্যথা, যন্ত্রণায় কষ্ট হ'চ্ছে এটা প্রায়ই হয়, এক্ষেত্রে হাড়জোড়ার ফুলুরি করে খেলে বিশেষ উপকার হবে। তৈরী করার নিয়ম হ'লো, আঙ্গুলের এক গাঁটের মত (পর্ব) হাড়জোড়ার ডাঁটা ওপরের খোসাটাকে ছাড়িয়ে তাকে এক-দেড় মুঠো আন্দাজ ২৫-৩০ গ্রাম ডালের সঙ্গে বেটে নিয়ে তাকে টিকিয়া ক'রে ভাজতে হবে, অর্থাৎ গোল ফুলুরি না ক'রে চ্যাপ্টা ক'রে ভাজতে হবে। সেইটাই ভাত খাওয়ার সময় খেতে হবে। অবশ্য অন্য সময় মুড়ির সঙ্গেও খাওয়া যায়।

বাহ্য ব্যবহার

৮। **অস্থিভগ্নে—** মানুষের তো বটেই, পশুপক্ষীরও হাড় ভেঙ্গে যায়, সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভেষজ একসঙ্গে বেটে, একটু গরম ক'রে প্রলেপ দিয়ে দেখুন, নিশ্চয়ই ফল পাবেন। গাঁদাল পাতা ২ ভাগ (Paederia foetida), নিসিন্দার পাতা ২ ভাগ (Vitex negundo), ধুতরোর পাতা ১ ভাগ (Datura metel) এবং হাড়জোড়ার ডাঁটা ২ ভাগ, একসঙ্গে বেটে গরম ক'রে ওখানে লাগালে ব্যথা ও ফুলো সবই চ'লে যাবে, তবে ১ দিন অন্তর লাগাতে হবে। ভগ্নস্থান বেশী লাল হ'লে ২ দিন অন্তর লাগাতে হবে আর যেদিন লাগানো হবে না, সেদিন যেকোন তেল (তৈল) একটু লাগিয়ে দিতে হবে। অস্থিভগ্নে (দ্বিতীয় যোগ) উপরিউক্ত ক্ষেত্রে হাড়জোড়া ১ ভাগ, রসুন সমপরিমাণ এবং গুগ্‌গুলু একভাগ একসঙ্গে বেটে, একটু গরম ক'রে প্রলেপ দিলে (সম্ভব হ'লে বেঁধে রাখুন) ওটা জুড়ে যাবে, তবে ১ দিন বা ২ দিন অন্তর লাগাতে হবে।

৯। **কানের পুঁজে—** হাড়জোড়ার ডাঁটা সরষের তেলে ভেজে সেই তেল প্রত্যহ দু'-এক ফোঁটা ক'রে কানে দিলে ওটা সেরে যাবে। তৈরী করার পদ্ধতি হ'লো, সরষের তেল ৫০ গ্রাম, হাড়জোড়ার ডাঁটা ২৫ গ্রাম—ওটাকে চাকা চাকা ক'রে কেটে আলুভাজার মত ভেজে ঐ তেলটাই নিতে হবে। তবে ভাজাটা একটু কড়া ক'রেই হবে।

অস্থিসংহার নিবন্ধটি লেখা শেষ ক'রে ভাবছি, পণ্ডিতরা শব্দের ঘূর্ণীতে ফেলে অস্থিসংহারের অর্থ তো পাল্টে দিলেন, কিন্তু তাতে আমাদের বৈদ্যকুলের কি হ'লো—সারা বিশ্বের চিকিৎসাবিজ্ঞানটির জনক হয়েও এই আয়ুর্বেদের এখন অস্থি সংহার হ'তে ব'সেছে, সেক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কি? আমরা কি দধীচির মত অস্থি দান ক'রে আয়ুর্বেদের বিজ্ঞানকে প্রসারিত ক'রছি, না কি আয়ুর্বেদের অস্থিকেই সংহার ক'রতে ব'সেছি?

CHEMICAL COMPOSITION

Cissus quadrangularis Linn.

Plant contains: — Moisture 13.1%; proteins 12.8%; fat and wax 10%;

fibre 15.6%; carbohydrates 36.6%; mucilages and pectins 1.2%. Vitamin C (398 mg in 100 gm tender stem parts, 232 mg. per fibrous bottom portion and 479 mg in freshly expressed sap). Ash 18.2% mostly as carbonates and to a smaller extent phosphates of sodium, potassium, magnesium and calcium). Carotene (267 mg per 100 gm fresh plant) Potassium tartarate and calcium oxalate.

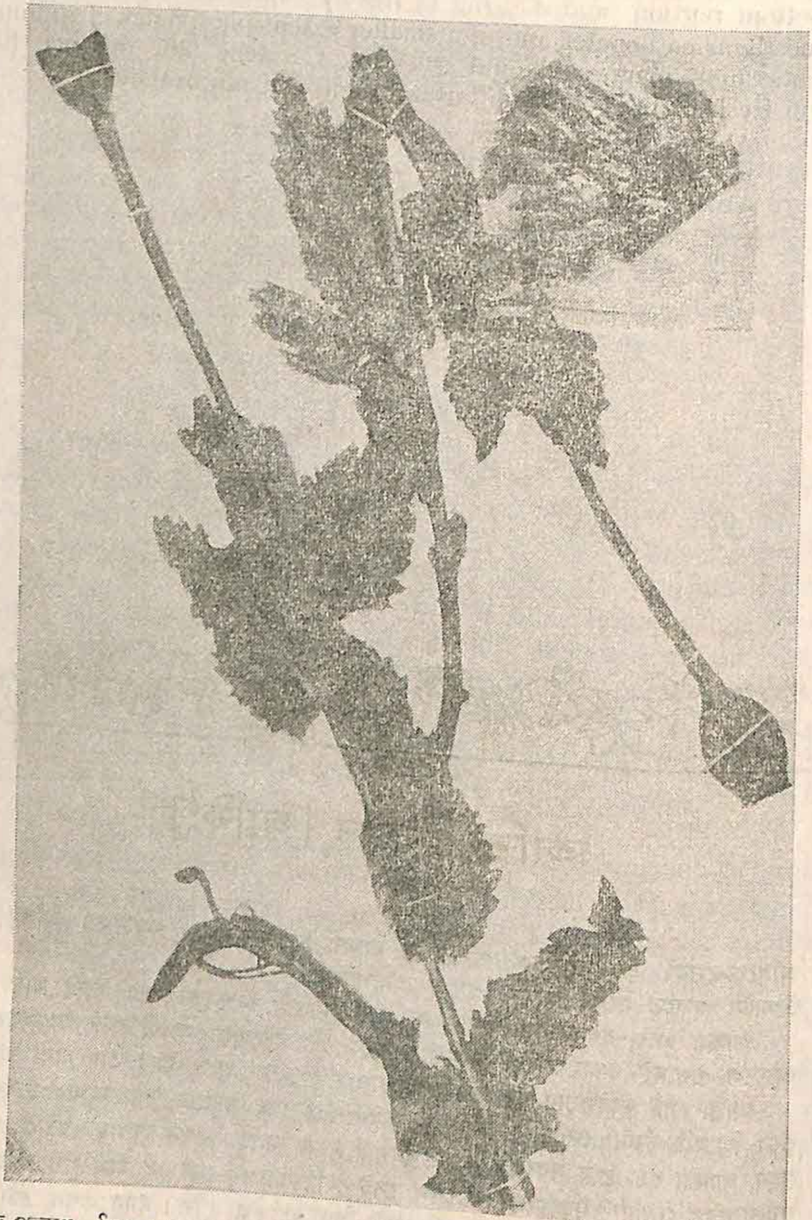
অহিফেন [আফিং]

অহিফেনসেবী এক নাস্তিক পণ্ডিতের মাথায় ঢুকলো এই খসফলের ইতিহাসটা উদ্ঘাটন ক'রতে হবে। আরম্ভ হ'লো অনুশীলন।

আচ্ছা, একে যখন ছাড়া যাচ্ছে না তাহ'লে এটা নিশ্চয়ই নেশা; তাই যদি হয়, তাহ'লে প্রথমেই আমাকে বিচার ক'রতে হবে এর বস্তুসত্ত্বা অথবা তার ভাবসত্ত্বাকে।

আগে সেই ভাবসত্ত্বার ব্যাপ্তি আর কোথায় কোথায় আছে, আর তার মধ্যে আমরা ডুবে গিয়েছি কিনা সেইটাই মানসিক রোমন্থন ক'রতে ক'রতে তাঁর মাথায় ঢুকলো; কেন, আমরা তো প্রায় সকলেই ধর্মের নেশায় ম'জে আছি। এখন দেখছি, এটাও একটা গ্যাঁড়াকলের নেশায় দাঁড়িয়েছে। তা কেন, সেই বৈদিকযুগেও তো এই ধর্মের কল ছিল— যেটা আগুনে বাতাসে জলে ন'ড়তো। সেটা ছিল সাত্ত্বিক বৃত্তি। আর এখন এটা তো তামসিক নেশায় দাঁড়িয়েছে; এই ধর্মের আফিং খায়নি এমন কোন লোক তো নজরেই প'ড়ছে না; তাহ'লে কি এই ধর্মের বস্তুসত্ত্বা কেবল মোক্ষলাভের আর স্বর্গবাসের নেশায় সীমায়িত?

আচ্ছা, আমার কাঁধে যখন ধর্মের ঢাক নেই, তখন আমি তো নাস্তিক! সুতরাং যেটাতে কেবলমাত্র বস্তুসত্ত্বা আছে সেটাই আমাকে অনুশীলন ক'রতে হবে। ঘাঁটলেন



বেদ-পুরাণ, কিন্তু কোন জায়গায় খসফল বা অহিফেনের সন্ধান পাওয়া গেল না। এখন পণ্ডিত ভাবছে একে প্রতিষ্ঠা করি কি ক'রে যে, এ নেশাটা প্রাচীন। এতক্ষণে পণ্ডিতের অহিফেনের নেশাটা কেটে গিয়েছে। তখন তিনি আশ্রয় নিলেন ইতিহাসের;

আরম্ভ ক'রলেন প্রাচীন ইতিহাসের অনুশীলন। ওই যে কিরাত, খস, নিষাদ, শাক-দ্বীপী প্রভৃতি জাতির আগমন ঘ'টেছিলো, সে সব জাতি কোথায় গেল? কাদের বা কোন সমাজের দেহে মিশে গিয়ে লীন হ'য়ে গেল? এরাই কি বর্তমান হিন্দুর সমাজভুক্ত? এর সদুত্তর বোধহয় পাওয়া যাবে না।

আচ্ছা, আরও একটু এগিয়ে গেলে এই ফলটা খস নাম কেন ধারণ ক'রলো? সেটা খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল, এই শব্দনামটার উল্লেখ আছে মহাভারত, হরিবংশ, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের স্থানে স্থানে, এমন সব ইঙ্গিতপূর্ণ শ্লোক রয়েছে যার দ্বারা এর প্রকৃত তথ্যটির সন্ধান পাওয়া যাবে। এই যেমন মনুসংহিতায় আছে ১০।৪৪ শ্লোকে, মহাভারতের ২।৫২।৩ শ্লোকে, হরিবংশের ১৪ অধ্যায়ে এবং বৃহৎসংহিতার ১০ অধ্যায়ে খস নামীয় জাতির উল্লেখ, যাঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয়, পরে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, তার আরও পরে ধর্মান্তরিত। এ ইতিহাস তো আধুনিক ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেন। এটাও তো লেখা আছে যে এককালে আর্যভাষী বহু ব্যক্তি এই হিমালয়ের প্রান্তরে এসে বাস করেন, তার মধ্যে খস জাতি যাঁরা তাঁরাই এখন খাসিয়া নামে পরিচিত। এঁদের আপামর সাধারণের নিত্যব্যবহার্য ছিল এই ফলের নির্যাস। ওঁরা সুরাপানের চেয়ে খসফলের রসই বেশী পছন্দ ক'রতেন, সেই ফল আজ বিভিন্ন নামে পরিচিত। সেই ফলনির্যাস আরবদের কাছে অফয়ূন্, গ্রীসে ওপিয়ন্, ইংরাজদের কাছে ওপিয়াম্, ভারতের প্রাচীন আহোম (আসাম) জাতির কাছে আফুফ্, মগধের (এখন মৈথিলী) হফীম্—এমনিভাবে চ'লতে চ'লতে তাকে নবীন সংস্কৃতে করা হ'য়েছে অহিফেন। সেইটাই বাংলায় এসে আফিং হ'লো।

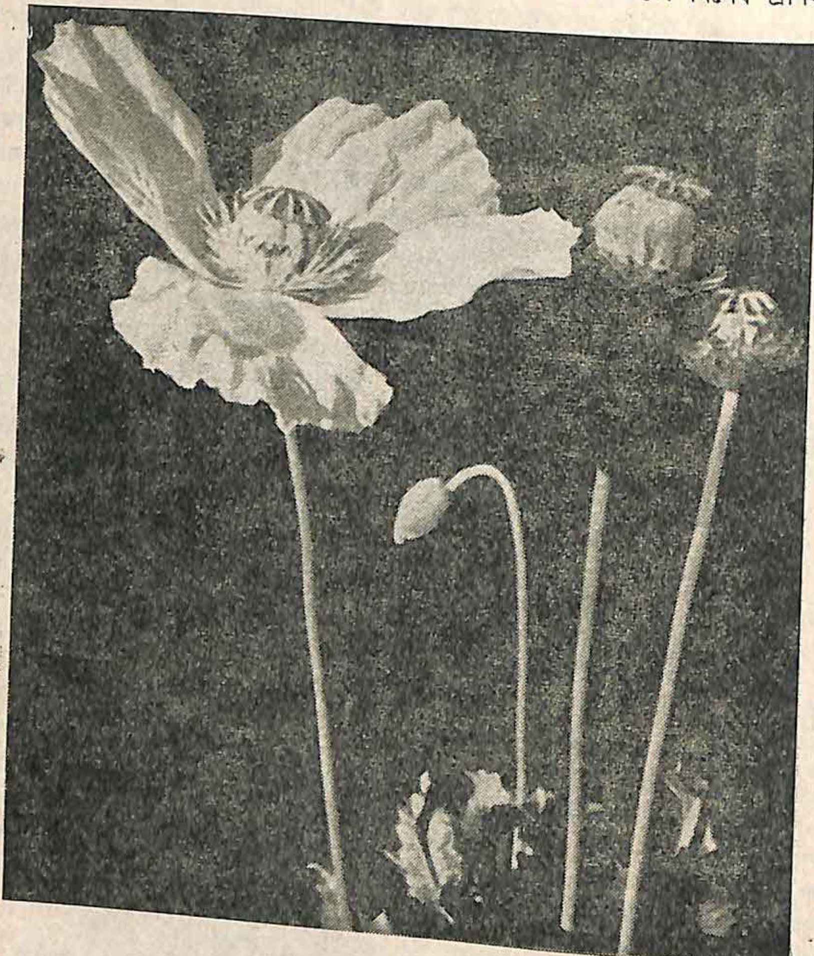
এত পিছনের ইতিহাস টেনে ঐ খসফলের পরিচয় জানাটা যেমন দরকার, তেমনি জানা উচিত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পর থেকে ভারতীয় বনৌষধির গ্রন্থমালায় ঐ খসফলের স্থান আছে কিনা?

এর উত্তরে ব'লবো অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রামাণ্য আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ বাগ্‌ভটে ঐ নামে কোন ভেষজের উল্লেখ নেই; তবে শিলহন, তুরুস্ক প্রভৃতির কয়েকটি নির্যাসও যে ভেষজরূপে গণ্য হ'তো সে ইঙ্গিত চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটে আছে; কিন্তু খসফল বা আফুফ্ প্রভৃতি এরকম শব্দনাম ওসব গ্রন্থে নেই। এই খসফলের ব্যবহার যে রোগের ক্ষেত্রে করা যায় তেমন স্পষ্টোক্তি আমরা পাই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শার্ঙ্গধর নামক গ্রন্থে। তারপর অন্যান্য নিঘণ্টুতে। শার্ঙ্গধরের পরে রচিত গ্রন্থে ঐ খসফলের নাম তখন বিবর্তিত হ'তে হ'তে পুরোপুরি অহিফেনে এসে গিয়েছে; যার প্রচলিত নাম আফিং। এই আফিংই খসফল, আর খসফল দেখেই আমরা শার্ঙ্গধরের কাছ থেকে পেয়েছি—

"উচ্যতে খসফল ক্ষীরং আফুফং ইতি নামতঃ।
ফলস্য বীজ নামানি খাখসতিলা ইত্যপি॥"

অর্থাৎ সেই খসফলই আফুফ্, আর তার বীজের নাম খাখসতিল। প্রচলিত বাংলায় যাকে পোস্ত বলি। এইটি ফারসী ভাষা, একে ইংরাজিতে Popy seed বলে। এই খসফলের বল্কলও ভেষজ, যাকে পোস্তঢেঁড়ি বলি। এটাও যে ভেষজ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে উল্লেখ আছে শার্ঙ্গধর নামক গ্রন্থে আর পোস্তদানা থেকে যে তেল (তৈল) নিষ্কাশন করা যেতে পারে বা করা হয়, সেটারও উল্লেখ ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায়। এখন দেখা যাচ্ছে যে, ফলের আঠা (নির্যাস) শুকিয়ে আফিং হ'চ্ছে, ফলের

বীজগুলি পোস্তদানা, তার খোসাটা পোস্তঢেঁড়ি। এই খসফলের বা আফুফ ফলের নির্যাসটি রসবহ স্রোতেই কাজ করে, সাধারণতঃ এ সিদ্ধান্ত কিন্তু রাজনিঘণ্টুর। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ফলবর্গে এটিকে ধরা হ'য়েছে, এখানের উক্তিটা বিশেষ প্রণিধান-



যোগ্য; সেটা হ'লো—

শ্বেতঃ কৃষ্ণঃ তথাপীতঃ কর্বুরো বর্ণভেদতঃ।
নির্য্যাসঃ খসবৃক্ষস্য ফলস্যাপি তথা ভবেৎ।
জারণং মারণং চাপি ধারণং সারণং তথা।
ক্রমতো জানীয়াৎ ভেদান্ খসনির্য্যাস রসাংশ্চহি॥

অর্থাৎ খসফল বা আফিং ফলের রসের ৪টি ভেদ। শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত ও কর্বুর—এটি কেবল বর্ণভেদের জন্য—শ্বেতবর্ণের নির্যাসে জীর্ণতা, কৃষ্ণবর্ণে মৃত্যু, পীতবর্ণে স্তম্ভন ও বাজীকর গুণ আর কর্বুর বর্ণে (পায়রার গলার রঙকে কর্বুর বর্ণ বলা হয়)

মল নিঃসারণে সাহায্য করে। তবে ঐ চার প্রকার বর্ণেরই সাধারণ সামান্যগুণ—এটিকে শোধন ক'রে ব্যবহার ক'রলে সান্নিপাতিক রোগ দূর করে। রসক্ষয়জনিত দুর্বলতায় সে বলদান করে। তবে মাত্রার ঊর্দ্ধে গেলেই মোহ আসে, আবার তার থেকে বেশী হ'লেই মৃত্যু ঘটায়।

এর আরও দুই-একটি সাধারণ স্বভাবগুণ আছে, সে গ্রাহী ও শ্লেষ্মাজাত ব্যাধির প্রশমক; কিন্তু বায়ু ও পিত্তবর্ধক।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি—খসফলকে সংস্কৃত ভাষায় কি বলা হয় তার উল্লেখ দেখা যায় না, তবে এর নির্যাসকে অহিফেন বলা হয়। কিন্তু কেন এই নাম হ'লো, এ প্রশ্নটা মনে আসাটাই স্বাভাবিক নয় কি? তার উত্তরে বলা যায়, সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানের ১৭ অধ্যায়ে "অহিপুষ্পম্" নামের উল্লেখ। টীকাকার এর ব্যাখ্যায় ব'লেছেন, এটি "নাগকেশর পুষ্প" (Mesua ferrea) এবং শিশুর গুহ্যক্ষতের নাম "অহিপুতনক", দীর্ঘ আকৃতির কর্কটিকার (কাঁকুড়) ফলের নাম "অহিফলম্"। বিট্-খদির বা গুয়ে বাবলার (Acacia farnesiana) নাম "অহিমার"। এমনি আরও অনেক ভেষজকেই অহি বিশেষণে বিশেষিত করা দেখেই অহি শব্দের আভিধানিক শব্দার্থ খুঁজতে গিয়ে দেখি, অহি শব্দটি কুটিলার্থ বাচক। এমন কি, যে মেঘ চলমান হ'য়ে বর্ষণ করে, সেই মেঘকেও অহি বলা হ'য়েছে ঋক্‌বেদের ১০।১২।২১ সূক্তে।

অতএব অহি শব্দের প্রয়োগ থাকলেই বুঝতে হবে এই দ্রব্যটির প্রকৃতিগত স্বভাবই কুটিল গতিতে। এক্ষেত্রেও অর্থাৎ খসফলের রসের স্বভাবও কুটিল। কারণ ওটা ব্যবায়ি দ্রব্য।

ব্যবায়ি দ্রব্যের মধ্যে এমন বীর্যশক্তি থাকে যে একসঙ্গে শোষ বা ক্ষয়কারক, আবার একই সময়ে সেটা পরিপাক হবার পূর্বেই শরীরের যেকোন স্থানে তার ক্রিয়া করে। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য পরিপাকান্তে হয় রস, না হয় রক্ত, না হয় মেদ প্রভৃতি ধাতুর উপকার সাধন করে, কিন্তু কুটিল গতিতে প্রসর্পণ করে না। এই খসফলের রস অহি অর্থাৎ কুটিল স্বভাবের। বক্ষের কিম্বা মস্তিষ্কের অথবা মূত্রবহ স্রোতের বা পাকাশয়ের ক্রিয়া সাধন করতে গিয়ে নিজের প্রভাব বাড়ায়। সেইজন্যই এটি অহিবৎ এবং ফেনবৎ। ফেন অর্থে বুদ্‌বুদ্ অর্থাৎ জলবিকারে যার উৎপত্তি এবং সে জল স্বচ্ছ নয়।

মোট কথা, অহিফেনের সঙ্গে সর্পবিষের তুল্যতা রেখে একে অহিফেন বলা হয়নি। আর এক কথা, স্থাবরবিষ ও উপবিষের পর্যায়েও এই খসফলের নির্যাসকে উল্লেখিত করা হয়নি। তবে চরকে উক্ত পঞ্চনির্যাসের ব্যাখ্যায় অহিফেন যে কোন বৃক্ষের নির্যাস তা গঙ্গাধরও বলেন।

তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর বেদ-তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের চিকিৎসাগ্রন্থ "রসেন্দ্র সার সংগ্রহে" গ্রহণী রোগের কয়েকটি ঔষধের অন্যতম উপাদান আফিং। এরপর ১৫ শতকের রাজনিঘণ্টু এবং ১৬ শতকের ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে আফিং-এর দ্রব্যগুণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হ'য়েছে (পিপ্পল্যাদি বর্গে), কিন্তু রাজনিঘণ্টুতে আফিং-এর ক্রিয়াবস্থায় যে চারিটি রূপ প্রকাশ পায় ব'লে উল্লেখিত হ'য়েছে, সেটি তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তাঁরা এই নির্যাস ভেষজটিকে ব'লেছেন—

খাখস কোষনির্য্যাসঃ অহিফেনোহি সংজ্ঞিতঃ।
দ্বিবিধঃ রূপ আয়াতি পিঙ্গলঃ কৃষ্ণবর্ণতঃ॥
যোগবাহি রসৈঃ যুক্তঃ সর্ব্বাময় বিনাশকৃৎ।
রসায়নঃ পরঃ প্রোক্তঃ বাজীকরণ উত্তমঃ॥

অর্থাৎ খাখস নামে যে বীজসম্পুট ফল (পোস্তর ঢেঁড়ি), তারই নির্যাসের নাম অহিফেন (এই নামটির ভাষাবৃত্ত পূর্বেই বলা হ'য়েছে)। অহিফেনের দু'টি রূপ, একটি পিঙ্গল বর্ণের আর এক প্রকার সামান্য কৃষ্ণ বর্ণের। এই অহিফেন যোগবাহী। এটি স্তম্ভক, আস্থাপক, উত্তেজক দ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহার ক'রলে তাতে সর্বপ্রকার ব্যাধিরই নিরাময়তা ঘটে। তাছাড়া এটি উৎকৃষ্ট রসায়ন এবং উত্তম বাজীকরণও।

রাজনিঘণ্টুকার ব'লেছেন, ভেষজটি সান্নিপাতিক বিকার দূর ক'রে দেহে বলাধান করে এবং বৃষ্যও। কিন্তু মোহপ্রদ। তবে যেটি এর বিশেষ শক্তি সেটির প্রকাশ চার প্রকারে—

চতুর্বিধং অ-ফেনং স্যাৎ জারণং মারণং তথা।
ধারণং সারণং চৈব ক্রমাদ্ বক্ষ্যে তু লক্ষণম্
শ্বেতঞ্চ জারণং প্রোক্তং কৃষ্ণ বর্ণংচ মারণম্।
ধারণং পীতবর্ণংচ কর্বূরং সারণং তথা।
জারণং জারয়েৎ অন্নং মারণং মৃত্যুদায়কম্॥

অর্থাৎ আফিং চার প্রকারের কাজ করে। সেই কাজ করা অবস্থাটিকেই সংজ্ঞা দিয়ে বিভক্ত করা হ'য়েছে—যেমন আফিং যদি মাত্রামত ও প্রয়োগবিধি সম্মত প্রযুক্ত হয়, তবে সেই আফিং যে কোন খাদ্যকে জীর্ণ করে, বা পরিপাকক্রিয়ার সাহায্য করে, তখন তার সংজ্ঞা জারণ এবং শ্বেত। আবার ওই আফিং মাত্রা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিধি লঙ্ঘন ক'রলে সেই হয় মারণ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এর অপর একটি নাম মারণ বা কৃষ্ণ। আফিংকে যথাযথভাবে প্রয়োগ ক'রতে পারলে সেটি তখন দীর্ঘকাল নীরোগে দেহধারণ করাতে খুবই সাহায্য করে। এই সহায়তা শক্তি আছে ব'লেই তার সংজ্ঞা ধারণ বা পীতবর্ণ। চতুর্থ শক্তি হ'লো, আফিং সর্বদাই দেহের রোগ অপসারণে পটু, তাই তার একটি সংজ্ঞা সারণ, এই সারণকেই বলা হয় ধূসর।

এ বিষয়ে বৈদ্যগণ বলেন যে, আফিং-এর এই সংজ্ঞা নামের মধ্যে চারটি ভাগ যে করা হ'য়েছে তাদের আদর্শ আফিং ফুলের রং দেখে; অর্থাৎ আফিং-এর ফুল কোনটি সাদা হয়, আবার ফিকে সবুজও হয়, আবার কোনটি একটু হলদে রঙেরও হয়। এগুলি চাষের উৎকর্ষেই সৃষ্টি করা হ'য়েছে।

নব্যের সমীক্ষায়

১। মাত্রামত সেবনেও অহিফেন মস্তিষ্ক, হৃদয় ও শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তেজনা আনয়ন করে এবং অল্প পরেই ইহা অস্বাভাবিক নিদ্রাকারক, অবসাদক ও আক্ষেপ-নিবারক হিসাবে কাজ করে। ইহা প্রধানতঃ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের উপর এবং তৎউত্থিত স্নায়ুমণ্ডলীর উপর কাজ করে। তাছাড়া ইহা অল্প-বিস্তর শরীরের প্রতি অঙ্গেই কাজ করে। তখন ত্বগাশ্রিত নাড়ী স্ফীত হওয়ায় প্রথমে কর্ণপালীর (কানের পাতা) উষ্ণতা ও পরে কণ্ডু দেখা দেয় এবং পরিণামে গাত্র ও অঙ্গুলি ফ্যাকাসে এবং আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে থাকে। অতিমাত্রায় সেবনে তীব্র বিষক্রিয়া হয়।

২। ইহা ঔষধোপযোগী মাত্রায় সেবনে সমস্ত স্রাবের কাজ হ্রাস পায়, তবে স্তন্য ও ঘর্মস্রাব বর্ধিত হয়। এতে মুখ ও গলার শুষ্কতা আসে, পাকস্থলীর স্রাব কমে যায়; পরিণামে ক্ষুধাহ্রাস ও কোষ্ঠবদ্ধতা আসে। ইহার পূর্ণ মাত্রা (২ গ্রেণ বা ⅛ গ্রাম)

সেবনে সাময়িকভাবে মস্তিষ্কের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, কিন্তু পরে মুখে শুষ্কতা আনে। তাছাড়া অজীর্ণ, গা-বমি-বমিভাব ও ঘর্মাধিক্য প্রকাশ করে। তারপরে হৃদ্‌যন্ত্র অবসাদ-গ্রস্ত হয়, রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া মৃদু হতে থাকে, আস্তে আস্তে শরীরের উত্তাপ কমে আসে, চক্ষুর তারার সংকোচ হয়, নাক চুলকাতে থাকে এবং মূত্রাবরোধ ঘটে। মস্তিষ্কের অবসাদের ফলে শীঘ্রই মাথার যন্ত্রণা ও মাথাঘোরা শুরু হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস মন্দীভূত হয়। অতিমাত্রায় সেবনে উপরিউক্ত লক্ষণগুলি আরও প্রকট হয়। তার ফলে আসে মোহ, নাড়ীর ক্ষীণতা, গলার ঘড়ঘড়ানির সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাস, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, তারপরে শরীর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে থাকে। চোখের মণি প্রথমে ছোট হয় ও পরিণামে বিস্ফারিত হয়। মুখ, হাত, পা নীলবর্ণ এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ ও অতি কষ্টে হতে থাকে এবং পরিশেষে মৃত্যু হয়। (R. N. Khory)

৩। কোষ্ঠগত শৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহে এককভাবে অথবা রসকর্পূর ও অ্যান্টি-মনির সঙ্গে ব্যবহার করা হতো। উদরচ্ছদের প্রবাহে (Peritonitis) ইহার ব্যবহার সর্বাগ্রে। জ্বরের তীব্রাবস্থায়, স্নায়ুর উত্তেজনায় ও নিদ্রাহীনতায় আফিং-এর ব্যবহার দেখা যায়। আক্ষেপহর হিসাবে ইহার প্রচুর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

৪। অহিফেন উদরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহের বিবিধ রোগে, যেমন—পাকস্থলীর সাধারণ অথবা ক্যান্সার জনিত ক্ষত, জীর্ণ আমাশয়প্রদাহ, নাড়ীদৌর্বল্য ও শোক-দুঃখাদি কারণ জনিত বমি, অতিসার, আমাশয়, সীসকশূল, অবরুদ্ধ অন্ত্রজ কোষবৃদ্ধি অর্থাৎ যে অন্ত্রজ-কোষবৃদ্ধিতে রক্ত চলাচল ক্রিয়া অবরুদ্ধ হয় (Strangulated Hernia), যেকোন কোষ্ঠাবরোধ (visceral obstruction & c.) প্রভৃতি রোগে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বিবিধ রোগে, যেমন—বস্তিপ্রদাহ (cystitis), বস্তির শ্লেষ্মাস্রাব রোগ (cystirrhoea), গবিনীর (urethra) মধ্যস্থিত পথ পুরু হয়ে যাওয়া (গবিনী-পথের অবরোধ), রক্তপ্রদর, বাধক বা কষ্টরজঃ, জরায়ুর উত্তেজনা, জরায়ু-প্রদাহ প্রভৃতি রোগে অহিফেন চমৎকার কাজ করে।

৫। ধনুষ্টঙ্কার, তরুণ (acute) আমবাত ও প্রলেপে ইহা ব্যবহৃত হতো। কলেরার কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বে অহিফেন ব্যবহৃত হয়ে থাকলেও এর ফলাফল সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে।

৬। আমবাতের যন্ত্রণায়, নাড়ীশূলে বা অন্য কোন যন্ত্রণায় এবং বিভিন্ন চোখের রোগে ইহার বাহ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা দেওয়া হ'ত।

পরিচিতি

এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের প্রায় সর্বত্র অহিফেনের গাছ (পোস্তদানার গাছ) জন্মাতো। দিনাজপুর থেকে হাজারিবাগ এবং গোরক্ষপুর থেকে আগ্রার মধ্যবর্তী স্থান সমূহে, পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে "বিয়াস" উপত্যকার ৭-৮ হাজার ফুট উঁচু পর্যন্ত স্থানে, বিন্ধ্যপর্বতের অন্তর্গত নিম্নভূমিতে; জম্বু, মহীশূর ও আসামের বিভিন্নস্থানে এটি জন্মাতে পারে অর্থাৎ এটির গাছ হওয়ার অনুকূল আবহাওয়া ও মৃত্তিকা। তবে বর্তমানে এর চাষ সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকে না হওয়ায় যত্রতত্র অহিফেনের গাছ জন্মাতে দেখা যায় না, কেবলমাত্র সরকারী তত্ত্বাবধানে বা অনুমোদনে কোথাও কোথাও চাষ হয়। আজকাল উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা এবং মধ্যভারতের বিভিন্ন ক্ষেতে এটির চাষ হয়।

বর্ষজীবী উদ্ভিদ, লম্বায় সাধারণতঃ ৩-৪ ফুট পর্যন্ত হতে দেখা যায়। বোঁটাহীন ঘনসন্নিবিষ্ট পাতাগুলো পরস্পর বিপরীতমুখী, কাণ্ডের গোড়ার দিকের পাতা উপরের দিকের পাতার চেয়ে আকারে ছোট; উপরিভাগের পাতা ৯।১০ ইঞ্চি ও গোড়ার দিকের পাতা ৫।৬ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতার গোড়ার দিকটা সরু, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পত্রাংশ দাঁতযুক্ত, পাতার রং সবুজাভ।

অক্টোবর-নভেম্বরে বীজ বপন করা হয়। জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে ফুল ও ফল হয়। ফুলের রং অনুসারে পোস্ত গাছ তিন প্রকারের—কালো, লাল ও সাদা। সমস্ত ভারতবর্ষে বেশীর ভাগই সাদা ফুলের গাছ হতে দেখা যায়। ফলের কাঁচা অবস্থায় চার দিকটায় লম্বা লম্বা ক'রে চিরে দিলে সোনালী আঠা বেরোয়, সেই আঠাই অহিফেন বা আফিং। এই ফলটিকে বলা হয় পোস্ত ঢেঁড়ি। ফল পাকলে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়, সেগুলিই আমাদের পরিচিত পোস্তদানা। ঐ বীজ থেকে যাতে সাধারণ লোকে পোস্তের গাছ তৈরী করতে না পারে, সেজন্য খোসাসমেত ফল সিদ্ধ ক'রে পরে বীজগুলো আমাদের ব্যবহারের জন্য বাজারে আসে এবং পৃথকভাবে আসে খোসাগুলো, এটির প্রচলিত নাম পোস্তঢেঁড়ী। বহু লোক পোস্তঢেঁড়ী ভিজানো জল খেয়ে নেশা করেন। কাঁচা পোস্তঢেঁড়ী থেকে যে সোনালী আঠা বেরোয়, সেটাই খুব খাঁটি এবং ঐ আঠা খুবই উত্তেজক ব'লে ওর সঙ্গে বিভিন্ন দ্রব্য (গাছের কচি পাতা ও উহার জলীয়াংশ, বটের আঠা, শাল গাছের আঠা, বেলের শাঁস ও আঠা, তেঁতুলের শাঁস, বাবলার আঠা, গাবের আঠা, কাঠের কয়লা, আধপোড়া আফিম্ প্রভৃতি) মিশিয়ে বাজারে বিক্রয় হয়। পোস্তঢেঁড়ীর ভেতরকার বীজগুলো খাদ্য হিসেবে বাজারে আসে।

এটির সংস্কৃত নাম অহিফেন, হিন্দীতে পোস্তা, বাংলায় পোস্ত ও আফিং গাছ নামে পরিচিত। এর বোটানিক্যাল্ নাম Papaver Somniferum Linn., ফ্যামিলী Papaveraceae.

ঔষধার্থে ব্যবহার্য অংশ— বীজ (পোস্তদানা), ফল (পোস্তঢেঁড়ী), আঠা, ফুল ও ফুলের পাঁপড়ি।

লোকায়তিক যোগ

বর্তমানে অকৃত্রিম আফিং বাজারে পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ বাংলায়, আর যেটুকু বিক্রি হয় সেও সরকারের কর্তৃত্বাধীনে। শুধু তাই নয়, বিনা পারমিটে আফিং কেনা যায় না। তবে যেটুকু পাওয়া যায় সেটা শোধন ক'রে ব্যবহার করা উচিত।

শোধন করার পদ্ধতি— প্রাচীন বৈদ্যগণ পূর্বে যে পদ্ধতিতে আফিং শোধন ক'রে ব্যবহার ক'রতেন, সেটা এখানে লেখা হ'লো।

একটা শালপাতায় মুড়ে (আলগা ক'রে) এক কাপ জলে ভিজিয়ে রেখে (অন্ততঃ ৪।৫ ঘণ্টা) পরে দেখা যায় ওই পাতাটায় বাদামী রং-এর আঠা লেগে আছে, বাকী ময়লা জলে মিশে গিয়েছে; ওই শালপাতায় যেটা লেগে থাকতো সেইটাই ব্যবহার করা হ'তো। বর্তমানে এ পদ্ধতিতে কি শোধন করা সম্ভব হবে?

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একটি কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, জ্বর রোগের ক্ষেত্রে আফিং-এর ব্যবহার সর্বপ্রকারে নিষিদ্ধ।

১। ঋতুজ রোগে— মাসিক স্রাব অনিয়ম চ'লতে থাকলে, যেমন অল্প স্রাবে, বেশী স্রাবে এবং ওরই জন্য কোমরে যন্ত্রণা অথবা এইসব কারণ জন্য অরুচিতে প্রত্যহ সকালে যোয়ান চূর্ণ ২০০ মিলিগ্রাম (৩ গ্রেণ) এবং আফিং ২৫ মিলিগ্রাম একসঙ্গে

৬-৭ দিন খেলে (জলসহ) ওই সব অসুবিধে চ'লে যায়। যদি পরের মাসে এইসব অসুবিধে এসে যায়, তাহ'লে ওই ব্যবস্থায় ব্যবহার ক'রতে হবে। এমনিভাবে তিন মাস ব্যবহার ক'রলে বায়ুপ্রধান বিকার জন্য ওইসব কষ্ট থাকবে না।

২। বাতের কষ্টে— এক ধরনের বাতের বিকার হয়, যেটি অমাবস্যা, একাদশী, পূর্ণিমায় সর্বাঙ্গ ভারি হয়, আর ভিতরে যেন ছুঁচ ফোটার যন্ত্রণা হয়, সেই সময় বয়স ও অগ্নিবল বিবেচনা ক'রে ২৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় অন্ততঃ ৩-৪ দিন খেলে ওই কষ্টটা থাকবে না। এটা খেতে হবে ৫০ মিলিগ্রাম শুঁঠের গুঁড়ো মিশিয়ে। এটা খাওয়ার পর অল্প গরম একটু মিছরির জল খেতে হবে।

৩। স্নায়ুপীড়ায়— এই রোগটির অথস্বা কি হয় তা এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ডে অল্পবিস্তর বলা হ'য়েছে। এখানেও সংক্ষেপে একটু ব'লে রাখি, ভ্রূ নাচা, হাত-পায়ের ভিতরের স্নায়ু ঝিন্ ঝিন্ করা, মাঝে মাঝে হাতে পায়ে খিল ধরা, লিখতে ব'সে কিছু পরেই কব্জি ও কনুইয়ে অসাড় ভাব হওয়া, এগুলি স্নায়ুদৌর্বল্য বা স্নায়ুগত বাত বিকারের জন্য। এসব ক্ষেত্রে ২৫ মিলিগ্রাম আফিং আর একটু দুধ মিশিয়ে পরে একটু মিছরি খেতে হবে। ২।৩ দিন পরই ওটা ক'মে যাবে।

৪। কটি বাতে— এ বাত বিকারটি পিত্ত-শ্লেষ্মা প্রকৃতির লোকের মধ্যেই দেখা যায় বেশী। এদের আকৃতি-প্রকৃতি কেমন হয় তা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত ক'রে উল্লেখ করা হ'য়েছে। তবুও সংক্ষেপে বলি—এঁদের দেহ দোহারা তো হবেই বরং স্থূলতাই পেয়ে থাকে। মিষ্টি, লবণ, ঝাল এঁদের সমান প্রিয়। এঁরা বেশী তেতো (তিক্ত) পছন্দ করেন না। এঁদের কটির মধ্যস্থল প্রায়শই এমন সেঁটে ধরে যে, উঠতে বসতে বেশ কষ্ট হয়। এঁরা যদি প্রত্যহ সকালে কিম্বা সন্ধ্যায় ২৫ মিলিগ্রাম আফিং ২।৪ চা-চামচ দুধ ও একটু মিছরির গুঁড়োসহ খান, এবং এই গ্রন্থে লিখিত পথ্য গ্রহণ করেন, তবে শীঘ্রই এ রোগের হাত থেকে রেহাই পাবেন। না হ'লেও কষ্ট আর থাকবে না।

৫। অন্ত্রজ বায়ুগত ব্যথায়— প্রচলিত বৈদ্যকভাষায় একে বলা হয় আন্ত্রিক শূল; পুরনো আমাশা, ভিতর বলিতে অর্শ, অম্লপিত্ত রোগ থাকলে অন্ত্রের খাঁজে খাঁজে কিম্বা একেবারে জড়িয়েও বেশ ব্যথা ওঠে, মনে হবে এই শূল রোগটি কলিক পেন (colic pain)। আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় কলিক পেনের মূল স্থান যকৃৎ প্লীহার কেন্দ্রস্থল। এই শূল দেখা দিলে সারতে বিলম্ব হয়, কারণ অনেকের অন্ত্রে ক্ষত দেখা দেওয়ার পরও হয়। তা যাই হোক্, সকালে কিম্বা বৈকালে কিছু খাওয়ার পর ঈষদুষ্ণ বার্লিজলসহ ২৫ মিলিগ্রাম আফিং মিশিয়ে খেলে এবং এই রোগের ক্ষেত্রে যে পথ্য গ্রহণ করা উচিত তা গ্রহণ ক'রলে নিশ্চয় উপশম হবে।

৬। যকৃৎ শূলে— যতক্ষণ খালিপেটে ততক্ষণ ভাল; যেই একটু ভারী খাবার পেটে প'ড়লো (লঘু ও কোন তরল জিনিস খেলে হয় না) অমনি লিভারে ব্যথা। এ রোগের কষ্ট অসহ্য, এঁরা তৎক্ষণাৎ ২৫ মিলিগ্রাম আফিং ঈষদুষ্ণ গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তৎক্ষণাৎ ব্যথাটার উপশম হবে। কিন্তু নিয়মিত পথ্যের মাধ্যমে কিছুদিন থাকলে ওটা নিরাময় হবে।

৭। পাথুরী রোগে— প্রথম প্রথম এইভাবে লক্ষণ প্রকাশ পায়—মাঝে মাঝে প্রস্রাবের ধারাটা ২।৩।৪ ভাগে বিভক্ত হ'য়ে বের হয়, লিঙ্গমূলে ব্যথা বা সেঁটে ধরা, কোমরে ব্যথা, থেমে থেমে প্রস্রাব, এসব দেখা দিলে প্রত্যহ ২৫ মিলিগ্রাম আফিং

মিছরির জলসহ খেতে হবে। কয়েকদিন খেলে এ অসুবিধেটা আস্তে আস্তে চ'লে যাবে।

৮। **অনিদ্রায়—** খুব অস্বস্তি হয় এ রোগে; কেন হয়, কত বয়সে হয়, কোন্ কোন্ রোগের পরিণামে বা প্রতিক্রিয়ায় হয়, সেগুলি বিস্তৃত ক'রে এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে বলা হ'য়েছে। সে যে কারণেই হোক্; সন্ধ্যার পর ২৫ মিলিগ্রাম আফিং একটু দুধে মিশিয়ে খেলে ওটা চ'লে যেতে পারে, তবে কুলেখাড়া মূলের রস ৩।৪ চামচ মিশিয়ে খেলে নিশ্চিত নিদ্রা আসে। কোন কোন প্রাচীন বৈদ্যের ব্যবস্থা, কাঁচা হলুদের রস এক চামচ মিশিয়ে খেলেও নিদ্রা আসে। আর একটা কথা জানিয়ে রাখি—কুলেখাড়ার কাঁচা মূল না পেলে শুকনো (শুষ্ক) মূল ৫ গ্রাম আধঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর একটু থেঁতো ক'রে ৪ কাপ জলে সিদ্ধ করার পর আন্দাজ এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সেই জল দিয়ে ঐ আফিংটা খেলে অনিদ্রা দূর হয়।

৯। **শ্লেষ্মাপ্রধান পাণ্ডুরোগে—** এই রোগটির লক্ষণগুলি এমনভাবে প্রকাশ পায় যে, আয়ুর্বেদীয় বৈদ্যগণের দৃষ্টিতে তা পৃথক পৃথক, কিন্তু এ্যানিমিয়া এই একটি মাত্র পরিভাষায় যাঁরা এটাকে ব্যক্ত করেন, সর্বজনীন পরিভাষায় বৈদ্যগণ তা নিরূপণ করেন না। অথচ রক্তাল্পতা নামক তথাকথিত পরিভাষা ব্যবহার ক'রতেও তাঁরা কুণ্ঠিত নন।

তা যাই হোক্, শ্লেষ্মপ্রধান পাণ্ডুরোগে একমাত্র এই আফিং ২০ মিলিগ্রাম, আদার রস ২৫।৩০ ফোঁটা ও অল্প মিছরির গুঁড়ো এক সঙ্গে মিশিয়ে খেলে ১ সপ্তাহের মধ্যেই উপকার বোঝা যায়। তবে আর একটা কথা জেনে রাখা ভাল, যখন আদার রস ব্যবহার ক'রতে হবে তখন রস করার পর একটু গরম ক'রে নিয়ে, ঠাণ্ডা হ'লে উপর থেকে ঐ পাতলা জলটুকুই নিতে হবে।

১০। **শ্বাসের টানে—** প্রচুর কফ জমে গিয়ে শ্বাসের মত হ'লে ১৫-২০ মিলিগ্রাম মাত্রায় (অগ্নিবল বিবেচনা ক'রে) ২০।২৫ ফোঁটা তুলসীর পাতার রস সহ খাওয়ালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফল পাওয়া যায়।

১১। **বমনে—** অজীর্ণের উপর খেয়ে বমন হ'তে থাকলে ১৫।২০ মিলিগ্রাম আফিং এবং ১৫।২০ ফোঁটা আদার রস (গরম ক'রে, ঠাণ্ডা হ'লে ছেঁকে) রসে মিশিয়ে খেলে বমিটাও বন্ধ হ'য়ে যাবে আর অজীর্ণটাও থাকবে না।

১২। **বহুমূত্রে—** এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে বহুবার এই রোগ সম্বন্ধে আলোচিত হ'য়েছে। এই ক্ষেত্র উপস্থিত হ'লে কর্পূর ১০।১৫ মিলিগ্রাম, জৈত্রীও ঐ ১০।১৫ মিলিগ্রাম এবং সমমাত্রায় আফিং (১০।১৫ মিলিগ্রাম) একসঙ্গে মিশিয়ে প্রত্যহ একবার, প্রয়োজন হ'লে দু'বার খেলে এই রোগ সাময়িকভাবে নিরাময় হয়, তবে খাওয়ার বিধিনিষেধ সর্বদা মেনে চ'লতে হয়।

১৩। **সর্দিগর্মিতে—** যদিও এই শিরোনামটি আধুনিক ভাষা কিন্তু এই নামটির দ্বারা শারীরিক যে অস্বস্তি হয়, সেটা অনেকেই জানেন। এক্ষেত্রে ২০।২৫ মিলিগ্রাম আফিং (সেটা অগ্নিবল বিবেচনা ক'রে) একটু মিছরির জলসহ খেলে একদিনেই উপকার পাওয়া যায়।

১৪। **রক্ত-আমাশয়ে—** এটা প্রবল আকার ধারণ ক'রলে শরীর কাঁটাসার হয়। সেক্ষেত্রে ১৫।২০ মিলিগ্রাম মাত্রায় (সরিষা প্রমাণ) নিয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ খয়ের (খদির) মিশিয়ে জল দিয়ে মেড়ে খেতে দিলে ওটা আরাম হবে, তবে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক-

গণের অভিমত হ'লো যে, বৃদ্ধ ও বালকের রক্তামাশা যতশীঘ্র সম্ভব বন্ধ করা উচিত, তবে এসব ক্ষেত্রের মাত্রা খুবই হিসেব ক'রে দিতে হয়।

১৫। শোথে— মাত্রামত আফিং নিয়ে সমপরিমাণ (১৫।২০ মিলিগ্রাম) অর্থাৎ ১৫।২০ মিলিগ্রাম জায়ফল ও সোহাগার খৈ মিশিয়ে গাঁদাল পাতার রসে মেড়ে ২।৪ চামচ দুধ মিশিয়ে প্রত্যহ একবার অথবা প্রয়োজনবোধে দু'বার খেতে হবে। এ সময়টা লবণ বন্ধ রাখলে ভাল হয়।

১৬। শুক্রধারণের অসামর্থ্যে— এটি শুক্রবহ স্রোতের রোগ, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দেহে এ স্রোত আছে। মানসিক উত্তেজনার কোন কারণ ঘটলেই (অবশ্য যৌন সম্পর্কীয়) তখনই শুক্রক্ষরণ হ'য়ে যায়। এক্ষেত্রে ১৫।২০ মিলিগ্রাম আফিং সামান্য একটু দুধসহ খেলে (প্রত্যহ একবার ক'রে) শুক্রধারণের সামর্থ্য বেড়ে যাবে। তবে দীর্ঘদিনের ব্যবহারে সেটা অভ্যাসে দাঁড়ায়, সেটা বিবেচনা ক'রে চ'লতে হবে।

১৭। অঙ্গ মর্দনে— যাকে বলে গা-হাত-পা কামড়ানো বা চিবানো, সাধারণতঃ এটা পিত্তশ্লেষ্মার বিকারে হয়, তখন ১০।১৫ মিলিগ্রাম আফিং (স'রষে প্রমাণ) নিয়ে ১০।১৫ ফোঁটা আদার রসে মিশিয়ে খেলে দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই ওটা ক'মে যায় (তবে আদার রস গরম করার পর ঠাণ্ডা হ'লে সেটা থেকে নিতে হবে)।

১৮। একশিরা রোগে— এটাকে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগও বলা হয়। এই রোগটির আশ্রয়স্থল প্রথমে কুঁচ্‌কিতে, পরে ওই অন্ত্র নীচে নেমে কোষকে ফোলায়। আয়ুর্বেদের চিন্তাধারা হ'লো—অন্ত্রগুলিতে বায়ু কুটিলভাবে কুণ্ডলী হ'য়ে এদিক-ওদিক ক'রতে ক'রতে প্রথমে কুঁচ্‌কিতে ব্যথা, ক্রমশঃ সেই বায়ুরই বিকারে কোষে যন্ত্রণা হয়, আওয়াজ হয়, এই সময় ১৫।২০ মিলিগ্রাম (সরষে প্রমাণ) আফিং ২০।২৫ ফোঁটা আদার রসের সঙ্গে প্রত্যহ একবার অথবা প্রয়োজনবোধে দু-বার খেলে ওটার উপশম হয়।

১৯। নিজের ইচ্ছাশক্তির উপর প্রভুত্ব আনতে— যাকে বলে Self confidence আনতে অর্থাৎ মানুষের সৎ সঙ্কল্পই হোক্ আর অসৎ সঙ্কল্পই হোক্, সেটা সফল করার ইচ্ছা সকলেরই থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু অপুষ্ট মনোবলের জন্য প্রায় ক্ষেত্রেই ইচ্ছাশক্তির সাফল্য লাভ হয় না, এক্ষেত্রে ভারতীয় যোগিদের একটি গুপ্ত প্রক্রিয়া আছে, সেটি হ'লো—নিয়তই একটু মাত্রামত আফিং খাওয়া (ঐ ২৫।৩০ মিলিগ্রাম) কিন্তু মাত্রা ওঁরা বাড়ান না, প্রত্যহই সকাল বা সন্ধ্যায় এককাপ দুধের সঙ্গে উপরিউক্ত মাত্রায় ওঁরা রোজই খেয়ে থাকেন। তাঁদের বিশেষ অভিমত, এর দ্বারা বিশেষ ইচ্ছাশক্তি কিছু-দিনের মধ্যেই তার উপর প্রভুত্ব ক'রতে থাকে।

এভিন্ন যাঁরা দুর্বল স্বাস্থ্য অথচ কর্ম করবার প্রবল ইচ্ছা, এ'রাও প্রতিদিন একটি নির্ধারিত মাত্রায় যদি দুধসহ আফিং খান তাহ'লে তাদের শরীর ও মানসবল অচিরেই বৃদ্ধি পাবে।

বাহ্য ব্যবহার

২০। বাতে— ২৫।৩০ গ্রাম তিলের বা সরষের তেলের সঙ্গে এক গ্রাম আফিং মিশিয়ে নিতে হবে এবং ব্যাধিতস্থানে মালিশ ক'রতে হবে, এমন কি এর দ্বারা স্নায়ু-শূল, আঘাতের ব্যথা এবং মুচ্‌কে যাওয়া ব্যথারও উপশম হবে।

২১। হুপিং কাসিতে— একে ঘুঙ্‌ড়ি কাসিও বলে। এই কাসি হ'লে আফিং মেশানো এই তেল মেরুদণ্ডে কিছুক্ষণ মালিশ ক'রলে অল্পক্ষণের মধ্যে কিছুটা উপশম

হবে, কয়েকদিন এইভাবে মালিশ ক'রলে শিশু বা বৃদ্ধের যেকোন বয়সের ঘুংড়ি কাসির উপশম হয়।

২২। দাঁতের যন্ত্রণায়— দাঁত ক্ষ'য়ে গিয়েছে, ঠাণ্ডা জল লাগলে দাঁত কন্‌কন্‌ করে (অবশ্য দাঁত না নড়লে কখনও হয় না), সেক্ষেত্রে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে তৈরী করা আফিং মেশানো তেল তুলিতে ক'রে দাঁতের গোড়ায় লাগিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তবে একটা কথা জেনে রাখা ভাল যে—ওই সময় যে লালাটা বেরোবে সেটা ফেলে দিতে হবে।

২৩। কানের যন্ত্রণায়— যেখানে কর্ফাবিকারে কানের স্রোতপথে বিকার হয় সেক্ষেত্রে ওইভাবে আফিং মেশানো তেল গরম ক'রে সেই তেলটা তুলিতে ক'রে লাগিয়ে দিলে কান কট্‌কটানি বা যন্ত্রণার লাঘব হবে।

২৪। যন্ত্রণাপ্রদ অর্শে— চালের গুঁড়োর সঙ্গে ওই আফিং মেশানো তেল মিশিয়ে অল্প গরমজল দিয়ে মেখে অর্শের বলিতে লাগাতে দিতেন প্রাচীন বৈদ্যরা। তাঁদের অভিজ্ঞতা হ'লো, এর দ্বারা ওই জ্বালা যন্ত্রণার লাঘব হয় এবং ফুলোটাও ক'মে যায়।

আফিং-এর ক্রিয়াকারিত্ব শক্তিকে প্রচার করা হ'লো, এখন এর অনুশীলক যাঁরা তাঁদের উত্তরসূরী হ'য়ে আমরা এখন তারই মৌতাতে ঘাড় গুঁজে ব'সে গুলিখোরের মত হাঁটুর মালায় মাত্‌গুড় (ঝোলা গুড়) লাগিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছি, আর মাঝে মাঝে জিগির দিয়ে উঠছি—"আমাদের সব আছে"। আর ওদিক থেকে দৈববাণী হ'চ্ছে "নেই কেবল তুমি-ই"।

CHEMICAL COMPOSITION

Papaver semniferum

1. Morphine 2. Papaverine 3. Reticuline 4. Prophyroxine 5. Hydrocotarnine 6. Narcotine 7. Narcotoline 8. Gnoscopine 9. Narcein 10. Nornarceine 11. Xanthaline 12. Laudanidine 13. Laudanine 14. Laudanosine 15. Codamine 16 Morphine 17. Codeine 18. Neopine 19. Thebaine 20. Meconidine 21. Lanthopine 22. Protopine 23. Cryptopine.

তণ্ডুলীয়ক [নটে শাঁক]

জানেন, আমার প্রথম জীবনটায় খুড়ো আর গজা পণ্ডিতই জুড়ে ব'সেছিল! আজ এই তন্ডুলীয়ক লিখতে বসে সেইটাই মনে প'ড়ছে।

একদিন খুড়ো এসে সংস্কৃত ঝেড়ে ব'লে ব'সলো—"অদ্য গৃহে তন্ডুলং নাস্তি"। আমারও ঝটপট উত্তর—তাহ'লে খুড়ীকে "ভাতে-ভাত ক'রতে বলো।" খুড়োর সেই তণ্ডুল আর আমার আজকের বৈদ্যক জীবনের তণ্ডুলীয়ক শ্রুতিধ্বনিতে এক হ'লেও বাস্তবে কি এক? এই ফের ভাঙ্গতে গেলে এ যুগে আমাদের মত বাঁজা সংস্কৃতের ধারক যাঁরা, তাঁদের কাছে উত্তর পাওয়াটা বোধ হয় দুর্ঘটই হ'বে।

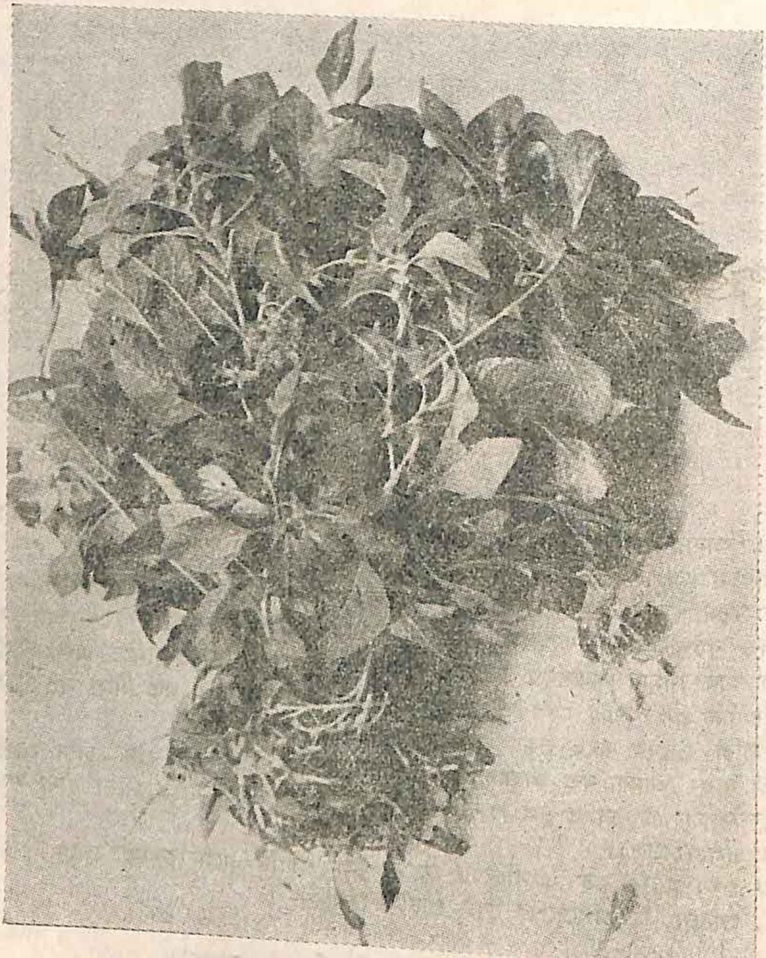
তা যাক্, আমরা যত আচরণ, যত ভাষার ব্যবহার করি, তার প্রায় চৌদ্দ আনাই গতানুগতিক। এই যে তণ্ডুল শব্দটি, একে কেবল জানি খোসা ছাড়ানো ধান্য শস্য, অর্থাৎ চাল (চাউল)।

এ প্রশ্ন মনেও তো এসেছিলো যে, তণ্ডুল শব্দটি এলো কোথা থেকে? তার উত্তরে, পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের সেই প্রাচীন শ্লোক—

"তুষেণাপি পরিভ্রষ্টো ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ"।

অর্থাৎ তণ্ডুল তখনই হয়, যখন সে তুষ পরিভ্রষ্ট হয়; তারপর আর তা থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, অর্থাৎ আর কলা বেরিয়ে গাছ হয় না। এর দ্বারা তার রূপান্তরিত চরিত্রের কথা জানা গেল বটে, কিন্তু এই নাম শব্দটি কোথা থেকে পাওয়া? সেটা খুঁজতে গেলেই দেখা যাচ্ছে এই 'তণ্ড' একটি বৈদিক সংজ্ঞানাম, ওটাতে উলচ্ প্রত্যয় যোগে তণ্ডুল নাম শব্দটির সৃষ্টি; আর এই তণ্ড মানে যার আবরণটা মায়া। যেমন প্রতিটি

চিত্তে বাসনার বীজ ওঠে ওই তণ্ড থেকে। এই তণ্ড থেকে মুক্ত হ'লেই বাসনা গেল। চিত্ত, মন দেহ সবই থাকবে কিন্তু তা থেকে আর কর্মবীজ, কর্মবাসনার অংকুর ওঠে না, কারণ সে তখন মায়ামুক্ত। যেহেতু ধানের খোসাকে ছাড়িয়ে দিলে সে যেমন নিরংকুর রূপ পরিগ্রহ ক'রলো, তখন সে শুদ্ধ প্রাণ-রক্ষকই হ'য়ে বেঁচে থাকবে আর প্রাণ বাঁচাবেও; কিন্তু অংকুরোদ্গম আর হবে না, অর্থাৎ নিজের বাসনার সম্বন্ধই ত্যাগ হ'য়ে গেছে; অবশ্য এই তণ্ড নামটি খুবই গূঢ় তত্ত্বার্থক।



Amarantus tristis

এখন প্রশ্ন এই তণ্ডুল নিয়েই কি তণ্ডুলীয়ক? কথাটা কিন্তু একদিকে সত্য; এই হিসেবে যে, তণ্ডুল সহ অর্থাৎ চাল সহ ব'লেই তণ্ডুলীয়ক, অর্থাৎ যার বীজ ক্ষেতে ছড়াতে তণ্ডুলের সাহায্য নেওয়া হয়। তাই তার নাম তণ্ডুলীয়ক। এর বীজ ক্ষুদ্রতর হ'লেও চড়াইপাখি তা খেয়ে নেয়, তাই ভাংগা চালের সংগে (যাকে আমরা

খুদ বলি) মিশিয়ে ক্ষেতে ছড়ালে চড়াই ঐ ভাঙ্গা চালগুলিই খায়, ওটার দিকে আর নজর পড়ে না, ওগুলি নিরাপদে থাকে। কয়েকটা দিন কেটে গেলেই ওর অঙ্কুর বেরিয়ে যায়, ঠিক যেন মায়ার আবরণে বাসনার বীজ। এই শাকের লোক-প্রচলিত নাম নটেশাক, এখানে দেখা যাচ্ছে চড়ুই পাখির জন্যে মায়া সৃষ্টি করে তণ্ডুল। এই তণ্ডুলীয়কের আরও দুটি বৈদিক নাম—তন্ডীর এবং মারিষ। এই মারিষ নামটি এসেছে মার্ষ থেকে, মার্ষদ মানে আর্য। সেই মার্ষ শব্দটি কালে মারিষ হ'য়েছে।

ভারতের মহাকবিরা তাঁদের কৃত নাটকে আর্য সম্বোধনে মারিষ ব'লেছেন (বিক্রম উর্বশীতে ১।১১ ও ১২ শ্লোক, মালতী মাধবে ৩।১৪ শ্লোক ও উত্তর রামচরিতে এবং সাহিত্য দর্পণের ৬।১৪৮ শ্লোকে, আর ১।৩-৪ শ্লোকে)। তণ্ডুলীয়ক যে মারিষ তা আজও ভারতের বহু প্রদেশে প্রচলিত। মারিষ যে আর্যদের ব্যবহার্য শাক এবং তার নাম যে তণ্ডির, তা আমরা পাই অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পে। সেখানে বলা হ'য়েছে—

> যাতে পন্থা প্রাবৃষেণ্যাঃ অরেণবঃ অন্তরিক্ষে।
> তণ্ডির ওজিষ্ঠো বহুলাভিমানঃ।
>
> (অথর্ববেদ বৈদ্যককল্প ৭৬।১৮৫।২২)

মহীধর এই সূক্তটির ভাষ্য ক'রেছেন—

> তণ্ডিরঃ তণ্ডুলীয়ক শাকঃ, স চ মায়াধূর্ত্তক ইব, তস্য উদয় কালোহি যদা প্রাবৃষেণ্যাঃ=প্রাক্ বর্ষাভ্যঃ, অবারিদঃ মেঘনাদো জায়তে, মেঘনাদোঽপি। স ওজিষ্ঠঃ, বহুলাভিমানঃ আত্মানং ভূমৌ বহুলং প্রকাশয়তি, যদা অন্তরিক্ষে অরেণবঃ ভান্তি তদৈব তণ্ডিরস্য পন্থা, জন্মকালঃ।

এই ভাষ্যটির অর্থ হ'লো—তণ্ডির অর্থাৎ তণ্ডুলীয়ক শাক, সেটি মায়াধূর্তকের মত, বর্ষার পূর্বে যখন বারিহীন মেঘের ধ্বনি ওঠে, অন্তরীক্ষে ধূলি থাকে না, তখন তণ্ডিরের (এই শাকের) উদয়কাল, এ নিজেকে ভূমিতে বহুল প্রকাশ করে। এটি বলিষ্ঠ।

বৈদিক সূক্তে পাই "তণ্ডির", আর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় পাই সেটি মেঘনাদও, তাছাড়া পাই, এই শাকটি বলকারক। এর জন্মকাল প্রাক্-বর্ষায়, এটি মাটিতে বহুল হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করার অভিমান করে, এবং লুণ্ঠিত বা লুটিয়ে পড়ে। এই লুটিয়ে বা নুটিয়ে পড়া থেকে তার প্রচলিত নাম "নটে" শাক হ'য়েছে। শাকটির বলকারক গুণ আছে।

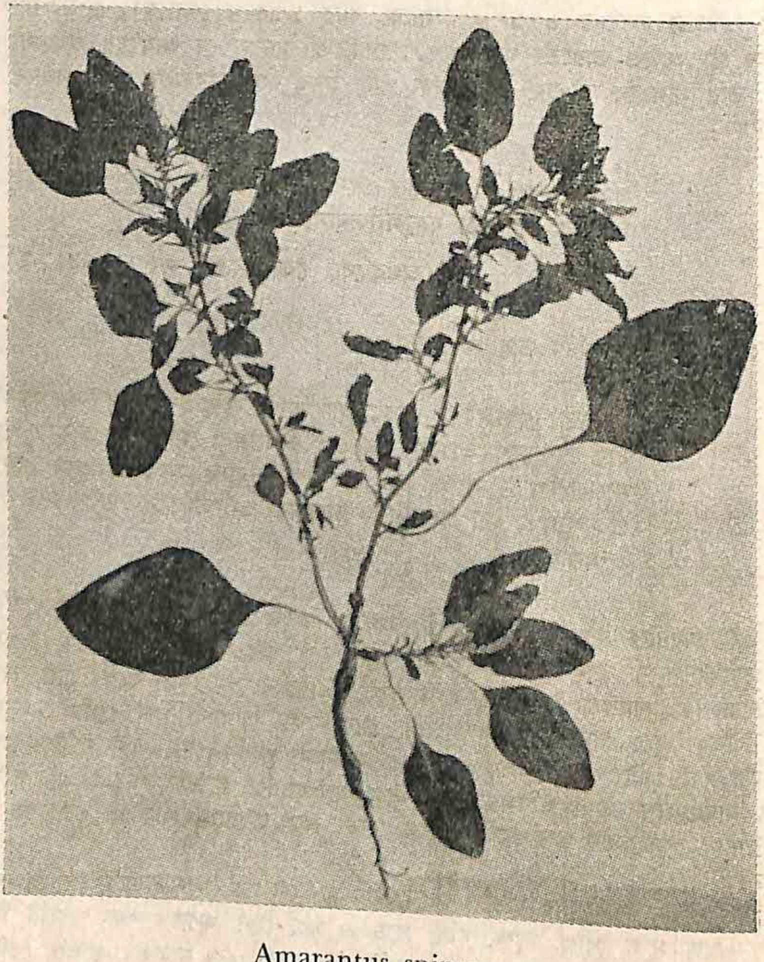
প্রাচীন মনু সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২২৬ শ্লোকে বলা হ'য়েছে যে, ব্রাহ্মণদের ভোজনকালে সূপ, শাক, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধু যেন থাকে। শাক শব্দটি কিন্তু কেবল পত্রশাক নয়, ভূমিজাত ক্ষুদ্রলতা, ডাঁটা ফল, ফুল এবং মূলও। এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হ'লো, অন্যান্য শাকে রোগ-কারকতা ঘটায় কিন্তু এই তণ্ডুলীয়ক শাক অর্থাৎ নটে শাক বলাধান করে। অনান্য শাক অল্পসিদ্ধ ক'রে জলটা ফেলে দিয়ে তারপর রাঁধতে হয়, কিন্তু নটে শাকের বেলায় তা ক'রতে হয় না। নটে শাক কেবলমাত্র আমাদের আহার্যের উপকরণ হিসেবেই উপযোগী তা নয়, এর ভৈষজ্য-যোগ্যতাও আছে; তাই চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটে এবং ভাবপ্রকাশে এর ওষধীয় প্রয়োগের উল্লেখ।

বৈদ্যকের নথি

এই শাক সম্পর্কে চরকে বলা হ'য়েছে—

রূক্ষো মদবিষঘ্নশ্চ প্রশস্তো রক্তপিত্তিনাম্।
মধুরো মধুরঃ পাকে শীতলস্তণ্ডুলীয়কঃ॥

(সূত্রস্থান ২৭ অধ্যায় ৭৪ শ্লোক)



Amarantus spinosus

অর্থাৎ তণ্ডুলীয়ক (শুধু পাতাগুলিই নয়) রুক্ষ (স্নেহশূন্য), মত্ততানাশক (মদ্যপানের বিহ্বলতা দূর করে) এবং বিষবিকার দূর করে। এর সর্বাপেক্ষা বড়গুণ রক্তপিত্তে প্রশস্ত। এভিন্ন সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ে ও বাগ্ভটের সূত্রস্থানেও নটে শাকের প্রকৃতি বিচারে এই একই অভিমত। তাহ'লেও নটে শাক সম্পর্কে চরকের

বক্তব্য বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করার আছে, ঐ সংহিতার বক্তব্যে আমরা একটা শব্দ পাই যে, নটে শাকে রূক্ষতা আছে বা রূক্ষতা নিয়ে আসে; আর একটি বক্তব্য হ'লো—এটি রক্তপিত্ত রোগে ব্যবহার ক'রলে অনুকূলই হবে। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন ওঠে, রূক্ষতা ব'ললে কি বোঝায়?

এর সাধারণ ব্যাখ্যায় মনে করা যায়—তৈল-চিক্কণতা যাতে নেই সেই রূক্ষ, কিন্তু তণ্ডুলীয়ক বীজে তৈল নেই, সেকি কথা? তৈলধর্মিতা না থাকলে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমই যে হয় না। তাই রূক্ষ শব্দটি দৃষ্টান্তমূলক করে বোঝানো হয়—

"প্রিয় দর্শনমপি রূক্ষং ভবতি গৃহং ধনবিহীনস্য"।

অর্থাৎ ধনহীন অবস্থা এলে সমগ্র বাড়িটাও রূক্ষ আর যারা প্রিয়জন তারাও রূক্ষ হয়। তাই তো প্রবাদ আছে—নিত্য অভাব, দেয় কে! তাই তারা তখন রূক্ষ। এর তাৎপর্য হ'লো, একের অভাবে সবই স্নেহহীন। স্নেহ বা তৈল থাকে আবরণে, রূক্ষতায় সেই আবরণ থাকে না। তণ্ডুলীয়ক মূল ও ডাঁটা এবং পাতায় যে ভৈষজ্য শক্তি, সেইটাই সংহিতাগ্রন্থে উক্ত হ'য়েছে। এই তিনটির মধ্যে এমন শক্তি আছে, যার দ্বারা রক্তবহ স্রোতের মূল কেন্দ্র যে যকৃৎ ও প্লীহা, সেখানে আবরক দ্রব্যের সংযোগে (আহার্যে ও পথ্যে) রক্তপিত্ত রোগের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু নটে শাকের রস বীর্য সেক্ষেত্রে স্নেহহীন ব'লেই আবরক হয় না, এইদিক থেকে সে রূক্ষ। অপরপক্ষে বলা হ'লো—রক্তপিত্ত রোগটি যখন রক্তবহ স্রোতে ধাতু বিকারের জন্যই দেখা দেয়, তখন ও স্থানটি তো স্নেহপিচ্ছিল—সর্বদা "সস্নেহং পিচ্ছিলঞ্চ কফান্বিতম্" (চরক/রক্তপিত্ত)—সেখানে যেকোন স্নেহধর্মী ঔষধ, পথ্য প্রয়োগ করা কি চিকিৎসকের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করে? তাই চরকের ইঙ্গিত পরিষ্কার যে, রক্তপিত্ত রোগে রূক্ষ আহার্য খৈ, মুথার শাঁস, কেশুর, দারুচিনি প্রভৃতি যেমন ভাল তেমনি নটে শাকও ভাল।

তা যাক্, এখন প্রসঙ্গটা হ'লো, এই বৈদিক নটে ভেষজটিকে আমরা আহার্যে যেমন গ্রহণ করেছি, তেমনি ভেষজ দ্রব্য হিসেবেও যে সুপ্রাচীনকাল থেকে বৈদ্যগণ ব্যবহার ক'রে আসছেন, সেইটুকু জানাই।

নব্যের সমীক্ষায়

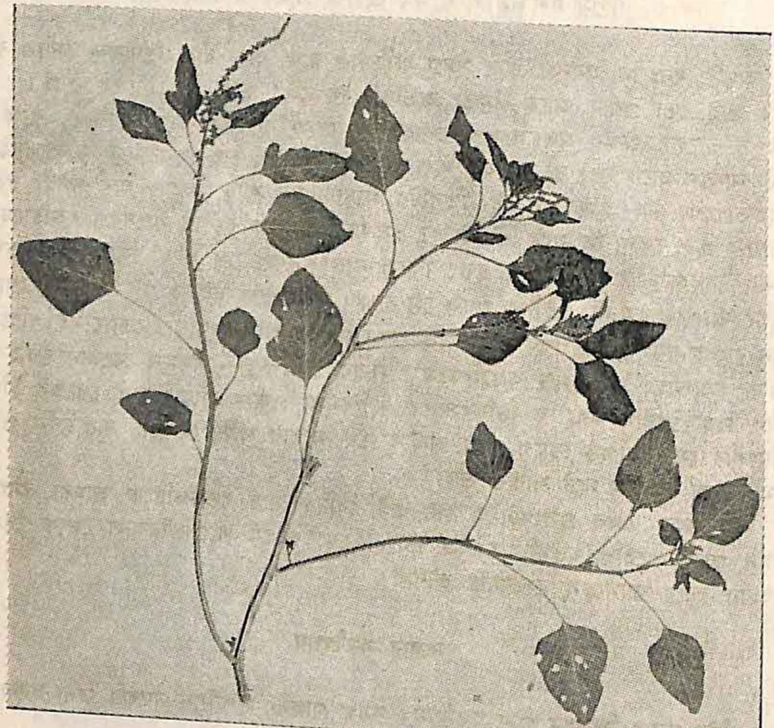
এটির মূলে স্নিগ্ধত্ব গুণ বর্তমান। সমগ্র গাছটি সর্পবিষ নাশের জন্য ব্যবহারের উপদেশ। শিকড় বিশেষতঃ শূলনাশক।

১। এর শিকড় গণোরিয়ার স্রাব প্রতিরোধ করে।
২। এর শিকড় বেটে ফোড়া ও বাগীতে প্রলেপ দিলে শীঘ্র ফেটে যায়।
৩। কোন কোন প্রদেশে এটা অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে অধিক রজঃস্রাবে ব্যবহৃত হয়।
৪। মূলের রস শ্বেতপ্রদরে ব্যবহৃত হয়।
৫। স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি করে আর সেজন্যই এটাকে ডালের সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে দুধ বাড়াবার জন্য গরুকে খেতে দেওয়া হয়।

পরিচিতি

প্রথম বক্তব্য হ'লো—এই ভেষজটির বর্ণনা লিখতে বসে ভাবছি, ডায়েরিটা কার নামে লিখবো!

বেদ সূক্তে দেখা যাচ্ছে, তণ্ডুলীয়ক ও তণ্ডির, আবার তারই আর একটি নাম মারিষ; আবার সংহিতার কালে এসে যেসব নিঘণ্টু গ্রন্থ রচিত হ'য়েছে তার কোন কোনটিতে জলতণ্ডুলীয় বলেও আরও একটি ভেষজের উল্লেখ, যার প্রচলিত নাম কণ্ঠট্। আর একটা কথা এখানে ব'লে রাখি—স্বর্গতঃ বিরজাচরণ গুপ্ত মহাশয় "বনৌষধি দর্পণ" নামক গ্রন্থে লিখেছেন—কাঁটানটের সংস্কৃত নাম মারিষ, তণ্ডুলীয়ক যে কাঁটানটে নহে, মারিষের সার্থক নামগুলির অর্থ চিন্তা ক'রলেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। মারিষ "দীর্ঘনাল" নাম শব্দের দ্বারা এইটুকু প্রতীয়মান হয় যে, কাঁটানটে পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ (লম্বা) হয়, অন্য নটেশাকের তা হয় না। অপরপক্ষে বাংলায় নটে



Amarantus viridis

শাকের নাম অনেক, আকৃতিভেদও বেশ, যেমন গোব্‌রা নটে, চাঁপা নটে, ঘণ্টী নটে, চিরু নটে, লাল নটে, টুনটুনি নটে, বন নটে, বাঁশপাতা নটে প্রভৃতি; কিন্তু তণ্ডুলীয়ক শব্দে চাঁপা নটে ভিন্ন অন্য নটেকে নির্দিষ্ট করা সমীচীন হবে না; কারণ এস্থলে আধারার্থে আধেয়ের ব্যবহার।

ন'টে শাকের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, তবুও বলি মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়েও বেড়ে চলে, আবার খাড়া হ'য়ে বেড়েও ওঠে। এত রকমের নটে শাক আছে এবং তার আকৃতি-পার্থক্যও আছে; সেটা কিন্তু সাধারণ মানুষের (উদ্ভিদবিজ্ঞানী ভিন্ন) চোখে ধরা পড়ে না, সুতরাং পরম্পরায় প্রচলিত যে চাঁপানটে, তার বোটানিক্যাল্ নাম Amarantus tristis Linn. ফ্যামিলি Amarantaceae.

ঔষধ ও আহার্য হিসেবে ব্যবহার হয় সমগ্র গাছ। এই গণের আর একটি গাছ, যেটা বৈদিকদেরও নজরে এসেছিলো, সেটার নাম হ'লো "মারিষ"। তার অপর একটি নাম তণ্ডির। এই গাছের পাতা সাধারণ নটে শাকের পাতারই মত; কিন্তু গাছের পাতার গোড়ায় এত কাঁটা হয় যে গরু-ছাগলেও গাছে মুখ দেয় না, কাণ্ড ১-১½ ফুট লম্বা, এর পাতার গোড়া থেকে ছোট ছোট বহু শাখা বেরোয়, সেখানে ছোট বড় বহু কাঁটা হয়। বর্ষজীবী সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম, বাংলা ও দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলের আগাছা। সাধারণতঃ পতিতজমি ও রাস্তার ধারে হ'য়ে থাকে, তবে জল-জমা বা জল-বসা জমিতে বাঁচে না, বারো মাস গাছ পাওয়া গেলেও সাধারণতঃ প্রাক্-বর্ষায় চারা বেরোয়, বর্ষার পরে ফুল ও বীজ হয়। এটির বোটানিক্যাল্ নাম Amarantus spinosus Linn. ফ্যামিলি Amarantaceae.

ঔষধার্থে ব্যবহার হয় সমগ্র গাছ (পাতা, ফুল, মূল ও বীজ)।

পূর্বে চাঁপা নটের যে আলোচনা করা হ'য়েছে, তার প্রজাতিগুলির বোটানিক্যাল্ নাম জানাচ্ছি—বাঁশপাতা নটে (Amarantus Lanceolatus), লাল বাঁশপাতা নটে (Amarantus atropurpureus), গোবরা নটে (Amarantus lividus), সাদা নটে (Amarantus blitum var oleracea) লাল শাক (Amarantus gangeticus), টুন্‌টুনি নটে (Amarantus fasciatus), চির্‌নটে (Amarantus polygomous), ঘেণ্টি নটে (Amarantus tenuifolus), বন নটে (Amarantus viridis).

আর একটি তথ্য জানার আছে—বৈদ্যকগ্রন্থে জলতণ্ডুলীয় ব'লে একটি ভেষজের ব্যবহার আছে, এই জলতণ্ডুলীয় সম্পর্কেও একটি ভ্রান্তি আছে, এটা আমাদের মধ্যে কতদিন চ'লছে জানা যায় না, তবে যেটি তণ্ডুলীয়ক ব'লে চলছে, সেটি পুকুরের ভাসমান একটি গাছ, এর তণ্ডলীয় নামের উৎস কোথায়—তা খুঁজে পাওয়া যায় না, যে গাছটির ব্যবহার হয়—সেটির বোটানিক্যাল্ নাম Jussiaea repens Linn. তবে এই জলতণ্ডুলীয়ক সার্থক নামটা দেখতে পাওয়া যায়—যার বোটানিক্যাল্ নাম Potamogeton indicus. এই গাছটি পুকুরে বা ঝিলে জন্মে, হেমন্তকালে পিপুলের মত ফল হয় এবং সেটিতে যে দানা হয়—সেগুলি তণ্ডুলবৎ। ঔষধার্থে ব্যবহার হয় সমগ্র গাছ। এরই আর একটি নাম কঞ্চট, এই নামকরণের তাৎপর্য হ'লো—কং=জলং চটতি।

ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় সমগ্র গাছ।

লোকায়তিক ব্যবহার

আমাদের একটা প্রাচীন কথা আছে—"নটে প্যাট আড়াই-এ, সজ্‌নে বারো মাস"। এদের অনেক প্রজাতি আছে, এই শাকটি সম্পর্কে চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট এইসব গ্রন্থে খুব যত্নপূর্বক অনুধাবন ক'রেছেন। প্রথমেই এ সম্পর্কে হয়তো খুবই আশ্চর্য মনে হবে যে, শাকে স্নেহ নেই—এ কথাটা বলার উদ্দেশ্য কি? শাক তো একটা সাধারণ শব্দ, এখানে বক্তব্য হ'চ্ছে, শাকের পত্রাংশে এবং মূলাংশে স্নেহ নেই, অন্যান্য অংশে আছে; কেন বীজেই তো আছে, কারণ বীজে যদি তেল না থাকতো, তাহ'লে তো অঙ্কুরোদ্‌গমই হ'তো না। এই তণ্ডুলীয় শাকের পত্রের এবং মূলের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ পেয়েছেন যে, অন্যান্য শাক রসবহ স্রোতে প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু তণ্ডুলীয়ক করে রক্তবহ স্রোতে। প্রশ্ন ওঠার পরে লোকে প্রশ্ন করেন যে, মুখ দিয়ে তো

খেলাম; সে কথার উত্তর তো আমরা পূর্বেই দিয়েছি, যে পারয়াগুলোকে আপনি তাড়িয়ে দিলেন, তারপর যখন তারা এলো, তখন যে-যার খোপে গিয়ে ঢুকে পড়ে। তেমনি আমাদের আহার্য ও পথ্য হিসেবে যেসব দ্রব্য গ্রহণ করি, সেটা এক পথ দিয়ে প্রবেশ ক'রলো সত্যি কিন্তু যার যেখানে কাজ সে সেখানে গিয়ে তার প্রভাব বিস্তার ক'রবে। যেমন মূত্রকর ঔষধ খেলে প্রস্রাব হবে, হৃদ্‌দৌর্বল্য নাশের ওষুধ খেলে সে সেটা দূর ক'রবে। সে যে কোন পদ্ধতির চিকিৎসা করুন না কেন, সে ফললাভ হ'য়েই থাকে; এমন-কি তুক্‌তাকেও তো উপকার হয়ে থাকে—এটা দ্রব্যের একটি স্বতন্ত্র প্রভাব অর্থাৎ তার ক্রিয়াটি কোথাও হবেই।

কোন রকমেরই শাক রক্তপিত্ত রোগে পথ্য নয়। কিন্তু তণ্ডুলীয়ের ক্ষেত্রে তাঁরা ব'লেছেন—যেমন খই মুথোর শাঁস (cyperus rotundus) কেশুর, এগুলি যে যার নিজের প্রভাবে রক্তবহ স্রোতে কাজ করে, এই চাঁপা নটে অর্থাৎ তণ্ডুলীয় শাকও তেমনি। অতএব শাকটি মূল্যবান শাকের পর্যায়ে পড়ে। সুপ্রাচীনকাল থেকে তাঁদের গ্রন্থেও যেমন এর গুণাবলী লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন, তেমনি লোকবৈদ্যগণও তার উপযোগিতাকে কম কাজে লাগান নি।

১। **সর্দিতে—** ঋতুগত কারণে নাক দিয়ে ঝরঝর ক'রে পড়া, মাথা ভার হওয়া—এই উপসর্গ উপস্থিত হ'লে এই চাঁপা নটের মূল থেঁতো ক'রে বা বেটে, নিংড়ে সেই রসটাকে অল্প গরম ক'রে তার থেকে ২ চা-চামচ নিয়ে দিনে ২-৩ বার খেতে হ'বে। এটাতে এই উপকার পাওয়া যাবে যে, সর্দি যদি গাঢ় থাকে তো সেটা পাতলা হয়ে বেরিয়ে যাবে আর পাতলা থাকলে সেটাও বেরিয়ে যাবে। তবে একটা কথা বলে রাখি—মারিষ আর তণ্ডুলীয়ক দু'টি পৃথক, অবশ্য একই গণ (genus) কিন্তু প্রজাতি (species) পৃথক। এই শব্দটি সংস্কৃতে বড় ধাঁধার সৃষ্টি ক'রেছে—কারণ এটা একটা শাককেও বলা হয়, আবার ভগ্নিপতিকেও বোঝায়, এছাড়া আচার্য মনিবটিকেও মারিষ বলা হয়।

২। **অনিয়মিত ঋতুস্রাবে—** যেসব রমণীর মাসিক ঋতুস্রাব ৪ দিনের পরেও চ'লতে থাকে—ঝির ঝির করে না, রীতিমত হ'চ্ছে; কারও কারও ২-৩ দিন পরে থেমে গেল আবার কয়েকদিন বাদে দেখা গেল। এইসব ক্ষেত্রে তাঁরা নটে শাকের মূল চাল ধোয়া জল দিয়ে বেটে সেটাকে ছেঁকে ওই রসটা একটু গরম করে ৩-৪ চা-চামচ মাত্রায় দুই-চার দিন খেলে এটার উপশম হবে এবং কিছুদিন খেলে ওটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এটা কিন্তু খুব প্রাচীন মত। অনেক লোকবৈদ্য এই ক্ষেত্রে কাঁটা নটের মূলের রস খেতে দিয়ে থাকেন।

৩। **অর্শরোগে—** বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মার যে দোষটিরই প্রাধান্য থাকুক না কেন, নটেশাকের তরকারী খেলে নতুবা শাকের রস ৩-৪ চা-চামচ অল্প গরম ক'রে দু'বেলা খেলে দাস্ত তো পরিষ্কার হবেই, উপরন্তু অগ্নিবলটা বাড়'বে।

৪। **বাত-শ্লেষ্ম কাসিতে—** এক্ষেত্রে সকালে ও সন্ধ্যায় কফ উঠে গেলেই শান্তি, সেক্ষেত্রে নটে শাকের রস ৩-৪ চা-চামচ অল্প গরম ক'রে দু'বেলা খেলে কয়েকদিনের মধ্যেই কফটা সরল হয়ে উঠে যাবে ও বাতশ্লেষ্ম কাসিটার উপশম হবে।

৫। **রক্তপিত্তে—** রক্তপিত্তের প্রথমাবস্থায় গলা সুড়সুড় করে, কাসির সঙ্গে অল্প অল্প রক্ত বেরোয়; যাঁরা আবার বেশী পান খেতে অভ্যস্ত তাঁরা এই রক্ত পড়াটা হঠাৎ ক'রে বুঝতে পারেন না, অনেক সময় ভ্রমের সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা রক্তবহ স্রোতটা দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রথমাবস্থায় নটের মূল ১০ গ্রাম ৪-৫ চা-চামচ চাল ধোয়া জলে বেটে

ওটাকে ছেঁকে সেই রসটা সকালের দিকে খেতে হবে। হঠাৎ ক'রে এটা সারতে চায় না, সেজন্য দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে হয়।

৬। **শ্বেত বা রক্তপ্রদরে—** এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে। এ দুটোর যেকোন একটি উপস্থিত হলেই নটের মূলের রস ২ চা-চামচ মাত্রায় নিয়ে আতপ চাল ধোয়া জল ১ কাপের সঙ্গে সকালে ও বৈকালে কয়েকদিন খেলে স্রাবটা নিয়ন্ত্রিত হবে, আঁশটে গন্ধটাও থাকবে না। কাঁটা নটের Amarantus Spinosus) মূলের রসও এক্ষেত্রে ভাল কাজ করবে। এগুলি বহু প্রসিদ্ধ যোগ।

৭। **অন্নদ্রবশূলে—** এ শূল সম্পর্কে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডেও আলোচনা হ'য়েছে এবং এ খণ্ডেও প্রসঙ্গক্রমে তা বলা হ'য়েছে। তবুও একটু বলি— পথ্যাপথ্য বিচার না ক'রে আহার গ্রহণ, অনিয়মিত উপবাস, অন্নভোজনের সাধারণ নিয়ম-কানুন মেনে না চলার ফলে সাধারণতঃ এই শূলের কবলে পড়তে হয় এবং এটি আহার জীর্ণ হওয়ার কালেই আরম্ভ হয়। এক্ষেত্রে নটের মূল ৫ গ্রাম ৩-৪ চা-চামচ চাল ধোয়া জলে বেটে ওটাকে ছেঁকে সকালে ও বৈকালে খেলে ৩-৪ দিনের মধ্যে উপশম হবে, বেশ কিছুদিন খেলে ওটা সেরে যাবে।

৮। **দাহে—** শরৎকাল পিত্তবৃদ্ধির সময়, এই শরৎকাল ছাড়াও অনেকে দেহে জ্বালা অনুভব করেন; এক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের চিন্তাধারা—শরীরে পিত্তবৃদ্ধি হয়েছে এবং বায়ু এসে ওর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোন জায়গায় আগুন লাগলে দেখা যায়, সেখানে বায়ু ছুটে আসে, সুতরাং আগুনের সঙ্গে বায়ুর খুবই নিকট সম্পর্ক; সেইরকম আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে পিত্তরূপী অগ্নি ও বায়ুর সম্পর্ক। এই অবস্থায় যাঁরা পড়েন, তাঁরা যদি নটে শাকের রস ৩-৪ চা-চামচ অল্প একটু গরম ক'রে সকালে ও বৈকালে দু'বেলা খান, তাহলে পিত্তবৃদ্ধিটা কমে গিয়ে দাহটার শান্তি হবে।

৯। **শোষ রোগে—** আমাশয়ে স্নেহদ্রব্য বেশী পড়লে শোষ উৎপন্ন হয়, যেমন তেল, ঘি, মাখন প্রভৃতি বেশী খেলে পিপাসার উদ্রেক হয় আর তা থেকেই মূত্রকৃচ্ছ্রতাও আসে। দীর্ঘদিন এভাবে চলতে থাকলে শেষে শোষ রোগ এসে জুটে যায়। এক্ষেত্রে নটে শাকের রস ৩-৪ চা-চামচ অল্প একটু গরম ক'রে দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে—এদিকে ঔষধ খাওয়াও হবে আর ওদিকে তেল-ঘি-মাখনও ছাড়া যাবে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু যেই কে সেই থেকে যাবে।

বাহ্য-প্রয়োগ

১০। **হঠাৎ কেটে গেলে—** নটের মূল জলে বেটে কাটা স্থানে বেঁধে দিলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রুতিটা (রক্ত পড়া) কমে যাবে। তবে শিরা বা ধমনী কেটে রক্তস্রাব হতে থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

সব শেষে নটে গাছটা মুড়ুতে ব'সে ভাবছি, "আমার কথা তো ফুরলো", শেষ টানটা একবার মেরে দিই—এই তণ্ডুল আর তণ্ডুলীয় এই কথাটার মারপ্যাঁচ। আচ্ছা, আপনারা মহাভারতটা খুলে দেখুন, দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে রুক্মিনী চিঠি পাঠিয়েছে সুদামা বিপ্রের হাতে, তিনি অত দূরের পথে চ'লেছেন এক মুষ্টি তণ্ডুল নিয়ে; আবার বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হ'য়েও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এসে বিদুরের বাড়িতে সেই ভিক্ষালব্ধ একমুষ্টি তণ্ডুলের অন্নকেই পরমাদরে গ্রহণ ক'রেছেন। এ তো গেল, এদিকে প্রখ্যাত যোদ্ধা দ্রোণাচার্য—তিনিও একমুষ্টি তণ্ডুলের আশায় দেশান্তরী হ'য়েছিলেন। আজও

তো আমাদের পিতৃপিতামহবৃন্দ নিজেদের বংশধরের প্রদত্ত একমুষ্টি তণ্ডুলের পিণ্ড গ্রহণ ক'রতেই বৎসরান্তে ছেড়ে যাওয়া সন্তানদের কাছে প্রত্যাশা ক'রে থাকেন।

তবে এটা ব'লতে পারি, এই তণ্ডুলীয়ক নাম আর তণ্ডুলীয় ভেষজটি একাধারে ঔষধ এবং পথ্যও বটে। যাঁরা ভারতীয় ভেষজ নিয়ে গবেষণা ক'রছেন, তাঁরা দেখুন না, কতটা জীবনীশক্তির উৎস এই সাধারণ শাকটির মধ্যে আছে। খুড়ো ব'লতো— "গোয়ালধারের ঘাস তো, এটা টেনে খেতে ইচ্ছে হয় না"।

CHEMICAL COMPOSITION

Amarantus spinosus

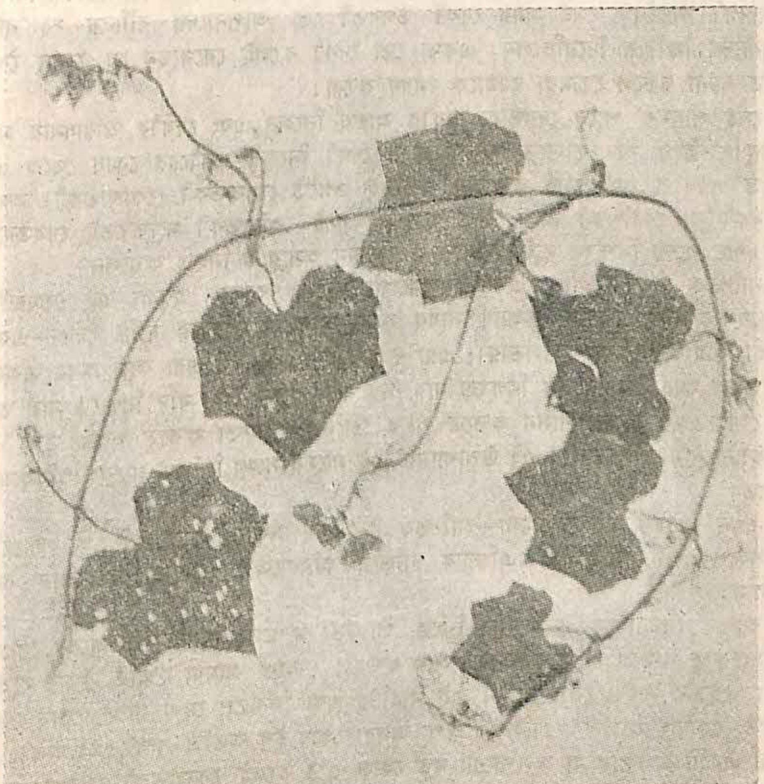
Plant contains: — 1. Moisture (85.0%) 2. Protein (3.0%) 3. Fat (0.3%) 4. Carbohydrates (8.1%) 5. Mineral matter (3.6%) 6. Calcium (0.8%) 7. Phosphorus (0.05%) 8. Iron (22.9 mg/100g).

কোষাতকী [ঝিঙ্গা]

নাস্তিক আর আস্তিকের খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল কোষাতকীর জন্মরহস্য নিয়ে।

আস্তিকের বক্তব্য, এটির জন্ম দেবীর অঙ্গের কোষ থেকে। নাস্তিক ব'ললে, রাখো তোমার কথা, আমি বলি এ সবই গালগপ্পো, কারণ দক্ষযজ্ঞে শিবের অপমানে সতী দেহত্যাগ ক'রলেন, তাঁকে কাঁধে নিয়ে শিব ক্ষ্যাপা হ'য়ে ঘুরতে লাগলেন, সেটা তো ঘ'টেছিলো পূর্বেকার সমগ্র ভারতে, এমনকি নেপালেও গেছেন। আর ওখানে তো

যাবেনই; ওটা তো তাঁর শ্বশুরবাড়ীর খিড়কি। তারপর সতীকে শিব কাঁধে নিয়ে তাঁর শবদেহটিকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিলেন; কোনো জায়গায় প'ড়লো হাতের কড়ে আঙুল (কনিষ্ঠাঙ্গুলী), কোনো জায়গায় চোখ, কোথাও পায়ের কড়ে আঙুল, কোনো অঞ্চলে গুপ্ত অঙ্গ, এইভাবে ফেলে সমগ্র ভারতে ৫১টি পীঠস্থান হ'য়ে গেল। এই হিসেবের মধ্যেই শিবচরিত্রের এক বিশেষ কথা পুরাণে অনেক আছে। দেবী শঙ্করীর দেহকোষের প্রসঙ্গ আনার মতই এ নামকরণ করা হ'য়েছে—



কোষাতকী। এরকম উপাখ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে গপ্পো তো আরও অনেক আছে, যেমন রুদ্রাক্ষ গাছের জন্ম হ'য়েছে রুদ্রের চোখের জল মাটিতে প'ড়ে, রসুনের জন্ম হ'য়েছে স্বর্গের অমৃত মাটিতে পড়ে, পুঁইশাক হ'লো হিরণ্যকশিপুর নাড়ী। এমন সব গপ্পো সমাজ জীবনের আফিংয়ের মত। তবে এ আফিংয়েরও মাদকতা আছে বৈকি। সমাজ ব্যবস্থাকে শাসন, শোষণ, পালন ও পোষণ করার জন্য এসব হ'লো দেবগুরুর ফ্যালাসি।

আস্তিক কানে আঙুল দিয়ে জিভ কেটে ব'ললে, তুমি পাষণ্ড। শোনো তবে কোষাতকীর জন্ম কি ক'রে হ'লো।

এক সময় ব্রহ্মার কাছে দিব্যশক্তি লাভ ক'রে শুম্ভ আর তার কনিষ্ঠ ভাই নিশুম্ভ এমন পরাক্রমশালী হ'য়ে উঠলেন যে, দেবতাদের স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত ক'রে

ছাড়লেন। রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে দুস্তর চিন্তায় প'ড়লেন তাঁরা। ওঁরা পরামর্শ গ্রহণ ক'রতে এলেন গুরুদেব বৃহস্পতির কাছে। তিনি সবই জানতেন, এখন বিস্তৃত ঘটনাটি শুনে বললেন—দেখুন, ভাবা যায় এক, আর ঘটে আর এক; যা জীবের আয়ত্তে নেই সেই তো দৈব। যা অবশ্যম্ভাবী তার প্রতিকার করা যায় না। কিন্তু বুদ্ধিমানগণ বলেন, তা ব'লে চুপ ক'রে থাকা উচিত না।

আপনারা এক কাজ করুন, কেবল দৈব আশ্রয় করে ব'সে থাকাটা কি সমীচীন হবে? এরকম অবস্থা তো পূর্বেও আপনাদের ঘটেছিলো—কেন, মহিষাসুর আপনাদের গৃহত্যাগী করেনি? সেই সময় দেবী ভগবতী তো আপনাদের বাঁচিয়ে স্বর্গরাজ্য আপনাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। একথা তো দেবী ব'লেই রেখেছেন যে, কোন দৈব-জনিত ঘটনা ঘ'টলে তোমরা আমাকে স্মরণ ক'রো।

সেই পরামর্শ শুনে দেবতারা দেবীর আশ্রয় নিলেন এবং দেবীর আরাধনায় মগ্ন হ'লেন। তাঁদের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হ'য়ে দেবী নিজের শরীরের কোষ থেকে এক অদ্ভুত পরম রূপের সৃষ্টি ক'রলেন। তিনিই জগতে কোষাতকী (কোশাতকী) অথবা কৌষিকী বা কৌশিকী নামে খ্যাত হ'লেন। সেই কোষাতকী মূর্তিতেই দেবতাদের পরম শত্রু শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভ্রাতাকে ও অন্যান্য অসুরকে নিহত ক'রলেন।

নাস্তিক তখন ব'লছে, এসব গালগপ্পো ছাড়ো, আসলে হ'লো এই ভেষজটির দ্রব্যগুণ জীবের বিশেষ কল্যাণ সাধন করে—আমাদের শরীরে দুটি দৈত্য—একটি প্লীহা আর একটি যকৃৎ (লিভার); এরা দুই ভাই—একযোগে এরা কাজ ক'রে একজন বিগ্‌ড়ালে আর একজন হয় বিগ্‌ড়ে যায়, নয় ব'সে পড়ে, এরা যদি বিগ্‌ড়ে যায় তবে এই কোষাতকী তাদের শাসন ক'রতে পারে, তাদের শায়েস্তা ক'রতে পারে, তাই এই ভেষজটির নাম কোষাতকী। এই উপাখ্যানটি এই নামের সঙ্গে বিশিষ্ট গুণের অধিকারীর ইঙ্গিত।

এখন বিচারে এই দাঁড়ালো—আস্তিক দৈবায়ত্বে অধীন, আর নাস্তিক বলায়ত্বের উপাসক। এখন রাজ-কবির এক্তিয়ার ছাড়িয়ে কবিরাজের (বৈদ্যের) আখড়ায় এসে প'ড়লাম।

আচ্ছা, আমরা যে একে বলি ঝিঙে, তা তো মুণ্ডারি/লোধা সম্প্রদায়ের দেওয়া, এর সংস্কৃত নাম 'ধারা কোষাতকী' আর ধুন্ধুল (যাকে আমরা চ'লতি কথায় ধুঁধুল বলি), এইটির নামও কোষাতকী। এই নামটির শব্দ বিন্যাসে দেখা যাচ্ছে কোষ থেকে অততি (কোষাৎ অততি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ অথবা কোষ ইব অততি=বর্দ্ধতে।) অর্থাৎ যে ফলটি একটি জলাধার বা জলপাত্রের মত বেড়ে ওঠে ব'লেই কোষাতকী বা কোশাতকী বা ঝিঙে। এটা পেকে গেলেই বোঝা যায় এর ভিতরকার কোষের বিন্যাসটা কি রকম, আর কোন ফলেই এরকম কোষ নেই, এই জাতীয় ফলে এই রকমই জাল হয়।

বৈদ্যক গ্রন্থমালায়

জানি না, চরক সুশ্রুত অপেক্ষা অত্রি সংহিতা প্রাচীন কিনা, কিন্তু অত্রি সংহিতার ১৬ অধ্যায়ে দেখা যায়—

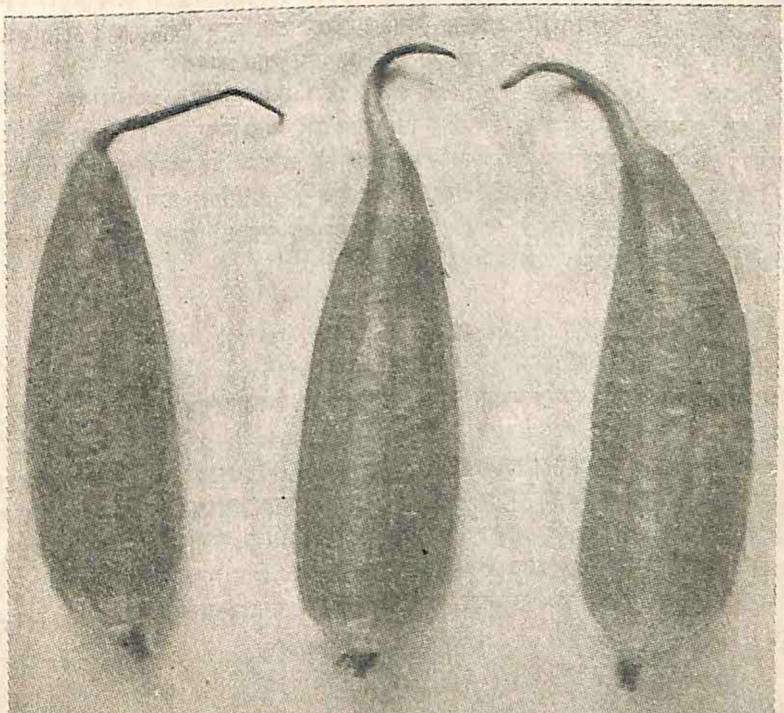
"জ্ঞেয়া কোশাতকী স্নিগ্ধা সরা পিত্তানিলাপহা"

অর্থাৎ এই কোষাতকী ফলটি সিন্ধ, সারক, পিত্ত ও বায়ুবিকার জয় করে। পরবর্তী অংশে বলা হ'য়েছে—

"ফলং চ স্বাদু মধুরং বাতপিত্তঘ্নং পাকে কফঘ্নং জ্বরে চ শস্তম্"

অর্থাৎ কোষাতকী ফল মধুর রস বায়ু ও পিত্ত দূর করে, কফ গৌণ থাকলে তারও হ্রাস করে এবং বাতপিত্তবিকার জনিত জ্বরে হিতকর।

এই কোষাতকীর (কোশাতকীর) কথা লিখতে গিয়ে চরকের সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোক থেকে পরবর্তী অংশের প্রসঙ্গ এসে প'ড়ছে, ওখানে বলা হ'য়েছে, এ গ্রন্থে যেসব ভেষজের উল্লেখ থাকবে সেগুলিকে একটা ছকে সাজিয়ে নেবে, কারণ কোন কোন ভেষজের মূলটায় থাকে ভৈষজ্যশক্তি, কোন কোন ভেষজের পাতায়, কারোর থাকে ফলে, কারোর শুঙ্গোয়, কারোর বীজের শাঁসে, তাছাড়া কায়চিকিৎসার রীতিতে সবই যে পাচনের জন্য তাও নয়, কোনটা চূর্ণ, কোনটা শৃত শীত, কেউ বা ফাণ্ট্ কেউ কষায়, কেউ নস্যে, কেউ বিরেচনে; এমনি বহুপ্রকারে এবং ভেষজেরও বহু অঙ্গের



দ্বারা যেমন ধামার্গব, ইক্ষাকু, কৃতবেধন, কোন কোন গ্রন্থের মতে ধামার্গব হ'লো ধুন্দুল আর ইক্ষাকু তেতো লাউ এবং কৃতবেধন হ'লো ঘোষা—এগুলি ফলপ্রধান। টীকাকার চক্রপাণি দত্ত মহাশয় ওই ধামার্গবের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ব'লেছেন, এ সবের ভেদ কয়েক প্রকার, আবার ওই ধামার্গব শব্দেরই প্রসঙ্গটি অন্যতম টীকাকার পূজনীয় গঙ্গাধর প্রণীত চরকের (জল্পকল্পতরু টীকা) কল্পস্থানে ধামার্গবকে বাংলায় প্রসিদ্ধ ধুন্দুল ব'লেছেন। আমরা উভয় টীকাকারের মন্তব্যের দ্বারা বুঝি কোষাতকী (কোশাতকীও) শব্দটিকে ওঁরা এমনভাবে নিয়েছেন যে আমরা যে কোষাতকী, জীমূতক,

ধামার্গব প্রভৃতি ফলগুলিকে একই কুল সঞ্জাত ব'লেই মনে করি, আর গুণক্রিয়াও পরস্পর তুল্য।

সেইজন্য চরকের কল্পস্থান সুশ্রুতের সূত্রস্থানের একই প্রয়োজন মেটাতে কোথাও কোষাতকী, কোথাও জীমূতক, কোথাও ধামার্গব প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন। এগুলি উল্লেখের সঙ্গে এটাও এসে পড়ে যে, যদি ওই ফলগুলি তিক্তাস্বাদের হয় তবে বমন ও বিরেচনের কাজে লাগাতে জীমূত, কৃতবেধন, ধামার্গব এগুলিকে অনায়াসেই লাগান যায়। একথা সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ৩৯ অধ্যায়ের প্রথমেই (৪ সূত্রে কোশাতকীর ব্যাখ্যায়) বলা হ'য়েছে। টীকাকারদের মন্তব্য কিন্তু ওগুলি ঘোষাফল। তবে যেগুলির গায়ে শিরা আছে সেগুলি "ধারা কোশাতকী", বাংলায় ওইগুলিই ঝিঙগা। ঘোষাফল এবং কোশাতকী যে অভিন্ন তা বোঝা যায় চরকের উক্তি থেকে; চরকের চিকিৎসা স্থানের সপ্তম অধ্যায়ে বলা আছে, কোষাতকী বীজের তেল কুষ্ঠ নিবারণ করে। আবার অর্শের বলি খসার জন্য এই গণের যে প্রজাতিটি ব্যবহার করা হয়েছে তার নাম ঘোষাফল। তার পাতা, ফল ও লতা অন্তধূর্মে ভস্ম ক'রে, ক্ষারোদকের মাধ্যমে পান করার ব্যবস্থা—এটা কামলা ও গণ্ডমালায় ব্যবহার করা হ'য়েছে। এই প্রজাতিটির নাম Luffa echinata. কোষাতকীর রস গুণ বীর্যবিপাক ও উৎপত্তি চিন্তা ক'রেই রাজনিঘণ্টুকার এর ৯টি নামের তালিকা দিয়েছেন মূলকাদিবর্গে। এর স্বাদু ফলটি আহার্য হিসেবে গ্রহণ করি। আর যেটি তিতো (তিক্ত) হয়, সেটাই ঔষধার্থে প্রয়োগ বেশী দেখা যায়।

বাংলায় এর ব্যবহার বীজ ও পাতা। ভেষজটি রসবহ স্রোতেই কাজ করে তবে ব্যবহারে দেখা যায় রক্তবহ স্রোতেও এর কাজ আছে।

নব্যের সমীক্ষায়

গুণঃ— ফলের রস স্বাদে মধুর, শীতগুণ সম্পন্ন, পিত্ত প্রশমক, ক্রিমিনাশক, ক্ষুধাবর্ধক ও বেদনানাশক।

ঔষধার্থ প্রয়োগঃ— পাতা ক্ষুধাবর্ধক, পিত্ত প্রশমক, মূত্রকারক, প্লীহারোগে, রক্তস্রাবে ও কুষ্ঠ রোগে হিতকর। পাতার রস শিশুদের চোখে দিলে চোখের যন্ত্রণার উপশম হয়।

ফল ক্রিমির উপদ্রবে হিতকর। পিত্তপ্রশমক, হাঁপানি ও কাসিতে ব্যবহৃত হয়।

বীজ মৃদুবিরেচক ও বমনকারক। অতিসার রোগেও এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

মূলের ছাল কারো কারো মতে গর্ভস্রাব কারক, বিরেচক, মূত্রকারক ও বিষদোষ নাশক।

পরিচিতি

বর্ষজীবী লতাগাছ কিন্তু কোণ বিশিষ্ট, মসৃণ গাঁট থেকে নূতন কাণ্ড বের হয় ও পরিণত সময়ে ফুল ও ফল হয়, লতাটি আকর্ষযুক্ত, সাধারণত বেড়ায় গায়ে, মাচায় ও অন্য গাছকে আশ্রয় করে প্রসারিত হয়ে থাকে। সাধারণত স্ত্রী পুরুষ ভেদে লাউ কুমড়োর মত দুই রকমের ফুল হয়। স্ত্রী জাতীয় ফুল থেকেই ফল হয়। ফুলের বর্ণ ঈষৎ হলদে। সন্ধ্যার পূর্বে ফুল ফোটে। সবুজ বর্ণের ফল বোঁটার দিক থেকে ক্রমশঃ মোটা এবং শিরতোলা, এজন্য এর নাম ধারা কোষাতকী। ফলের অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠগুলি যেন জাল বুনে তৈরী। সেটা আমরা দেখতে পাই ফল পাকলে। প্রকোষ্ঠের মধ্যে অনেকগুলি বীজ থাকে। এগুলি দেখতে অনেকটা ডিম্বাকৃতি ও চেপ্টা। এর কাঁচ ফলই তরকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভারতের সর্ব প্রদেশেই কমবেশী এর চাষ হয়, সাধারণতঃ

বাংলায় ফাল্গুন-চৈত্রে বীজ পোতা হয়, এভিন্ন অন্যকালেও যে চাষ হয় না তা নয়, ঋতুকালের তারতম্যে (অন্যান্য প্রদেশে) অন্য মাসেও এই সবজীর চাষ হয়। এর সংস্কৃত নাম ধারা কোষাতকী; বাংলা নাম ঝিঙগা বা ঝিঙে, হিন্দীতে ঝিমানি ও তামিলে ভেরিবিরা নামে পরিচিত। বোটানিক্যাল নাম Luffa acutangula Roxb. ও ফ্যামিলি Cucurbitaceae. ব্যবহার্য অংশ পাতা, ফল, বীজ ও মূল।

এই গণের (Genus) আরো একটি প্রজাতি আছে, সেইগুলি দেখতে আকারে ছোট, ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা, গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় হয়, কিন্তু এর গায়ে শিরা নেই বললেই হয়। এটি ঝুরি ঝিঙে নামে পরিচিত।

লোকায়তিক যোগ

১। **শোথের মূত্রাল্পতায়—** অবশ্য অনেক কারণেই শোথ হ'য়ে থাকে। তবে মুচকে গেলে বা ফোড়া হ'লে সেই স্থানের শোথের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না।

হৃদ্‌রোগ, যকৃদ্‌গত রোগ ও অন্যান্য কারণে শোথ হয় এবং তাতে মূত্রেরও কৃচ্ছ্রতা হয়। সেই সময় ঝিঙে (পাকা নয়) ও তার পাতার রস অথবা যেকোন একটির রস ক'রে একটু গরম করে রাখতে হবে, তা থেকে ২ চা-চামচ ক'রে দু'ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ বার আধ কাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিতে হবে, তবে পাতার রস হলে ২ বারের বেশী নয়। ঝিঙের রস হ'লে ৪ বার দেওয়া যায়। এর দ্বারা যে দুটি প্রধান উপসর্গ শোথ ও মূত্রাল্পতা—এ দুটির উপশম হবে।

২। **মাথার যন্ত্রণায়** (শ্লেষ্মাজনিত)— ঝিঙে ফলের রস (পাকা নয়) ২।৩ ফোটা ক'রে নাকে টেনে নিলে এবং সেই সঙ্গে ২ চা-চামচ ক'রে রস খেলে (একটু গরম করে ৭।৮ চা-চামচ জল মিশিয়ে) শ্লেষ্মা বেরিয়ে গিয়ে যন্ত্রণাটা ক'মে যাবে।

৩। **বমনেচ্ছায়—** চাপা অম্বল, প্রায় গা বমি বমি করা, সেই ক্ষেত্রে পাকা ঝিঙে বীজ বেটে (৩।৪টি) এক কাপ জলে গুলে খেতে হয়। যদি পেটে বায়ু থাকে সেটাও ক'মে যাবে। বমনেচ্ছাটাও থাকবে না, তবে ওটা বেটে জলে গুলে ন্যাকড়ায় ছেঁকে নিতে হবে। আর একটা কথা বলার আছে, ঝিঙে যদি তেতো (তিক্ত) হয়, তাহ'লে তার বীজ বেটে খেলে বমন হয়। সুতরাং যাদের শরীর দুর্বল, কিংবা বৃদ্ধ, বালক, গর্ভিণী, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত এমন রোগীকে এটা খাওয়ানো সমীচীন হবে না।

৪। **কুষ্ঠরোগে—** আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে এটাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হ'য়েছে। যেমন দাদকে বলা হ'য়েছে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ। যদি দেখা যায় কিছুতেই কিছু হ'চ্ছে না অথবা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে ঝিঙে পাতার রস এক-দেড় চামচ প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে একটু জল মিশিয়ে খেতে হবে। আর কুষ্ঠের রূপ যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানে ওই পাতার রস লাগাতে হবে। এইভাবে অন্ততঃ ২ মাস প্রত্যহ খেতে হবে, তাতে এ থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

৫। **অর্শের রক্তপড়ায়—** একে রক্তার্শও বলা হয়। রক্ত পড়ে, তার সঙ্গে যন্ত্রণা। এক্ষেত্রে কচিও নয় আবার বুড়োও নয় এই রকম ঝিঙে কুচি কুচি ক'রে কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে তাকে গুঁড়ো ক'রে নিতে হবে এবং কাপড়ে বা চালুনিতে ছেঁকে ওই গুঁড়ো ১ গ্রাম মাত্রায় আধ কাপ গরম জলে মিশিয়ে প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে দু'বার ক'রে খেতে হবে। এটা দৈব ঔষধ ব'লে প্রচলিত।

৬। **চোখে পিঁচুটি ও জুড়ে যেতে থাকলে—** (এটা শ্লেষ্মাবিকার থেকেই হয়

আবার ঠাণ্ডা লেগেও হয়)। ওই সময় ঝিঙের কচি পাতার রস দুই-এক ফোঁটা ক'রে দুচোখে দিতে হবে। তবে রসটা গরম করে, ঠাণ্ডা হ'লে সেটা চোখে দিতে হবে।

নিবন্ধের বক্তব্য এখনকার মত শেষ হ'লো—এখনও ভাবছি "কোশ" আর "কোষ" এই দুটি শব্দকে নিয়ে। তবে দেখতে পাচ্ছি এই দুটি "শব্দস্তোম্ মহানিধির" (এটি একখানি মৌলিক শব্দাভিধান) দৌলতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই তিনটিকে এক সূত্রে বেঁধেছে। কেন বলছি? দেখা যাচ্ছে কোষাতকীর আর এক নাম কৌষিকী, আবার "কোশাতকী" তালব্য 'শ' ক'রলে কৌশিকীও হয়, আর মূর্ধণ্য 'ষ' থাকলে কৌষিকী হয়, তখন তার অর্থ গুটিপোকা আবার কৌশিকী প্যাঁচার এক নাম। আমাদের (বৈদ্যক গোষ্ঠীর) কোশাতকী আছে, এইসব ঝঞ্ঝাটে প'ড়ে ভাবছি, তাঁরা কি কৌশিকী বৃত্তি, না কৌষিকী বৃত্তি অবলম্বন ক'রে ভারতের অমূল্য সম্পদ এই বনৌষধিটিকে কারোর কাছে কেন জানতে দেননি। আজ তো দেখছি অনেকের মধ্যে সেই কোশাতকী বৃত্তি, আমরা কি তবে কৌশিক না কৌষিক গোত্রের? আর একটা কথা—এই ধরুন কোষ (cell) না থাকলে সৃষ্টিই হয় না, এদিকে ধনকোষ না থাকলে স্থিতিও হয় না, আবার এই কোষই "এ্যাটম্ বোমের মৌল বস্তু"—লয় ক'রে দেওয়ার উপাদান। তাই ব'লছি, এই "শব্দ" নামটি যেন ব্রহ্মের প্রতীক!

CHEMICAL COMPOSITION

Luffa acutangula

Analysis of edible fruit:— Moisture 95·4%; protein ·5%; fat ·1%; carbohydrate; mineral matter ·3%; carotene 56 U/100g.; Phytin; amino acids; calcium .04%; Phosphorus .04% and iron 1.6 mg/100g. Seed contains:— Luffin; cucurbitacins B, D, G and H; saponin glycoside 20%; enzyme; fixed oil 19·9% (saturated, oleic and oleanolic acid). Seed kernel contains:— Crude protein 39·8% fat 48·4%; fibre 1·89%; Pentosans 2·24%; reducing sugars 3·61% and ash 4·77%. Root contain:— Cucurbitacin-B and cucurbitacin-C ; amino acids —arginine; glycin; threonine; glutanic acid; bucine; serine; alanine; γ-aminobutyric acid and pipecolic acid.

পরিশিষ্ট

রোগ লক্ষণ ও তার অশুভ সংকেত

তমক শ্বাস

(ASTHMA)

'শ্বাস উঠেছে, ও আর বাঁচবে না'—এ কথাও আছে, আবার শ্বাস রোগে যাঁরা আক্রান্ত হন তাঁরা দীর্ঘ দিন বাঁচেন'—দুটি কথারই যুক্তি আছে। প্রথমোক্তটি রোগ অন্য, শ্বাস তার অশুভ লক্ষণ বা অরিষ্ট লক্ষণ আর শ্বাসই যেখানে নিজেই রোগ (যদিও সে অন্যের অপেক্ষা রাখে) এবং এটির মৌল কারণ থাকে প্রধানভাবে বংশগত অর্থাৎ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত হওয়া। এই রোগ প্রথমে শ্বাসযন্ত্রের এলাকায় থাকে, তারপর দীর্ঘদিন রোগ ভোগ ক'রতে ক'রতে অর্থাৎ শ্বাস টানতে টানতে হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল হ'য়ে যায় এবং ওটা প্রসারিত হ'য়ে যায়, যার ফলে দুটিই রোগগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। এখানে একটা কথা বলে রাখি, হাঁপানি রোগীর দীর্ঘ জীবন পাওয়ার কারণ হ'লো, এ'দের প্রত্যহ ৪-৫ ঘণ্টা যাকে বলা যায় বাধ্যতামূলক প্রাণায়াম ক'রতে হয় তাই তাঁদের দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, তবে বড় কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকতে হয়। মোটকথা শ্বাসযন্ত্রগত ব্রঙ্কিয়াল্ ও হৃদ্‌যন্ত্রগত (কার্ডিয়াক্) শ্বাস রোগই "তমক শ্বাস", তবে সব ক্ষেত্রে শ্লেষ্মার বিকার থাকবেই। এ রোগ যখন সুরু হয় তখন কারও কারও প্রথম প্রথম একটা না একটা সূত্র ধরে হিক্ হিক্ ক'রে হৃদ্‌যন্ত্রের প্রতিক্রিয়ার ধ্বনি হ'তে থাকে, তখনই সাবধান হওয়া উচিত। এই রোগাক্রান্ত যাঁরা তাঁরা সকলেই এক ধরনের উপসর্গের কবলে প'ড়বেন না, এটা পাঁচ প্রকারের হ'তে দেখা যায়। এই সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩৫৯—৩৬১ পৃষ্ঠায় মোটামুটি বলা হ'য়েছে, তার মধ্যে উপরিউক্ত তমক শ্বাসই দুঃসাধ্য বলা যেতে পারে (যদিও সব শ্বাসই অল্পবিস্তর দুরারোগ্য)। এখন তম শব্দের অর্থ অন্ধকার, যখন হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্গে শ্বাসযন্ত্রের পর্যায়-

শালীতা অর্থাৎ যাকে কালেক্‌শন্‌ ডিষ্ট্রীবিউশনের বিঘ্ন ঘটে, যাকে বলে হারমণি নষ্ট হ'য়ে যায়—তখনই রোগী চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। এদিকে শ্বাসনলীর আকুঞ্চনের জন্য প্রয়োজনমত শ্বাস নিতে না পারায় অক্সিজেনের অভাব দেখা যায়, যার জন্য রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটতে থাকে, তার ফলে অনেক সময় হাত-পা নীল হ'তে থাকে। আর একটা কথা—অন্ধকার দর্শনটা তো আর হৃদয়ের কাজ নয়, এটা দর্শন ইন্দ্রিয়ের কর্মভূমি মস্তিষ্ক—এর রক্তসঞ্চালন ক্রিয়াও ভাল না হওয়াতে অন্ধকার দর্শন হতে থাকে। অনেক সময় কাসির বেগ এত দ্রুত হয় এর দ্বারাও অন্ধকার দর্শন হ'তে থাকে আবার তার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট—এটাই অশুভকে হাতছানি দেয়।

পরিণাম শূল

(DUODENAL ULCER)

কারোর আচরণে বিরক্ত হয়ে এবং বার বার অবাধ্যতা দেখে ব'লে থাকি এর পরিণাম ভাল নয়, অর্থাৎ এ চরিত্রের পরিণাম খুবই অশুভ। এমনি পরিণামের ক্ষেত্র ঘটে কয়েকটি রোগের অবস্থান্তরে, যেমন, অতিসার রোগ পুরো সারলো না, আবার অত্যাচার করা হ'লো, খাওয়া-দাওয়ার হিসেবে মাত্রা রাখা হ'লো না, তার পরিণাম গ্রহণী রোগ, একেবারে অগ্নিবলটাই আর ফিরে পাওয়া কঠিন। ক্ষয় রোগেও প্রায় তাই, এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তাই হয়, এর পরিণাম খুবই অশুভ। এমনি আরও কয়েকটি রোগের মধ্যে শূল রোগও।

শূলের প্রথম অবস্থায় বায়ুর সাম্য আসতে না আসতে সে অবস্থায় এমন শ্লেষ্মাকর দ্রব্যের ব্যবহার করা হ'তে লাগলো যাতে বর্ধিত শ্লেষ্মা ধাতুটি পিত্তের সঙ্গে একাত্ম হয়ে স্বাভাবিক (সাম্য অবস্থায় থাকা) বায়ুকে বিকৃত পরিণামে বাধ্য করিয়ে এবং জোট পাকিয়ে এমন শূলের সৃষ্টি করা হ'লো যে, যেই আহার করা অমনি ব্যথা উঠলো, হয়তো কারোর আহারের কিছু পরেই প্রচণ্ড ব্যথা আরম্ভ হ'লো পেটে, নাভিতে, বুকের দু'পাশে আর ব্যথার অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে পেটের খাদ্য যতক্ষণ বমি না হবে বা স্বেচ্ছায় গলায় আঙ্গুল দিয়ে ওগুলিকে তুলে ফেলা না যাবে ততক্ষণ পেটের যন্ত্রণার শান্তি হবে না—একেই বলে পরিণাম শূল। অর্থাৎ তখন রসবহ স্রোতগুলির সবই দূষিত হ'য়ে গিয়েছে; এইটাই হ'ল আয়ুর্বেদের সিদ্ধান্ত। তাই শ্লোকাকারে বলা হ'য়েছে—

তমাহু রসবহানাং স্রোতসাং দুষ্টি হেতুকম্।
তৎ পরিণামজং শূলং দুর্বিজ্ঞেয়ং মহাগদম্॥

আয়ুর্বেদিক গ্রন্থাবলীতে একে অন্নদ্রব শূল, পক্তিশূল, অন্নবিদাহ শূল প্রভৃতি নামেও পৃথক পৃথক করা আছে। এদের চিকিৎসা যদিও কঠিন তথাপি রোগোপশমের পক্ষে সহায়ক বনৌষধিগুলির আলোচনা এই গ্রন্থের খণ্ডগুলিতে করা হ'য়েছে। এক্ষেত্রের এই রোগোপশামক ভেষজগুলির নাম হ'লো, আমলকী, পিপুল, মাষকলায়, যষ্টিমধু, শতাবরী, শ্বেত বেড়েলা, গুলঞ্চ, চাঁপা নটে, ভৃঙ্গরাজ, আকন্দমূল, শ্বেত-সর্ষপ (সাদা সরষে), দারুচিনি, বড়এলাচ প্রভৃতি।

মধু মেহ

(DIABETES MELLITUS)

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে শারীর পরিচয় এবং পদার্থবোধ যেমন

অপরিহার্য তেমনি লাক্ষণিক বিকৃতি বিজ্ঞান জানাও আবশ্যিক। রোগ লক্ষণ এবং শারীর পরিচয় জ্ঞানটি অনেক ক্ষেত্রে হেতুসূত্রও হ'য়ে থাকে, এটার বিশেষ নিদর্শন এই "মধুমেহ রোগে"। চরক সংহিতায় এই হেতুসূত্রটি বেশ সংকেতের সংগে বলা হ'য়েছে, দেহের ওজ ধাতুকে যখন অন্যান্য দোষের দ্বারা আবৃত হ'য়ে বায়ু এসে গ্রহণ করে এবং সেই ওজকে নিয়ে বস্তিতে প্রবেশ করে তখনই বড় কষ্টসাধ্য মধুমেহ রোগের জন্ম হয়; তাই শ্লোকে বলা হ'য়েছে—

তৈ রাবৃত গতি র্বায়ুরোজ আদায় গচ্ছতি।
যদা বস্তিং তদা কৃচ্ছ্রো মধুমেহঃ প্রবর্ত্ততে॥

চরকীয় উক্তিটির দ্বারা মধুমেহ রোগটির খুব দূরবর্তী কারণেরই সঙ্কেত রয়েছে, কিন্তু এই উক্তি রোগ-পরীক্ষার পক্ষে চিকিৎসাবিজ্ঞানী যথেষ্ট মনে করেন না ব'লেই তাঁরা আরও বিবৃত ক'রে ব'লেছেন, সব প্রমেহ রোগই পরে মধুমেহ রোগে পরিণত হয়। তখন মেহ অর্থাৎ বিশেষ ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে যাই নিঃসৃত হবে সবই মিষ্ট রস, সবই মধুর আস্বাদের। তাই শ্লোকে বলা হ'য়েছে—

মধুরং যচ্চ মেহেষু প্রায়োমাধবং প্রমেহতি।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, ঋক্‌বেদে ১।১৬৩।৪ সূক্তে মেহ শব্দটির অর্থ শিশ্ন (মিথুন দণ্ড) বলা হ'য়েছে, আর সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ১।৩২।২ শ্লোকে বলা হ'য়েছে—মূত্রমার্গে নিঃসৃত।

আয়ুর্বেদীয়গণ আরও বিশ্লেষণ ক'রে ব'লেছেন, মধুর রসটি কফস্বভাবের পরিণতি। দোষবিকারে বিকৃত বায়ু এসে ওজ ধাতুকে (ওজ হ'লো রস-রক্ত প্রভৃতি সব ধাতুর সারভাগ থেকে জাত একটি বিশিষ্ট ধাতু। সমস্ত দেহেই তার শক্তি, কিন্তু যখন যে ধাতু যে স্থানে থাকে তারই রঙ গ্রহণ করে। এই ওজ পূর্ণ শক্তিতে থাকলে আমরা বেশ সচেতন ক্রিয়াশীল হ'য়ে থাকি) কখনও স্থির, কখনও চঞ্চল, কখনও বা ঠাণ্ডা প্রভৃতি বায়ুর যত স্বভাব সবই করে এবং প্রধান প্রধান স্থানপথে এসেও মূত্রমার্গের মাধ্যমে নিঃসৃত হয়, এইজন্যই মধু মেহের পথ্যের দিকে এমন নজর রাখতে হয় যে খাদ্যের রস যেন কফস্বভাবের এবং মধুর রসের অনুকূল না হয়, তাই বর্জন ক'রলে অনেকটা সংযত করা যায়, কিন্তু যদি এ রোগ বংশগত হয়, বীজ দোষে এবং প্রায়ই কাসি, হাঁপানি এবং শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁড়া দেখা দেয় তবে তাকেই অরিষ্ট লক্ষণ বলা হবে। মোটকথা একে সারানো সহজ নয়। হয়তো দীর্ঘজীবী হবেন, ওই রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, অবশেষে মূত্রকৃচ্ছ্রতা শেষ লক্ষণ।

মূত্রসাদ

এই "সাদ" একটি শব্দ, তার আশেপাশের শব্দ পরিক্রমায় "সাদর" পাই আবার "অব" উপসর্গ যদি পাশে এসে ব'সে যায় তাহ'লে "অব"/সাদ এসে গেল, তাছাড়া "প্র" উপসর্গটি আগে এসে যেই বসে প'ড়লো প্র/সাদ পেয়ে গেলাম, এবং প্রয়োজন হ'লে কারুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ক'রে তার উৎ/সাদও করি, কিন্তু যেই শুনি বল দিকি সাদ শব্দের অর্থ কি? অগত্যাই পণ্ডিতের খপ্পরে পড়তেই হ'লো—সেখানে গেলেই

আওড়ে দিলেন কালিদাসের রঘুবংশের সেই শ্লোক, যেটা সুদক্ষিণার গর্ভাবস্থা বর্ণনা ক'রতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

"শরীর সাদাৎ অসমগ্র ভূষণা......"

অর্থাৎ গর্ভের প্রায় সমাপ্তি হ'য়ে আসার মুখে সুদক্ষিণার শরীর এত ভারী হ'য়ে গেল যে আর নড়া-চড়াও ভাল লাগে না তাঁর, দেহের অলংকারগুলি খুলে ফেললেন, আর যেখানে সেখানে আঁচল পেতে শুয়ে প'ড়তেন—এইসব বর্ণনা। আশা করি সাদ শব্দের বাস্তব রূপটির বর্ণনাই এখানে দেওয়া হ'লো।

ওখানেই বলা হয়েছে সাদ শব্দের অর্থ বিরতি। সাদ/ভেদ/থেমে যাওয়া। এই মূত্রসাদ রোগ বুঝতে সেই সাদ। অর্থাৎ যে রোগের ফলে "মূত্রসাদ" হয় অথবা যে রোগটার নামই মূত্রসাদ।

কারণ পিত্ত-কফ এই দুটি অথবা একটির প্রবল বিকার হ'লে ওই বস্তিস্থানের ঝরণায় (মূত্রে) সাদা, হ'লদে রঙের খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ (পাউডার) জ'মতে থাকে. আর প্রস্রাব হওয়ার সময় ওটা নির্গত হ'তে এমন কষ্ট হয় যে, মনে হয় যে মূত্রপথে কেউ ঝাঁঝালো কাদা দিয়ে আটকে দিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বালাও হ'তে থাকে, এর চিকিৎসা ক'রতে হ'লে ওই মূত্রবস্তির চিকিৎসা ক'রতে হয়। নইলে সামান্য টুকি-টাকিতে সারে না, অবশেষে বস্তিকুন্ডলের অরিষ্ট লক্ষণই দেখা দেয়।

বস্তি কুন্ডল

(DISTENSION OF URINARY BLADDER)

কুন্ডল ব'ললে আমরা বুঝি ওটি কানের একটি অলংকারের নাম কিন্তু এ কুন্ডল উপবীত গ্রহণের সময়েও কানে পরার বিধি আছে পুরুষেরও। এখনও বাংলার বাইরে এটি প্রচলিত। পৈতে হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের—অন্যান্য প্রদেশের পুরুষদের আজীবন তা কানে থাকে। কুন্ডল হ'লো কর্ণভূষণ, গোল ক'রে পাকানো ধাতু বলয়। এই কুন্ডল শব্দ থেকেই কুন্ডলী এবং কুন্ডলিনী নামের উৎপত্তি; মোটকথা, কুন্ডল ব'ললে আমরা বুঝি গোল ক'রে পাকানো একটি বস্তু। কিন্তু ওই পাকানো ক্রিয়াটি ধরেই আমাদের বস্তিগত একটি রোগের নাম দেওয়া হ'য়েছে "বস্তিকুন্ডল", এটা অবশ্য আয়ুর্বেদীয় নাম।

বস্তি কথাটি বোঝা থাকলে বস্তিকুন্ডল বোঝানো সহজ হয়, কিন্তু স্বল্প কথায় তা বোঝাতে গেলে এইভাবে ব'লতে হয় যে, আমাদের দেহের নাভিপৃষ্ঠ (পিঠ), কটি, মুষ্ক, মলদ্বারের পীঠ, বংখন (কুঁচকি) এবং লিঙ্গ এরই মাঝখানে থাকে বস্তি। এর চেহারাটা একটা গোল ছোট লাউ-এর মত, অথবা ছোট কলসীর মত, এবং তা উপুড় করা আছে। ওর শরীরটা তৈরী হয় খুব পাতলা চামড়ায়। এইটাই আমাদের মূত্রথলি। এই বস্তিতে বায়ুর ক্রিয়া স্বাভাবিক (অনুলোম) থাকলে সহজ সরলভাবে প্রস্রাব হয় আর বক্রী হয়ে থাকলে, যাকে বলে প্রতিলোম হয়ে থাকলে, মূত্রমার্গে কত যে রোগ হয় তার ইয়ত্তা থাকে না। এই বস্তিকুন্ডলও একটি বক্রী বায়ুর প্রকোপে বস্তিতে এসে মূত্র যেন কুন্ডলী পাকিয়ে যায়। সেই কুন্ডলী পাকানোটা ঘটে এইভাবে—যেমন, দ্রুত পথ হাঁটা, প্রচন্ড বেগে লাফানো, ঐস্থানে আঘাত, এবং নানানভাবে টেপা-টিপি ঘটলে মূত্রাশয় স্বস্থান থেকে ওপরে উঠে যায়, তার ফলে পাশের দিকে এসে

ফাঁপতে থাকে, আর তাতে শূলের যন্ত্রণা, সারা শরীরে কাঁপুনি আর জ্বালা। ফলে বিন্দু বিন্দু ক'রে প্রস্রাব হ'তে থাকে, একটু চেপে ধ'রলে মূত্রটা কিছু সরল হ'য়ে বেরুতে থাকে। এর অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো, ঘন ঘন পিপাসা (জল খেলেও তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা) আর হাঁপানি তারপর যন্ত্রণায় মূর্ছিত হওয়া।

অষ্ঠীলা (অষ্ঠিলা)

(ENLARGED PROSTATE)

শব্দবিন্যাসটি এমন যে ভারতীয় পৌরাণিকগণ মনে করেন ছোট বাটুল, সংস্কৃত ভাষায় হ'লো অষ্ঠীলা। আবার উত্তর-প্রদেশের লোকের ভাষাও "অষ্ঠীলা ফেকো", মানে, ছোট ছোট নুড়ি ছোঁড়া। আবার মহাভারতের সংগ্রাম বর্ণনাতেও দেখা যায়, ছোট লোহার গুলিকে অষ্ঠীলা বলা হ'য়েছে। এমনি অষ্ঠি থেকে আঁঠি (লোকভাষা) এদিকে অষ্ঠি থেকে অষ্ঠিলা বা অষ্ঠীলা। সেই অষ্ঠি আয়ুর্বেদিক গ্রন্থে বহুরূপী হ'য়েছে। এইজন্য ব'লছি যে, বাগ্‌ভট সংহিতার নিদানস্থানের নবম অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে বলা হ'য়েছে, কুপিত বায়ু যখন মলদ্বার ও বস্তির ভিতরে এসে আরও কুপিত হ'য়ে বাইরে সঞ্চারিত হ'তে পারে না, তখনই ওখানে একটা ছোট্ট গাটের মত বা আঁঠির মত হ'য়ে যায়। তার ফলে পেটে ফাঁপ আর মূত্র এবং মলের নিঃসরণ রুদ্ধ হয়; আবার ওই বাগ্‌ভটেই (নিদানস্থানের ১২ অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোকে) বলা হ'য়েছে যে, দীর্ঘদিন আনাহ রোগে আক্রান্ত হ'লে পেটেই হয় অষ্ঠীলা, অর্থাৎ এক ধরনের গুল্ম। বাগ্‌ভটের এই যে রোগলক্ষণ সঞ্চয়ন সেটি কিন্তু সুশ্রুত থেকেই নেওয়া, কারণ ঠিক ওই লক্ষণটিই সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের ৫৮ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে বলা হ'য়েছে। আবার ওই অষ্ঠিলা নামটিকে শূক রোগেও উল্লেখ করা হ'য়েছে। এটা আছে সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানের ২১ অধ্যায়ে। তবে এটা অনুমিত হয় যে, বর্তমানের ইন্‌টেস্‌টাইনাল্ অবষ্ট্রাক্‌শন্ (Intestinal obstruction) রোগটাই প্রাচীনকালের অষ্ঠীলা রোগ।

এই অষ্ঠীলা রোগের সঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও ঊর্ধ্বগত উদাবর্ত রোগ দেখা দিলে তা অসাধ্য হয়। এইটাই তখন এই রোগের অরিষ্ট লক্ষণ।

শর্করা

(URINARY CALCULUS)

শর্করা মানে চিনি আর সিকতা মানে বালি; এটা বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ ছাড়া সকলেই ব'লবেন। কিন্তু আয়ুর্বেদবিজ্ঞ পণ্ডিতগণের অর্থ ভিন্ন—শুধু তাই নয়, সংস্কৃত ভাষার নাটক মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্কে ৭-৮ গুচ্ছে এক জায়গায় একটি উপমা দেওয়া হ'য়েছে যে—

"গণিকা নাম পাদুকান্তর প্রবিষ্টা শর্করা ইব"

অর্থাৎ এ সমাজে বারবনিতারা হ'লো জুতোর ভিতরে ঢোকা কাঁকরের মত। পায়ে পরলে করকর ক'রছে আবার খুলে ঠোকাঠুকি করে ঝাড়লেও কোথায় আটকে আছে, তাকে না পারা যায় ফেলতে, না পারা যায় সইতে। ঠিক যেন জুতোর শর্করা।

এই শর্করা শব্দই ফারসী ভাষায় "শক্কর"। পাশ্চাত্য দেশে চিনির যেসব নাম তার সঙ্গে অনেকটা শ্রুতিসাম্য আছে, যেমন স্যাকারিণ, সুগার এইসব। সেই সুগারই

তো চিনি অথচ চিনি শব্দটি ৬২০ খৃষ্টাব্দের আগেও চিন দেশে জন্মেনি। আর ভারতে তো চিনি এসেছে ঢের পরে। কিন্তু ভারতে ছিল গুড়খণ্ড। মৎস্যাণ্ডিকা (মিছরি) ফেণিকা (বাতাসা) তারপরে সেই শর্করা শব্দটির আকার দেখেই ইক্ষুবিকার, গুড়বিকার প্রভৃতির রূপগুলিতে শর্করা যুক্ত করা হ'য়েছে। আসলে শর্করা মানে চিনি নয়, পাথরের টুকরোর নাম। শর্করা শব্দ এসেছে অথর্ববেদ (১১।৭।২১) সূক্ত থেকে। ওখানে বলা হয়েছে, শিলাখণ্ডই শর্করা। আর চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হয়েছে,—

> "শুক্রধারণাৎ অশ্মরী জায়তে, পীড়িতে সৈব অশ্মরী শর্করা জায়তে।
> ততো বায়ুনা ভিন্না সতী মূত্রেণ নিরেতি।"

অর্থাৎ যাঁরা কামোত্তেজনা সত্ত্বেও শুক্রবেগ ধারণ করেন, তাঁদের সেই শুক্র ক্রমেই অশ্মরীর রূপ নেয়, ওটা বায়ুর বেগেই হয়, তারপর নাভির নীচে মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। আবাব কোঁথ দিলে, টেপাটিপি ক'রলে মূত্রবহ স্রোতে এসে মূত্রপথ রুদ্ধ করে। ওই সময়েই সেই শুক্র অশ্মরীগুলি চূর্ণ হ'তে থাকে এবং তাই তখন শর্করা নাম অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রস্তরচূর্ণ নাম হয়। আরও মিহি হ'য়ে গেলে নাম হয় সিকতা। এটি স্থায়ী হ'লে অসহ্য যন্ত্রণা, শোথ, হৃৎপীড়া আর বমি হ'তে থাকে।

শল্যশালাক্য চিকিৎসার দ্বারা (খুব সাবধানতা অবলম্বন করে) অনেকটা সুস্থতা লাভ হয়, কিন্তু নিঃশেষিত হওয়া কঠিন। শেষে অণ্ডকোষে শোথ, শূলের যন্ত্রণা আর নাভিতে শোথ হ'লেই বুঝতে হবে, প্রাণ সংশয়—তারই নাম অরিষ্ট লক্ষণ।

আনাহ
(ACUTE ABDOMINAL DISTENSION)

এখন এই রোগটি কোন মুখ্য ব্যাধি না অন্য রোগের উপসর্গ? কারণ আয়ুর্বেদিক পরিভাষায় যে "আনাহ" নামের রোগ সেটিও প্রথমতঃ দুর্বোধ্য ভাষা, কারণ "আ-নাহ অর্থাৎ আ=সম্যক প্রকারে নহ", আবার সেই ধাতু থেকে নাহ। নহ বা নাহ শব্দের অর্থ আচ্ছাদন ও বন্ধন।

উদরে এমন রোগ হয়, যে রোগের স্বভাবটাই হ'লো যেন দ্বার বন্ধন অর্থাৎ দ্বার আটকানো। মলদ্বার, মূত্রদ্বার, মুখে আসা নালীর দ্বার অর্থাৎ রোগটি এমনভাবে উদরে সৃষ্ট হয়, না হ'তে চায় পায়খানা না প্রস্রাব না বমি, আয়ুর্বেদিকগণ এটিকে এইভাবেই প্রকাশ ক'রেছেন—

> আমং শকৃদ্ বা নিসৃতং ক্রমেণ ভূয়ো বিবদ্ধং বিগুণানিলেন।
> প্রবর্ত্তমানং ন যথাস্বমেনং বিকার মানাহ মুদাহরন্তি॥

এটি সৃষ্টি হ'লে তৃষ্ণা হবে, কিন্তু জল পান করলে প্রস্রাব হবে না। নাক দিয়ে জল ঝরুক কিন্তু খানিকটা শ্লেষ্মা যে বেরিয়ে যাবে, তা যাবে না। মাথাটা যেন পুড়ে যাবে, জল দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রলে শ্লেষ্মা বেড়ে যাবে। আমাশার শূলের যন্ত্রণা হবে, কিন্তু দাস্ত হতে চাইবে না। পেটটায় ফাঁপ ধরবে, এদিকে অধোবায়ু বেরুবে না। বুকটায় চাপা চাপা অবস্থা হবে, আনচান্ ক'রবে কিন্তু ঢেকুর উঠবে না। এই হ'লো রোগের প্রকৃতি—এই রোগটি উদাবর্ত রোগেরই অন্তর্গত। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ক'রে বলা হ'য়েছে

এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩২৯ পৃষ্ঠায়।

এই আনাহ রোগেরও অরিষ্ট লক্ষণ হয়, যখন এটা হয় তখন অসাধ্যের পর্যায়ে প'ড়ে যায়, তখন তার লক্ষণ হবে, মাঝে মাঝে বমি হবে, তার সঙ্গে মল চলে আসবে, তারপর মূর্ছা (অজ্ঞান হ'য়ে যাওয়া), আর শোথ (ফুলো)।

বিড়্বিঘাত

সংস্কৃত ভাষায় "কেকর" একটি শব্দ, এর প্রচলিত অর্থ ট্যারা। যে ব্যক্তির চোখের তারা দেখে বোঝা যায় না সে কোন্ দিকে চেয়ে আছে। এই বিড়্বিঘাত শব্দ শুনলেও মনে হবে বিট্ মানে যখন বিষ্ঠা, তখন তার ব্যাঘাত হ'লে যে রোগ তারই নাম বিড়্-বিঘাত কিন্তু প্রচলিত অর্থ হ'লো, এক ধরনের মূত্র রোগ।

অবশ্য এটাও ঠিক যে, বিষ্ঠা থেকে বিট্ বা বিড়্—বিষ্ঠার অর্থ হ'লো, যা নানান রঙের নানান আকারে থাকে। এই বিষ্ঠার প্রতিশব্দ পুরীষ। সেই পুরীষবিঘাত বললে কিন্তু বিড়বিঘাত হবে না, কারণ পৃ ধাতু+ঈষণ থেকে পুরীষ। তার অর্থ দেহের অভ্যন্তরে উদক আশয়ের পাশে থাকে পুরীষাশয়। এই আশয়টি রোগগ্রস্ত হ'লেই দেহের প্রাণশক্তি দুর্বল হয়। কিন্তু সেই পুরীষের নিঃসৃত অবস্থাটির নাম বিষ্ঠা, সেই বিষ্ঠা দেখে পুরীষের অবস্থা নির্ণয় করা হয়। কিন্তু পুরীষ পরীক্ষা ওভাবে হয় না। অতএব পুরীষবিঘাত ব'ললে যে অর্থ হয়, সেটা কিন্তু বিড়বিঘাত বললে হবে না ব'লেই এই নামকরণ। আরও পরিষ্কার করা যাবে এইভাবে, পুরীষের পরবর্তী অবস্থা বিষ্ঠা। সেই বিষ্ঠা নির্গমনের পথের পাশেই থাকে মূত্রনিঃসরণ পথ। এই রোগটির ক্ষেত্র এবং হেতু হ'লো—

> রুক্ষ-দুর্ব্বলয়োর্বাতে নোদর্ত্তং হি শকৃদ্ যদা।
> মূত্র স্রোতোঽনুপদ্যেত বিট্সংসৃষ্টং তদা নরঃ॥

অর্থাৎ যারা উপবাসের দ্বারা কিম্বা পুষ্টিকর আহার্যের অভাবে রুক্ষ কিংবা দুর্বল হয়, ফলে এক প্রকার উদাবর্ত রোগে আক্রান্ত হ'য়ে থাকে (এই উদাবর্ত কি রোগ, তা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩২৯ পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে) সেই উদাবর্তের দ্বারা তার মলাশয়ের পুরীষ ঊর্ধ্বগত হ'য়ে মূত্রস্রোতে এসে মিশতে থাকে। তখন তাঁর মূত্রের গন্ধ একেবারে বিষ্ঠাগন্ধ হ'তে থাকে (শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবারই হয় এ রোগ), তখনই সেই মূত্র রোগটির নাম হয় "বিড়্বিঘাত"। খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে চিকিৎসা না ক'রলে কঠিন আরও কঠিনতর হয়। পরে খুব দ্রুত এর অশুভ লক্ষণ দেখা দেয় (তাই বলে অরিষ্ট লক্ষণ মৃত্যু লক্ষণ নয়—যেটি কষ্টসাধ্য সেইটাই অশুভের সঙ্কেত) তবে এটা ভয়ের কারণ হয়—যদি রক্তবর্ণের মূত্র আর সেটা ফোঁটা ফোঁটা হ'য়ে বেরুতে থাকে।

রক্তার্শ

(BLEEDING PILES)

প্রত্যক্ষত বর্ষার খোঁচা খাওয়ার যন্ত্রণা দিতে যে রোগ তার নামই অর্শরোগ, তা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩২১ পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে।

এই রোগটির ৬টি রূপ, তাও সংক্ষেপে বলা হ'য়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে যেটা

রক্তার্শ অর্থাৎ ব্লিডিং পাইল্‌স্‌ সেইটাই বড় ভয়ঙ্কর, কারণ এর মাংসাঙ্কুরগুলি যখন ক্রমেই বড় হ'য়ে ওঠে, এই সময় ওর চেহারা চোখে দেখলে (আয়না বসিয়ে) শরীর শিউরে ওঠে, মনে হবে যেন গোটা মানুষটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার জন্য কি ভীষণ দাঁত বের করে মলদ্বারে ব'সে আছে. এক ধরনের কালচে লাল সেখানকার রং, আর কয়েকটা কাঁটা (পাণিফলের কাঁটার মত), নীচেটা লাল টক্‌টকে থল্‌থলে মাংস, যত দিন যাবে ততই তার রং বদলায়, কোনদিন ফ্যাকাসে, কোনদিন ছাই রং, কোনদিন সাদা ছিটে বা লাল ডোরা। মাত্র এক বৎসর পর থেকেই ওটা হ'য়ে দাঁড়ায় শালুকের গোড়ার (কন্দমূলের) মত। এই সময় থেকেই সেই রক্তার্শ ব্যক্তিটির সারা শরীরের শিরাগুলি সহজেই নজরে পড়ে, আহার ক'মে যায়, তার সঙ্গে অন্যান্য ইচ্ছাও ক'মে যায়, ক্ষণে ক্ষণে ক্রোধ, পেটে ব্যথা, বুকটা চেপে ধরার মত চাপ, আর চোখের অসুখ, মাথায় যন্ত্রণা হ'তেই থাকবে, এসব উপদ্রব হ'লেও (অর্থাৎ অসহ্য যন্ত্রণা হ'লেও) রোগীর জীবন কিন্তু বিপন্ন হয় না, কিন্তু যেদিন থেকে ওই ব্যক্তিটির মুখ হাত পা ফুলতে থাকবে অর্থাৎ শোথ দেখা দেবে, সেইদিন থেকেই ধরে নিতে হবে এবার অশুভ লক্ষণ সুরু হ'য়েছে; তারপর যেদিন থেকে হৃদয়ের শূল ব্যথা এবং মলদ্বার আর পুরুষ হ'লে অণ্ডকোষ, নারী হ'লে মুখ ফুলবে, তখনই বুঝতে হবে এটা চরম পর্যায়ে এসে পড়েছে।

অহিপূতন

(PRURITUS ANI WITH PERIANAL FARUNCLES OF INFANTS)

সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রবাদবাক্য আছে যে—

"অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ"

অর্থাৎ প্রেমের গতি কখনও সরল হয় না, এঁকেবেঁকে চলে যেন সাপের গতি। সাপের আর আর নামের মধ্যে 'অহি'ও একটি। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থে সেই অহিকে নিয়েই একটি রোগের নামকরণ। তাছাড়া সেই অহির সঙ্গে যোগ করা হ'য়েছে নূতন একটি শব্দ। এই শব্দের দ্বারা বোঝা যায় না এই নামের সার্থকতা কোন রোগে সম্ভব। অথচ এই রোগের নামটি সুশ্রুতেই আছে এবং সেটা বালরোগে অর্থাৎ শিশু-রোগের মধ্যে। যদিও তা সব দেহেই হয়।

অহি নামটি বৈদিক। এটি ঋক্‌ সূক্তের ১।৩২।৩-এ আছে। তৎকালেই অহি শব্দের ব্যাপ্তি বহু স্থলে। সূর্য, রাহু, পৃথিবী, নাভি প্রভৃতি বোঝাতে তৎকালে অহি শব্দের প্রয়োগ ক'রতেন। অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে এসে অহি শব্দ সর্পে এসেই থেমে গিয়েছে। কিন্তু বেদের সূক্তিতে সাপ নয়, ওখানের শব্দে অর্থ মেঘ—যে মেঘ তরঙ্গের আকৃতিতে উড়ে যায়। ঐ তরঙ্গাকৃতি যেখানে দেখা যায় সেখানেই "অহি" আর পূতন, এ শব্দটি বৈদিক না হ'লেও বেশ প্রাচীন। পূতন মানে কামাচার অর্থাৎ বাইরে এক ভিতরে আর এক। সেই পূতন থেকে পূতনা নাম। এটি তখন এক রাক্ষসী রমণীর নাম। আবার হরীতকী ফলেরও নাম।

এই অহিপূতন শব্দটি যখন রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন বক্তব্য হ'লো, দেহের গুহ্যাংশের (মলদ্বারে) ভিতরে বাইরে এঁকেবেঁকে এই রোগের ব্যাপ্তি ঘটে, এটা হয় মলদ্বার ভাল পরিষ্কার না ক'রলে বা না থাকলে। অনেক সময় দেখা যায়, বাইরেটা শুকিয়েছে কিন্তু ভিতরটায় দগদগে ঘা। এটা অল্প অল্প চুলকোয়, তার মানে শুকিয়ে আসছে, এমন ক্ষেত্রে পুনরায় ঘা বেড়ে গেলে ফুস্‌কুড়ি হয়। স্নান, পরিষ্কার

রাখা, শুকনো রাখা না ঘটলে ওই মলের ছিটে দেহের ময়লা, মূত্রজল, এসব মিলে যে ঘা হয় তারই নাম "অহিপূতন"। ক্রমে সেই ঘা রক্তবহ শিরায় এসে উপস্থিত হয়, তার ফলে সারতে বেশীদিন লাগে। অনেক সময় অর্শের উপক্রম করে, মলদ্বার সঙ্কুচিত করে।

এমন ব্যাধিটি শিশুদের দেহে বেশী হয়, এ এক ধরনের কুষ্ঠের অন্তর্গত। এটা সেরেও সারতে চায় না।

এ রোগের অরিষ্ট লক্ষণ হয়, গভীর ক্ষতের বিষাক্ত রসে, বড় বয়সে ভগন্দরও হ'য়ে যায়, আবার অল্প বয়সে অর্শও হয়। সেইজন্য মলদ্বারকে শুচি রাখার কত প্রয়োজন তা যেন অহিপূতন নামেই প্রকাশ করা হ'য়েছে।

ব্রণশোথ

(LOCALISED INFLAMMATION)

সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় শারীর পীড়াগুলিরও শ্রেণী বিন্যাস ক'রেছেন, যেমন নাড়ীব্রণ, সদ্যোব্রণ, শারীর ব্রণ, ব্রণ শোথ প্রভৃতি। এর নামকরণও বিশেষ অর্থ-ব্যঞ্জক। এর কারণ রোগগুলির সম্প্রাপ্তিও যেমন পৃথক স্থানভেদও পৃথক, আবার লক্ষণও পৃথক এবং তার চিকিৎসায়ও বিশেষ পার্থক্য আছে। ওইসব রোগের কোন কোনটা আগন্তুক হ'য়ে আসে, তার কারণ হয়তো কোন ভেষজও হ'তে পারে। সেইসব ভেষজের একটি নামও হয়তো তার ক্রিয়া প্রকাশিকার ইঙ্গিত দিয়ে রাখা হ'য়েছে—যেমন ভল্লাতক, যার প্রচলিত নাম ভেলা (Semecarpus anacardium). —এর ফলের আঠা গায়ে লাগলে ঘা হয়। যেমন ব্রাণঘ্নী মানে ছোট উচ্ছে—এর ডাঁটা পাতা বেটে লাগালে ছোট ফোড়া সেরে যায়। আবার বয়োব্রণ, গালের ব্রণেও এর উপশামক

তা যাক্,, আয়ুর্বেদের মতে ব্রণ (যেকোন ফোড়া) দেহের সব জায়গার ফোড়া একই পদ্ধতিতে চিকিৎসার বিধি নেই; কোনটাকে বসাতে হয়, কোনটাকে ফাটাতে হয়, কোন-টাকে বাড়িয়ে দিয়ে তারপর তাকে সারাতে হয়। তবে সবই নির্ভর করে চিকিৎসকের বিচার বিবেচনার উপর। কারণ ব্রণ শোথের ভাল চিকিৎসা না ক'রলে অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দিতে পারে, তবে সেটা পৃথক পৃথক হ'তে পারে, এটা যদি মর্মস্থানে পরিসর্পিত হয় এবং সেখানে শোথ হয়, তার সঙ্গে জ্বর থাকে ও হিক্কা হ'তে থাকে, তবেই সেটা হবে অরিষ্ট লক্ষণ।

বিদ্রধি

(ABSCESS)

সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় "বিদ্রুধি" পরবর্তী সংস্কৃতে "বিদ্রধি"। দেশীয় ভাষায় ফোড়া—এটি এসেছে স্ফোটক থেকে কিনা বলা যায় না, কারণ আরবের ভাষায় ফুড় একটি অর্থব্যঞ্জক শব্দ আছে। থাক ও তথ্য।

মোটকথা সেই বিদ্রুধি নাম ও রোগটিকে চিহ্নিত করার জন্য চরকীয় সূক্তি—

স বৈ শীঘ্রং বিদাহিত্বাদ্ বিদ্রুধীত্যভিধীয়তে।

অর্থাৎ শরীরের ভিতরে বা বাইরে অত্যন্ত দ্রুত ও প্রচণ্ড জ্বালা যন্ত্রণার সঙ্গে

একটি ব্যাধির জন্ম হয়, তার নাম বিদ্রূধি। ওই বিদ্রূধিই পরবর্তী সংস্কৃত ভাষায় বিদ্রধি। ওই বিদ্রধির ব্যাখ্যাটি—"বেত্তি অনেন হৃদয়ং রূণদ্ধি ইতি বিদ্রধি।" অর্থাৎ এ রোগের স্বভাব এমনি যে, যন্ত্রণার বেগে হৃদয়কেও যেন রূদ্ধ ক'রে দেয়।

প্রচলিত পরিচিত ভাষা ফোড়া। এই ফোড়া বা বিদ্রধি যে কেবল শরীরের বাইরে হয় তা নয়, ভিতরে এবং মর্মস্থানেও হয়। তার ইঙ্গিত এইভাবে দেওয়া হ'য়েছে—

গুদে বস্তিমুখে নাভ্যাং কুক্ষৌ বংক্ষণয়োস্তথা।
বৃক্কয়ো প্লীহ্নি যকৃতি হৃদি বা ক্লোমি বাপ্যথ॥

অর্থাৎ এমন সব বিদ্রধির জন্ম হয় যেগুলি মলদ্বারের মুখে, বস্তিমুখে, নাভিতে, কুক্ষিদেশে, কুঁচকিতে, প্লীহায়, যকৃতে, হৃদয়ে ও ক্লোমেও—এক এক ফোড়ার যন্ত্রণা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে। সবই অব্যক্ত আর অসহ্য, কি যে তফাৎ প্রত্যেকটির যন্ত্রণার তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না কিন্তু প্রত্যেকটিরই যন্ত্রণা পৃথক।

সবই ব্যাধি, সবই কষ্টসাধ্য, তবে সবেরই চিকিৎসা হয়, কিন্তু তাদের যদি অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দেয় তবে রোগীর মৃত্যু ঘটা অসম্ভব নয়। সেই অরিষ্ট লক্ষণ হলো—যদি ওই সময় মূত্ররোধ, বমি, হিক্কা, পিপাসা প্রভৃতি জোটে, সেইসব লক্ষণই অরিষ্ট বা অশুভ লক্ষণ। আর পেকে ফেটে যাওয়া ফোড়াগুলি যদি মর্মস্থানে হয় যেমন প্লীহা, যকৃৎ, মস্তিষ্ক, নাভির মধ্যভাগে, ক্লোমে, কণ্ঠনালিতে, তাহ'লে কল্পনাও করা কঠিন এর পরিণতি কোন্‌দিকে।

বৃদ্ধি
(ENLARGEMENT OF THE SCROTUM)

বৃদ্ধি শব্দটি খুবই পরিচিত ভাষা, কিন্তু ওই বৃদ্ধি কার? প্রথমেই বলি, বৃদ্ধি শব্দটি বৈদিক, ওটি আছে ঋক্‌বেদের ১।১০।১২ সূক্তে। ওখানের বক্তব্য হ'লো বর্ধন ও উপচয়। আর প্রসঙ্গটি আছে চন্দ্রকে নিয়ে, তারপর সংস্কৃত ভাষায় ওই বৃদ্ধিকে বহু প্রসঙ্গের আদিতে ও অন্ততে বসানো হ'য়েছে। এমনকি নীতিশাস্ত্রেও বলা হ'য়েছে—"বৃদ্ধি কালে তু সম্প্রাপ্তে দুর্জনোঽপি সুহৃদ্‌ ভবেৎ" অর্থাৎ সময় যখন অনুকূল হ'য়ে বৃদ্ধির মুখে আসে, তখন যে ছিল শত্রু, সেও তখন বন্ধু হয়। তা যাক্‌, আয়ুর্বেদীয়গণ বৃদ্ধি মানে বাড়-বাড়ন্ত এই অর্থেই গ্রহণ ক'রেছেন এবং তা শরীরের যাবতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রেছেন। বায়ু বৃদ্ধি, পিত্ত বৃদ্ধি, কফ বৃদ্ধি তো আছেই, তাছাড়া আছে সপ্তধাতুর বৃদ্ধি, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিরা ধমনী স্রোতের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি। কিন্তু বৃদ্ধি নামটিকে বিশেষ পরিধিতে আটকে রেখেছেন নিম্নলিখিত সাতটি স্থানে; বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ (Heamatocil), মেদোজ, মূত্রজ (Hydrocil) ও অন্ত্রজ (Ingunal hernia)। সার কথা হ'লো, আহার বিহারের অজ্ঞতার জন্য যাঁরা কোন নিয়ম মানতে চান না এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা এবং প্রত্যক্ষ ক্রিয়াযোগেও শিক্ষা না নিয়ে ব্যায়াম করেন, কিম্বা জোর ক'রে মলমূত্রের বেগ ধারণ করেন কিম্বা বেগ দিয়ে মলমূত্র ত্যাগ ক'রতে চান, তাঁরাই ওই সাত প্রকার বৃদ্ধি রোগের কোন না কোন একটিতে আক্রান্ত হ'য়ে পড়েন। সেই অন্ত্রজ বৃদ্ধির বিশেষ অশুভ হ'লো, বাতজ বিকারের আক্রমণ হ'লে। অর্থাৎ মৃদু মৃদু ব্যথা থেকেই যায়, বাইরেটা ক্রমশ খসখসে হয়। আর প্রায়ই মলবদ্ধ, মূত্রস্তব্ধতা আসতে থাকে—সেইটাই তার অশুভ লক্ষণ।

ব্রধ্ন (বাঘী/বাউসী)

(BUBO)

কেন যে এই ব্রধ্ন নাম দিয়ে এক বিশেষ ধরনের রোগকে চিহ্নিত ক'রেছেন আয়ুর্বেদীয়গণ, সেটা বহু চেষ্টা ক'রেও সেই প্রাচীন রীতিতেই ঘোরাফেরা ক'রেছেন। ব্রধ্ন নাম সংস্কৃত ভাষা। এই শব্দটি পাওয়া যায় মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ২৩১ শ্লোকে। ওখানে ব্রধ্ন নাম উদ্ধৃত হয়েছে। ওখানের বক্তব্য, ব্রধ্ন মানে সূর্য, এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে গাভী ও ষণ্ড দান করেন তিনি ব্রধ্নস্য পিষ্টপম্ প্রাপ্নোতি। অর্থাৎ সূর্যলোকে বাস করেন। আয়ুর্বেদীয়গণ যে অর্থে ব্রধ্ন শব্দের উল্লেখ ক'রেছেন তাতে বন্ধন এই অর্থই হয়। তার আভ্যন্তরীণ অর্থ হ'লো যাঁরা অভিষ্যান্দিকর (কফকারক দ্রব্যই অভিষ্যন্দিকর) দ্রব্য অত্যধিক অভ্যাস করেন, তাঁদের দেহের মলবহ স্রোতগুলিতে খুব ক্লেদ হয়। পানীয়ের ক্ষেত্রেও তাই। তাই বলা হ'য়েছে—

অত্যাভিষ্যান্দি গুর্বন্ন—শুষ্ক পূয্যুষিতাশনাৎ।
করোতি গ্রন্থিবৎ শোথং সঃ শোথো বক্ষ্মণ সন্ধিষু জায়তে,
স এব ব্রধ্নঃ।

অর্থাৎ খুব অভিষ্যান্দিকর, গুরুপাক অন্নপানীয় (মদ্য মাংসাদি) গ্রহণ করার অভ্যাসে ক্রমেই তাঁদের দেহ ভারী হ'তে হ'তে অনেক সময় বংক্ষণে (কুঁচকিতে) একটা গ্রন্থির মত শোথ হয়—এইটার নামই "ব্রধ্ন"। এটা জন্মে বংক্ষণ দেশের রক্তবহ ধমনীর মাধ্যমে। অনেক সময় পুরুষের দেহের অন্ডকোষের সংকোচন বিকাশন ক্রিয়াটাকেও স্তব্ধ ক'রে দেয়।

দড়্‌কচা, ডাঁসাপাকা ফোঁড়ার মত অত্যধিক যন্ত্রণা হয়। এটা অতি উৎকট আবেগের সঙ্গে স্ত্রীসঙ্গ ক'রতে গেলেও হয়, আবার সংক্রামক বীজাণুর সংস্পর্শেও হয়। এই রোগটির সম্পর্কে একাদশ শতকের চক্রদত্ত নামক গ্রন্থের টীকাকার শিবদাস সেনের অভিমত—তখনকার দিনে এটিকে বাউসী রোগও বলা হ'তো। চক্রদত্ত ব'লেছেন, শস্ত্র চিকিৎসা দ্বারাই এ রোগের প্রশস্ত চিকিৎসা হ'লেও ভৈষজ্য চিকিৎসাও এর অনুকূল হয়। কিন্তু এ রোগটিতে প্রলেপ চূর্ণ প্রভৃতি ব্যবহারের পূর্বে যদি অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দেয় অর্থাৎ অনিপুণ চিকিৎসকের কুচিকিৎসার দোষে (উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে) ব্যাধি গুরুতর হয়, তবে তাতে প্রচণ্ড তাপে জ্বর, অবসাদ, শূল এবং ঘন ঘন বমি হ'তে থাকলে সেইটাই তার অরিষ্ট লক্ষণ।

বিদ্ধ

আয়ুর্বেদীক গ্রন্থমালায় আছে—

নানাধারমুখৈঃ শস্ত্রৈর্নানা স্থান নিপাতিতৈঃ। ভবন্তি নান কৃতয়ঃ

অর্থাৎ নানান ধরনের ধারওয়ালা অস্ত্রের দ্বারা শরীরের নানা স্থানে আঘাত লাগলে সদ্য সদ্য তা ক্ষত হয়। তবে মর্মস্থান বিদ্ধ হ'লে গোড়া থেকেই অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়। সন্ধিস্থান বিদ্ধ হলে গোড়া থেকেই দ্রুত শোথ, আর বলক্ষয় হয়, আর অস্থি বিদ্ধ হ'লে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয় (যদি অস্থিক্ষয় না হয়) তবে অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়

কদাচিৎ। আর মাংস বিদ্ধ হ'লে একটু বিলম্বে সেরে যায়। কিন্তু মাংস মর্মবিদ্ধ হ'লে সেই স্থানটি স্পর্শশক্তি হারায়। আর যেসব বিদ্ধ পক্ষাঘাত ঘটায়, উন্মাদ ঘটায়, বমি, শ্বাস, কাস প্রভৃতি ঘটায় সেসব বিদ্ধ অরিষ্ট লক্ষণেই আক্রান্ত হয়।

ভ্রম রোগ

(VERTIGO)

ভ্রম একটা ব্যাধি, এই ভ্রম ব্যাধির অর্থ কিন্তু শুদ্ধ ভুল হওয়া নয়, ভুলে গিয়ে ভুল হওয়া; রোগটা কিন্তু মনোবহ স্রোতের। এই রোগটির পাশ্চাত্ত্য নাম Vertigo- কিন্তু Gidiness নয়। প্রচলিত শব্দ ভুল এসেছে প্রাকৃত ভাষা ভুল্ল থেকে, আর ভ্রম শব্দটি এসেছে ঋক্‌বেদের ৬।৬।৪ সূক্ত থেকে। যাঁর ভুল তিনি বুঝলে সেটা তো রোগ নয়। যেটা দেখা, যেটা করা, যেটা বলা তার অভ্যাস, সেটার অসঙ্গতি হ'লেই তবেই তো রোগ। আর জানা জিনিসের না চেনাটাই তো ভ্রম রোগের পর্যায়ে পড়ে। যদিও ভ্রম থেকে ভ্রান্ত এসেছে, তাই বলে এটা ভ্রম রোগ নয়, ভ্রম আসে অনবস্থানতার জন্য অর্থাৎ যা একস্থানে থাকে না অর্থাৎ স্থিরচিত্ত নয়। এই রোগের অবস্থাগত শব্দ চয়ন ক'রতে গেলেই মনে আসে মনের সঞ্চারণ, ঘূর্ণন, আবর্ত প্রভৃতি শব্দগুলি। এই শব্দগুলি ওই ভ্রম শব্দের পর্যায়বাচী ক'রলে অনেকটা ঠিক হ'লেও ভ্রম শব্দের প্রকৃত বক্তব্য বলা হয় না। যদি কোন আগন্তুক কারণে ভ্রম রোগ না হয় (যেমন কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহারে, অথবা কোন বিষাক্ত দ্রব্য সেবন জন্য) তাহ'লে পিতৃকুল বা মাতৃকুলে যদি কোন মূর্ছা রোগের ইতিহাস না থাকে, তাহ'লে ভ্রম রোগ আসে না ব'ললেই হয়। তবে বয়সের স্বভাবধর্মে অনেকের আসে, তাকে আমরা চ'লতি কথায় কথায় ব'লে থাকি "বাহাত্তুরে" ধ'রেছে; অর্থাৎ ৭২ বৎসর বয়সের পর অনেকের এটা আস্তে আস্তে আসে; আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে এটা কিন্তু রোগের পর্যায়ে ধরা হয় না। শিরা ধমনী প্রভৃতি স্রোতের মাধ্যমে মনোবহ স্রোত যদি বায়ু-পিত্ত-কফের বিকারে আক্রান্ত হয় তখনই প্রথম ভূমিকা হয় মূর্ছার, তা সে মূর্ছার প্রাবল্য বা অল্পতা যদি থাকে ভ্রম রোগের অবস্থাও তেমনি হবে, কিন্তু মূর্ছা রোগ প্রবল হ'লে ভ্রম রোগটা সঙ্গে সঙ্গেই আসে ঠিকই কিন্তু এলেও মূর্ছার প্রাবল্যে তা চাপা প'ড়ে যায়, মূর্ছাটাই তখন প্রধান হয়। আর মূর্ছার কারণগুলি দুর্বল হ'লে ভ্রম রোগটা প্রায়ই হয়।

সন্ন্যাস

(APOPLEXY)

আয়ুর্বেদীয় সংহিতায় একটি রোগের নামকরণ করা আছে সন্ন্যাস রোগ। এই নামটির অনুশীলন করতে গেলেই প্রশ্ন ওঠে—এটা কি শব্দার্থভেদী নাম? নাকি শব্দার্থ লক্ষ্যমাত্র নাম? অর্থাৎ আয়ুর্বেদ সংহিতায় এই রোগটির নামকরণের ব্যাপারে কি সংস্কৃত ভাষার অন্যান্য গ্রন্থের অর্থ গ্রহণ ক'রে কি বলা হবে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গৃহত্যাগ করাই সন্ন্যাস? তাহ'লে এই রোগ দেখা দিলে এই দেহগৃহটি পরিত্যাগ করার আগে সব পরিত্যাগই ঘটে নাকি?

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যায়—এই রোগটির নাম যে সন্ন্যাস তা শব্দার্থ লক্ষ্য নামই হবে, কারণ আমাদের দেহে এই রোগ দেখা দিলে প্রথমে কি হয় তার লক্ষণের সঙ্গেই সন্ন্যাস নামকরণের সার্থকতা আসে।

সংহিতায় বলা হ'য়েছে, মূর্ছা রোগেও দেখা যায় ব্যক্তিটি হঠাৎ প'ড়ে যায় কিম্বা বাক্য মন দেহের সব ক্রিয়া যেন বন্ধ হ'য়ে গিয়ে এমনভাবে প'ড়ে যায় যেন সবকিছু পরিত্যাগ ক'রেই লোকটি চ'লে গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার এই দেহগৃহে ফিরে আসে, তখনই বলা যায়—

দোষেষু মদ মূর্চ্ছায়াঃ কৃত বেগেষু দেহিনাম্। স্বয়মেবোপ শাম্যন্তি

অর্থাৎ মদ্যপানের মাত্রা ছেড়ে গেলে এবং মূর্ছা রোগের প্রচন্ড বেগ হ'লে একেবারে হতজ্ঞান, হতচেষ্টা, হতবাক্ হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে যায়, বেশ অনেকটা সময় ওইভাবেই থাকে, কিন্তু কিছু পরেই আপনা-আপনি শান্ত হয়, আবার ওঠে, এবং এমনভাবে কথা বলে যে, ওর কি হ'য়েছিলো তা জানে না, এমন অবস্থা যে সময়ে ঘটেছিল সে সময়ের কোন কিছু অবস্থাই মনে থাকে না; এইভাবে জাগার জন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাস রোগ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ যদি তীক্ষ্ন ওষুধ না দেওয়া যায়, তবে সত্যই সে গৃহত্যাগী অর্থাৎ দেহত্যাগী হ'য়ে সন্ন্যাসীই হয়, আর ফিরে ঘরে আসে না। "সন্ন্যাসো নৌষধৈর্বিনা" অর্থাৎ খুব তীক্ষ্ন ওষুধ ছাড়া আর বাঁচে না। কারণ ওই সন্ন্যাস রোগটি প্রাণের আয়তন যে চেতনার স্থান, যা নাকি হৃদয় আশ্রয় ক'রে সমগ্র দেহের গতি চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে, সন্ন্যাস রোগের উত্থান পতন ওই আয়তনেই ঘটে।

তবুও প্রশ্ন ওঠে যে, এই অবস্থাকে রোগ বলা হবে কেন? ও তো প্রাণস্পন্দনের স্তব্ধতাই সৃষ্টি করে? ও সন্ন্যাস তো একটা অবস্থা বিশেষ যা নাকি মৃত্যুরই একটি চমকপ্রদ অতিথি মাত্র।

তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, দেহের মধ্যে বায়ু পিত্ত কফের বিকার প্রবল হ'য়ে প্রাণের আয়তন স্থানটি আক্রমণ করে তবেই সন্ন্যাস রোগ হয়। যদিও বায়ু, পিত্ত, কফ সব রোগেরই মূলীভূত কারণ, তাই কোষ্ঠ ভেদে তার রোগও পৃথক পৃথক হ'য়ে থাকে, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তো প্রাণের আয়তন আক্রান্ত হয় না, তাই এমন প্রাণঘাতীও হয় না। তবে এখানে আর একটা কথাও আছে, সব সময়ে বা সব ক্ষেত্রে এই বায়ু, পিত্ত, কফের প্রাবল্যের কোন না কোন একটি আধিক্য বা ন্যূনতা ঘটে, সেই সব ক্ষেত্রেই এ রোগাক্রমণ হ'লেও দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না, ফলে সেযাত্রা বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে কোন একটা অঙ্গের বৈকল্য ঘটে যায়। এই রোগটির সম্পর্কে একটি কথাই বলা যায় যে, এই রোগটাই অরিষ্ট বা অশুভ, সুতরাং লক্ষণের পার্থক্য কি ক'রে করা যাবে!

সর্বাঙ্গ বাত

(RHEUMATISM)

সংস্কৃত ভাষায় সরস্বতীর বর্ণনায় দেখা যায়, "সর্বশুক্লা সরস্বতী" অর্থাৎ "যিনি সর্বাঙ্গে শুক্লা"। এ কথাটা এক রাজ-কবিরাজ বা কবিরাজের মাথায় ঢুকে গেল—কি রকম? তাহ'লে দেবী সরস্বতীর মস্তকের কেশ, চোখের তারা, চোখের পল্লব, ওগুলিও কি সাদা? তাহ'লে সে আবার কি মূর্তি? অতএব ওখানে "সর্ব" শব্দের সঙ্কোচ ক'রতে হবে ওইসব অঙ্গে।

আমাদের আয়ুর্বেদেও যখন "সর্বাঙ্গগত বাতবিকার" এ কথাটা দেখি, তখন তাতে

মনে এ প্রশ্ন ওঠে, তাহ'লে অর্থাৎ সর্বাঙ্গগত বাত বললে পৃথক পৃথকভাবে বাত-লক্ষণ বা বাতব্যাধি বলার সার্থকতা কি? এককালে যদি দেহের সর্বত্রই বাতবিকার হয় তাহ'লে প্রাণবায়ু কোথায় বইবে? রক্তও তো একটা অংশ, রসও একটা অংশ, তা'হলে তার দেহে প্রাণবায়ু বইবে কি ক'রে? সবই তো অচল হ'য়ে যাবে?

এইবার রাজ-কবির মাথায় ঢুকলো—দেখা যাক অঙ্গ মানে কি? তারপর মনে প্রশ্ন জাগলো, কেন? "অঙ্গ" তো একটি দেশেরও নাম (অঙ্গদেশ), ব্যক্তির নাম "অঙ্গদ", গানেরও নাম অঙ্গ আছে, খাদ্যের অংশের নামও অঙ্গ (রস, গুণ, বীর্য প্রভৃতি); তাহ'লে?

এইবার তিনি ব্যাকরণের আশ্রয় নিলেন, দেখলেন—পাণিনির ২।৩।২০ সূত্রে বলা আছে, যা চিহ্নিত হয়, বা অঙ্কিত করা যায় তারই নাম অঙ্গ। এটি অঙ্ক থেকে অঙ্গ হ'য়েছে। তাহ'লে আয়ুর্বেদ যাকে অঙ্গ বলে সেও এসেছে ওই অঙ্ক থেকে? তা'হলে এইটাই সমাধান সূত্র যে, সর্বাঙ্গ বাত বললেই বুঝতে হবে যা কোষ্ঠগত বাতবিকার নয়, কারণ কোষ্ঠ তো একটি সংকেত পরিভাষা, আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক, ফুস্ফুস্ এইগুলির নামই তো কোষ্ঠ। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে সর্বাঙ্গ বাত মানে কোষ্ঠ বাত নয়, অর্থাৎ ওগুলি বাদ দিয়ে, বাকী চিহ্নিত অংশের বাতই অঙ্গ বাত, অর্থাৎ এককালে এমন বাতরোগ হবে, যাতে গায়ে, হাতে, পায়ে যন্ত্রণা, কাঁটা দিয়ে ওঠা, এবং সন্ধিস্থলগুলিতে যন্ত্রণা ও ছুঁচ বেঁধার যন্ত্রণা—অসম্ভব যন্ত্রণা থাকবে।

তা বলে মূত্রকৃচ্ছ্রতা, অগ্নিমান্দ্য, মলসংকোচ বা অতিসার ঘটাবে না অথবা দেহের কোষ্ঠগত কোন অংশের উপরেও বাতবিকারের প্রভাব থাকবে না। তথাপি সর্বাঙ্গগত বাতের যন্ত্রণা আর তাতে কোন রকম শোথও থাকবে না, তখন হবে রসগত। এইভাবেই সর্বাঙ্গগত বাতের লক্ষণ বিচার ক'রে নিয়েই তারপর দেখতে হবে এই সর্বাঙ্গগত বাতের অরিষ্ট লক্ষণ কি?

সর্বাঙ্গে তু বিশেষোহি ধাতুক্ষয় বিশিষ্যতে।

অর্থাৎ সর্বাঙ্গ বাতের আক্রমণের সঙ্গে যদি প্রতিদিন ধাতুক্ষয় হ'তে থাকে অর্থাৎ রস রক্তাদির ক্ষয় হ'তে থাকে, তবে তেমন সর্বাঙ্গগত বাতে আক্রান্ত লোকের চিকিৎসা ক'রলেও সুস্থতা আনা যায় না। এইগুলিই তার অশুভের পরিচায়ক।

ক্রোষ্টুকশীর্ষ

(SYNOVITIS OF THE KNEE JOINT)

এই ক্রোষ্টুকশীর্ষ বাত রোগটি এমন জায়গায় হয়, যেটির নামকরণের তাৎপর্য উপমাবাচক না ক'রে বোঝানই যায় না। ক্রোষ্টা বা ক্রোষ্টু শব্দের অর্থ শৃগাল, সুতরাং শৃগাল বললেই বা কি দোষ হ'তো? বরং সহজবোধ্যই হ'তো।

এর উত্তরে এইটাই ব'লতে হবে, যিনি এই নামকরণ ক'রেছিলেন তার সমীক্ষা কতটা নিখুঁত, সেটা বৈদ্য প্রত্যক্ষ ক'রে থাকেন।

কেন এই নামকরণ তা ব'লছি—শৃগাল শব্দটি ওই পশুর সাধারণ নাম। যে পশুটি রক্তের গন্ধ পেলে তার চোয়াল ব'য়ে লালা পড়ে এবং চাটে, তার নাম শৃগাল। "সৃজং=শোণিতং আলতে"।

এই রোগটির আকৃতি শৃগালের মস্তকের মত ঠিকই, কিন্তু ক্রোষ্টু নামটির দ্বারা

তার যে আকৃতি বোঝায়, শৃগাল নামে তা হয় না। ক্রোষ্টু নামটি তখন হয় যখন ওই শৃগাল কাঁদে, তখন তার কণ্ঠের স্বর এবং মাথাটির অবস্থান যে ধরনের হয়—সেটার আকৃতি কেমন হয় তা তো আর সকলের নজরে পড়া সম্ভব নয়, কিন্তু এই ক্রোষ্টুক-শীর্ষক রোগটির আকৃতি দেখলে অনায়াসেই কল্পনা ক'রে নিতে পারেন যে এটা যথার্থ। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ওই স্থানটায় (হাঁটুতে) হাত দিলে বা একটা ঠোকা মারলেই ব্যথাতুর হয়ে মুখভঙ্গীটার যে সাদৃশ্য থাকে সে ঠিক শৃগাল মুখ উঁচু ক'রে কান্নার সুরে যেমন ডাক ছাড়ে। আর হাঁটুটার আকৃতিও ঠিক শেয়ালের মাথার মতই হয়।

রোগটি শুধু বায়ুবিকার থেকেই হয় না, এটি "বাত শোণিতজ" অর্থাৎ এককালে বায়ুও যেমন কুপিত ও বিকৃত হয় তেমনি শরীরের রক্তধাতুও বিকৃত ও ব্যাকুলিত হয় সেই কুপিত বায়ু দ্বারা। তাই বলা হ'য়েছে—

বাত শোণিতজঃ শোথো জানুমধ্যে মহারুজঃ।
জ্ঞেয়ঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষস্তু স্থূলঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষবৎ॥

রোগটির প্রকৃতিই এমনি যে, ঠাণ্ডা প্রলেপ দিলে, বা শীতবীর্য ওষুধ দিলে আরও শক্ত হ'য়ে অচল ক'রে দেবে, আবার গরম সেঁক বা গরম প্রলেপ অথবা উষ্ণবীর্য (গরম) ওষুধ দিলে কিম্বা খাওয়ালে পাকা ফোড়ার কষ্ট সুরু হবে। অসম্ভব রকমের কষ্ট এই বাতরক্তজ ব্যাধির। এর চিকিৎসা ক'রলে সারে ঠিকই, কিন্তু অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দিলে তা অসাধ্য। সেই অরিষ্টের লক্ষণটি হ'লো যদি সর্বাঙ্গে শোথ দেখা দেয়।

তাই বলা হ'য়েছে—

ক্রোষ্টুকশীর্ষক ইত্যাখ্য শোথাঽরিষ্ট প্রমুচ্যতে॥

অংশশোষ ও অববাহুক

(FRIGID SHOULDER OR STIFFNESS OF THE SHOULDER JOINT)

যা বিভাগ করা যায় অথবা বিভক্ত দ্রব্যের নাম অংশ। তা সে ধন-সম্পত্তিই হোক্ আর দেহই হোক্।

বহু পূর্বেই ভারতীয় চিকিৎসকগণ প্রত্যক্ষ ক'রেছেন, শল্যচিকিৎসার দ্বারা শরীরের বহু অংশ বিভক্ত করা যায়, তবে যে অংশ বিভক্ত ক'রলে আর প্রাণ থাকে না, সেটা নয়; তাকে অংশ বলা হয় না।

এখানে যে রোগটির নাম "অংশ শোষ" সেটি দেহের ঊর্ধ্বাংশ বাহু সম্পর্কে। পা দুটিও দেহাংশ, তাদের ব্যাধি হ'লেও বলা যাবে অংশশোষ, কিন্তু যখন বলা হবে "অববাহুক" তখন কিন্তু অংশশোষ মানে ওই বাহু দুটি অবলম্বন ক'রে। ভারতীয় চিকিৎসকগণ অংশশোষ বলার পরেই উল্লেখ করেন এটা পাদাংশ হলে "কলায় খঞ্জ" আর বাহুগত হ'লে "অববাহুক", কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে বায়ু, পিত্ত, কফের বিকারের তারতম্য আছে।

এখন, এখানে প্রশ্ন এসে যাচ্ছে—কাঁধেও (স্কন্ধে) তো ত্রিধাতুর (বায়ু, পিত্ত, কফ) অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ সর্বাঙ্গে যেমন থাকে, স্কন্ধেও তেমনি। স্কন্ধের অভ্যন্তরে বন্ধন স্নায়ু দ্বারা ঝোলান থাকে দুটি হাত (বাহু), কিন্তু আহার, বিহার বা অভিঘাতের দরুণ যদি স্কন্ধে বায়ু ওখানের শ্লেষ্মন ধাতুকে শুকিয়ে দিতে থাকে তবে তা হবে

অংশশোষ। একটি বা দুটি বাহুই ক্রমে শুকিয়ে দেবে। এ রোগ বায়ু-জন্য এবং আরম্ভ থেকেই ওটা অশুভ বা অরিষ্ট দোষে দুষ্ট।

আর ওই স্কন্ধের বায়ু যদি শিরাকে সঙ্কুচিত করে তবে হবে অববাহুক। এটার অরিষ্ট হ'লো, যদি ওই সময় অংশশোষ হ'তে থাকে তবেই। নইলে হস্তচালনা, শিরা প্রসারিণী, মালিশ প্রভৃতি উপায়ে নিরাময় হবে।

প্রশ্ন ওঠে—তাহ'লে শোষ এবং সংকোচে তফাত কি? প্রভেদ হ'লো এই যে, উভয়ের মধ্যে থাকে সম্প্রাপ্তিগত ভেদ—যেখানে শিরাব্যধ, সেটা ওষুধের বা সূচীভেদ দ্বারা নিরাময় হয়। আর শোষ রোগ হ'লে তার আর পথ থাকে না। সুশ্রুতের উক্তিতে দেখা যায়—

"সংশোষণাৎ রসাদীনাং শোষ ইত্যভিধীয়তে"

অর্থাৎ রস থেকে আরম্ভ ক'রে অন্যান্য ধাতুগুলিও যখন শুকোতে আরম্ভ করে, তখনই শোষ রোগ।

এই শোষ রোগটির ব্যাপ্তি অনেক। যক্ষ্মারোগের অন্যতম কারণ শোষ।

ঊরুস্তম্ভ

(LOCOMOTAR ATASEIA)

ঊরঃক্ষত রোগ ও তার অরিষ্ট লক্ষণ কি কি সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

এখানের বক্তব্য, একটি হ্রস "উ" আর সামান্য একটু রেখাপাতের তফাতেই যে "ঊ" (দীর্ঘউকারটি) একেবারে পৃথক অর্থ প্রকাশ করে তার বিশেষ প্রমাণ উর মানে বক্ষ, আর ঊরু মানে জানুর উপরিভাগ। এই ঊরুটি একটি বিশেষ ধরনের রোগের আধার বা ক্ষেত্র। অর্থাৎ দুটি পায়ের জঙ্ঘায় এমন রোগ হয় যে, এ রোগের সুচিকিৎসা না হ'লে অসাধ্য হবেই। এখানে স্তম্ভ মানে থাম। স্তম্ভ থেকেই থাম আর ওই ঊরু থেকেই ঊর্ব্বী অর্থাৎ পৃথিবী। একেবারে স্তব্ধ পৃথিবীর অবস্থা ঘটে দু'টি জঙ্ঘায়।

এর কারণ থাকে, অজীর্ণ আম দোষ নিঃশেষিত না ক'রে যাঁরা আহার ক'রতে অভ্যস্ত, এবং হাঁটা চলা বিশেষ করেন না, তাঁদের দেহে ক্রমশ মেদ জন্মে; এর ফলে শরীরে বায়ু এবং পিত্তবিকার কম হ'য়ে শ্লেষ্মা আর মেদোবিকারটা বাড়তে থাকে। আয়ুর্বেদীয় চিন্তায় এক্ষেত্রে আবরক শ্লেষ্মার চিকিৎসা আগেই ক'রতে হয়, এবং সেইটাই প্রধান চিকিৎসা। নইলে তারই ফলে দুটি পা ভারী হ'তে থাকে। এই সময় চিকিৎসক ও রোগী উভয়েই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'তে থাকেন। সন্দেহ হ'তে থাকে এটা কি বাত? এই ভ্রম নিরসন করার জন্য—

"গূঢ় লিঙ্গং ব্যাধিং উপশয় অনুপশয়াভ্যাং পরীক্ষেত"

অর্থাৎ যে ব্যাধির পরিস্ফুট রূপ দেখা যায় না, সেক্ষেত্রে রোগ ধরার সহজ লক্ষণ হ'লো গরম বা ঠাণ্ডা সে'ক দিলে বা মালিশ ক'রলে রোগ ক'মছে কিনা দেখে নিতে হবে।

এই ঊরুস্তম্ভ রোগটিও ভ্রম সৃষ্টি করে। পায়ে বাত হ'চ্ছে ভেবে তেল মালিশ ক'রলে রোগ বাড়ে। এক্ষেত্রে রূক্ষ চিকিৎসাই বিধি।

এর অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো, জাং দুটিতে ছুঁচ ফোটার মত যন্ত্রণা, জ্বালা, আর অমন ভারী পায়ে ভিতরে বাইরে কাঁপুনি হ'তে থাকে; এর পরে সামান্য জ্বর হ'তে থাকে। আর ছাড়ে না।

এর শেষ অবস্থা ঊরুস্তম্ভ পাকতে থাকে, তারপর ফেটে যায়। কিন্তু তেমন অবস্থা কদাচিৎ ঘটে, তার আগে অসহ্য যন্ত্রণায়ই মৃত্যুর কারণ ঘটে।

পক্ষবধ
(HEMIPLEGIA)

সংস্কৃত ভাষায় পক্ষ মানে অন্ততঃ ৩০ প্রকার, কিন্তু আয়ুর্বেদীয় পরিভাষায় একটিই অর্থকে গ্রহণ করা হয়। তাৎপর্যার্থ কিন্তু একই, তবে ব্যতিক্রম জ্যোতিষশাস্ত্রে আর ন্যায় দর্শনে। জ্যোতিষীদের বক্তব্যে পক্ষ মানে ১৫ সংখ্যা, এবং সেটি অহোরাত্র ক্রমে এবং শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই ভাগে। আর ন্যায়দর্শনের পক্ষ শব্দের অর্থ একেবারে ভিন্ন। সেখানের বক্তব্য যে পদার্থের বক্তব্যে সাধ্যের সংশয় থাকে, তার মানে সেইটাই পক্ষ যেমন—পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ। আর স্মৃতিশাস্ত্রের বক্তব্যে পক্ষ মানে প্রতিবাদীর সম্মুখে লেখনীয় বাদীর নিবেদিত বিষয়। তা যাক্, আয়ুর্বেদীয় সংহিতাকারগণ পক্ষ শব্দটির অর্থ গ্রহণ ক'রেছেন পরিগ্রহ অর্থে। অর্থাৎ পক্ষয়তি=পরিগৃহ্নাতি পক্ষ। অর্থাৎ যে রোগটি একেবারে গ্রহণ করে, আর পরিত্যাগ করে না। তাই বলা হ'য়েছে—

একাঙ্গ রোগং তং কেচিদন্যে পক্ষবধং বিদুঃ।

অর্থাৎ যে রোগ দেহের একটি অঙ্গকে গ্রহণ করে, কেউ বলেন একাঙ্গ রোগ, আবার কেউ বলেন পক্ষবধ।

এই রোগটার প্রকৃতি এমনি যে শিরা স্নায়ুকে বিশুষ্ক ক'রে দেয়। মুখ থেকে একেবারে পা পর্যন্ত যে কোন অঙ্গের স্নায়ুশিরায় বিকৃত বায়ু এসে সেখানটা ক্রমেই শুকিয়ে দেয়। এতে কিন্তু মৃত্যু হয় না।

তবে এই পক্ষবধেরও অরিষ্ট লক্ষণ হয়, তার আগে আর একটা কথা মনে রাখা ভাল—গর্ভিণী, সূতিকা, বালক, বৃদ্ধ এবং ক্ষীণ প্রকৃতির ব্যক্তি যদি পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, তা'হলে আর খুব বেশীদিন তাকে ধ'রে রাখা যায় না, এটা অবশ্য প্রাচীনদের মত।

আর বিশেষ অরিষ্ট বা অশুভ লক্ষণ হ'লো (আকস্মিক না হ'লে) পক্ষবধ হ'লেও স্থানটি টিপলে লাগবে, কিন্তু ভাল ক'রে জোরে টিপলেও যদি না লাগে তবে আর বেশীদিন তাকে মর্ত্যে রাখা যায় না। এই বেদনাহীন পক্ষবধই তার অশুভ লক্ষণ।

বিশ্বাচী

লোকে কথায় বলে, রসিকতা করারও একটা সীমা আছে; সীমা বা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সে রসিকতায় ক্রোধের উদ্রেক হবেই। অবশ্য এও ঠিক যে, ক্রোধ ক'রলেই কোন ব্যাপারের মীমাংসা হয় না, অথবা সমাধাও হয় না। তাই ব'লতে হয় ভারতীয় আদি বৈদ্যবৃন্দের একি রসিকতা? বেদে মহাভারতে রামায়ণেই পাওয়া যায় বিশ্বাচী নামের অস্তিত্ব। কিন্তু সে নাম তো এক অপ্সরার। তেমন অপ্সরা নামটির সার্থকতা তাঁরা

কোথায় পেলেন এই রোগটির ক্ষেত্রে! যদিও ঋক্‌বেদের ১।৪১।৭ সূক্তে এবং অথর্ব-বেদের ৪।৩৮।১ সূক্তে এই বিশ্বাচী নামের অপ্‌সরা রয়েছে, কিন্তু সেও তো ভাষ্যকার, নিঘণ্টুকার (যাস্ক) এই অপ্‌সরা নামের ব্যাখ্যায় ব'লেছেন, অদ্‌ভ্য সরন্তি ইতি অপ্‌সরা, অর্থাৎ এই অপ্‌সরাগণ আকাশের জলছবি, অর্থাৎ সূর্যকিরণে জলের ও মেঘের থোকায় যে সুন্দর সুন্দর মূর্তিগুলি আকাশে ভাসে তারাই অপ্‌সরা।

তারপর কালের বিবর্তনে সেই জলছবিগুলির অভূতপূর্ব রূপ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে পৌরাণিকগণ কল্পনা ক'রেছেন এই অপ্‌সরারা হ'লেন স্বর্গীয় বেশ্যা। যেমন মেনকা, উর্ব্বশী, ঘৃতাচী, সহজন্যা প্রভৃতি ১৪জন স্বর্গবেশ্যা, আবার তাঁদের মধ্যে (মহাভারত ১।৭৪।৬৮ শ্লোকে) ৬ জন সর্বশ্রেষ্ঠা। এই বিশ্বাচী নামের বেশ্যাটি হ'লেন পঞ্চমা সংখ্যার। তাহ'লে এক ধরনের বাতব্যাধির রোগের সঙ্গে বিশ্বাচী নামে স্বর্গ বেশ্যার কি সম্বন্ধ? এখন দেখা যাক্‌, এই নামের সঙ্গে কিভাবে তার সামঞ্জস্য করা হ'য়েছে।

দুটি বা একটি বাহুর পিছনদিক থেকে আক্রমণ করে; বাহুর পিছনের যে শিরাগুলি আছে সেগুলি একেবারে হাতের তালু পর্যন্ত এসে পেঁ'চেছে, সেই শিরাগুলিতেই এর শুরু, শেষে বাহু থেকে গোটা হাতটাই অকর্মণ্য ক'রে দেয়। এরপর বিশ্বাচী নামের মিল কোথায় তার বর্ণনায় দেখা যায়, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি আর কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি। চোখ কান প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় আর বাক্‌ (কথা) পাণি পাদ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়। রূপবতীর প্রেম শুরু হয় প্রথমে চোখে চোখে, তারপর ক্রমেই (দ্রুত) আর ৪টি জ্ঞানেন্দিয়ে তাদের ক্রিয়াকারিতার ব্যাপ্তি ঘটে, তারপর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তির পর কর্মেন্দ্রিয় সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—তার প্রথম ইন্দ্রিয় বাক্‌ (কথার ফুলঝুরি), তারপর পাণি অর্থাৎ হাত বা করের। এই করস্থানেই থাকে বিশ্বাচী কথার তাৎপর্য। এটা পাওয়া যায় ভরতের অলংকারশাস্ত্রের মধ্যে "বিশ্বাচী প্রণয়বরী" (এখানে বর মানে দেহ) উপাখ্যানের মধ্যে। অর্থাৎ দেহের প্রণয়বিকাশ হয় দুটি হাতে বা করে। এই হাতই তো সব কাজের গুরু-মশাই। অতএব এই হাতের কর্মণ্য শক্তি বিনষ্ট করে ব'লেই তার নাম বিশ্বাচী। জানি না পরবর্তীকালে এর আর কোন ব্যাখ্যা বেরুবে কিনা।

তবে এটা ঠিক যে, এই রোগটির আক্রমণ আসে বাহুমূলের পিছনের শিরাগুলি থেকে, হাতের তালু পর্যন্ত প্রথম প্রথম ব্যথা, তারপর কাঁপুনি, তারপর আকুঞ্চন প্রসারণ-ক্রিয়া যায় থেমে।

এ রোগও সারে যদি প্রথমেই তা ধরা প'ড়ে এবং চিকিৎসক যখন জানতে পারেন যে—

খল্বী তীব্ররুজান্বিতা হি বিশ্বাচী।

অর্থাৎ বিশ্বাচী রোগটির প্রথম থেকেই যদি খিল ধরা এবং তীব্র যন্ত্রণাযুক্ত অবস্থা ঘটে, তবে সে বিশ্বাচীকে আর সারান যায় না। ক্রমশঃ হাত বা হাত দুটি শুকিয়ে অসাড় অবশ হ'য়ে যায়।

গৃধ্রসী

(SCIATICA)

গৃধ্র বা গৃধ্রস্‌ মানে যে অত্যাধিক লোভাতুর হ'য়েও ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে টেনে টেনে খায়। এই স্বভাবটি থাকে ব'লেই শকুনির বোধ হয় এই নাম। এই বাত ব্যাধিটির প্রকৃতি সেই ধরনেরই। যে শিরায় এই বাতটি আশ্রয় ক'রে যন্ত্রণা দেয় তারও নাম গৃধ্রসীশিরা—

এরই নাম সায়েটিকা নার্ভ। যার হয় তিনিই বলেন, প্রথমে শুরু হয় পাছায় আর কোমরে ফিক্ ব্যথা (অর্থাৎ স্ফিক্ মানে পাছা) তারপর দেহের কটিদেশ ও পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত আক্রমণ করে, তারপর আস্তে আস্তে নীচের দিকে নেমে উরুস্থান, জঙ্ঘা, জানু ও পায়ে এসে স্থিতিলাভ করে। বারবার যেন টেনে টেনে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টান ধরায়; তাতে জঙ্ঘা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত কাঁপে আর অসহ্য যন্ত্রণা দেয়। এটা পুরোপুরি বাতবিকার। এটাকে যদিও যত্ন নিয়ে সারানো যায় কিন্তু এই বাতবিকার গৃধ্রসী রোগে অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দিলে আর সারানো যায় না। এর অশুভ লক্ষণ হ'লো, বায়ুর বিকারের সঙ্গে যদি কফবিকারও ঘটে, তখন তার লক্ষণ হবে, ক্রমেই অরুচি, তন্দ্রা এবং ঐ যন্ত্রণার সঙ্গে মোটা না হ'য়েও ভারী হওয়া।

পাদহর্ষ

(ANAITHESIA)

শুধু আমাদের বেলায় পাদ বা পা নয়, অন্য অন্য ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ তো দেখা যায়, যেমন বৃক্ষকে বলি "পাদপ", শ্লোকের বাকী অংশটা পূর্ণ করার বেলায় বলি "পাদপূরণ" ক'রতে হবে। পর্বতের পাদদেশ এটাও তো ব'লে থাকি। তাহ'লে পাদ শব্দটি মানুষের অঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর নিশ্চয় পৃথক অর্থও আছে।

এই পাদ শব্দের অর্থ হ'লো, শরীরের যে অঙ্গ দ্বারা অপ্রাপ্ত স্থানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তারই নাম পাদ বা পা।

এই পাদ অঙ্গে অনেক রকম রোগ হয়, তাদের মধ্যে উপরিউক্ত রোগও একটি অর্থাৎ পাদ অঙ্গে হর্ষ; অবশ্য হর্ষ শব্দটির অর্থগত সংস্কার এমনি যে, আমরা ভাবতেই পারি না যে হর্ষ মানে আনন্দ, উল্লাস ছাড়া আরও কিছু হ'তে পারে। কিন্তু আয়ুর্বেদীয় সংহিতায় বলা হ'য়েছে—

হৃষ্যেতে চরণৌ যস্য ভবেতাং চাপি সুপ্তকৌ পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।

অর্থাৎ যার দু'টি পায়ে মাঝে মাঝে হর্ষ দেখা দেয় আর অসাড় হ'য়ে যায়; সেই ব্যাধিরই এই নাম। যদিও অনেকটা সরল অর্থ হ'লো, তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, হর্ষের উদয় হয় মনে—সে আবার পায়ে কি করে? এর উত্তর হ'লো, হ্যাঁ, পায়েও হয়, হর্ষ শব্দের আর একটি অর্থ শিহরণ অর্থাৎ শিউরে ওঠা, রোমাঞ্চিত হওয়া। কিন্তু এ রোগটিরও অরিষ্ট লক্ষণ হয়, তার একটি হ'লো সুপ্ততা আর একটি হ'লো সাময়িক ও স্থায়ী অবস্থা। যখন সাময়িক হয় তখন তার সঙ্গে কিছুটা ব্যথাও থাকে; একে প্রচলিত কথায় টিস্‌টিস্ বা ঝন্‌ঝন্ বলা হয়। এটা কিন্তু কফসংযুক্ত বায়ু-বিকারের জন্য। সেটা অরিষ্ট নয়। কিন্তু চিরানুবন্ধিনী সুপ্ততা অর্থাৎ ঝিন্‌ঝিন্ ক'রতে ক'রতে পায়ের তলাও অসাড় হ'য়ে যাচ্ছে এবং কিছুতেই ক'মছে না, তখনই বুঝতে হবে এ আর সারবে না। ক্রমশঃ বাড়বেই। পাদহর্ষের এইটাই অরিষ্ট লক্ষণ।

বাতকণ্টক

(ANKLE COLONUS/CALCANEUS SPUR)

এই কণ্টক শব্দটি এমন অর্থ নিয়ে গঠিত যে, দেহ-মনের আবাস-নিবাসে ব্যথা-

বেদনা এবং প্রতিকূলতা যেখানে, কণ্টক শব্দের উপস্থিতি সেখানে আছেই; এইটাই বক্তব্য। অতএব আহার-বিহার এমন হওয়া দরকার যেখানে কণ্টকের সামান্য সংসর্গও না ঘটে; কিন্তু তা হয় কৈ?

এই যে চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি, আর বাক্-পাণি-পাদ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়—এরা কি দেহ-মনকে নিষ্কণ্টক ক'রতে দেয়? না দেবে? তা কোন কালেই হয়নি; হবেও না। এইজন্যই বাতকণ্টক রোগটির ক্ষেত্রেও চিকিৎসকগণ দেখেছেন—

রুক্ পাদে বিষমন্যস্তে শ্রমাদ্বা জায়তে যদা।
বাতেন গুল্ফমাশ্রিত্য তমাহুর্বাতকণ্টকম্॥

অর্থাৎ হিসেব ক'রে না চ'ললে তাতেও কাঁটা এসে জোটে; তারই নাম "বাতকণ্টক"। কথাটা এই যে, দুশ্চিন্তায় কিম্বা খুশীর চিন্তায় অথবা অন্য কারণে ব্যস্ত হ'য়ে অথবা ধীরে-সুস্থে হ'লেও উঁচু-নীচুতে পা প'ড়ে যায়, তখনই শুরু হয় গুল্ফে কাঁটার মত বায়ুর গতি।

গুল্ফ মানে গোড়ালি, এইটুকু আমরা সাধারণে জানি। কিন্তু গুল্ফ শব্দটি এসেছে ঋক্‌বেদের ৭।৫০।২ সূক্ত থেকে। বেদের ওই সূক্তে আছে "গুরুকীর্ণমার্গঃ" অর্থাৎ গুরু দ্বারা পথ ব্যাপ্ত। ওই গুরু মানে গোল মাংসপেশী। দুটি পায়ের দু'টি গ্রন্থিতে থাকে গোল আকৃতির দুটি মাংসপেশী। ঐ পেশীতে কোন কারণে বায়ু প্রবেশ ক'রলে তার সরলতা আসতে খুবই বিলম্ব হয়, তখন সূচীবিদ্ধ (যাকে ব'লে ছুঁচ বেঁধানো) যন্ত্রণা হয়। তাই বলা হ'য়েছে—

গুর্ব্বঙ্গং তুদ্যতেঽত্যর্থং দণ্ডমুষ্টি হতং যথা।

অর্থাৎ যেকোন মাংসপেশীতে (যারা নৃত্য করে, কুস্তি করে, দৌড়ঝাঁপ করে, ভারী জিনিস নিয়ে নামা ওঠা করে, তাদের মাংসপেশীতে) বায়ু প্রবেশ ক'রলে সূচীবিদ্ধ যন্ত্রণা অথবা কণ্টকবিদ্ধ যন্ত্রণা হয়। সেই কণ্টকবিদ্ধ যন্ত্রণা বোঝাতেই আয়ুর্বেদিকগণ বলেন বাতকণ্টক। এই অবস্থাটি সামান্য মালিশ, গরম সেঁক, এইসব করলে সেরে যায়, কিন্তু তারপর আর সারে না, তখন ওই স্থানটিতে অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়। বাতকণ্টকের অরিষ্ট হ'লো, ক্রমে বাতরক্তের বিকার দেখা দিলে সেই হবে অরিষ্ট লক্ষণ।

খঞ্জ
(LAMENESS)

পুরোহিততন্ত্রের বড় খুঁটি মনুসংহিতা; সে সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৪২ শ্লোকে বলা হ'য়েছে—

খঞ্জোবা যদিবা কাণো দাতুঃ প্রেষ্যোঽপিবাভবেৎ
হীনাতিরিক্ত গাত্রোবা তমপ্যপসরেৎ ততঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাড়ির শ্রাদ্ধ কাজের সময় যেখানে শ্রাদ্ধের দানোৎসর্গের কাজ হ'চ্ছে সেখানে বাড়ির কর্তার, বাড়ির ঝি-চাকরদের মধ্যে যদি কাণা বা খোঁড়া (খঞ্জ) থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেবে। এই উক্তিটি পড়ার সময় এটা মনে হয় না কি যে, খোঁড়া বা কানা হওয়াটা অপবিত্র হওয়া, এ কি বিধান? কেউ কি

খঞ্জ হয় সাধ ক'রে? উত্তরে বলা যেতে পারে, প্রত্যক্ষতঃ মনে হয়, ও সাধ ক'রে খঞ্জ হয়নি কিন্তু চিকিৎসকগণ বলেন, এ ব্যক্তি প্রজ্ঞাপরাধী (চরকীয় মতে) অর্থাৎ বুদ্ধির দোষেই অপরাধী।

এবার কথাটা খুলে বলি—খজ্ ধাতুর অর্থ গতিবিকলতা, এটা যদি স্বাভাবিক হয় তাহ'লে অন্য রোগগ্রস্ত; তখন সে পঙ্গু, তখন দুটি পায়েই গতিবিকলতা হবে। একটি পায়ে হ'লেই খঞ্জ।

যদি ত্রিপুট কলায় (খেঁসারির ডাল) ও অন্যান্য সংযোগবিরুদ্ধ আহার করে, তবে তার কটিতে (কোমরে) আশ্রিত বায়ু ক্রমেই কুপিত হয় এবং একটি পায়ের উপরের জঙ্ঘার কণ্ডরাকে (বড় শিরাটির নাম কণ্ডরা) বেশ আকৃষ্ট ক'রে ক্রমেই সেটি সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে খঞ্জ হ'য়ে যায়, আর যদি দুটি জঙ্ঘার শিরাকে আকর্ষণ করে তখন পঙ্গু হ'য়ে যায়। তবে স্বেচ্ছাকৃতভাবে বেপরোয়া হ'য়ে যারা রোগকে ডেকে আনে, তারাই প্রজ্ঞাপরাধী।

এই খঞ্জ রোগেরও অরিষ্ট লক্ষণ হয়—

যদাহি মলসংকোচঃ তদাঽসাধ্যঃ ন সিধ্যতি।

অর্থাৎ এর যখন মল সংকোচ গভীর ভাবেই দেখা দেবে, তীব্র জোলাপেও দাস্ত হয় না, তখন বুঝতে হবে এটা অসাধ্যের পর্যায়ে প'ড়ে গেছে।

খল্বী

(CRAMPS & SPASM)

আয়ুর্বেদীয় শল্যশালাক্য গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতার সূত্রস্থানের সপ্তম অধ্যায়ের দশম গুচ্ছে একটি অস্ত্রের নাম দেখা যায়—তার নাম খল্ল্যাস্ত্র। এখানেই একটি খল্ল শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, সেটার আকৃতি শলাকার মত, কিন্তু সুমুখের দিকটা ধারালো, কিন্তু খল্লী ব'ললে যে রোগ হয় এর কোন সার্থক বক্তব্য রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু আয়ুর্বেদীয়গণ বলেন, এই রোগ যখন দেখা দেয়, তখন প্রথমেই হয় মাঝে মাঝে শরীরটা শিউরে ওঠা, তারপর মাথাটা কাঁপে, তারপর কখনও পা কখনও দুটি জঙ্ঘা (জাং), কখনও ঊরু আর কখনও বা আঙ্গুল, হাত, পায়ের গাঁট, এইসব জায়গা যে আলগা হ'য়ে গিয়ে সেঁটে ধরে—যাকে বলে খিল ধরা। এই হ'লো খল্বী রোগ।

পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় বলা হয়, ভিটামিনের অভাবে এসব হয়। আবার পৌরুষ গ্রন্থির Enlarged prostrate স্ফীতির জন্যও হয়। আবার আভ্যন্তরীণ শোথ হ'লেও হয়। এসবের চিকিৎসা ক'রলে সেরে যায় কিন্তু একসঙ্গে হাত-পা বেঁকে গিয়ে যন্ত্রণা ও লাল হ'তে থাকলে, যাকে বলে বাতরক্তের সম্পর্ক ঘটলে, সেইটাই হয় অরিষ্ট লক্ষণ।

আক্ষেপক

আবার আর একটি রোগের নাম নিয়ে মুশকিলে পড়া গেল—মূল শব্দটি তো ক্ষেপ্, তার আগে আ উপসর্গটি ব'সে পড়ে কি মানসিক যন্ত্রণাই না দেয়।

কিন্তু আয়ুর্বেদীয়গণ এসব অর্থ গ্রহণ করেননি, তাঁরা ক'রেছেন আকর্ষণ, টানা-

টানি, হাঁচড়-পাঁচড়, ছট্‌ফট্ করা এইসব অবস্থাকে। "ক্ষেপ" এই ধাতুর আগে উপসর্গ যা যা দেওয়া যাবে, অমনি অর্থটাও পাল্টে যাবে। নিক্ষেপ, বিক্ষেপ, ভ্রূক্ষেপ, সংক্ষেপ, এমনি কত উপসর্গের যোগে ক্ষেপ ধাতুর অর্থ পাল্টে যায়। এই আক্ষেপ রোগের ক্ষেত্রেও আক্ষেপের অর্থ এই রকম, অর্থাৎ একটা থলের ভিতর বিড়াল, কুকুর বা অন্য কোন প্রাণীকে বন্ধ ক'রে রাখলে সে যে থলের ভেতর থেকে বেরোবার জন্য ছটফট করে, এই আক্ষেপ রোগের ক্ষেত্রেও বলা হ'য়েছে—

> যদাতু ধমনীঃ সর্বাঃ কুপিতোঽভ্যেতি মারুতঃ।
> মুহুর্মুহুশ্চাক্ষেপণাদাক্ষেপক ইতি স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ কোষ্ঠ থেকে বিকারপ্রাপ্ত বায়ু যখন দেহের শাখাগুলিতে সোজা, বাঁকা, ওপর-নীচে ছুটে বেড়ায় তখন সারা শরীরটাকে আক্ষিপ্ত করে, যাকে বলে টানা-হ্যাঁচ্‌ড়া করে, কাঁপায়, গোটায়, ছড়ায় এইসব আঙ্গিক চাঞ্চল্য আসে। দেহের ওই অবস্থা দেখেই ওই রোগটার নাম নির্বাচন করা হয় এটা আক্ষেপক রোগ। কখনও এককালে সর্বাঙ্গকে ছটফট করায়, কখনও এক অঙ্গকেও। তার মানে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান—অপান বায়ুর কেন্দ্রগুলি তো কাঁপাবেই, তাছাড়া শরীরের প্রতিটি স্থানকেও কাঁপায় এবং মুহূর্তের মধ্যে হতচেতনও ক'রে দেয়, কারণ মনোবহ স্রোতেও প্রবেশ করে।

এমন আক্ষেপক রোগে আক্রান্ত হ'লে স্থানের প্রাধান্য দেখেই চিকিৎসা করার বিধি, কিন্তু এমন উদ্বেগজনক রোগটি সেরেও যে যায় না তা নয়, তবে এই রোগের বার বার আক্রমণে যদি শুক্রধাতু বা ওজ ধাতুর কিম্বা নারীর রেতো ধাতুর ক্ষয় হ'তে থাকে, তখনই বুঝতে হবে একে আর এ রোগ থেকে সুস্থ করা যাবে না। ওইটিই অশুভ লক্ষণ

দণ্ডাপতনক
(TONIC CONVULSIONS/RIGID SPASM)

যে রোগটি দণ্ডের পতনের মত দেহযষ্টিকে মাটিতে ফেলে তারই নাম "দণ্ডাপতনক"।

এই পর্যন্ত লিখেই ভাবছি, তাহলে "দণ্ডপতনক" না লিখে দণ্ডাপতনক নামকরণের তাৎপর্য কি? কথাটা ভাববার মতই, পতন আর আপতনে প্রভেদ কি? এর উত্তরে বলা যায়, আপতন বলার উদ্দেশ্য এই রোগটি আক্ষেপক রোগেরই অন্তর্গত। এই আক্ষেপক রোগের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখন দণ্ডাপতনক নামকরণ এইজন্য করা হয় যে, এ রোগ দেহস্থ বায়ু পিত্ত কফের বিকারে হয় না, এটি হয় খুব গুরুতরভাবে দণ্ডের আঘাত পেয়ে; অর্থাৎ দেহের মর্মস্থানে যদি প্রবলভাবে কোন শক্ত লাঠি বা রড্ প্রভৃতি দণ্ডের আঘাত লাগে, তবে তৎক্ষণাৎ সে মাটিতে প'ড়ে যায়, তখন দেহস্থ কফ ও বায়ুর বেগ এমন হয় যে, সারা শরীরটাকে শক্ত ক'রে দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। অর্থাৎ এটা হঠাৎ বা আকস্মিক ঘটে, এই আকস্মিকতা জানাবার জন্যই আপতনক শব্দের যোজনা।

এই আপতনক যদি গর্ভপাত, অত্যধিক রক্তস্রাব এবং প্রবল দণ্ডাঘাতজনিত হয়, তবে তা অশুভ সূচক।

গর্ভপাত নিমিত্তশ্চ শোণিতাতি স্রবাচ্চ যঃ।
অভিঘাত নিমিত্তশ্চ ন সিধ্যত্যপতানক॥

অপতন্ত্রক/অপতানক

(APOPLECTIC CONVULSION)
(HYSTIRICAL CONVULSION)

অপতন্ত্রক আর অপতানক এই দুটি নামের পৃথক অর্থ, পৃথক রূপ বোঝাতে যে কিভাবে প্রাচীনগণ শব্দাভিধানকে আশ্রয় ক'রেছেন সেটা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হ'চ্ছে।

অপতন্ত্রক বাতব্যাধি এবং অপতানকও বাতব্যাধি, এই দুটি নামেই অপ শব্দ দুটি ঐ নামেরই বিশেষণ। অপ মানে ভ্রংশ, ভ্রষ্ট, বিয়োগ প্রভৃতি ১৫টি অর্থ, আর তন্ত্র মানেও অন্ততঃ ৩০।৩২ টি অর্থ। অতএব অপতন্ত্রক নামে কোন রোগ আছে বললে সহজে তার বক্তব্য বোঝা কষ্ট। এইজন্য বলা যায় যে, এ রোগের মূলীভূত কারণ বিকৃত বায়ুটিই পক্কাশয় থেকে উত্থিত হ'য়ে প্রথমে হৃদয়, তারপর মাথা, দুটি রগ্ আক্রমণ ক'রেই একেবারে ধনুকের মত ঝাঁকিয়ে দেয়, আবার তৎক্ষণাৎ সোজা ক'রে আছড়ে ফেলে দিয়েই মূর্ছিত ক'রে দেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটি বন্ধ করিয়ে পায়রার ডাকের মত হুঁহুঁ শব্দ করে বলেই তার নাম অপতন্ত্রক। ওই সময় নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন হয় না, অনেক পরে পরে তোলা-ফেলা করায় অর্থাৎ তন্ত্রক শব্দটি ধ্বনিবাচক, কিন্তু অপশব্দের যোগে তা ভ্রষ্টধ্বনি। এই রোগটি হয় বিকৃত রুক্ষ বায়ু যদি প্রায়শঃ পক্কাশয়ে জ'মতে থাকে আর ওই সঙ্গে প্রায় মাথাধরা, রগ আঁকড়ে ধরা ঘটতে থাকে।

এর অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো, ক্রমশইঃ যদি রোগাক্রমণ হ'তে হ'তে দৃষ্টিশক্তি ক'মে আসে, এবং কণ্ঠের ওই বিকৃত হুঁ হুঁ শব্দ কম হ'তে থাকে।

অপরপক্ষে অপতন্ত্রক রোগ থেকে আসে অপতানক রোগ, প্রাচীনকালের গ্রন্থ চরকের অভিমত হ'লো—এ দুটি রোগ অন্তরায়াম বহিরায়ামের এবং অভিঘাতক রোগেরই অন্তর্গত, আর সুশ্রুতের অভিমত—এই দুটি রোগ আক্ষেপেরই অন্তর্ভুক্ত।

অর্দিত

(FACIAL PARALYSIS)

এটা কোন রোগের নাম এইটুকুই জানা গেল এবং তার বক্তব্যটাও বুঝতে পারলাম, কিন্তু আয়ুর্বেদের কোন মূল গ্রন্থে রোগের নাম প'ড়ে সেটা যে এই রোগ এটা বিচার করা খুবই কঠিন। তাই বলছি, বক্তার বক্তব্যের ভাষাটা যদি বহু অর্থব্যঞ্জক হয় এবং সে যদি অতীতকালের হয়, তাহ'লে বিতর্কিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

উপরিউক্ত অর্দিত রোগটির নামকরণ সেই পর্যায়ের। এই যেমন অর্দিত অর্থে পীড়িত, যাচ্ঞা, প্রার্থনা, হিংসা, হত্যা ইত্যাদি বহু অর্থই প্রকাশ করে। এর দ্বারা কি বোঝা গেল যে এটা মুখের পঙ্গুতা এবং সেটা কোন্ দিকে? ডাইনে বা বাঁয়ে (বামে) মুখটা যে বেঁকে যাবে এটাও বুঝতে পারা গেল না, তাই এর টীকা-টিপ্পনীর প্রয়োজন হ'য়েছিলো একে বোঝাতে।

যাক্, আয়ুর্বেদের সংহিতা গ্রন্থে বলা হ'য়েছে—অর্দিতো বক্রী ভবতি, অর্থাৎ বেঁকে যায়। তারপরেই বলা হ'য়েছে—

উচ্চৈ ব্যাহরতোঽত্যর্থং খাদতঃ কঠিনানি চ।
হসতো জৃম্ভতো বাপি ভারাদ্ বিষমশায়িনঃ॥
শিরোনাসৌষ্ঠ চিবুক ললাটেক্ষণ সন্ধিগঃ।
অর্দিত্যনিলো বেগাদার্দিতং জনয়ত্যতঃ॥

অর্থাৎ হাসতে গিয়ে, জোরে হাই তুলতে, শক্ত খাবার খেতে কিম্বা বিষমভাবে খাবার খেতে গিয়ে প্রবল বায়ুবিকারে আক্রান্ত হ'য়ে খুবই পীড়িত এবং যন্ত্রণা কাতর হ'য়ে পড়ে। এতেও স্পষ্ট বোঝা যায় না শরীরের ঊর্ধ্বাংশ বেঁকে যাবে কিনা, তবে অনুমান করে নিতে হয়, হাসি, হাইতোলা, শক্ত খাবার খাওয়া প্রভৃতি কাজ যখন মুখের দ্বারা হয়, তখন মুখই পীড়িত হয়। তাকে আরও পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ষষ্ঠ শতকের দৃঢ়বলাচার্য ব'লেছেন—

"অর্দ্ধে তস্মিন্ মুখার্ধে বা কেবলে স্যাৎ তদার্দিতম্"

অর্থাৎ সমস্ত মুখ কিংবা অর্ধেক মুখ পীড়িত হয়। উভয় উদ্ধৃতির টীকাকারই ব্যাখ্যা ক'রেছেন, এখানে অদ্দির্ত মানে অপবর্তন। অর্থাৎ সোজা থাকে না। এইবার পরিষ্কার বোঝা গেল, আর্দিত রোগ মানে মুখের সর্বাংশ বা অর্ধাংশ বক্রীভূত হয়। এরপর এই রোগটির বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পেলে তা হবে অরিষ্ট লক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ। সেটা সম্পর্কে বলা হ'য়েছে—

ক্ষীণস্যা নিমিষাক্ষস্য প্রসক্তাব্যক্ত ভাষিণঃ।
ন সিধ্যার্দিতং গাঢ়ং ত্রিবর্ষং॥

অর্থাৎ সে ব্যক্তি যদি ক্ষীণ হ'য়ে আসে, আর চোখের পলকও ফেলতে পারছে না, এবং কথাগুলি ক্রমশ অস্পষ্ট হ'তে হ'তে অব্যক্তই হ'য়ে যায়, কিম্বা তা না হ'য়ে ঐ অবস্থাতেই তিনটি বৎসর অতিক্রান্ত হয় তবে তা অবশ্যই অশুভ লক্ষণ বলা যেতে পারে।

ধনুস্তম্ভ

(TITANUS)

রোগটির এই নাম আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত নয়, তবে ধনুষ্টঙ্কার ব'ললেই শরীর শিউরে ওঠে, এমনকি পাশ্চাত্ত্য জগৎও এ রোগের নাম শুনলে আঁতকে ওঠেন। এখন ধনুস্তম্ভ নামটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্—

নামটা শুনে প্রাথমিক চিন্তায় মনে হবে বোধ হয় ধনুর মত বেঁকে গিয়ে যা স্তম্ভ-সদৃশ অর্থাৎ খুঁটির মত হয়, কিন্তু এই ধনুর মত এটা বোঝা গেলেও ধনু শব্দের অর্থ কি? আমরা জানি রাশির পরিচয়েও তো ধনু বলা হ'য়েছে, তাহ'লে সেখানেও বা কোন অর্থে নামকরণ করা হ'য়েছে! এদিকে আয়ুর্বেদস্রষ্টা তাঁর নামও ধন্বন্তরি—সেখানেও সন্ধিবিচ্ছেদ দ্বারা পাই ধনু+অন্তর=ধন্বন্তর; তারপর ধন্বন্তরি, সেখানেও তো ধনু, অতএব আরও শব্দে যখন ধনু তখন তার শব্দার্থও পৃথক। এখন ধনু শব্দের অর্থ না পেলে সমাধান নিশ্চয়ই হবে না। এইবার শব্দের উত্তরমেরুতে খোঁজ করে সেই বৈদিক ঋকে ১।৪০।২ সূক্তে ধন শব্দের উল্লেখ—সর্বাধিক পুরাতন বৈদিক

অভিধান যাস্ক এই শব্দটির ব্যাখ্যা ক'রেছেন—ধনায়=সংগ্রামঃ অর্থাৎ ধনের জন্য সংগ্রাম ক'রতে হয় যে অস্ত্রের সাহায্যে তারই নাম ধনু। ধন+উক্, সেই যুগের ধনুর অর্থ হারিয়ে গিয়ে এখন ওই বাঁশের তৈরীর বস্তুটির নামই ধনু হ'য়েছে, এবং তাতে তীর যোজনা ক'রলে ধনুর্বাণ হয়। তা যাক্, এখন পাওয়া গেল সংগ্রামের জন্য যা অবলম্বনীয় তাই ধনু। অতএব সেই ধনুর আকৃতি ঘটিয়ে দেয় যে ব্যাধি তারই নাম ধনুর্ব্যাধি এবং ধনুরোগ।

এখন ধনুর্ব্যাধি না ব'লে ধনুস্তম্ভ বলার সার্থকতা কি? এখানেও একটি শব্দ জুড়ে আছে "স্তম্ভ"; এই স্তম্ভ মানেও বেশ কয়েকটি অর্থ, খুঁটিকে স্তম্ভ, আবার রুদ্ধ করাও স্তম্ভ, এমনি প্রতিহত করা, পাতা দিয়ে গুচ্ছ করা, গ্রন্থাদির মধ্যে স্তবক (column) করা ইত্যাদি, কিন্তু আয়ুর্বেদীয় অর্থ নিশ্চলতা আনা। এই রোগের নামকরণটার বেলায় এই নিশ্চলতা অর্থই প্রকাশ করে। তাই "ধনুস্তম্ভ" মানে সেই রোগটি যেটি দেহটিকে ধনুর আকৃতিতে বেঁকিয়ে শক্ত করে দেয়, এবং নিশ্চল করে দেয় তার সন্ধিস্থলে।

এই রোগটি "অন্তরায়াম" ও "বহিরায়াম" ভেদে দুই প্রকার অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের নির্দেশিত রোগগুলির নামকরণের অর্থ অনুশীলন ক'রে রোগের নিদান (হেতু) নির্ণয় করা হ'তো। ধনুস্তম্ভ রোগের অবস্থাভেদ এই "অন্তরায়ামের" প্রকৃত অর্থ জানতে অমনি দ্বিধাচিত্ত হ'তে হয়। এই নামকরণের আদিতে আছে "অন্ত" শব্দ আর একটি অন্তঃ শব্দও আছে। এই দুটি শব্দ কিন্তু একই অর্থ প্রকাশ করে না। অর্থাৎ এক অন্ত শব্দই পুংলিঙগ, আবার ক্লীবলিঙগে প্রযুক্ত হ'য়ে দু'রকম অর্থ প্রকাশ করে। যখন পুংলিঙগ অর্থাৎ "অন্ত" হবে, তখন অর্থ হবে নিকটবর্তী, এবং সীমান্ত বা শেষ, আবার যে কাজ আরম্ভ হয়েছে, এখনও শেষ হয়নি, বা চ'লছে, সেখানেও বসানো যায় "অন্ত", যেমন তিনি "জীবন্ত" ব্যক্তি।

আবার অন্তঃ শব্দটি একেবারে ভিন্নার্থও প্রকাশ করে, এই অন্তঃ থেকেই ফারসী "অন্দর" অর্থাৎ ভিতর। এই অন্ত শব্দ রূপায়িত হয়ে ইংরাজীতে "আন্ডার"। শব্দটি বৈদিক ব'লেই হ'য়তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই অন্তঃ শব্দ রূপায়িত হয়।

মোট কথা এই অন্তঃ শব্দের অর্থ—মধ্যে বা অভ্যন্তরে। এই অন্তঃ শব্দের সঙ্গেই 'আয়াম' যোগ করে 'অন্তরায়াম', ঠিক সেই ভাবেই বহিঃ শব্দের সঙ্গে 'আয়াম' যোগ করে "বহিরায়াম"। অন্তরায়াম মানে 'ক্রোড়ে নতম্' অর্থাৎ কোলের দিকে, সামনের দিকে নত আর বহিরায়াম মানে "পৃষ্ঠেনতম্" অর্থাৎ পিঠের দিকে নত হওয়া বা বেঁকে যাওয়া।

ধনুস্তম্ভ রোগে যখন প্রবল বেগবান প্রকুপিত বায়ু শরীরের সামনের দিকের অঙগুলী, গুল্ফ, জঠর, হৃদয় ও অক্ষিগোলক আদি স্থানে সংশ্রিত স্নায়ুপ্রতান সমূহকে আশ্রয় করে হঠাৎ তীব্র আক্ষেপ সহকারে সমস্ত শরীরটাকে শক্ত বাঁশের মতন করে সামনের দিকে বেঁকিয়ে দেয় তখন তাকে বলে 'অন্তরায়াম ধনুস্তম্ভ'।

আবার যখন সেই প্রকুপিত বায়ু শরীরের বাহির অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশের মন্যা, পৃষ্ঠ, কটি আদি স্থানে সংশ্রিত স্নায়ুপ্রতান সমূহকে অর্থাৎ লতার ন্যায় অনেক শাখা-প্রশাখাযুক্ত স্নায়ুজালকে আশ্রয় করে সমস্ত শরীরটাকে বাইরের দিকে অর্থাৎ পিঠের দিকে শক্ত করে ধনুকের মত বেঁকিয়ে দেয় তখন তাকে বলে 'বহিরায়াম ধনুস্তম্ভ'।

এই রোগে হনুসন্ধি (Madibular joint) দৃঢ় বদ্ধ হয়। মধ্যদেহের দুই পার্শ্ব ভেতরের দিকে এমনভাবে কুঁচকে ঢুকে যায় যে মনে হয় পার্শ্বদ্বয় ভেঙ্গে গেছে। আর কফস্রাব হতে থাকে। রোগের প্রবল বেগের সময় বক্ষ কটি ও ঊরু তীব্র বেদনার সঙ্গে

ভেঙে যাওয়ার মত বেঁকে যায়। এ রোগের লক্ষণ সমূহকেই অরিষ্ট লক্ষণ বলা যায়, কারণ এ রোগ অসাধ্য। তাই বলা হ'য়েছে—

ধনুস্তুল্যং নমেদ্‌যস্তু স ধনু স্তম্ভকঃ স্মৃতঃ।
অরিষ্ট লক্ষণৈঃ ক্রান্তঃ নোচেৎ জীবতি ভৈষজৈঃ॥

অর্থাৎ যে রোগ দেহটিকে ওই ধনুর আকার ক'রে দেয়, তারই নাম ধনুস্তম্ভ। তবে অরিষ্ট লক্ষণের দ্বারা যদি আক্রান্ত না হয় তবে জীবনের আশা থাকলেও থাকতে পারে। অতএব প্রশ্ন ওঠে, এ রোগের অরিষ্ট লক্ষণ কি? তার উত্তরে বলা হ'য়েছে—

বিবর্ণো বদ্ধ-বদনঃ স্রস্তাঙ্গো নষ্ট চেতনঃ।
প্রস্বিদ্যংশ্চ ধনুঃস্তম্ভী দশরাত্রং ন জীবতি॥

অর্থাৎ ধনুস্তম্ভ ব্যক্তির মুখের রং যদি সাদা, নীল, কালো পান্ডুর হ'য়ে যায়, দাঁতের পাটিতে খিল ধ'রে যায়, হাত পায়ের গাঁটগুলি আলগা হ'য়ে যায়, আর প্রবল ঘাম ঝ'রতে থাকে, তবে তার দশরাত্রির মধ্যেই জীবনায়ু শেষ হয়।

মুখ রোগ

(DISEASES OF THE MOUTH)

মুখ শব্দটি শুদ্ধ সংস্কৃতই নয়, এটি বৈদিকও, কারণ ঋক্‌বেদের ৪।৩৪।৬ সূক্তে এবং যজুর্বেদের স্থানে স্থানে মুখ শব্দটির উল্লেখ। ব্রাহ্মণ জাতিবাচক নয়, বেদের কোথাও জাতি শব্দ নেই। ব্রাহ্মণ হ'লো মুখ, সেখানেই ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে "খাদ্য খনন সাধন ঘাতং হি মুখম্‌", অর্থাৎ এই সৃষ্টির মধ্যে যেখানেই সৃষ্টি সেইখানেই খাদ্য খনন ঘাত অবশ্যই থাকে। সেই খনন ঘাতের সংখ্যা দুটি ঠোঁট/দন্তমূল/দন্ত/জিহবা/তালু ও কণ্ঠ সবই মুখ, অর্থাৎ ৭টি। এগুলির প্রত্যেকটিই মুখ। তাই শ্লোকাকারে বলা হয়েছে—

ওষ্ঠৌ চ দন্তমূলানি দন্তা জিহবা চ তালু চ।
গলো গলাদি সকলং সপ্তাঙ্গং মুখ মুচ্যতে॥

তারপরে বলি—এই সাতটি অংশে যে রোগগুলি হয় আয়ুর্বেদের ভাষায় সবই মুখরোগ—এখন কোথায় কতপ্রকার রোগ হয়—সেটা জানাই, ঠোঁটে রোগ হয় আটটি, দন্তমূলে ১৫টি, দন্তে ৮টি, জিহবায় ৫টি, তালুতে ৯টি, কণ্ঠে ১৭টি এবং সমস্ত মুখেই হয় তিনটি—মোট ৬৫টি। তাই শ্লোকাকারে বলা হয়েছে—

দন্তেষবষ্টা বোষ্টয়োশ্চ মূলেষু দশপঞ্চ চ।
নব তালুনি জিহবয়াং পঞ্চ সপ্ত দশাময়াঃ॥
কণ্ঠে ত্রয়ং সর্বসরা এক ষষ্ঠি চতুষ্পরা॥

এইবার তার দোষ বিচার ক'রতে গিয়ে বলা হয়েছে এটি বায়ু, পিত্ত ও কফবিকার জন্য পৃথক পৃথক রোগ তো হয়ই, তা ছাড়া সান্নিপাতিক এবং রক্তবিকার, মাংসদুষ্টি, মেদোদুষ্টি এবং আঘাত জন্যও হ'য়ে থাকে।

বায়ুবিকারজনিত ওষ্ঠ রোগ

আরও স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে যে—পেটে বায়ুই হোক কিম্বা প্রাকৃতিক কারণেই বায়ুর আধিক্য আসুক, ঠোঁট ফাটা, ঠোঁটে রুক্ষতা এবং রংটা কালো হবেই। এই সময় এমন আহার ও পরিবেশের প্রয়োজন থাকে, যে বায়ুটা যেন না বাড়ে। কিন্তু ওইসব উপদ্রবের সঙ্গে যদি ব্যথা বেদনা থাকে কিম্বা প্রায়ই ঠোঁট দুটির মধ্যে মনে হয় বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে, তবে সেইটাই হবে অরিষ্ট লক্ষণ—অর্থাৎ শুধু ঠোঁট ফাটা, ঠোঁট কালো হওয়া থাকলে তাড়াতাড়ি সারে কিন্তু তার সঙ্গে যন্ত্রণা থাকলে সেটা সারা কঠিন হয়। এইটাই এর অশুভ লক্ষণ।

ওষ্ঠভেদ

(CHEILOSIS/CHOPPING OF LIPS)

আমরা সাধারণে বড় জোর ব'লতে পারি ওষ্ঠ মানে ঠোঁট কিন্তু ওষ্ঠ এলো কোথা থেকে? এইবার দেখুন, আলংকারিক পণ্ডিতগণ এই ওষ্ঠকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন --যদি বলি, ও বাবা, প্রাণ ওষ্ঠাগত কিংবা রাঙা ঠোঁট দেখতে ভাল এবং সুলক্ষণও (রক্তোষ্ঠ), তারপর এটাও তো বলা হয় যে, মেয়েটির সবই ভালো কিন্তু ঠোঁট দুটি বড় বেমানান—অত মোটা ঠোঁট্ যার, সে রূপের বড়াই করে কি করে? ঠোঁট দুটি যদি পাতলা হ'তো? ও লোকটি ঠোঁট কাটা (স্পষ্টোক্তি করে), এইবার বলি যদি ওপরের কিম্বা নীচের ঠোঁট না থাকে বা কাটানোই হয়,—উঃ না জানি সে কি ভয়ঙ্কর রূপ হবে। অতএব রূপের বর্ণনার ক্ষেত্রে ঠোঁট বা ওষ্ঠের গুরুত্ব সর্বাধিক; সর্বাধিক বললাম এই জন্য যে, সর্ব অঙ্গ সুন্দর কিন্তু জন্ম-অঙ্গ, তাতেও রূপের দিক থেকে ওষ্ঠহীনের মত নয়। এমনি মুখের আশপাশের অন্য কোন এক অংশের অভাবে ততটা বীভৎস হয় না, যতটা হয় ঠোঁটের অভাবে। এতক্ষণ তো আলংকারিকদের কলমের ডগায় ঠোঁট ছিল; এইবার শারীরবিজ্ঞানীগণ এই ঠোঁটকে কি চোখে দেখেছেন, সেটা বলি, তাঁদের সমীক্ষা হ'লো—ঠোঁট না থাকলে জরায়ুজাত প্রাণীর, এমনকি অনেক অণ্ডজ প্রাণীরও খাদ্য গ্রহণ এবং খাদ্যের গলাধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক শক্তি অল্পদিনেই ক'মে যায়। এইজন্য ও দুটির নামই বোধ হয় "ওষ্ঠ" উষ্ ধাতুতে থন প্রত্যয়/এটা উনাদিক ধাতু। বৈদিক ছান্দস্ শব্দ। উষ্ ধাতুর প্রয়োগ তখনই হয় যখনই উষ্ণতার লেশ থাকে। খাদ্যের স্পর্শের উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে মুখগহবরের অন্যান্য সূক্ষ্ম ঝিল্লীগুলি উত্তেজিত হয়, এবং ঝরণার মত জিহবা ও ভিতর চোয়াল থেকেও পাচক রস আসতে থাকে। এমনি অধর-ওষ্ঠের সঙ্গে ও দুটির (অধর-ওষ্ঠের) স্পর্শ পেলেই মুখমণ্ডলের শিহরণ জাগে। অতএব ওষ্ঠের গুরুত্ব অনেক দিক থেকে।

এই ওষ্ঠে যে সব ব্যাধি হয়, তাদেরই নাম ওষ্ঠভেদ। ওষ্ঠভেদ মাত্র এক রকম নয়, ১১ প্রকার। প্রত্যেকটিকে চেনা যায় কোন্ দোষের বিকার (বায়ু, পিত্ত বা কফ) প্রধানভাবে হ'য়েছে। যেমন (১) দু'ভাগ হ'য়ে যাওয়ার মত ফেটে গেলে বুঝতে হবে বায়ুই প্রধান হ'য়েছে, (২) আর কালো রং, খস্খসে এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা থাকলে বুঝতে হবে পিত্তপ্রধান বিকার, (৩) কখনও ফুলো আর কিছু ঠাণ্ডা লাগলেই যন্ত্রণা, আর ছোট ছোট ফ্স্কুড়ি, এটা কফবিকারে সৃষ্টি, (৪) কখনও ফুলো, কখনও কালো আর পচা পচা গন্ধ এবং চট্চটে হ'লে বুঝতে হবে এক্ষেত্রে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষই বিকারগ্রস্ত। (৫) পাকা খেজুরের মত, ফেটে রক্তঝরা থাকলে ধরে নিতে হয় এটা হ'য়েছে রক্তবিকার

থেকে। (৬) শক্ত মাংসপিণ্ডের মত, অথচ চুলকায়, ওটা মাংসদুষ্টি, অর্থাৎ মাংসধাতুতে বিকার হ'য়েছে। (৭) সর্বদা চক্‌চক্‌ ক'রছে আবার পচাটে গন্ধও ছাড়ছে, তখন ওটা মেদো দুষ্টির জন্য হ'য়েছে ধরে নিতে হবে। (৮) প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, কিম্বা প্রচণ্ড তাপে ফেটে গিয়ে জ্বালা ক'রলে এবং সত্বর না চিকিৎসা ক'রলে ঠোঁট দুটিতে পরে ঘা হবে। (৯) দুটি পাশে গ্যাঁজ বেরুনো, পরে সাদা রং এবং পচা গন্ধ, সেটা ওষ্ঠার্শ। (১০) প্রথমে গালের ভিতর ফুস্‌কুড়ি, পরে সেইটাই হয় ওষ্ঠার্বুদ। পরিণামে সেইটাই ক্ষয়ক্ষত (ক্যান্‌সার?)। (১১) প্রথমে ব্রণ তারপর শোথ, তারপর ফাটা অর্বুদ। এই শেষের তিনটির উৎপত্তির সঙ্গে জ্বর থাকলেই সেই হয় অশুভ লক্ষণ।

(প্রকার ভেদ—দ্বিতীয়)

অনেক সময় হঠাৎ হঠাৎ ঠোঁট দুটির রং যেন হ'লদে হয়ে যায়; কিম্বা কেমন একটা নীলাভ হয়। আর তার সঙ্গে খুব ছোট ছোট স'রষের মত ফুস্‌কুড়ি হয়, ওগুলি আবার পেকেও যায়, আবার ওগুলির ওপরে এবং চারদিকে চট্‌চটে ঘামের আকারে একটা তেল চট্‌চটে অবস্থা আসে, কোনটা বা পেকেও যায়, জ্বালাও করে। এই সময় অনেকের পেটটা নরম হয়, আমযুক্ত দাস্তও হয়, সেটা শক্তও নয়, বরং পেটে বায়ুও হয়। এর জন্য অনেক সময় ঠাণ্ডা প্রলেপ, ঘি দুধের সর প্রভৃতি ব্যবহার ক'রলে সেরে যায়, তবে গরম ভাত, গরম পানীয় ব্যবহার ভাল নয়, অর্থাৎ ঠোঁটে যেন গরম স্পর্শ না লাগে, এমনকি গরম চাও নয়। চিকিৎসায় সেরেও যায় কিন্তু ওই ধরনের ঠোঁট ফাটায় যদি মাঝে মাঝে পুঁজ হ'তে থাকে কিম্বা ঠোঁট থেকে রস গড়াতে থাকে তবে ওই ধরনের ঠোঁটের রোগ সারতে বেগ পেতে হয়। এইটাই তার অশুভ লক্ষণ।

(প্রকার ভেদ—তৃতীয়)

এই রোগের লক্ষণ হ'লো—হঠাৎ দুটি ঠোঁট ভারী হ'য়ে যায়, আবার ফোলেও, মাঝে মাঝে চুলকানি থাকে, আবার কারও কারও তারই মধ্যে খুব ছোট ছোট ফুস্‌কুড়ি হ'তে থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে সব সময় মনে হয় ঠোঁটে ফোড়া হবে নাকি? তা হ'লেও ঠোঁট দুটি তেমন গরম হয় না বা পাকা ফোড়ার কোন লক্ষণও থাকে না অথচ ভারী বোধ হয়। এই সময় সে ব্যক্তির দাস্ত পরিষ্কার তো হয়ই না বরং কষে যায়, প্রস্রাব বাড়তে থাকে, মিষ্টি খাওয়ার ঝোঁক্ বাড়ে আর কেবলই মনে হবে সারা মুখটাই ফুলে যাবে নাকি! কিন্তু তা ফোলে না অথচ ঠোঁট ভারী হ'তে থাকে, শেষটায় দেখা যায় ঠোঁটের পাশে ঘামাচির মত ছোট ছোট ফুস্‌কুড়ি বেরোচ্ছে। এ সব উপসর্গ সেরে যায়—মাত্র ২।৪ দিন হরীতকী বা অন্য কষায়-তিক্ত রসের কিছু প্রলেপ দিলে, তেতো (তিক্ত) রস খেলে, কিন্তু যদি তারই মধ্যে ওগুলি থেকে আটার মত কিছু ঝ'রতে থাকে তবে সেটাই অশুভ লক্ষণ।

(প্রকার ভেদ—চতুর্থ)

যাঁদের ঠোঁট প্রায়ই কালো হ'য়ে যায় (মনে হয় ইনি ধূমপান করেন) কিম্বা হ'লদে (মনে হয় বুঝি ন্যাবা হ'য়েছে) কখনও বা সাদা ফ্যাকাশে রঙের, মনে হয় শ্লেষ্মা জন্য পাণ্ডুরোগ হ'য়েছে (আধুনিক ভাষায় এ্যানিমিয়া) অর্থাৎ ঠোঁট দুটির রং প্রায়ই ব'দলে যায়; আবার তারই সঙ্গে যদি দেখা যায় ঠোঁটের ধারে পাশে ফুস্‌কুড়ি হ'চ্ছে—এই সব

লক্ষণ যদি ঠোঁটে হয় এবং সেই ফুস্‌কুড়ি পেকে গিয়ে রস বেরুতে থাকে তবে এই ধরনের ঠোঁটের রোগই ত্রিদোষজ অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফ তিন দোষেই দুষ্ট। এটা সারতে বেশ দেরী লাগে, আর এটা সারালেও এমনতর রোগ প্রায়ই হ'তে থাকে।

(প্রকার ভেদ—পঞ্চম)

পূর্বোক্ত চার প্রকার ঠোঁটের রোগের ধরণ-ধারণ বলা হ'লো—মুখের এ অংশটির গুরুত্ব বড় কম নয়। কেবল খাওয়ার ব্যাপারেই নয়, অনেক শব্দ উচ্চারণে এই ওষ্ঠ অপরিহার্য—এই ধরুন যদি ব'ল্‌তে হয়—"পাব কি পাব না", "বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে", "বিপত্তিতে পড়েছি", এমনিতর হাজার ধরনের কথার আগে ওষ্ঠ বর্ণের উচ্চারণ চাই-ই চাই। সে ক্ষেত্রে তো ঠোঁট দুটিতেই বাধা আসে।

এই ওষ্ঠরোগ সম্পর্কে আর একটা ইঙ্গিত ক'রে রাখি—ঠোঁট দুটি যদি পাকা খেজুরের মত ফুলে ওঠে এবং সেটা পাকতে সুরু করে এবং তার সঙ্গে তার চারিপাশে ফুস্‌কুড়ি হ'চ্ছে আবার যাচ্ছে এই অবস্থার হয়, তা হ'লে একাধারে বাক্যালাপ বন্ধ, আহারও প্রায় বন্ধ, কারণ গরম কিছু ঠেকলেই জ্বালা, আবার ঠান্ডা কিছু দিলেই ঘাগুলোতে দ্রুত মাম্‌ড়ি পড়ে যাবে। ঠোঁটে এমন অসুখ হ'লে বুঝতে হবে এটা রক্তদুষ্টি জন্য। আবার এটা থেকে যদি রক্ত ঝ'রতে থাকে তবে সেইটাই হবে রক্তদুষ্টি—ঠোঁটের রোগের অশুভ লক্ষণ। তখন মনে হবে ঠোঁটে কুষ্ঠরোগ হ'লো নাকি?

(প্রকার ভেদ—ষষ্ঠ)

মাংসদুষ্টির জন্য এক রকম ওষ্ঠ রোগ হয়। সেটা হ'তে দেখা যায়—যাঁদের সাধারণতঃ অর্শ থাকে কিম্বা একটু বয়স বাড়ার পর থেকেই গালে বয়স ব্রণ হয়, মুখের কোন অংশে বা গায়ে ছুলি, মেছেতা, মাঝে মাঝে গলার বীচি (গ্ল্যান্ড) ফোলা, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এঁদেরই দুটি ঠোঁট ভারী হচ্ছে। আবার ঠোঁটের দু'পাশে একটু ফাটা ফাটা, তার পরেই দেখা যাবে ঠোঁট দুটির সীমান্তে আঁচিলের মত, কিম্বা অর্শের বলির মত একটা মাংস অঙ্কুর জন্মাবে, ফেটে যাবে, পুঁজ বেরুবে, গন্ধ হবে। এই ধরনের ঠোঁটের রোগ ভয়ঙ্কর, এটা অপারেশন ক'রলে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, আর তাড়াতাড়ি সারতে চায় না। এটা আরও মারাত্মক হয় যখন ওই ঘায়ের পাশে সুড়্‌সুড়্‌ করে, পিপ্‌ড়ের কামড়ের মত বোধ হয়—তখনই বুঝতে হবে এটা বেশ ঘোরালো অবস্থায় এসে প'ড়েছে।

(প্রকার ভেদ—সপ্তম)

যাঁদের দেহটি ভারী অর্থাৎ মেদস্বী, যাকে বলে খুব মোটা, আর সামান্য পরিশ্রমে কিম্বা অল্প গরমেই ঘাম ঝরে, অথবা যাঁরা মধুমেহ (ডায়াবেটিস্‌) রোগে ভুগছেন কিম্বা যাঁদের মাঝে মাঝে কুঁচ্‌কি ফোলে, কোষবৃদ্ধি প্রভৃতিতে আক্রান্ত হন, তাঁদেরই ঠোঁটে প্রায়ই প্রথম প্রথম চুলকানি (ঘষতে ইচ্ছে হবে), কোন সময় মনে হবে ঠোঁট দুটিতেই প্যারা-লিসিস্‌ হ'লো নাকি, কিন্তু দেখা যাবে এঁদের ঠোঁট দুটির চারপাশ কোন সময় শুকনো থাকবে না, সর্বদা ঘাম ঝরতে থাকবে, বিশেষ ক'রে যেখানটায় গোঁপ ওঠে ওখানে ঘামতেই থাকবে, এমন ঘাম হবে যেন স্বচ্ছ নির্মল জলবিন্দু জমে যাচ্ছে—এই রোগের ওইটাই অস্বস্তি। এ রোগ সারানো কঠিন। যেদিন থেকে বহুমূত্রকে কব্‌জা করা যাবে সেই দিন থেকেই এর উৎপাত ক'মে যাবে।

(প্রকার ভেদ—অষ্টম)

এই রোগটার কারণ হয় ধাক্কা লাগলে, কেটে গেলে, খুবই যন্ত্রণা হয়, ফুলে যায়, লাল হয়, আর সামান্য চুলকাণি থাকবে। যদি দেহে অন্য কোন রোগ না থাকে তবে এ কষ্ট এমন বেশী কিছু ভোগায় না।

জিহ্বাগত রোগ
(DISEASES OF THE TONGUE)

শারীরবিজ্ঞানিগণ জানেন মুখের মধ্যে জিভটি কি কাজ করে। তবুও জানাই,—লেহন করা আমরা যাকে বলি চেটে খাওয়া। এ কার্যটির জন্য জিহ্বারই প্রয়োজন; অন্য কোন অঙ্গের দ্বারা এটা সম্ভব হয় না। কিন্তু কুকুর, বিড়াল, বাঘ, ভালুক ও চিতাবাঘ এদের জিহ্বাই জীবন অথচ কুমীরের জিভ নেই, লুফে লুফে খায়, জল পানও করে। এই জিহ্বার দ্বারা মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তিটি বর্ণে ও বাক্যে প্রকাশ করার প্রধানতম শক্তিমূর্তি। এই জিহ্বায় রোগ হয় পাঁচ প্রকারের—

(১) "স্ফুটিত"
(DISQUAMATION OF THE TONGUE)

এই রোগটির সৃষ্টি হয়—বায়ুপ্রকৃতির ব্যক্তি যদি হিতাহিত খাদ্য ও পানীয়ের বিচার না ক'রে গ্রহণ ক'রতে থাকে আর বায়ু কুপিত হয়ে তারই অভিব্যক্তি জিভে প্রকাশ পায় (যদিও বায়ুর ক্রিয়া সর্বাঙ্গেই প্রকাশ পায়) সেটা রূপ নেয় স্ফুটিত রোগে। অর্থাৎ জিভ ফেটে ফেটে গিয়ে একেবারে সেগুন পাতা, বেগুন পাতা, বা ডুমুর পাতার মত হ'য়ে যায়। সেটি দীর্ঘস্থায়ী হ'লে কোন জিনিষেরই স্বাদ পাওয়া যায় না, ফলে অতৃপ্ত আহার জন্য প্রকৃতিবিরুদ্ধ আহার ক'রতে বাধ্য হয়। অবশেষে অগ্নিমান্দ্য রোগ এসে পড়ে।

(২) জিহ্বা কণ্টক
(HYPERTROPY OF THE PAPILLA)

আমরা চল্‌তি কথায় ব'লে থাকি জিভে কাঁটা হয়েছে। এটা হয় পিত্তবিকার থেকে। দীর্ঘদিন অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, কিম্বা পিত্ত জন্য পাণ্ডুরোগে ভুগলে জিভটায় হলদে দাগ প'ড়ে যায়, আর সব সময় খেতে ভাল লাগে দই কিম্বা মাখন। এমনটি বেশ কিছুদিন থাকলে সারা জিভটার রং হ'য়ে যায় লাল, আর জিভে কাঁটা কাঁটা হয়। এ অবস্থায় সত্বর চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে জিভে ক্ষত আসা অবশ্যম্ভাবী আর যদি হ'য়েই যায় তবে সেটা সারানো খুবই কঠিন হয়, এটাই এ রোগের অরিষ্ট লক্ষণ।

(৩) জিহ্বাঙ্কুর
(PAPILOMA OF THE TONGUE)

এই রোগটি জিহ্বাকণ্টকের চেয়েও কষ্টসাধ্য। মাঝে মাঝে অথবা একটানা শ্লেষ্মা-বিকারের পরিণতিতে এটা হয়। জিভ ভারী হ'য়ে যায়, মোটা হয়, মনে হবে কোন আঠায়

জিভটা যেন জড়িয়ে র'য়েছে, কিছুদিন থেকে থেকে শিমুলের কাঁটার মত জিভের গোড়ায় মাংসাঙ্কুর হয়, সেগুলি শক্ত হ'য়ে থাকে, ওগুলি আবার ক্ষতও হয়ে যায়—এটা যখনই হয় তখনই এটা অশুভ লক্ষণ বলে মনে করতে হবে।

(৪) অলাস

রোগের পরিভাষাগুলি বিচিত্র, যেমন একটি রোগ হলো অলস আবার এই 'ল'-এর পাশে একটি আকার "া" ব'সে গেলে অমনি হ'য়ে গেল অলাস—যাকে বলে একেবারে পা থেকে রোগ মাথায় উঠে গেল, আবার এই অলস শব্দের পাশে "ক" বসিয়ে দিলে অলসক হ'য়ে গেল, তখন এসে পেটে ঢুকলো।

কথাটা হ'লো এই যে—অলস রোগটি হয় পায়ে যাকে আমরা পাঁকুই বা হাজা বলি—, আর অ-লাস রোগ হয় জিভে (জিহ্বায়) এই রোগে জিভটাই অবশ হ'য়ে যায়, আর অলসক হয় পেটে। এটি এক ধরনের কলেরার মত রোগ।

তা যাক্, আলোচ্য রোগ সম্পর্কে আয়ুর্বেদে যেটা বলা হ'য়েছে সেটা হ'লো—

জিহ্বাতলে যঃ শ্বয়থুঃ প্রগাঢ়ঃ
সোঽলাস সংজ্ঞঃ কফরক্ত মূর্তিঃ।
জিহ্বাং সতু স্তম্ভয়তি প্রবৃদ্ধো
মূলে চ জিহ্বা ভৃশমেতি পাকম্॥

অর্থাৎ দূষিত ও বিকৃত কফ এবং বিকৃত দূষিত রক্তধাতু ঊর্ধগত হ'য়ে জিহ্বার নীচে এসে জ'মে গিয়ে এক উৎকট যন্ত্রণাময় শোথ হয়, তার ফলে জিভ নাড়ানো যায় না, অনড় হওয়াটার সংস্কৃত ভাষা অ-লাস। এর ফলে কথা কওয়া তো দূরের কথা, সামান্য কাঁপানোও যায় না। এই রোগটা স্থায়ী হ'লে সমস্ত জিভটা শুধু অবশই হয় না, তার অরিষ্ট লক্ষণও দেখা দেয়। সেটা হ'লো জিভের গোড়ায় (মূলে) ফোড়ার রূপ নিতে থাকে, অবশেষে ক্ষত হয়, তখন সারানোই কঠিন হ'য়ে পড়ে।

উপজিহ্বিকা

জিভটা উপরের দিকে তালুতে ঠেকালে জিভের নীচে যে কোমল শিরাগুলি আছে ওইখানেই এক ধরনের শোথ হয়, তা থেকে লালা ঝ'রতে থাকে এবং চুলকানিও হয়, আবার মাঝে মাঝে জ্বালাও করে। পরে ওখানটায় পাক ধরে। অবশ্য এটা দূষিত রক্ত ও কফের বিকারেই হয়। ওই পাক ধরাটাই এর অরিষ্ট বা অশুভ লক্ষণ, আর এইখানেই ক্ষত হ'লে তা অসাধ্য।

অরসজ্ঞতা

(CHRONIC SUPURATIVE GLOSSITIS)

এই রোগটির নামকরণে ঠিক বোঝানো যাচ্ছে না যে এখানকার বক্তব্য কি?

রসজ্ঞ শব্দের বিপরীত শব্দ তো অরসজ্ঞতা। এইতো হয়, এটা তো মনে আসা স্বাভাবিক যে রসজ্ঞ ব'ললে অনেক কিছুই বোঝার থাকে—এই যেমন মনে করা যেতে

পারে যে—বন্ধ্যা রমণী প্রসব বেদনা কি বুঝবে? এও তো অরসজ্ঞতা, আবার চির বৈরাগী যে, সে সংসার রসে অরসজ্ঞ; আবার নিরক্ষর ব্যক্তি সেও তো গ্রন্থপাঠে অরসজ্ঞ, কিন্তু সেগুলিকে তো রোগের পর্যায়ে ফেলা যায় না। ওখানকার রসজ্ঞ শব্দের অর্থ "অনুভূতি-সম্পন্ন চিত্ত", আয়ুর্বেদজ্ঞগণের অরসজ্ঞতা কিন্তু এ সব নয়। আবার এও তো আছে যে পারদকে রস বলা হয়, শুধু বনৌষধির জ্ঞান যাঁর আছে তার এই পারদ সম্বন্ধে হয়তো কোন জ্ঞান নেই, সে ক্ষেত্রেও তো বলা যেতে পারে ইনি অরসজ্ঞ বৈদ্য।

এখন প্রশ্নে হ'লো এই অরসজ্ঞতা যে ব্যাধি তার অর্থ কি?

সেটা হ'লো—কোন লোকের জিভ এমন অবস্থায় আছে যে তিতো (তিক্ত), ঝাল, কষা, টক প্রভৃতি কোন রসেরই আস্বাদ গ্রহণ ক'রতে পারছে না, অতএব অরসজ্ঞতা ব'ললে বুঝতে হবে এটি জিহ্বাগত রোগ। জিহ্বার যে স্নায়ু, শিরা ও ঝিল্লী প্রভৃতির রসগ্রাহিতার শক্তি আছে সেইটি বিকল হ'য়েছে—সে বিকলতা আসে বায়ুপ্রধান বিকারের দ্বারা।

তাই বলা হয়েছে—

জিহ্বানিলেন স্ফুটিতা প্রসুপ্তা শাকচ্ছদন প্রকাশ—

অর্থাৎ জিভের ওপরে ডুমুর, সেগুন প্রভৃতির পাতার ওপর যেমন কর্কশতা থাকে, তেমনি কর্কশতা হ'লে সাময়িকভাবে কোন জিনিসের স্বাদ পাওয়া যায় না, সেটা বেশ কিছুদিন স্থায়ী হ'য়ে থাকে, তবে সেটা অরসজ্ঞতা ব্যাধির জন্যই বুঝতে হবে। যদি দেখা যায় জিভের গোড়ার দিকে অথবা নিচেটা ফুলেছে তখন তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করাতে হয়, কারণ ওই ফুলো স্থায়ী হ'লে সেটাই হবে শোথ, আর ওই অরসজ্ঞতা আর শোথ দুই-এ মিলে অসাধ্য অবস্থার সৃষ্টি হবে। এইটাই তার অরিষ্ট লক্ষণ।

দন্তগত রোগ

(DISEASES OF THE TEETH)

মুখের তৃতীয় অংশ দন্ত, যাকে আমরা চল্‌তি কথায় দাঁত বলি। এই দন্তই সমস্ত খাদ্যকে (দমিত) দুমড়ে দিয়ে পিষ্ট করে অর্থাৎ পিষে দেয়। এই দাঁত না থাকলে, কোন কঠিন জিনিসকে কেবল মাড়ির দ্বারা পিষে গলাধঃ করানো গেলেও তাকে পরিপাক করার উপযোগী ক'রে পাঠানো যায় না। তাই শৈশবের দাঁতগুলিকে অবশ্যই যত্ন নিতে হয়। তারপরে দাঁত প'ড়ে গিয়ে যে দাঁত ওঠে তাও অনেকের যৌবনেই প'ড়ে যায়। তাই অকালে কেন পড়ে, তারই রোগ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদে বলা হ'য়েছে দাঁতে রোগ হয় আট প্রকারের—কোন্‌টি যে হবে বা হবে না সেটা নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়—তবে প্রাচীনেরা বলেন—দাঁতের রোগের ক্রম থাকলেও কোন ক্ষেত্রে ব্যক্ত থাকে, কোন ক্ষেত্রে অব্যক্ত থাকে, কোন ক্ষেত্রে অব্যক্ত হ'য়েই রোগ সৃষ্টি করে।

দালন

এ এক ধরনের দাঁতের রোগ—এটির সম্পর্কে বলা হ'য়েছে—

দীর্য্য মানেষ্বিব রুজা যস্য দন্তেষু জায়তে।
দালনো নাম স ব্যাধিঃ সদাগতি নিমিত্তজঃ॥

অর্থাৎ প্রথম প্রথম মনে হয় দাঁতগুলি শিরশির করছে, একটু গরম জল খেলে ওটা

কমে যায়। তারপর কয়েকদিন পরে আবার দেখা দেয়, তখন মনে হয় দাঁতগুলোতেই বোধ হয় ফাট্ ধরেছে। আবার অনেকে আয়না ধ'রে দেখেন দাঁতের মধ্যে কোন কোনটা ফেটেই গিয়েছে। এঁদের প্রকৃতি হয় বাতপ্রকৃতির (তার লক্ষণ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩১৩ পৃষ্ঠায় বলা হ'য়েছে) তাঁদেরই এ ধরনের রোগ হয় দাঁতে। এই দালন শব্দটি এসেছে "দারণ" থেকে। আমরা প্রচলিত ভাষায় বলি ফাটা। দাঁতগুলি ফাটা ফাটা হ'লেই জানতে হবে এটি দালন ব্যাধি। এই ব্যাধিরও অরিষ্ট লক্ষণ হয় যদি এর সঙ্গে দাঁতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয় আর দাঁতের গোড়া ফেটে ফেটে রক্ত প'ড়তে থাকে—তখন ওস সব কাঁচা দাঁতও তুলে ফেলতে হয়।

দন্তশর্করা

(CALCULUS)

শর্করা শব্দের উৎপত্তি পূর্বেই আলোচিত হ'য়েছে। এখানে এক কথায় বলি যে এখানে শর্করার অর্থ কাঁকর। আবার কাঁকর এসেছে কংকর থেকে। কংকরও মৌল নয়, ওটিও ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ধ্বনি হ'লো কর্কর, অতএব শব্দবিচার ছেড়ে কাঁকর বললে যা বুঝি তা এই দন্তশর্করা রোগ, মানে দাঁতের এমন ক্ষয়রোগ হয় যেটিকে বলা যায় দাঁতে কাঁকর জমে। এটা বায়ু ও পিত্তবিকারে জন্মে। অর্থাৎ দাঁতের মূলের রস বায়ু দ্বারা শুকিয়ে যায় এবং পিত্তের স্থানীয় অবস্থানটাও শুকোতে থাকে, শেষে ওখানকার দাঁতের অবস্থাটা এমন হয় যে, প্রথমে ছোট কাঁকরের মতই জমে, অবশেষে সেগুলিও শুকিয়ে যায়, ঝুরো ঝুরো হয়ে যায় আর যাঁরা দাঁত বিশেষ মাজেন না তাঁদের ক্ষেত্রে তাল পাকিয়ে সিমেণ্টের টুকরোর মত হ'য়ে যায়। ওরই নাম দন্তশর্করা। এর অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো দাঁত দিয়ে চেপে খেতে গেলেন ঝন্ ঝন্ ক'রে লাগবে যখন, তখনই এটি অশুভ লক্ষণ। এর পর অন্যান্য উপসর্গ আসবে।

কপালিকা

অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকেন যে মাঝে মাঝে দাঁতের চটা উঠে যাচ্ছে, কোন গাছের (যেমন তেঁতুল, অশ্বত্থ) ছাল শুকিয়ে গেলে যেমন খোসা ছেড়ে যায়, ঠিক তেমনি দাঁত থেকে পাতলা শক্ত, চাক্লা উঠে যাচ্ছে। ওকে বলা হয় কপালি। এই শব্দটির অনেকগুলি অর্থ থাকলেও এখানকার অর্থ হ'লো "খোলাম্-কুচি"। এই খোলা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত খোল থেকে, তার আগে খাল্ল থেকে, যার অর্থ উপরের ত্বক বা ছল্ল বা ছাল। এখনও লোক-প্রচলিত ভাষায় শোনা যায় ছাল বা খাল ছাড়ান (ওপরের চামড়া) শব্দটি। অতএব কপালিকার অর্থ দাঁতের ছাল উঠে যাওয়া। দাঁতের অস্থিময় অবয়বটি পর্দা পর্দা হয়ে বা স্তর স্তর হ'য়ে যে জমাট অস্থিরূপ হয়—সেই পর্দা বা স্তরগুলি খ'সে যায়। এটাকে বলা হয় দাঁত ক্ষয়ে যাচ্ছে। এই রোগটির ওই হবে অরিষ্ট। যখন দাঁতগুলি থেকে অমনি ছাল উঠে গিয়ে করাতের মত হ'য়ে যাবে তখন অপর দাঁতেরও মাঝ বরাবর ফাঁকা হয়ে যায়। তখন কোন কিছু খাওয়াটাই অস্বস্তিকর হ'য়ে পড়ে।

ক্রিমিদন্তক

(DENTAL CARRIES)

দাঁতের অন্যান্য ৭টি রোগের মধ্যে যদিও সব কয়টি বেশ কষ্টপ্রদ, তা হ'লেও এই

ক্রিমিদন্তক রোগ বড়ই উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

হঠাৎ হঠাৎ দাঁতের যন্ত্রণা আর দাঁতগুলির উপর কালো কালো ছিটের দাগ হবে, এবং কোন কোন দাঁতে ছিদ্র হ'য়ে যাবে, বেশীর ভাগ তা দাঁতের গোড়া ঘেঁষেই হয়, কয়েকদিন পরে দাঁত নড়তে থাকে, আর গোড়া থেকে লালা গড়াতে থাকবে। বুঝতে হবে দাঁতের গোড়ায় এবং দাঁতের অস্থি-অবয়বে ক্রিমি হ'য়েছে। প্রচলিত ভাষায় দাঁতে পোকা হ'লে পর এই লক্ষণ হয়। সামনের দিক অপেক্ষা নিচের-ওপরের ভিতরের দিকটায় বেশী পোকা ধরে ক্রমে ক্ষত হয়, দাঁতগুলি খুব ধীরে ধীরে ক্ষয় হ'য়ে যেতে থাকে, শেষটায় গর্তও হয়, কিবা গরম জল কিবা ঠাণ্ডা জল যাই লাগুক, মাথার শিরা পর্যন্ত ঝন্ ঝন্ ক'রে ওঠে, কানের পাশের শিরা টন্‌টন্ করে। এ রোগ হয় বাতপ্রকৃতির লোকের; তার ওপর যদি খাদ্য পানীয়ের মধ্যে বায়ু বাড়ার মত কিছু ঘটে অর্থাৎ যে সব খাদ্য পেটে বায়ু সৃষ্টি করে এবং অনবরত ক্ষিধে লাগতে থাকে তা হ'লে এই ক্রিমিদন্ত রোগটি আরও কষ্টপ্রদ হয়। এমন কষ্টপ্রদ রোগের অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো, যদি দাঁতের গোড়া ফোলে এবং সেই ফোলা থেকে ঘা হয় তবে রীতিমত চিকিৎসা না করালে আর সারে না, অকালেই মুখে দূষিত ক্ষত হ'য়ে যায়।

দন্তহর্ষ

এই ব্যাধিগুলির সুপরীক্ষিত লক্ষণ সুশ্রুতের নিদানস্থানের ১৬ অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে, টীকাকারগণ অন্যান্য সংহিতা থেকে (ভোজ, নেমি) তার চুম্বক লক্ষণ আহরণ ক'রে লিখেছেন—

শীতমুষ্ণঞ্চ দশনাঃ সহন্তে স্পর্শনং ন চ।
যস্যতং দন্তহর্ষন্তু ব্যাধিং বিদ্যাৎ সমীরণাৎ॥

অর্থাৎ যাঁর দাঁতে ঠাণ্ডা কিম্বা গরম কোনটাই সহ্য হয় না, এমন কি ঐ রকম ঠাণ্ডা-গরম খাদ্যপানীয় স্পর্শ করালেই সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে, সে রোগের নাম দন্তহর্ষ। এই লক্ষণটি দেখা দিলে বুঝতে হবে, বাতপ্রকৃতি ব্যক্তির বায়ুবিকার জনিত এই রোগ।

সুশ্রুত সংহিতার মতে এটি পিত্তপ্রধান এবং অনুগামী বায়ুবিকার জন্য এই রোগ, কারণ শুধু বায়ু হ'লে গরম লাগালে আরাম হ'তো, কিন্তু ঠাণ্ডা জিনিস লাগালেও কষ্ট হয় যখন, তখন বিকার প্রাধান্যে পিত্তবিকারই আগে হয়, তার সঙ্গে ওতপ্রোত বায়ুযুক্ত থাকে ব'লেই অমন বিপরীত গুণের স্পর্শেও কষ্ট হয়।

তাই বলা হয়েছে—

শীতরুক্ষ প্রবাতাম্লস্পর্শানামসহা দ্বিজাঃ।
পিত্তমারুত কোপেন দন্তহর্যঃ স নামতঃ॥

অর্থাৎ যে অবস্থা হ'লে দাঁতগুলি ঠাণ্ডা, রুক্ষ, অম্ল, এদের যে কোন কিছুর স্পর্শ পেলেই শিউরে ওঠে, সিড়্‌সিড়্ করে, সেই অবস্থাটি ঘটে পিত্ত এবং বায়ুর বিকারে। এরই নাম দন্তহর্ষ।

এই রকম অবস্থায় তার সঙ্গে যদি রক্তবিকারজনিত কোন রোগ এসে জুটে যায়

তবেই হবে তার অশুভ লক্ষণ।

বর্ধন (খল্লিবর্ধন—আক্কেল দাঁত)

ব্যথা-বেদনার সংস্রব থাকে ব'লেই রোগ, নইলে এই খল্লিবর্ধন নামে যে দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণাদায়ক একটি অবস্থা, সেটিকে ব্যাধি বলা যায় না, তবে বি-আধি অর্থাৎ বিশেষভাবে অধিষ্ঠান করে বলে যদি ব্যাধি হয়, তবে এটাও ব্যাধি, কারণ এই যে. যাকে বলে আক্কেল দাঁত ওঠা, সেটা কি কোন ব্যাধি? ও তো প্রাকৃতিক দেহের প্রাকৃতিক নিয়ম, আর আক্কেল কথাটি তো বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত কোনটাই নয়, এমন কি ভারতীয়ও নয়। আক্কেল শব্দটি আরবী ও ফারসী ভাষা। ও ভাষায় আক্কল মানে জ্ঞান/বিবেচনা। দাঁতের মাড়িতে দাঁত এমন সময় ওঠে যখন বলা যায় এবার জ্ঞান-বিবেচনার বয়স হ'য়েছে, তাই বলা হয় আক্কেল দাঁত উঠেছে, অর্থাৎ আর ঠিক শিশু-বুদ্ধি নেই এর। আক্কেল হয়েছে।

সুশ্রুত সংহিতার দৃষ্টিতে

এটার নাম খল্লিবর্ধন।

মারুতেনাধিকো দন্তো জায়তে তীব্র বেদনঃ।
খল্লিবর্ধন সংজ্ঞোঽসৌ সংজাতে রুক প্রশাম্যতি॥

অর্থাৎ বায়ুর প্রকোপ বশতঃ প্রবল যাতনার সঙ্গে যদি একটি অতিরিক্ত দাঁত ওঠে, তা হ'লে তাকে বলা হয় "খল্লি বর্ধন"। তবে এই দাঁত ওঠার পর আর যন্ত্রণা থাকে না। সুশ্রুতের কোন পাঠ বর্ধন, কোন পাঠ খল্লিবর্ধন। খল্লি শব্দটি এসেছে স্খলিত শব্দ থেকে; অর্থাৎ দাঁতের মাড়ি স্খলিত ক'রে দাঁত বেরোয় এবং বেড়ে ওঠে।

এ রোগের অরিষ্ট বা অশুভ লক্ষণ আসে না, তবে যাঁদের ঊর্ধ্বগত রক্তপিত্ত রোগ থাকে, তা'হলে তার সঙ্গে এসে জুটে যায়, অল্পেতেই রক্তপাত হ'তে থাকে, তার ফলে ওই স্থান থেকে রক্ত ঝরা বন্ধ হ'তে চায় না। হ'লেও ক্ষত হ'য়ে যায়। এ ছাড়া অন্য অরিষ্ট দেখা দেয় না।

ভঞ্জনক

চলতি কথায় বলা যায় এ রোগটির নাম "দাঁতভাঙগা", আসলে মুখটা বেঁকে গিয়ে যে দাঁত ভাঙ্গে এমন নয়। বরং তার উল্টোই হয় অর্থাৎ আগে দাঁত ভাঙ্গে, তারপর মুখখানা বেঁকে যায়। এটা তো সবারই হয় না, যাঁরা দীর্ঘদিন বাতশ্লেষ্মা বিকারে ভুগতে থাকেন তাঁদেরই হয়। এ তো গেল—তারপর বাতশ্লেষ্মা প্রকৃতির লোক যদি আবার ওই বাতশ্লেষ্মা বিকারে আক্রান্ত হন, যেমন ধরুন কেউ নিউমোনিয়া রোগে ভুগলেন, কিম্বা বুকে শ্লেষ্মার চাপে হাঁপ ধরা রোগে বেশ কিছুদিন কষ্ট পেলেন, কিম্বা বাতশ্লেষ্মার জন্য মাথার অসুখে ভুগলেন; তাঁদেরই প্রায় দেখা যায় দাঁতগুলিতেও রোগ এসে জুটছে। প্রাথমিক অবস্থায় দাঁতের মাড়ি ফোলে, দাঁত কন্‌কন্‌ করে, তারপর আস্তে আস্তে দাঁতের জোর ক'মে যায়, কোন কারণে সামান্য আঘাতেই এদের কিন্তু তাড়াতাড়ি হাড় ভাঙ্গে।

এ সম্বন্ধে সুশ্রুতোক্ত মতবাদটা যে কি সেটা জানাই—

বক্তুং বক্কং ভবেদ্‌ যস্য দন্তভঞ্জন জায়তে।
কফ বাত কৃতো ব্যাধিঃ সভঞ্জনকঃ সংজ্ঞিতঃ॥

অর্থাৎ পূর্বাপর ক্রম না হ'য়ে (আগে দাঁত ভাঙ্গে অথবা আগে মুখ বাঁকে) মুখ-খানা বেঁকে যাওয়া এবং দাঁত ভাঙ্গা, এ দুটো ঘটে যায় কিন্তু দাঁতে ও দাঁতের মাড়িতে একসঙ্গে যন্ত্রণা হ'তে থাকে, তারই নাম ভঞ্জনক ব্যাধি।

এই ব্যাধিটির যেটি অরিষ্ট লক্ষণ সেটি হলো ওই মুখ বাঁকার সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের মাড়িতে যদি স্পর্শ শক্তিটিও হ্রাস হ'তে থাকে, তবে বাঁকা মুখ আর স্বাভাবিক হয় না—এইটাই এর অশুভ লক্ষণ।

শ্যাবদন্তক

(HYPOPLASIA)

ক্রিমিদন্তক আর শ্যাবদন্তক এই দুটি রোগের তফাৎ হ'লো—ক্রিমিদন্তকে দাগ প'ড়বে খুব ছোট ও ছিট্ ছিট্, আর শ্যাবদন্তক রোগ হবে সব দাঁতটাই দাগী। দ্বিতীয় তফাৎ—ক্রিমিদন্তকে গোড়ায় ফুলো আর খুব যন্ত্রণা কিন্তু শ্যাবদন্তকে যন্ত্রণাও হবে না আর ফোলাও হবে না।

যাঁরা আভ্যন্তরীণ রক্তপিত্ত রোগে ভোগেন, তাঁদেরই এই রোগ হয়। শ্যাবদন্তটি বৈদিক। এটি আছে ঋক্‌বেদে ২।১০।২ সূক্তে। ওখানের বক্তব্য কালো ও হ'লদে দুটি রঙের সংযোগেই শ্যাববর্ণ হয়।

এর অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো—ওই শ্যাব রংটি আসে দূষিত পিত্তের ক্ষারাংশ থেকে, অর্থাৎ পিত্ত এত ক্ষ'রে যায় অর্থাৎ তীক্ষ্ম হ'য়ে যায়, যার জন্য দেহের অস্থিও অঙ্গার হ'য়ে যায়। দেহের আভ্যন্তরীণ অস্থিগুলির রংও অমনি কালো হয়ে যায়। পোড়া কয়লার মত হ'য়ে গিয়ে সামান্য চাপেই তা গুড়িয়ে যায়। এই হ'লো অরিষ্ট লক্ষণ।

দন্তবেষ্ট রোগ (দাঁতের মাড়ির রোগ)

(এর সংখ্যা ১৫ প্রকার)

(DISEASES OF THE GUM)

বাগানের বা বাড়ির পাঁচিল (প্রাচীর) বা বেড়াটির গুরুত্ব কম নয়। মুখের মধ্যেও আর এক বিশেষ অংশ দন্ত বা দাঁত। সেই দাঁত ও সেগুলিকে থরে থরে সাজিয়ে মুখগহবরে প্রবেশের মুখে যে বেড়া আছে তারই নাম দন্তবেষ্ট বা দাঁতের মাঢ়ী বা মাড়ি। এই বেষ্ট থেকে বেড়া কথাটা চালু হ'য়েছে। আর মাঢ়ী শব্দটা কিন্তু মাঢ় বা মাড় থেকে আসেনি। এসেছে মর্দ থেকে অর্থাৎ যার শক্তি মর্দ করে বা মর্দন করে অথবা চূর্ণ বা পেষণ করে। দাঁতের মাড়ি না থাকলে দাঁতগুলি কোন খাদ্যকে চূর্ণ ক'রতে পারে না বা মর্দন ক'রতে পারে না, তাই দাঁতের গুরুত্ব যেমন, তার থেকেও দাঁতের মাড়ির গুরুত্ব বেশী। কারণ দাঁত চ'লে গেলেও অস্থি, শক্ত মাংস জাতীয় দ্রব্য ছাড়া প্রায় সব দ্রব্যই মর্দন করে বা চূর্ণ ক'রতে পারে এই মাড়ি। যাঁরা ফোক্‌লা অর্থাৎ যাঁদের দাঁত নেই তাঁরাও শক্ত-কোমল দ্রব্য ওই মাড়ি দিয়ে চূর্ণ ক'রে খেতে পারেন (হিন্দিতে পোপ্‌লা, সেই পোপ্‌লাই বাংলায় এসে ফোক্‌লা) অল্প শক্ত হ'লে শিশুরাও খেতে পারে।

অতএব দন্তবেষ্ট বা দাঁতের মাড়ির সুস্থতা রক্ষা করা খুবই দরকার। প্রথমেই বলা হ'য়েছে এই মাড়িতে রোগ হয় ১৫ প্রকারের।

পরিদর

(PERIO-DONTITIS)

এটি সংস্কৃত শব্দ—পরি শব্দটির যা অর্থ, দর মানে তা নয়। এটি দাঁতের মাড়ির একটি রোগ—মাড়িতে গর্ত হ'য়ে যায় তাই গর্তকে দর বলা হ'য়েছে—শুধু গর্ত নয়, সঙ্গে রক্তও জমে এবং ঝ'রে পড়ে, তারপর তাতে পুঁজও হয়; সেই পুঁজ, রক্ত এবং গর্তের সঙ্গে মাড়ির মাংসও প'চতে থাকে; এই জন্য ওইসব অবস্থাকে একসঙ্গে বোঝাতে বলা হ'য়েছে পরিদর। সংস্কৃত ভাষায় পরি শব্দটির অন্ততঃ ২৫ প্রকার অর্থ হয়, যেমন চতুর্দিক ব'ললে "পরি" বলা চলে, আবার নিন্দা করার জন্য বাদ শব্দের সঙ্গে জুড়লে "পরিবাদ"—এর অর্থ নিন্দা, শুশ্রূষা বোঝাতে পরিচর্যা, কিন্তু "পরি"-এর সঙ্গে "দর" জুড়ে যে শব্দটি হ'লো এর অর্থে "ব্যাপ্ত" এখানেই বলা হয়েছে—

দন্তমাংসানি শীর্যন্তে যস্মিন্ ষ্ঠীবতি চাপ্যসৃক্।
পিত্তাসৃক্ কফজো ব্যাধির্জ্ঞেয়ঃ পরিদরো হি সঃ॥

রোগের লক্ষণ পূর্বেই বলা হ'য়েছে। এখানকার বিশেষ কথা এই যে, যাঁরা ঊর্ধ্বগত রক্তপিত্ত রোগে আক্রান্ত হন, তাঁদের প্রায় এই পরিদর রোগ হয়। এই রোগের প্রাথমিক কর্তব্য দাঁতগুলি তুলে ফেলা, নইলে সৌষির রোগের লক্ষণ দেখা দেয়—সেইটাই তার অশুভ লক্ষণ।

বৈদর্ভ

সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত হয়েছে দন্তবেষ্ট রোগের মধ্যে এই বৈদর্ভ নামীয় রোগটির নামকরণের তাৎপর্যটি খুবই বিস্ময় সৃষ্টি ক'রে, এটি একটি সাহিত্য রচনা শৈলীরও নাম, তাছাড়া বিদর্ভ একটি প্রদেশেরও নাম, কিন্তু রোগের সঙ্গে এর সঙগতি দেখা যায় না—তবে এইটা বলা যেতে পারে বিঘর্ষণ জন্য দর্ভক্ষত। অর্থাৎ কুশের দ্বারা ঘর্ষণ ক'রলে যেমন কর্কশ হয় সেইরূপ। তাই শ্লোকে দেখা যায়—

ঘৃষ্টেষু দন্তমাংসেষু সংরম্ভো জায়তে মহান্।
চলা ভবন্তি দন্তাশ্চ সবৈদর্ভোঽভিঘাতজঃ॥

অর্থাৎ ঘষে যাওয়া আঘাত থেকেই এই রোগ হয়, তার ফলে দাঁত ন'ড়ে যায়। দাঁতের মাড়ির মাংস যদি কোন কর্কশ দ্রব্যের দ্বারা (যেমন কোন কড়া জিনিস দিয়ে দাঁতন করার সময়) এমনকি লবণের দ্বারা ঘর্ষণেও ক্ষত হ'য়ে যায়। যদি কারও রক্তপিত্ত রোগ থাকে, তা হ'লে তাঁদের এ রোগ খুব দ্রুত দেখা দেয়। আর যাঁরা কফ পিত্ত প্রকৃতির তাঁদেরও হয়, তবে দ্রুত হয় না।

উপকুশ

(PERIO-DONTITIS)

উপ শব্দটির অর্থও গৃহীত হ'য়েছে পরি উপসর্গের মত অর্থাৎ অনেক অর্থের মধ্যে যেমন একটি অর্থ-ব্যাপ্তি তেমনি উপ শব্দেরও ২৯ প্রকার অর্থ থাকলেও এখানে

মাত্র একটি অর্থই গ্রহণ করা হ'য়েছে, সেটি নিকটবর্তী বা সামীপ্য। কথাটা এই যে, যেমন হাতের কাছে থাকলেও একটু নাড়াচাড়ার অপেক্ষা, তার পরে ঝ'রে পড়ে তেমনি, অর্থাৎ দাঁতের গোড়ায় রক্ত জ'মে আছে কিন্তু যতক্ষণ দাঁতটি না নাড়ানো যায়, ততক্ষণ রক্ত পড়ে না, এমনি অর্থ বোঝাতে "উপ" আর কুশ শব্দের অর্থ আমাদের জানা আছে এক জাতীয় তৃণবিশেষ কিন্তু এখানে কুশ শব্দের অর্থ যেখানে কুৎসিত ঘটনা ঘটে; এবং যে ব্যক্তি দুর্বৃত্ত, এই উভয় ক্ষেত্রেই কুশ শব্দের প্রয়োগ করা হয়। এই উপকুশ রোগের নামকরণের অর্থ হ'লো যে রোগটি ভিতরে ভিতরে অনেকদিন থেকেই জন্ম নিয়েছে।

মাঝে মাঝে দাঁতের গোড়ায় জ্বালা আর নড়াচড়া অবস্থা। তারপর সেই নড়া দাঁতের গোড়ায় জল লাগালেই টন্‌টন্ ব্যথা। ক্রমে ওই স্থানেই গর্ত ও রক্তের সঞ্চয়। তার পর কোন একটি দাঁত নাড়ালেই অমনি রক্ত বেরিয়ে গেল। শেষে ওই দাঁতগুলো থেকে পচা গন্ধ। এই হ'লো উপকুশ। এমনি ব্যাধির আবার অরিষ্ট লক্ষণ হয়—সেটা হ'লো ওই পচা গন্ধের সঙ্গে মাংস কুচি বের হওয়া।

সৌষির (শৌষির)

(SUB-GINGIVAL CALCULUS)

এটি দাঁতের মাড়ির আর একটি রোগ। এই নামটি হ'য়েছে সুষি বা শুষি শব্দ থেকে। এই শব্দটির অর্থ হয়তো বেদে আছে কারণ পাণিনি ব্যাকরণে এই শব্দটিকে ধরা হয়েছে ৫।২।১০৭ শ্লোকে। বলা হ'য়েছে, যে কাঠের ভিতরটা ফাঁপা বা শূন্যগর্ভ, যেমন বাঁশ/নল প্রভৃতি—এইজন্য বাঁশের তৈরী বাঁশীকে বলা হয় সৌষির ধ্বনি, বা বংশীধ্বনি। এই সৌষির শব্দটিকে সুশ্রুতে ব্যবহার করা হ'য়েছে দন্তবেষ্টক রোগে। অনেকের ভুল ধারণা, দাঁতেরই এক রোগের নাম এটি। তা নয়, এটা দাঁতের মাড়ির একটি রোগ।

এই রোগ হ'লে দাঁতের গোড়া ফোলা থাকে, এবং প্রায়ই লালা জ'মে যায় আর ঠাণ্ডা জল বা গরম জল স্পর্শ পেলেই যন্ত্রণা হয়। লালাটা মুছে নিলেই আবার জ'মতে থাকে।

শিশুদের মুখে লালা ঝরাটাও দাঁতের মাড়ি থেকেই, কিন্তু তাতে শোথ বা ফুলো হয় না বা থাকে না। ঠাণ্ডা-গরম জলের স্পর্শেও কিছু হয় না, ও লালাটা তার হজমের সাহায্যই করে। কিন্তু বয়স হ'লে কন্‌কনানি ও ফুলোর সঙ্গে যদি লালা ঝ'রতে থাকে, তখন ধ'রে নিতে হবে এটা কফদুষ্টি ও রক্তদুষ্টি থেকে হ'চ্ছে। শ্লেষ্মা ও রক্তদুষ্টির চিকিৎসা না করলে এটা সারে না। তবে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ঘা, পূঁজ (দুর্গন্ধযুক্ত) হ'য়েছে তখনই হয়েছে এই ক্ষেত্রের অশুভ লক্ষণ।

মহাশৌষির (সৌষির)

(ULCERATIVE GINGIVITES)

এটিও দন্তবেষ্টগত রোগের একটি বিশেষ অবস্থা, সৌষির রোগটিই যখন গুরুতর হয়, তখন নাম হবে মহাসৌষির। ভারতীয় গ্রন্থমালায় "মহা" শব্দটি যেন বিশ্বরূপ। বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োগ ক'রে তাকে বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে; তা হ'লেও ৯টি ক্ষেত্রে মহাশব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা আছে—যেমন শঙ্খ হ'লো শুভধ্বনিকারক জলজ প্রাণীর যে অস্থি (শাঁখ) কিন্তু মহাশঙ্খ মানে নরকপাল। এই রকম তেলের (তৈলের) আগে মহা বসালে অর্থ হবে মানুষের মাথার ঘেলু (ঘিলু), মাংসের আগে ব'সলে অর্থ হবে

গোমাংস, বৈদ্যের আগে ব'সলে "যম" বুঝে নিতে হবে, জ্যোতিষীর আগে বসালেই নিকৃষ্ট জ্যোতিষী। দ্বিজের (ব্রাহ্মণের) আগে ব'সলে চণ্ডাল, যাত্রা শব্দের আগে ব'সলে "মহা-যাত্রা" মৃত্যুর পথ অর্থ হবে। পথ শব্দের আগে ব'সলে "যমপুরীর পথ" আর নিদ্রাশব্দের আগে ব'সলে "মহানিদ্রা" অর্থাৎ সে নিদ্রা আর ভাঙ্গে না। এই নয়টি ক্ষেত্র বাদে মহা শব্দটি বিশিষ্ট অর্থের ইঙ্গিত করে। শত শত ক্ষেত্রে।

আয়ুর্বেদীয় সংহিতা সুশ্রুতে যে দন্তবেষ্টক রোগটির এক বিশেষ অবস্থার নাম "মহা শৌষির" বলা হ'য়েছে, সেটির ক্ষুদ্রাবস্থা শৌষির রোগ আর আরও গুরুতর হলেই মহাশৌষির।

এর লক্ষণ হ'লো—দাঁতের মাড়িতে দাঁত থেকেও প্রায় প্রত্যেকটিই নড়বড়ে করে, তালুর দিকটায় ঘায়ের মত হেজে যাবে আর দাঁতের গোড়াগুলো পচে যাওয়ার মত অবস্থা, আর দুর্গন্ধ হ'তে থাকবে, মুখের গহ্বরের সর্বত্রই এক অস্বস্তির কারণ ঘটাবে।

তাই শ্লোকাকারে বলা হ'য়েছে—

দন্তাশ্চলন্তি বেষ্টেভ্যস্তালু চাপ্যবদীর্য্যতে।
দন্ত মাংসানি পচ্যন্তে মুখঞ্চ পরিপচ্যতে॥

আসল কথা হ'লো সৌষির রোগ ভালভাবে না সারলে যে অবস্থা দাঁড়াবে সেটা ত্রিদোষ বিকারের রোগ এবং সৌষির রোগরই অরিষ্ট লক্ষণ মহোশৌষির; এ রোগটি এত ভয়ঙ্কর যে দ্রুত বেড়ে যায় এবং সমানভাবে থেকে মানুষের প্রাণ বিনষ্ট করে।

দন্ত পুপ্পুট

(PERIO-DONTITIS)

এই শব্দটি আমাদের কাছে খুবই অপরিচিত। কিন্তু ভাষাভিত্তিক গ্রন্থ রচনা ও রচয়িতার ইতিহাসের ভিত্তি খুঁজলে পাওয়া যায় কোন এক সুদূর অতীতের ভারতে অথর্ববেদিক পুষ্প শব্দটি বিবর্তিত হ'তে হ'তে পুপ্প, তারপর পুপ্পু ও পরে পুপ্পুট হ'য়েছে। এ ভাষার বক্তব্য হ'লো—মাড়ির একটি কিম্বা দুটি বা তিনটি দাঁতে প্রথমে গোড়াটার সরু অংশটা সামান্য ফোলে, এটা দেখতে অনেকটা পুষ্পের কুঁড়ির মত হয়। তারপর একটু সাদা পুঁজ জমার মত সাদা হয়, তারপর ওখানটায় ব্যথা (কন্‌কন্ করা), তারপর একবার সাদা পুঁজ, তারপরেই লাল হ'তে হ'তে আরও ফোলে; ওটি আস্তে আস্তে টিপে দিলে একটু আরাম হয়, ঈষদুষ্ণ জল দিলে কিছুক্ষণের জন্য আরাম, তারপরেই যে যন্ত্রণা হয়, তখন মনে হবে মাথার শিরাই বুঝি ছিঁড়ে যাচ্ছে। অথচ দাঁতগুলি নড়ে না, ঠাণ্ডা জলের কুলকুচি ক'রলে প্রথমটা সামান্য যন্ত্রণা, তারপরই আরাম। এই রোগটা স্থায়ী হ'লে ক্ষত হ'য়ে পুঁজ রক্ত বের হ'তে থাকে; তখন এই দন্তপুপ্পুট রোগের এইটাই হয় অশুভ লক্ষণ অর্থাৎ কষ্টসাধ্য ব্যায়ারাম।

দন্তবেষ্টক

দন্তবেষ্টক নামেও একটি রোগ হয়; অর্থাৎ দন্তমূলে আছে দন্তবেষ্ট, বা দাঁতের মাড়ি। এখানে ওই নামে একটি রোগের কথা বলা আছে। এই দন্তবেষ্ট রোগটি জন্ম নেয় রক্তদুষ্টি রোগ থাকলে। অর্থাৎ যাঁরা প্রায়ই চুলকণা, দাদ, একজিমা রোগে ভোগেন,

অনেক ক্ষেত্রে এ'দের দাঁতের মাড়িতে পুঁজ হয়, রক্ত পড়ে, আর প্রতিটি দাঁতই ন'ড়তে থাকে, তাঁরা ভাল ক'রে চিবিয়ে খেতে পারেন না, যেটুকু খান তার সঙ্গে দাঁতের মাড়ির পুঁজ রক্ত মিশে যায়, সেটা পেটে যায়, ফলে রক্তদোষ সারতে চায় না। এর ওপর যদি স্বাভাবিক অবস্থাতেও মুখে দুর্গন্ধ হ'তে থাকে তখনই হয় দাঁতের মাড়ির অশুভ লক্ষণ অর্থাৎ তখন বুঝতে হবে দাঁতগুলি তুলিয়ে বেশ কিছুদিন রক্তদুষ্টি রোগের চিকিৎসা না ক'রালে মুখের ঘা থেকে রেহাই হয় না।

শীতাদ

(PERIO-DONTITIS)

শীত শব্দটি নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির যত স্তর আছে অর্থাৎ সাহিত্য, ব্যাকরণ, রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের কোন না কোন স্থলে শীত শব্দটি ব্যবহৃত হ'য়েছে।

এখানে সে সবের প্রসঙ্গ আনলে আসল বক্তব্য চাপা প'ড়ে যাবে, তাই রোগের প্রসঙ্গটি এনে অথর্ববেদের শীত শব্দটিকে যে একটি শিশুরোগের অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে, সেখানে তার নাম দেওয়া হ'য়েছে "শীতপূতনা", সেটি একটি আধিদৈবিক কল্পনা। সেটা আছে সুশ্রুত সংহিতার উত্তরতন্ত্রের ৩৪ অধ্যায়ে। আবার শীত শব্দটি যেমন ঋক্‌বেদে (১০।৩৪।১) আছে—এই শীত শব্দটিকে টানা হ'য়েছে দাঁতের মাড়ির রোগেও অর্থাৎ দন্তবেষ্ট রোগে শীত-আদ অর্থাৎ জলে যে শীত স্পর্শতা প্রাকৃতিক শক্তি আছে, সেই শক্তিটি বিকৃত ক'রে দেয় দেহের বিকৃত রক্তধাতু। তার লক্ষণ হ'লো—বিকৃত রক্তদোষটি দাঁতের মাড়িতেও যে রসধাতু আছে তাকে দ্রুত বিকৃত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের মাড়ি থেকে হঠাৎ হঠাৎ রক্ত পড়ে, দাঁতের মাড়িতে মাংসপচা গন্ধ হয় ও মাড়ি কালো হ'য়ে যায়, বেশ ভোগায় এবং এ সময় দাঁতের চিকিৎসার প্রাধান্য না দিয়ে রক্তদুষ্টি রোগের চিকিৎসায় সারে, কিন্তু শীতাদ রোগে যদি কুচি কুচি পচা মাংস বের হ'তে থাকে তবে তা হবে অরিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত।

অধিমাংস

এটি দাঁতের মাড়ির রোগ—এসব রোগের লক্ষণ চরক সংহিতায় বিস্তৃত ক'রে বলা হয়নি, হ'য়েছে সুশ্রুত সংহিতার নিদানস্থানের ১৬ অধ্যায়ে। সেটিকে এইভাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে—

হানবো পশ্চিমে দন্তে মহান্ শোথো মহারুজঃ।
লালাস্রবী কফকৃতো বিজ্ঞেয়ঃ সোঽধিমাংসকঃ॥

অর্থাৎ হনুকুহরের শেষের দিকের মাড়িতে প্রথমে অল্প ফোলা (ফুলা) তারপর শক্ত ঢিপির মত হয়, ক্রমেই তা বেশ বড় হয় আর যন্ত্রণা হয়। হনু মানে ওপর আর তলার দাঁতের পাটি যেখানে শেষ হয়, আর কুহর মানে গর্ত। এই গর্তেই হয় শক্ত মাংসের ঢিপি আর ফুলো। ক্রমে তা ফোড়ার মত হ'য়ে পেকে যায়। এ রোগটা কফের বিকার থেকেই হয়। কিন্তু তা হয়, যখন সেই লোকটির যদি রক্তপিত্ত রোগ থাকে তবে ওই শোথটা তখন ক্ষত এবং পুঁজের আশ্রয় হয়ে বেশ ভোগায়। ওইটাই তার অরিষ্ট

লক্ষণ। অবশেষে অস্ত্রসাধ্য ক'রলেও সে আর এক ক্ষত বিসর্পের কারণ হয়। সেটা আরও বিপজ্জনক। এরপর দাঁতের মাড়িতে আরও যে পাঁচ প্রকার রোগ হয়, সেগুলির সবই নাড়ী রোগ, অর্থাৎ নালী ঘায়ের রোগ। বারোমাসই ভোগাতে থাকে। প্রতিটি নালী ঘা অস্ত্রচিকিৎসায় আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা থাকলেও, নাড়ী ঘাগুলি দেহের রক্ত-বিশুদ্ধতার উপর নিঃশেষিত রোগের অস্তিত্বে বর্তমান থাকে।

হনুগ্রহ

(DISLOCATION OF TEMPERO-MANDIBULAR JOINT)

আমাদের দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গগুলিরও পৃথক পৃথক নাম। যেমন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, ওষ্ঠ, অধর, গণ্ড প্রভৃতি। এইসব নামেরও পৃথক পৃথক অর্থ আছে। তেমনি কপোল, হনু, চিবুক প্রভৃতিও নাম। এইসব নামের অর্থের সঙ্গে কোন্ স্থানটির কি নাম তাও চরক সুশ্রুত সংহিতায় বলা হ'য়েছে। যেমন, কপোল, এই স্থানটি দুটি কানের নিকটবর্তী দেশ, বলা যায় গালের একটি অংশ। আবার সেই কপোলের পরবর্তী-ভাগ বা চোয়াল ব'লে যাকে বলি, সেই কপোল আর গণ্ডের একটা অংশের নাম হনু। হন্ ধাতু থেকে এসেছে, অর্থাৎ আমাদের খাদ্যগুলি হনন ক'রতে হ'লে ওই হনুর সাহায্য চাই-ই চাই। নইলে মুখ যদি হাঁ হ'য়ে থাকে আর বন্ধ না হয়, তা'হলে তো আর চিবোনো যায় না। আবার মুখ বন্ধ হ'য়ে গেলেও (যা মূর্ছা অপস্মারে হ'য়ে পড়ে) চিবানো যায় না। অতএব ওই কপোল এবং গণ্ডের মাঝের হনুটি চাই—মুখের দুটি অংশ খোলা ও জোড়া যায় যে স্থানটির জন্য। মানুষের চেয়ে অন্য এক শ্রেণীর প্রাণীর ওখানটার শক্তি বেশী এবং মুখের অনুপাতে হাঁ হ'য়ে যায় বেশী, তাই এই প্রাণীটিকে আমরা 'হনুমান' ব'লে থাকি। সেই হিসেবে বিচার ক'রতে গেলে আমরাও ওই পর্যায়ে প'ড়ে যাই। কিন্তু সেই হনু দুটি যদি বাতের রোগে জুড়ে যায় কিম্বা আটকে গিয়ে হাঁ হ'য়ে যায়, তবে তাকে বলা হয় "হনুগ্রহ"।

যাঁদের শরীরে আহার্য রসগুলি বীর্যকর হ'য়ে প্রবেশ ক'রে বলাধান সৃষ্টি করে না, অর্থাৎ পুষ্টিকর আহার্য পায় না, তাদের দেহ প্রায়ই দুর্বল হ'য়ে থাকে। (সে স্থূল হলেও দুর্বলতা থাকে) তেমন অবস্থাতেই আভ্যন্তরীণ বায়ু কুপিত ও বক্রীভূত হ'য়ে শরীরে সঞ্চারিত হ'তে থাকে। হয়তো মুখ হাঁ ক'রে জিভ পরিষ্কার ক'রতে ক'রতে কিম্বা কোন শক্ত খাদ্য জোর করে চিবিয়ে খেতে যাওয়ার সময় চোয়াল এমনি আটকে গেল যে, যন্ত্রণায় অস্থির, আর মুখটি বন্ধ করাই যাচ্ছে না কিম্বা খোলা গেল না। এ তো অনেক ক্ষেত্রে হ'য়ে থাকে, ঠিক সেইটাই আয়ুর্বেদে বর্ণনা করা আছে—

কুপিতো হনু (নূ) মূলস্থঃ স্রংসয়িত্বানিলো হনূম্।
করোতি বিবৃতাস্যত্বমথবা সংবৃতাস্যতাম্॥

এটা যদিও সাময়িক হয় তবুও সেটা রোগ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা বারে বারে হ'লে এবং ওই সময়টায় যদি মলমূত্রের বেগও বন্ধ হ'য়ে যায় এবং যন্ত্রণার জন্যই হোক অথবা মূর্ছার কারণ থাকার যোগ যদি থাকে তবে বুঝে নিতে হবে, এটা বাতব্যাধি পুরোপুরি দেখা দিয়েছে। এইটাই অশুভ লক্ষণ।

হনুমোক্ষ

(TRISMUS—LOCK JAW)

দুটি চোয়ালের (উপর নীচের) সংযোগস্থলটাকেই হনু বলে। বাতব্যাধিতে হনু-

স্তম্ভ হয়, আর দাঁতের এক রোগে হনুমোক্ষ হয়, অর্থাৎ বায়ুই সংকোচবিকাশ ঘটানোর কাজে অগ্রণী হয়। বাহ্য বিকৃত বায়ু ঘরের দরজা বন্ধও করে এবং খুলেও; দাঁতের পাটির ওপর-নীচের শেষ কোণে যা শেষ সংযোগ যেখানে, সেখানটায় আটকে যায়, আবার খুলেও যায়। আটকে গেলে তা খোলা যেমন কষ্টসাধ্য, খুলে গেলে কিন্তু তা আর জোড়া যায় না, কারণ হনুস্থানের দাঁতগুলিই আলগা হ'য়ে যায়। এটা ঘটে যখন কোন শক্ত জিনিস চিবিয়ে খাওয়ার চেষ্টা হয়, কিম্বা প্রচণ্ড আবেগে মুখ হাঁ ক'রে বক্তৃতা করার অভ্যাস ক'রলে আকস্মিকভাবে তা ঘটে যায়, এইটারই নাম হনুমোক্ষ। তাছাড়া জোর ক'রে হাই তুলতে তুলতেও এটা হয়। এটা যদি প্রায়ই হ'তে থাকে তখন সেই হনুমোক্ষ রোগে আসে অরিষ্ট লক্ষণ, যেটা অর্দিত রোগেরই রূপ।

অর্দিত (দন্তরোগজনিত)

এই রোগটি বড়ই কষ্টদায়ক ও মানসিক দুঃখদায়ক। মুখের অর্ধেক বেঁকে যাওয়া, ঘাড় বেঁকে যাওয়া, চিবুকও বেঁকে যাওয়া থাকবে, এর সঙ্গে মাথাটাও কাঁপে, অর্থাৎ "শিরঃকম্প"।

এই রোগটি বাতব্যাধিজনিত অর্দিত রোগের লক্ষণই প্রায় আসে কিন্তু দন্তরোগের অরিষ্ট যে অর্দিত তার বৈশিষ্ট্য হ'লো, সঙ্গে সঙ্গে দাঁতেরও যন্ত্রণা হয়, যা বাত-ব্যাধিজনিত অর্দিত রোগে তা হয় না।

কণ্ঠগত রোগ

(DISEASES OF THE THROAT)

এইসব রোগ সম্পর্কে যখন বাংলা ভাষাতেই লেখা হ'চ্ছে, তখন যতটা সম্ভব বাংলা ভাষায় রোগের নামগুলির শব্দার্থ বোধ করার প্রসঙ্গটা মনে হয় বিরক্তিকর হবে না।

এই যে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংজ্ঞা নাম, এ নামগুলি তো আজকালকার নয়, বহুকালের, এবং সেই নামগুলির মৌল আকরভাষা সংস্কৃত প্রায়। সেইজন্য ক্রমে পর্যায়প্রাপ্ত কণ্ঠরোগের ভূমিকায় ব'লে রাখা ভাল যে, কণ্ঠ শব্দটি এত পরিচিত যে মনে হয় এই কণ্ঠ নামটি সম্বন্ধে বোধ হয় মানে জানার দরকার নেই। কিন্তু তাই কি ঠিক? তা'হলে কণ্ঠ মানে কি?

প্রকৃতপক্ষে কণ্ঠ মানে যা শব্দ করে। কণ ধাতু শব্দ করা, তার উত্তরে 'ঠ' প্রত্যয় মুখের মধ্যে শব্দ করার স্থান যেটি তারই নাম কণ্ঠ। যে প্রাণীর কণ্ঠস্থান নেই সে শব্দ ক'রতে পারে না। কণ্ঠ স্থানটির আর এক পরিচয় গলবিল। অর্থাৎ গলার অন্তশ্ছিদ্র। গ্রীবার পুরোভাগের নাম গল বা গলা। সেই গলার ভিতরকার ছিদ্রের নামই কণ্ঠ। সেই কণ্ঠেই ১৭ প্রকারের রোগ হয়, তার মধ্যে রোহিণী রোগই পাঁচ প্রকারের। বায়ুবিকারে, পিত্তবিকারে, শ্লেমাবিকারে তো হয়ই, তাছাড়া সান্নিপাতিক ও রক্তবিকার জনিতও হয়। এই রোহিণী মানে লাল রঙের খোঁচা (সাধু ভাষায় রক্তবর্ণ শঙ্কু আকৃতির কীলক)।

এই রোগটি যদি বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রাধান্যে পৃথক পৃথক হয়, আর রোহিণী রোগের রক্তমোক্ষণসহ দ্রুত চিকিৎসা না ক'রলে ৪ দিনের পর জীবন আর থাকে না প্রায়ই। কারণ গলবিলটি দ্রুত বন্ধ হ'য়ে যায়। কণ্ঠের মধ্যে কেউ যেন পেরেক পুঁতে দিচ্ছে, এমনি যন্ত্রণা এবং লাল শক্ত রকমের কীলক হ'য়েই এর সৃষ্টি। তবে বায়ু প্রধান হ'য়েছে কিনা, তার লক্ষণ—জিভ্‌টা চারদিক থেকে অঙ্কুরগুলির মতই হবে আর প্রচণ্ড

যন্ত্রণা হবে, বাড়বে, ক'মবে, জ্বালা ক'রবে, আর খোঁচা দিচ্ছে, এমনি যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে গলার ছিদ্রটা ছোট ক'রে আনবে।

এই বাতজ রোহিণীতে জ্বর থাকবে না আর অঙ্কুরগুলি পাকবেও না।

পিত্তজ রোহিণী

পিত্তজ রোহিণীতে জ্বর থাকবে, এবং উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে, অঙ্কুরগুলি পাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে গলাটার ছ্যাঁদা বন্ধ হ'য়ে যাবে, আর সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল জ্ব'লে গেল ব'লে রোগী বার বার মূর্ছিত হ'তে থাকবে।

রোহিণী (শ্লেষ্মা বিকার জনিত)

রোহিণী রোগের তৃতীয় রূপটি হয় শ্লেষ্মাটারই বিকার প্রাধান্যের জন্য। পিত্ত-প্রাধান্যের জন্য যেমন জ্বরই প্রধান পরিচয়, শ্লেষ্মা প্রাধান্যের জন্য সেটা হয় না; আর পিত্ত প্রাধান্যে কণ্ঠের মাংসাঙ্কুরগুলি দ্রুত পেকে ওঠে, শ্লেষ্মার বিকারে তা না হ'য়ে কণ্ঠের চতুর্দিকের মাংসাঙ্কুরগুলি শক্ত হয় আর গলনালীর পরিধি খুব দ্রুত ছোট হ'য়ে যায়; ওই অঙ্কুরগুলি মোটা ও শক্ত হয়ে যায়, ফলে মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়াটাও আর সম্ভব হয় না, তখন জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

ত্রিদোষ বিকারের রোহিণী

এই চতুর্থ ধরনের রোহিণী রোগে বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটির বিশিষ্ট লক্ষণের সমন্বয় দেখা যায়, বৈশিষ্ট্য থাকে, ওটার সব অবস্থা এমন দ্রুত হয় যে, শস্ত্র চিকিৎসার সময়ও থাকে না। মৃত্যু ঘটানোর জন্যই যেটি ত্রিদোষ বিকারের রোহিণী রোগের উদ্ভব।

রোহিণী রোগ (রক্তবিকার জনিত)

সাধারণভাবে মনে হয়—এই শেষেরটি বোধ হয় এমন হয় যে, রোগ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয় না, বরং বলা হ'য়েছে, এই রক্তবিকার প্রাধান্যের রোহিণী রোগটি তত কঠিন নয়, বরং একটু সুখসাধ্য হয়। তাই বলা হ'য়েছে—

স্ফোটৈশ্চিতা পিত্তসমানলিঙ্গ
সাধ্যা প্রদিষ্টা রুধিরাত্মিকাতু॥

রক্তবিকার-প্রধান যে রোহিণী রোগ সেটি সেরে যায়, এ অভিমত সুশ্রুতের নয়। এটি মাধব কর, বিজয় রক্ষিত এবং ভোজের অভিমত। তাঁদের মূল শ্লোক এবং টীকায় পরিষ্কার বক্তব্য রেখেছেন যে, একমাত্র ত্রিদোষ বিকারের রোহিণী রোগই সারানো যায় না, যেমনি দ্রুত হয় তেমনি দ্রুত মৃত্যু ঘটায়। আর শ্লেষ্মপ্রধান হ'লে অন্ততঃ তিন দিন রেখেও চিকিৎসা ক'রলে সারে। পিত্তপ্রধান হ'লে পাঁচ দিন এবং বায়ুপ্রধান হ'লে সাত দিন রেখেও রোগ সারানো যায়, আর রক্তজ রোহিণী রোগ এমন জটিল ও কঠিন হয় না। তবে অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দিলে অর্থাৎ ওই সঙ্গে যদি বায়ুর বিকার দেখা দেয় এবং বাইরেটা শ্লেষ্মা এসে শোথ বা ফুলো হ'তে থাকে তবে সেই হয় তখন অরিষ্ট লক্ষণ।

অতএব গলা ফুলছে, গলায় ব্যথা হ'চ্ছে, আওয়াজটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাগছে, এই

রকম ক্ষেত্র ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হয়। এই সম্পর্কে ভোজ সংহিতায় বলা হ'য়েছে—

হেমন্তে প্রথমে মাসি কণ্ঠরোগস্তু জায়তে।

অর্থাৎ ঋতু প্রভাব হিসেবে গলার রোগ আশ্বিনের পরই প্রায় হয়।

গলরোহিণী
(EXTENSIVE AND PAINFUL SWELLING AT THE BASE OF THE TONGUE)

প্রাচীনের সমীক্ষায় রোগকে এমনভাবে নামের মাধ্যমে পরিচিত করানো হয়েছে, যেটা উত্তরসূরিগণের নিকট একটি দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রের মত। এই যেমন গলরোহিণী—গল শব্দটি আমাদের সকলের কাছে পরিচিত কিন্তু রোহিণীটি? এটি তো আমাদের কাছে পরিচিত একটি নক্ষত্রের নামে। জ্যোতিষশাস্ত্রে দেখা যায় এটির রং লাল এবং আকৃতিতে বলয়ের মত। পৌরাণিকগণের অভিমত শুধু রক্তবর্ণের নামই রোহিণী। আয়ুর্বেদে হরীতকীর এক নাম রোহিণী। আবার রক্তপুনর্ণবার নামও রোহিণী, তবে জ্যোতিষীগণের মতবাদে যে রোহিণীর বর্ণনা, চরকীয় চিন্তাধারায় সেটি প্রতিফলিত। কারণ চরকের রোগবিচারে বলা হ'য়েছে—

গলেঽনিলঃ পিত্তকফৌ চ মূর্ছিতৌ প্রদূষ্য মাংসঞ্চ তথৈব শোণিতম্।
গলোপসংরোধ করৈ স্তথাঙ্কুরৈর্নিহন্ত্যসূন্ ব্যাধিরিয়ং হি রোহিণী॥

অর্থাৎ জিহ্বার মূলে অথবা কণ্ঠনালীতে একপ্রকার ভয়ঙ্কর রোগ হয়, তার দাহ এবং যন্ত্রণা খুব। অতি দ্রুত ওই গলার মূলে কণ্ঠনালীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসাঙ্কুর জন্মে, তার ফলে সেখানে জল প্রবেশ করানোও কষ্টকর হয়, অতি দ্রুত সে স্থানটি ফুলতে ফুলতে শেষটায় গলার ছিদ্রটাই বন্ধ হয়ে যায়। ওখানের রং এবং আকার ঠিক রোহিণী নক্ষত্রের মত। এই রোগটিতে বায়ু পিত্ত কফ ও রক্ত এককালেই বিকৃত হয়; যদি বায়ুপ্রধান হয় তবে জীবননাশের আশঙ্কা যদিও থাকে কিন্তু অন্যগুলির প্রাধান্যে বিকারগ্রস্ত হ'লে চিকিৎসারও সময় সীমিত—অন্নবহ স্রোতমুখ বন্ধ হ'য়ে যায়। শেষে শ্বাসনালীর ক্রিয়াও বন্ধ হয়। রোগটার স্বভাবই এমনি যে, এটির সঙ্গে সঙ্গেই যেন মৃত্যুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে, তবে অশুভ লক্ষণ ২-৩ দিনের মধ্যেই দেখা দেয়। আর সান্নিপাতিক বিকার দেখা দিলে জ্বর, শ্বাসকষ্টই তার প্রাথমিক অশুভের পরিচায়ক আর শেষ অরিষ্ট রক্তবমন।

অধিজিহ্ব
(ABSCESS UNDER THE TONGUE)

এটিও একটি গলরোগ। কফ এবং রক্তের বিকার যদি একই সময়ে হয়, তবে তার সম্প্রাপ্তি ভেদে অর্থাৎ তার অনুকূল পরিবেশ পেলে গলার ভিতরে জিহ্বামূলের সামান্য উপরে একটা শোথ হয়; সে শোথটা এমন, যেন ঠিক জিভের ডগার সরু অংশটির মত। এরই নাম অধিজিহ্ব। অর্থাৎ জিভের গোড়ায় ছোট জিভ। এটি হ'লে অনবরত খুক্-খুক্ কাসি আসে; কারণ বায়ুর গতিটা সরলভাবে যাতায়াত ক'রতে পারে না। ওই ছোট

জিভটায় ধাক্কা লাগে আর অমনি প্রতিহত বায়ুর গতিটা কিছুক্ষণ তলার সঙ্গে উপরে ধাক্কা পায়।

এর চিকিৎসা দ্রুত লেখনক্রিয়া, অর্থাৎ যাতে ওই স্থানে শ্লেষ্মা জন্য স্ফীতি না হয়, কোনও রকম ময়লাও না জমে।

গলশুণ্ডিকা

(TONSILITIES)

মুখের যে যে অংশের সাহায্যে খাদ্য ও পানীয় বস্তু কণ্ঠ হ'য়ে উদরে যায়, তাদের মধ্যে অধস্তালুঃ ও জিহ্বামূল অন্যতম। কণ্ঠ ও জিহ্বামূলের মধ্যবর্তীস্থান অধস্তালু, তারই অধোভাগের নাম গল। এত গল শব্দ থেকে গিলন হয়, এবং স্রবণ, অধঃকরণ কাজও হয়। কিন্তু গল বা গলায় যদি শুণ্ডাকৃতি শক্ত কিছু থাকে তবে তো গিলন কাজই ব্যাহত হয়। শুণ্ড শব্দটির অর্থ হ'লো এক ধরনের নাল। যেমন পদ্ম, শালুক প্রভৃতির নাল হয়; যে নালের সঙ্গে মৃ শব্দ জুড়ে মৃণাল হয়। সেই নালই হ'লো শুণ্ড, এই শুণ্ডের অভ্যন্তরে জলবহ স্রোত বা ঝরণার মত খুব সরু নালা থাকে। তালুর মূল থেকেই ওই নালটির জন্ম হয়। সেটি বিকৃত কফ ও বিকৃত রক্ত একত্র মিলে গিয়ে অমন আকার নেয়। তারপর ওটি বাড়ে এবং ফাঁপে, তখন ওটির আকৃতি হবে সরু একটি ফানুসের মত। একেই আয়ুর্বেদে বলা হ'য়েছে "ধ্মাতবস্তি প্রকাশ" অর্থাৎ পাতলা চামড়ার "হাঁপরের মত", তার ভিতরটা প্রথমে ফাঁকা থাকে, তারপরই সেই ফাঁকাটুকুও ক'মতে থাকে। এ বড়ই কষ্টকর রোগ। কিন্তু তারও চিকিৎসা ক'রতে যদি অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়, সেটা আরও কষ্টদায়ক হয়। এর অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো বার বার পিপাসা, কাসি আর শ্বাস।

তুণ্ডিকেরী

(CHRONIC TONSILITIES)

সুশ্রুত সংহিতায় রচনা ও রচয়িতা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিমত যদি এই হয় যে, বৈদিক সম্প্রদায়েরই একটি চিকিৎসাধারা থেকেই এটির উৎপত্তি, তাহ'লে প্রশ্ন ওঠে যে, এই রোগটির নামকরণের ক্ষেত্রে যেসব শব্দের ব্যবহার করা হ'য়েছে, সেসব শব্দ তো অনেকক্ষেত্রে বৈদিক নয়, দৃষ্টান্ত হিসাবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, অন্ততঃ এই শব্দ দুটি দক্ষিণ ভারতেরই শব্দ, প্রাচীন তামিল শব্দের ধ্বন্যাত্মক শব্দ। অর্থাৎ তুন্ড মানে মুখ এবং কেরী মানে বন-কাপাসের ফল। এই ধরনের শব্দার্থ বোধ কিন্তু বৈদিক শব্দার্থ কোষে দেখা যায় না।

যাই হোক, তালুগত রোগের মধ্যে তুণ্ডিকেরীও একটি। এও বিকৃতরক্ত ও বিকৃত-শ্লেষ্মা থেকে উৎপন্ন হয়। রোগটি হয় তালুমূলে। এই যে বলা হ'লো কেরী, ওটি ঠিক ওই আকৃতির একটি আব (অর্বুদ) হয়, সেটিও ফোলে, খুব কষ্ট দেয়। এরও অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো ওই কেরীতে দাহ এবং পরে পাক ধরে, তারপর ওটা ফেটে গেলেই গলক্ষত রোগ। যা তৎকালের পণ্ডিতদের বর্ণিত অরিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত।

কণ্ঠশালুক

(CHRONIC PHARYNGITIS)

কফের বিকারে যেমন রোহিণী নামের রোগ হয়, তেমনি আর একপ্রকার রোগ হয়—

তার নাম কণ্ঠ-শালূক। শালূকের ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ২৮৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হ'য়েছে। এখানে কণ্ঠশালূক মানে কিন্তু গলায় শালূক ফুল ফোটে না। তাই এখানে শালূক শব্দটি উপমাবাচক এবং সে উপমাটি শালূকের মূলকে সামনে রেখে। অর্থাৎ শালূক মূলের আকৃতিতে লক্ষণীয় যে খুব সরু সরু কাঁটার মত ওই কন্দমূলের গায়ে থাকে এবং কন্দটিও বেশ শক্ত হয়।

কফবিকারে যতগুলি অবস্থা দেহে হয়, তাদের মধ্যে গলায় শালূক কন্দের আকৃতি নিয়েও একটি রোগ হয়। এটা কিন্তু কোন রকমের ওষধীয় চিকিৎসায় সারে না, এ অভিমত সুশ্রুতসহ সমস্ত আয়ুর্বেদীয় সংহিতার।

এরও অসাধ্য অবস্থার একটি লক্ষণ দেখা দেয়—সেইটাই এর অরিষ্ট লক্ষণ "অন্তর্বাহিঃ শোথঃ" অর্থাৎ গলার ভিতরে যেমন কুল আঁটি বা শালূক মূলের মত শক্ত হয়, তেমনি সেই সঙ্গে যদি বাহিরে শোথ হয়, তাহ'লেই অরিষ্ট লক্ষণ।

গলবিদ্রধি

(PERI TONSILER ABSCESS)

এই গলবিদ্রধি কি ধরনের হয়, তার পরিচয় দিতে সুশ্রুত সংহিতায় এইভাবে বলা হ'য়েছে—

সর্ব গলং ব্যাপ্য সমুত্থিতো যঃ, শোথো রুজাঃ সন্তিচ যত্র সর্বাঃ।
সসর্বদোষৈ গল বিদ্রধিস্তু তস্যৈবতুল্যঃ খলু সর্বজস্য।

অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফ তিনটিই এককালে কুপিত ও বিকৃত হ'য়ে গলার ভিতর বার (বাহির) ফুলিয়ে দেয়, অর্থাৎ শোথ হয়, এর সঙ্গে মুহুর্মুহু যন্ত্রণা আর জ্বালা। শুধু তাই নয়, সঙ্গে থাকে চুলকানি, কল্পনা ক'রলেই বোঝা যাবে কি দারুণ ব্যাধি। এর অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দিতে দেরী হয় না, স্বরভঙ্গ তো হবেই, তারপর আসে শ্বাস আর গলার ভিতরের শিরা স্নায়ু ছিঁড়ে যাচ্ছে এমন যন্ত্রণা। তারপরে গলার ভিতরটা লাল হ'তে হ'তে আর জল প্রবেশ করারও অবকাশ থাকে না।

গলৌঘ

এ রোগটির সঙ্গে অর্থাৎ গলৌঘ নামক রোগের সঙ্গে গলবিদ্রধির তফাৎ কেবল জ্বরে; অর্থাৎ গলৌঘ রোগটি প্রবল জ্বরের সঙ্গেই দেখা দেবে। এখনও যে প্লেগ নামক রোগ হয়, সেটা এই গলৌঘ রোগই বা হবে; কারণ ওঘ শব্দটির অর্থ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থাৎ ওঘ শব্দটি যাস্কের নিরুক্তিতে (২।২।১) উদ্ধৃত হ'য়েছে। সেইজন্যই পণ্ডিতরা মনে করেন, এটি বৈদিক শব্দ। ওঘ শব্দের অর্থ সমূহ, রাশি প্রভৃতি কয়েকটি। অর্থাৎ এক ও দুয়ের অধিক তো বটেই, বলা যায় প্রচুর। গলার তাবৎ সব রকম উপসর্গের রূপ নেয়, এবং সেইসব উপসর্গের কারণও ঘটে। এই গলৌঘ রোগেও প্রচুর উপসর্গ থাকে, সেইসব উপসর্গের অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিকারের কারণও থাকে। তাই যাস্ক ব'লেছেন, "যাতুধানৌঘ" অর্থাৎ যাতুধানদের রাশি। রোগের ক্ষেত্রে যাতুধানের অর্থ রোগবীজাণু। এরা অদৃশ্য হ'য়ে থাকে এবং সর্বত্রই আছে; এবং সর্বত্রই থাকে, আর সেই বীজাণুর সংখ্যাও "ওঘ" অর্থাৎ রাশি রাশি বা প্রচুর।

এদিকে সুশ্রুতের অভিমত হ'লো—

শোথো মহানন্নজলাবরোধী তীব্রজ্বরো বায়ু গতে র্নিহন্তা।
কফেনজাতো রুধিরারিন্বিতেন গলে গলৌঘঃ পরি কীর্ত্ত্যতেতু॥

অর্থাৎ কফবিকার ও রক্তবিকার থেকে গলৌঘ নামে এক রোগ হয়। এই গলৌঘ জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল জ্বর (এটা কফরক্তবিকার সমন্বিত জ্বর) ও যাবতীয় উপসর্গ দেখা দেয়, এবং গলার ভিতরটা এমনভাবে ফোলে যে সামান্য জল প্রবেশও করে না।

এই রোগের স্থিতিকাল খুবই কম। কারণ রক্তবিকার অর্থাৎ পিত্ত রক্ত খুব সান্নিধ্যে থেকে দ্রুতই সর্বাঙ্গে প্রসর্পিত হয়, হৃদয় ও মস্তিষ্কে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে, তাই অরিষ্ট লক্ষণ সমন্বিতই এই রোগ।

শিলায়ু/গিলায়ু

(CANCER OF THE THROAT)

শুক্রনীতিতে পড়া হয় (৩।২২২) "তিমিঙ্গল-গিলোঽপ্যস্তি তদ্‌গিলোঽপ্যস্তি রাঘব" অর্থাৎ অন্যান্য ছোট ছোট মাছ, তারা জানে যে, যারা আমাদের চেয়ে বড়, তারা আমাদের সবাইকে গিলে খায়, তারপর যে সব চেয়ে বড়, তাকে গেলে তিমি, তারপর তিমিকেও গেলে তারও বড় তিমি, তারপর সেই বড় তিমিকেও গেলে রাঘব। গিল মানে বাধাহীন গেলা (গিলে ফেলা), সামান্য চিবোতেও হয় না।

কণ্ঠে এমন রোগ হয় যে রোগের নাম "গিলায়ু", অর্থাৎ রোগের স্বভাবই এমনি যে দেহের অন্যান্য অংশের আয়ু থাকলেও অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ু থাকলেও তাদিকে গিলে খায়, আর কোন বাধাই মানে না। তাই বলা হ'য়েছে—

গ্রন্থির্গলে ত্বামলকাস্থি মাত্রঃ স্থিরোঽতিরুগ্‌ যঃ কফরক্ত মূর্ত্তিঃ।
সংলক্ষ্যতে রক্তমিবাশনঞ্চ সশস্ত্র সাধ্যস্তু গিলায়ুসংজ্ঞঃ॥

অর্থাৎ কফবিকার ও রক্তবিকার প্রবল হ'য়ে কণ্ঠের ছিদ্রমূলে আমলার আঁটির মত একটা শক্ত গুটি জন্মে, সেটা ক্রমে ফোলে আর প্রবল যন্ত্রণা হয়। কোন কিছু খেলেই সেটা গলায় আটকে যায়। দ্রুত শস্ত্র চিকিৎসা না ক'রলে ওই রোগেই প্রাণ হারাতে হয়। তাই এর নাম গিলায়ু। রোগটা রক্ত ও কফের বিকারের জন্য সৃষ্টি হয়।

বলয়

অপরাধীকে পাকড়াও ক'রে রাজপুরুষ নিয়ে যান তার হাতে লোহার বলয় পরিয়ে, আবার সোনার বলয় পরানো হয় নববধূর হাতে, আর পশুপক্ষীর হাতে পায়ে গলায় সরু বলয় পরিয়ে তার প্রতি আদর আছে বোঝানো হয়, কিন্তু এই বলয় বা বেষ্টনটি কফ ও রক্ত বিকারের প্রাধান্যে গলার অভ্যন্তরে যদি হয়, তখনই বুঝতে হবে যে মৃত্যুর দূত হাতছানি দিয়েছে; কারণ কোন ধাতুরই বলয় তো আর ছোট বড় হয় না। কিন্তু কণ্ঠ বলয়টি এমনি স্বভাব যে, গলার নালীর দিকটা ক্রমশঃ ভরাট ক'রে ক'রে বলয়টি বাড়ে, অতএব নালীর বা গলার ফাঁকটা ছোট হ'য়ে যায়। আয়ুর্বেদের ভাষায় "বলাশঃ"— এই বলাস বা বলাশ শব্দটি আয়ুর্বেদের সংহিতাগ্রন্থগুলির নয়। খোদ অথর্ববেদের

৬।১৪।১ সূক্তে উল্লেখ আছে। মহীধরের ভাষ্যে বলাশ মানে শ্লেষ্ম রোগ। সুশ্রুত সংহিতার নিদানস্থানের ১৬ অধ্যায়ে ঐ বলাশ শব্দ যোজনার দ্বারা বলা হ'য়েছে—

বলাশ এবায়তন মুন্নতশ্চ শোথং করোত্যন্নগতিং নিবার্য্য।
তং সর্বথৈবা প্রতিবার্য্য বীর্যং বিবর্জ্জনীয়ং বলয়ং বদন্তি।

অর্থাৎ বিকৃত ও দুষ্ট কফ কণ্ঠনালীর মুখে এমনভাবে জমে এবং আকার নেয়, যেটি ঠিক একটি বলয়ের মত উঁচু ও গোল, যেটি ক্রমশঃ ফুলতে থাকে অর্থাৎ শোথ হয়, এর ফলে অন্নবহ স্রোতপথই ক্রমে রুদ্ধ হ'য়ে আসে, এর শক্তি দুর্নিবার হ'তে হ'তে সামান্য জলও সেপথে আর প্রবেশ ক'রতে চায় না। ভিতর থেকে যেন টুঁটি চেপে ধ'রে মৃত্যু ঘটায়। (টুঁটি শব্দটি সংস্কৃত ত্রোটি থেকে এসেছে, ত্রোটি হ'লো—গলনালী এবং চঞ্চু) এমন রোগটির আর অরিষ্ট লক্ষণের প্রসঙ্গই আসে না।

বিদারী

কণ্ঠগত রোগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে আরও যে কয়টি রোগের উদ্ভব হয়, সেগুলিকেও এ প্রসঙ্গে নিবন্ধ রাখার ব্যাপারে যেসব বর্ণনার সম্মুখীন হ'তে হয়, তার মধ্যে এই বিদারী রোগটি ভীষণ বলা যেতে পারে। এটি হওয়ার সময় থেকেই গলার ভিতরের শোথটা পেকে যায়, তারপর ওই পাকাটাই আবার ফেটে গিয়ে প'চতে থাকে, গলার পচা মাংস গলার নালী দিয়ে নেমে পেটে যায় আর প্রবল বমি আসে। গলার ভিতরের পচাটা বাইরেও এসে একেবারে হাঁ হ'য়ে যায়, নালীটার গায়ে ছেঁদা হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা, রোগীর মূর্ছা হয়, অথবা যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যা করে।

শতঘ্নী

আয়ুর্বেদীয় সংহিতায় "শতঘ্নী" নামের দ্বারা একটি বিশেষ রোগকে পরিচিত করার সার্থকতা কি? অবশ্য এই নাম শব্দটি রামায়ণের আদিকাণ্ডেও আছে আবার মহাভারতের বনপর্বে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা রক্ষার প্রসঙ্গে ঘটনার বর্ণনাতেও আছে এই "শতাঘ্নীর" কথা।

এই শতঘ্ন ও শতাঘ্নী দুটি শব্দই অর্থবাচ্যতায় এক, কিন্তু প্রসঙ্গ বাচ্যতায় পৃথক, কারণ শতঘ্ন শিবের একটা নাম, তার কারণ শত শত শত্রু তিনি ধ্বংস ক'রেছিলেন। আর শতঘ্নী মানে যে যন্ত্রটি শত শত শত্রু ধ্বংস করে। সেই শতঘ্নী যন্ত্র বসানো হ'তো, অর্থাৎ যে যে পথে শত্রু এসে রাজধানীতে প্রবেশ ক'রতে পারে সেখানকার প্রাচীরের ওপরে।

যন্ত্রটির সর্বাঙ্গে লোহার কীলক বসানো হ'তো, আর সেই কীলকগুলি থাকতো এক বিপুলায়তনের পাথরের গায়ে (জানি না সেগুলি ফাঁপা ছিল কিনা)। তবে কি এর মধ্যে থাকতো কিছু দাহ্য পদার্থ?

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ওই স্থানের টীকায় লিখেছেন—

"লৌহ নির্মিত বন্ধুকঃ কমানো বা"।

যা হোক্, ঠিক এটা না হ'লেও এমন ধরনের কিছু কীলকবৎ জিনিস বসানো হ'তো, যার দ্বারা শত শত শত্রুকে মারা যেতো।

রোগের ক্ষেত্রে এই "শতঘ্নী" নামকরণের তাৎপর্য হ'লো, রোগের জীবননাশী ক্ষমতা এবং তার সঙ্গে তার আকৃতির পরিচয়ের সাদৃশ্য। তাই বলা হ'য়েছে—

বর্ত্তির্ঘনা কণ্ঠ নিরোধিনী যা চিতাতিমাত্রং পিশিত প্ররোহৈঃ।
অনেকরুক্ প্রাণহরী ত্রিদোষাজ্ জ্ঞেয়া শতঘ্নীচ শতঘ্নীরূপা।

অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটি একই সঙ্গে কুপিত ও বিকৃত হয় এবং শতঘ্নীর কীলকের (খোঁচা) মত মাংসাঙ্কুরগুলি গলার ভিতরের সবটা ঘিরে জন্ম নেয়, আর শরীরে গলায় মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হ'তে থাকে, তার সঙ্গে জ্বর, আর মাঝে মাঝে এমন বমির বেগ আসে যে, তখন হৃদয়টাই যেন টুকরো টুকরো হ'য়ে ফেটে যাওয়ার যন্ত্রণা। এই শতঘ্নী রোগের অবস্থাটি দেখে ভোজ ব'লেছেন—

"শঙ্কুনেব গলে বিদ্ধা শতঘ্যেষা ন সিধ্যতি"

অর্থাৎ এই শতঘ্নীর মাংসাঙ্কুরের বেধন বা খোঁচা এমন হয় যে আর বাঁচার কোন পথই থাকে না। অতএব এ রোগের অরিষ্ট বর্ণনা করার কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

বৃন্দ

এও একটি কণ্ঠগত রোগ; এই রোগটিও হয় বিকৃত কফ ও বিকৃত রক্ত এই দুই মিলে।

এই রোগের উদ্ভব হ'লে তার রূপটি নেবে গলার মধ্যে সামান্য উঁচু ও গোল ভাব, সেইটাই ফুলতে থাকবে, তার সঙ্গে উপসর্গ আসবে দাহ, এবং সেখানটায় চুলকোবে, আবার পাকা ফোড়ার মত দপ্ দপ্ করার অবস্থা ও যা খাওয়া বা পান করা যায়, সবটাই যেন জ্ব'লতে জ্ব'লতে যাচ্ছে আর বুকটা ভারী বোধ।

অতএব এই বৃন্দ রোগের নামটিও তো সার্থক। এর অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো শ্বাস, ঘন ঘন পিপাসা। এটাতে প্রলেপ, সেঁক কিছুই চলে না, এ ক্ষেত্রে বিসর্পের চিকিৎসা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকে না। এদের জন্মই হয় অরিষ্ট বা অশুভ লক্ষণ নিয়ে।

রক্ত ও পিত্তবিকার জাত এই বৃন্দ রোগে গলার একটু উপরে অমনি বলয় তো থাকবেই, তার সঙ্গে ভীষণ জ্বর, যে জ্বরে কাঁপুনি নেই কিন্তু সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে, অমনি জ্বালা আর আন্‌চান্ অবস্থা, ঢোঁক গিলতে গেলেই মনে হয় কেউ যেন বাধা দিচ্ছে, যে কোন জিনিস খেতে গেলেই যন্ত্রণা, অথচ উপবাসও করা যায় না, তাই ভোজ সংহিতায় বলা হ'য়েছে—

শ্লেষ্ম রক্ত সমুত্থানং এক বৃন্দং বিভাবয়েৎ।
তুল্যস্থানাকৃতি বৃন্দো বৃন্দজো রক্তপিত্তজঃ॥

অর্থাৎ এক বৃন্দ হয় শ্লেষ্মা আর রক্তবিকার থেকে, আর বৃন্দ হয় রক্ত এবং পিত্ত দুই-এর বিকার থেকে। এটি কখনও পাকে কখনও ভীষণ ঘা হ'য়ে যায়। অতএব

পিত্তবিকারের উপসর্গও আসে, আবার রক্তবিকারের সব উপসর্গও জোটে। এটার জন্মাবধিই অরিষ্ট লক্ষণ থাকে। কিন্তু শেষ অবস্থা হ'লো প্রচণ্ড বেগে শ্বাসের টান।

বলাস

এটিও কণ্ঠগত একটি রোগ, এর উদ্ভব হয় ঐ বিকৃত কফ থেকে, যদিও কফের প্রাধান্য দেওয়া হয়, তা হ'লেও পিছন থেকে আর একজন তাকে মদত দিয়ে থাকে, সে হ'লো বায়ু। পিত্তের ক্ষেত্রেও তাই, তখনও এর চালক থাকে বায়ু।

তা যাক্, এই বলাস রোগে এমন যন্ত্রণার সূত্র দেখা দেয় যে, বলা হয়েছে "মর্মচ্ছিদ" অর্থাৎ ভ্রূ মধ্য থেকে কণ্ঠ, গলা, কপালের দু'পাশ, কোমর, পিঠ, মলদ্বার, হাত-পা এবং হাড়ের গাঁটে গাঁটে যে সংযোগস্থল, তাদের সবগুলিই বোধ হয় ছিঁড়ে যাচ্ছে, এমনি রোগের স্বভাব-ধর্ম। তারপর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাঁপ, আর গলার ভিতর ও বার (বাহির) দুই-ই ফুলতে থাকে। অতএব এ নিজেই অশুভ লক্ষণ হ'য়েই উপস্থিত হয়।

মূক রোগ (বোবা)
(DUMBNESS)

একই শব্দ কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্র ভেদে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, এই যেমন—"বোবা" একটি শব্দ—একে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন ক্রিয়াকে বোঝানো যায়, যেমন—মারের চোটে বোবারও বোল ফুটে যায়, অথবা বোবার স্বপ্ন দেখা/বোবার শত্রু নেই/লোকটাকে বোবায় ধরেছে (রোগে)/দেখে শুনে বোবা হ'য়ে গিয়েছে, এই সব কথার অন্তর্নিহিত অর্থ কিন্তু এক নয়; অথচ এ সব ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করার অন্য ভাষাও নেই। এদিকে বোবা শব্দটির ব্যাখ্যা ক'রতে গেলেও বোবা হ'য়ে যেতে হয়, কারণ বোবা শব্দটিই ধ্বন্যাত্মক, অর্থাৎ বোবো ধ্বনি ক'রে কথা কইতে গেলে, তাই ওই অবস্থাটা বোঝাতে বোবো বা বোবা বলা হয়। তা হ'লেও বলা যায়, এটা একটা রোগই। এর মৌলিক সূত্র "মূক"; কিন্তু প্রচলিত শব্দ বোবা শব্দটি যেমন সর্বজনবোধ্য, মূক শব্দটি কিন্তু বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতদেরই বোধ্য। বিশেষ বিশেষ বলা হ'লো এই জন্য যে—মূক শব্দটি যে রোগবাচী এটাও তো অনেকের অজানা।

এখানে একটা কথা মনে প'ড়ে গেল, ভক্তরা যে ব'লে থাকেন—"মূকং করোতি বাচালং"... ব'লে, গোবিন্দ প্রণতি জানান, সেখানে কি মূক রোগ থাকলে তাকেও বাচাল করেন? অথবা নির্বোধও যে মূক হ'য়ে থাকে কিম্বা নিরক্ষরও যে মূক হ'য়ে থাকে, তাকেও তিনি কৃপা ক'রে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রতে পারেন, এটা বাস্তব সমীক্ষায় দেখা যায় কি?

তা যাক্, মূক শব্দটি বৈদিক, এটি আছে যজুর্বেদের ৩০। ১৯ সূক্তিতে—"অনন্তায় মূকং"—ওখানে ভাষ্যকার মূক শব্দের অর্থ ক'রেছেন মূ=বন্ধনে=অথ বাক্ বিকলম্, অর্থাৎ মূ ধাতুর অর্থ বন্ধ। এই বন্ধন যখন বাক্‌বাহী শিরায় হয় তারই নাম মূক। যে কোন অণ্ডজ, জরায়ুজ প্রাণীরই থাকে বাক্‌বাহিনী শিরা। থাকে না, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জের। অতএব প্রথমোক্ত প্রাণীদের যে বাক্‌বাহিনী শিরার দ্বারা শব্দ প্রকাশ করে (ভাষা নয়) সেই শব্দ প্রকাশিকা শিরায় রোগ হ'লেই তাকে মূক বলা হয়।

মূক রোগ তিন প্রকারের হয় (১) একেবারে বন্ধ (বাক্‌হারা) (২) মিন্‌মিন্ বচন

(৩) লুপ্ত ব্যঞ্জন বর্ণ (গদ্‌গদ ভাষী) এই তিন প্রকার মূক রোগের মৌল কারণ বলা হ'য়েছে—

আবৃত্য বায়ুঃ সকফো ধমনী শব্দ বাহিনীঃ—
করোত্য ক্রিয়াকান্ রোগান্ মূক মিন্‌মিনগদান্।

অর্থাৎ বিকার প্রাপ্ত কফের সঙ্গে বায়ু সংযুক্ত হ'য়ে শব্দবাহিনী ধমনী(বাক্-বাহিনী) আক্রমণ ক'রে ওই তিনটির একটি বা সবকয়টিকে স্তব্ধ ক'রে দেয় এবং বোবা, মিন্‌মিন ও গদ্‌গদ রোগ সৃষ্টি করে।

এর মধ্যে যাদের সহজাত এই রোগ তারা তো সহজেই অনারোগ্য, বাকী তিনটির অরিষ্ট লক্ষণ যদি দেখা দেয়, তাও অসাধ্য, অরিষ্ট হ'লো ক্রমে স্মৃতিভ্রংশতা, যা কিছু স্মরণ করতে যাবে তাই বিস্মৃত হওয়া এবং জিহবার পাশ বয়ে লালা ঝ'রে পড়া।

জৃম্ভা (হাই তোলা)

(YAWNING)

এই জৃম্ভা আমাদের পরিচিত ও প্রচলিত শব্দ নয়—বিশেষতঃ বাংলা দেশে। অন্যান্য প্রদেশে, যেমন হিন্দীতে বলা হয় জম্ হাই, মহারাষ্ট্রে জাংভই, মৈথিলী ভাষায় হাফী, ওড়িষা ভাষায় হাই তোলা বলেন। তা হ'লে এই হাই-এর মৌল শব্দ কি?

তবে দেখা যায়—অর্বাচীন লোকসংস্কৃত ভাষায় "হাফিকা" ব'লে একটা নাম-ধাতুর অস্তিত্ব রয়েছে। মনে হয় ওই হাফিকা থেকেই এসেছে হাই, কিন্তু সুপ্রাচীন ভাষা জৃম্ভা। আর জৃম্ভার জন্যই সব পুরাতন ভাষাতেই অল্পাবিস্তর ভাংচুর ক'রে তাঁরা জৃম্ভাই ব'লে থাকেন।

জৃম্ভার উৎপত্তি হয়, দেহের শৈথিল্যকর অবস্থায় এবং বিকাশ হয় মুখের বিকাশে, অর্থাৎ তার অভিব্যক্তি হয় মুখ থেকে।

এদিকের কারণ হ'লো দেহের শৈথিল্য হয় অজীর্ণে, উপবাসে, রাত্রি জাগরণে, এবং আরও কয়েকটি কারণে। আবার আলংকারিকরা বলেন, দেহে যেদিন থেকে যৌবনের শিহরণ আসে, সেইদিন থেকেই নারীপুরুষ উভয়ের মধ্যে কামনার বিকাশ হয় জৃম্ভার দ্বারা, নয়নের চঞ্চলতা, মনের অস্থিরতা প্রভৃতি দ্বারাও। আয়ুর্বেদিকগণ এই দ্বিতীয় বিচারটি গ্রহণ করেন নি। বরং তাঁরা দেহের বাস্তব বিকাশের হেতুগুলিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রকৃতিগত এই বিচারটিকেই এক ধরনের রোগেরই কারণ বলে তাঁরা স্বীকার ক'রেও বলেছেন, যদিও জৃম্ভার কারণগুলির হেতু অনুসন্ধান ক'রে তার প্রতিবিধান করা দরকার, কিন্তু জৃম্ভাকে জোর ক'রে বন্ধ ক'রলেই যে রোগটির উৎপত্তি হয় সেটি হোলো উদাবর্ত রোগ।

তাই বলা হ'য়েছে—

মন্যা-গল স্তম্ভ-শিরোবিকারা
জৃম্ভোপঘাতাৎ পবনাত্মকাৎ স্যুঃ॥

অর্থাৎ জৃম্ভার বেগ রোধ ক'রতে নেই, অর্থাৎ যে যে কারণে হাই ওঠে সেই সেই কারণগুলিকে দূর করার চেষ্টা ক'রতে হয়। তা ছাড়া জৃম্ভাকে (হাইতোলাকে) যদি

বন্ধ করার চেষ্টা করা হয় তা হ'লে প্রথমে হবে উদাবর্ত রোগ, রোগটির বর্ণনা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩২৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ক'রে বলা হ'য়েছে।

কিন্তু জৃম্ভা রোধ করার জন্য যে অদূরদর্শিতা প্রকাশ পায় সেইটার প্রতিক্রিয়ায় উদাবর্ত হ'য়ে থাকে। সেই উদাবর্তের ক্ষেত্রে যখন দেখা যাবে যে স্বর ভঙ্গ আর কণ্ঠ মূলে ক্ষত দেখা দিয়েছে, তখন সেই হবে অশুভ বা অরিষ্ট লক্ষণ।

নাসা রোগ (নাকের রোগ)
(DISEASES OF THE NOSE)

পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয় নাসিকা/নাসা; এটি বৈদিক শব্দ (ঋক্ ৫।৬১।২), পাশ্চাত্ত্যের নামটির শ্রুতিধ্বনি তো একই। নস্ ধাতু থেকে নাসা, অর্থাৎ প্রাণবায়ুর উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ হয় যে পথে তার নাম নস্। কিন্তু কেবল নাস শব্দটির অর্থ কেশ সংস্কার।

এই নাসা বা নাসিকা ইন্দ্রিয়ের অবস্থান বেশ জটিল। মস্তিষ্কে যে তিনটি ইন্দ্রিয় সোজাসুজি তাদের কাজ পেঁাছে দেয় (মনের কাছে), তাদের মধ্যে পার্থিব শক্তির মুখ্যত্ব প্রকাশ করার যোগ্যতা এক মাত্র নাসা ইন্দ্রিয়েরই আছে। অর্থাৎ নাসা মর্মটি আহত হ'লে মস্তিষ্কস্থিত মন ইন্দ্রিয়ের কাছে পার্থিব শক্তির যে মুখ্য শক্তি নির্বাচন গন্ধ, তাকে আর কেউ জানাতে পারবে না। সেই নাসাটি ৩১ প্রকারে বিপন্ন হয়, অর্থাৎ ওই জ্ঞানেন্দ্রিয় বিকল হ'য়ে যায় ৩১ প্রকারে। তাদের মধ্যে কয়েকটির বর্ণনা করা হবে।

পীনস/অপীনস
(ACUTE RHINITIS)

নাসা স্রোতের অবস্থান এবং মনের কার্যকরী শক্তির সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়ের সংযোগটি কেমন ক'রে হয়, সে তথ্য বোঝানো জটিল, কিন্তু এই পীনস বা অপীনস নামকরণের মধ্যে শব্দ ভেদ রহস্যটিও তত সরল নয়। তবুও সংক্ষেপে বলি, প্যায় ধাতু থেকে পীন, সেটি সম্প্রসারিত হয়, তাকে বোঝাতেই প্যায় ধাতু। প্যায় থেকে পীন, অর্থাৎ উপচিত মাংস বোঝাতেই পীন শব্দ। এই থেকেই পীন পয়োধর হয়। অর্থাৎ নিটোল মাংসাধার। সেই উপচিত মাংসাধারটি যখন বায়ুদ্বারা ছোট হয় কিম্বা বড় হয়, তখনই নাসার পীনতা হয়। সেই পীনতাকে যে রোগ শুষ্ক করে, কিম্বা শ্লেষ্মা দ্বারা ক্লিন্ন ক'রে নস্ ক্রিয়ার ব্যাঘাত করে, তখন পীনস অথবা অপীনস। এখানে "অ" শব্দটি অধিক অর্থ, অল্প অর্থ, অভাব অর্থ প্রভৃতি কয়েকটি অর্থ জ্ঞাপনের জন্যে অপীনস। অতএব পীনসও বলা যায়, অপীনসও ব'ললে দোষ হয় না।

সেই পীনস রোগটি যখন দেখা দেয় তার আগেই মনে হয় নাকে গন্ধ নেবার শক্তি যেন কিসে রুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, অথবা নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরা হচ্ছে, আবার কখনও একেবারে শুকিয়ে যায়, আবার কখনও সব সময়েই জল ঝরে প'ড়ছে, শ্লেষ্মাটা নাক থেকে সরতেই চায় না, এটার সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে নুন ঝাল টক তেতো, মিষ্টি কোনটারই বিশেষ আস্বাদ পাওয়া যায় না। বুঝতে হবে পীনস রোগ ধরেছে নাসার ছিদ্র পথে। এটা স্থায়ী হ'য়ে গেলে, খুব কঠিন হয় সারাতে, এই পীনস রোগের অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দিলে অর্থাৎ কারণে অকারণে শ্লেষ্মা হাঁচি এবং মাথার যন্ত্রণা হ'তে থাকলে বুঝতে হবে পীনস রোগের এইটাই অরিষ্ট লক্ষণ।

প্রতিশ্যায়

(NASAL CATTARRH)

লোকে কথায় বলে—

হাঁচি টিকটিকি বাধা॥
যে না মানে সে এক গাধা॥

বোঝা গেল গর্দভ প্রকৃতির লোকই ওই সব কুসংস্কারের বাধা মানে না। কিন্তু মুশকিল হ'লো এই যে, বেপরোয়া লোকের প্রকৃতি চেনাতে গর্দভের তুল্যতা কেন? তবে কি সিংহ ব্যাঘ্র গো মহিষ প্রকৃতি যারা তারা সবই বাধা বিপত্তি মেনে চলে? যদি তাই হয় তা হ'লে প্রাণীদের মেধাবৃত্তির অনুশীলন অবশ্যই ক'রতে হয়। কিন্তু একটি "হাঁচি"-এর তথ্য জানাতে এত বিচার হাস্যকর। হাঁচির সংস্কৃত শব্দ হঞ্চ্, এই হঞ্চ্ ধাতুর অর্থ সশব্দে ঝরে পড়া। স্তব্ধ জলরাশি যখন আওয়াজ ক'রে ঝ'রে পড়ে তখন প্রয়োগ করা হয় হঞ্চতি। সেই হিসেবেই আমাদের শিরোভাগে সঞ্চিত জল যে যে কারণে ঝরে পড়ে সেই কারণটার নাম হাঁচি নয়, সেই কারণের নাম "শ্যায়", শ্যায় ধাতুর অর্থ গতি। সেই গতি যদি অনুবর্তী হয় তবে অনুশ্যায়। সম্মুখে এলে অভিশ্যায়। আর প্রতি মুখ হ'লে প্রতিশ্যায়। তার মানে বায়ুর গতি যে দিকে সেই দিকে ধাবমান হ'লেই প্রতিশ্যায়। শরীরের অভ্যন্তরে বায়ুর সঞ্চার অহরহ, কিন্তু প্রতিমুখে বায়ুর গতির সঞ্চারের সঙ্গে যদি সঞ্চিত জলের শ্যায় হয় অর্থাৎ ঝরে পড়ার গতি হয়, তবেই তাকে প্রতিশ্যায় বলা হয়। এমন অবস্থা ঘটে নাসায়। যেমন সব মেঘ থেকেই কি জল ঝরে? ঝরে না—মেঘেরও প্রকার ভেদ আছে—পুঞ্জ মেঘ, স্তূপ মেঘ, বাষ্প মেঘ প্রভৃতি। কিন্তু বায়ুর প্রতিমুখে যে মেঘ থাকে, তাতেই জল ঝরার বেগ আসে।

আমাদের মস্তকে যে শ্লেষ্মার স্তর থাকে তাদের সবগুলিতেই যে প্রতিশ্যায় ঘটায় তা নয়, কিন্তু বায়ুর বিকার ঘটলে (অন্ততঃ ১০টি কারণে), ভ্রূর অন্ততঃ আড়াই ইঞ্চি গভীরে নাসিকা মূলে যে শ্লেষ্মার স্তর থাকে তা থেকেই জল ঝরে। সেই জল ঝরা অবস্থায় আরও যদি অপথ্য-কুপথ্য করা হয়, তবে পিত্তবিকারেরও যোগ হয়, আবার প্রকৃতিগত শ্লেষ্মা ধাতুর সঙ্গে মিলিত হ'য়েও প্রতিশ্যায় আরও গুরুতর হয়। এই প্রতিশ্যায়টির অবস্থা ভেদে ওই নাসায় (নাকে) ১৮ প্রকার রোগ হয়। সময়ে যোগ্য চিকিৎসা না করালে ওই প্রতিশ্যায় থেকে ক্ষয় রোগ হয়, ঘ্রাণপাক রোগ (মাংস পচা), পূতিনাসা রোগ (অর্থাৎ তালুতেও পাক ধরায়), নাসার্শঃ, নাসার্বুদ (ক্যানসারের সামিল), শেষটায় শ্বাসকষ্ট এবং শুষ্ক নাসাও ঘটায় (নাকটা শুকিয়ে সরু হ'য়ে যায়), সুতরাং প্রতিশ্যায়ে অরিষ্ট লক্ষণ এক প্রকার নয়। তাই প্রতিশ্যায় বা সর্দি (এটা ফার্সি শব্দ) অথবা হাঁচি সূচনাতেই (অবশ্য বারে বেশী) সাবধানতার ইঙ্গিত। অনেক সময় হাঁচির দ্বারাও কোন কোন রোগ সংক্রামিত হয়।

(প্রকার ভেদ)

(এটাও এক ধরনের নাসা রোগ) কেন সর্দি হ'চ্ছে, আর কেনই বা শুকিয়ে যাচ্ছে, এর হদিস পাওয়া যায় না, অর্থাৎ কারণে অকারণে বারো মাস সর্দি হয় আবার চ'লে যায়—

ভূত্বা ভূত্বা প্রতিশ্যায়ো যস্যাকস্মাৎ নিবর্ত্ততে।
সংপক্কো বাপ্যপক্কো বা স সর্বপ্রবভঃ স্মৃতঃ।

এই অবস্থাটির কারণ খোঁজার পরই জানা যায়, এও এক ধরনের পীনস রোগ, এতে ঘ্রাণ নেওয়ার শক্তি তো ক্রমে ক'মেই যায়, তার সঙ্গে জোটে নাকের ছিদ্র পথে কেমন একটা পচা দুর্গন্ধ; কেউ কাছে ব'সলেও একটা গন্ধ পেতে থাকে। এ তো সারতেই চায় না, তার ওপর যদি মাঝে মাঝে রক্ত পড়া, নাকের ছ্যাঁদায় (ছিদ্রপথে) রক্তের মামড়ি জ'মতে থাকে, সেগুলি পরিষ্কার ক'রে দিলে আবার ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে রক্ত প'ড়তে থাকে, তখন এ রোগের খানিকটা উপশম হ'বে। কিন্তু নাকে পচা গন্ধ থেকেই যাবে। তবে এটা চিকিৎসা না করালে অন্য রোগ আসবে আর বারো মাস মাথার যন্ত্রণা তো থাকবেই।

এই প্রতিশ্যায়টির আর একটু তথ্য আছে। সর্দি বা প্রতিশ্যায় রোগটি দু' রকমের হয়, একটি সদ্য আর একটি সঞ্চিত হ'য়ে হ'য়ে তারপর সর্দি বা প্রতিশ্যায়। এ সম্বন্ধে সুশ্রুতের একটি প্রামাণ্য উক্তি আছে, সেটি হ'লো—

> নারী প্রসঙ্গঃ শিরসোঽভিতাপঃ
> ধূমো রজঃ শীত মতি প্রতাপঃ।
> সন্ধারণং মূত্র পুরীষয়োশ্চ
> সদ্যঃ প্রতিশ্যায়নিদান মুক্তম্‌॥

অর্থাৎ সদ্য সর্দি হয় এই সব কারণে—যাঁরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে নারী সঙ্গে আসক্ত হয়, অথচ পুষ্টিকর খাদ্য বা বাজীকরণ রসায়নকারক ঔষধ খান না, কিম্বা মাথায় তাপ, কিম্বা সাময়িক আঘাত, অথবা ধূঁয়ো কিম্বা ধূলো, অথবা ঠাণ্ডা লাগানো, কিম্বা কান্নাকাটি, পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ ধারণ ক'রে কাজে থাকা—এই সব কারণে সর্দি হয় কিন্তু তা সাময়িক বা সদ্য সর্দি—এর আর অরিষ্ট লক্ষণ হয় না। আর যে কারণগুলিতে প্রতিশ্যায় একটা স্থায়ী ব্যাধি হয়—যেমন যে ব্যক্তি উগ্র তীক্ষ্ণ আহার করে, ক্রোধ প্রকাশও তার ক্ষণে ক্ষণে, দেহ ধাতুর ক্ষয়ও স্বাভাবিক কারণেই হয়, তার ফলে শরীরের পিত্তাশয়টির বিশ্রামই হয় না, উদান বায়ুর দ্বারা ঐ প্রতিবাহিত পিত্ত তার শিরোভাগের শ্লেষ্মাকে বেশ উত্তেজিত করে এবং বায়ুর প্রতিলোমে তা নাসিকার পথে ঝরতে থাকে—এই সর্দি রোগ সারতে চায় না। এর ওপর যদি মাঝে মাঝে মাথার রোগ (শিরঃপীড়া) এবং নাক দিয়ে রক্তপড়া ঘটে, তবে তাই হবে অরিষ্ট লক্ষণ।

(প্রকার ভেদ)

যাঁদের প্রায়ই মাথা ধরে, আর কোন কোন সময় মাথায় ফেটি বেঁধে কিম্বা পাগড়ি বেঁধে যন্ত্রণা দূর করে, এদিকে শরীরের রং হয় ফ্যাকাশে, আর গলাটা প্রায়ই শুকিয়ে যায়, প্রায়ই মনে হবে গলায় কিছু সুড়্‌সুড়্‌ ক'রছে, আবার গরম দুধ বা জল খেয়ে সেটা দূর করার ইচ্ছা হচ্ছে, তখনই বুঝতে হবে যে কিছুদিন পরেই সে ব্যক্তি-টির শ্লেষ্মাস্থান শুকোতে আরম্ভ ক'রবে আর নাক দিয়ে পাতলা শ্লেষ্মা ঝরতে থাকবে, থাকবে কেন—? এ তো হ'য়েই থাকে, অর্থাৎ বারো মাস সর্দিটা শুকোচ্ছে আর পাতলা হ'চ্ছে, একে সারানো কঠিন। কিন্তু এর উপর যদি নাসাপথের ছিদ্র দুটির একটির নিশ্বাস নেওয়া বন্ধ হয় এবং কোন গন্ধের অনুভূতি ক'মে যাচ্ছে সেইটাই এ রোগের অশুভ লক্ষণ।

(প্রকার ভেদ)

এই রোগটির পূর্ববর্তী কারণ থাকে সর্দি বা সর্দি, সে যে কোন কারণেই হোক

না কেন। সর্দি শব্দটি কিন্তু সংস্কৃত নয়, এটি ফারসী, সেই প্রতিশ্যায় শব্দটির বর্ণগত ভেদ বিচ্ছেদ না ক'রলে অর্থ বোঝা যায় না।

শ্যেঙ্ ধাতুর অর্থ গতি বা ক্রিয়াশালিতা; এখানে প্রশ্ন হ'লো কার গতি? তার উত্তরে বলা হ'য়েছে "বাতং প্রতি অভিমুখং গমনং কফাদীনাং" অর্থাৎ কফপিত্ত বায়ু প্রভৃতি শিরঃস্থিত ধাতুগুলি যদি বায়ুর অভিমুখে ধাবিত হয় বা গমন করে তবে নাসিকার মূলে আছে যে বায়ু, সেই বায়ুর দ্বারাই উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে সেগুলি নাসা স্রোতে ঝ'রে আসে। তারই নাম প্রতিশ্যায়।

এই প্রতিশ্যায় একটি মাত্র কারণে হয় না, অর্থাৎ সর্দিটি এমনি হয় না, আর সব সর্দি বা প্রতিশ্যায়ের চিকিৎসাও এক রকম নয়, সর্দিটা সাময়িক হওয়ার জন্য যেমন কারণ থাকে, সেটা স্থায়ী হওয়ারও কারণ থাকে, আবার অরিষ্ট লক্ষণগুলিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। ধরুন ধাতুর বিপর্যয়ে প্রতিশ্যায় হ'লে অর্থাৎ প্রচণ্ড গরমে উপরোউপরি কয়েক-দিন বৃষ্টি হ'তে থাকলে এতেও সর্দি হয়। এ সর্দিতে যাঁরা আক্রান্ত হন, তাঁদের অল্প কয়েকদিন ভুগতে হয়, কিন্তু যাঁদের রক্তপিত্ত রোগ আছে, তাঁদের এ ধরনের ঋতু বিপর্যয়ের সর্দি হ'লে তা আর যেতে চায় না, শেষটা শিরঃপীড়া হয়, এবং সেইটাই তার অশুভ লক্ষণ।

ক্ষবথু

(VASOMOTOR RHINITIS)

প্রতিশ্যায় হ'লে হাঁচি হয় (নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়া, নাক চুলকনো, নাক সুড়্সুড়্ করা) এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। তা হ'লে কি হবে, হাঁচিটা কিন্তু একটা স্বতন্ত্র ব্যাধি হ'তে পারে, সে ইঙ্গিত যে নেই তা নয়; ভারতীয় স্মার্তদের একটা ভাল নির্দেশ আছে—

ক্ষুতোৎ পতন জৃম্ভাসু জীবোক্তিষ্ঠাঙ্গুলী ধ্বনিঃ।
শত্রোরপি চ কর্ত্তব্যং অন্যথা ব্রহ্মহা ভবেৎ।

অর্থাৎ কেউ যদি হাঁচে অথবা হাই তোলে, তা হ'লে নিজ হাতের দুটি আঙুলে ধ্বনি করবে আর মুখে বলবে "জীব জীব" অর্থাৎ বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো। এ বক্তব্যটি শত্রুর বেলাতেও ক'রবে নইলে ব্রহ্মহত্যার ভাগী হবে।

তা হ'লে ধ'রে নিতে হয় হাঁচি ও হাই তোলার ব্যাপারটার সঙ্গে অকস্মাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই ক্ষুৎ/ক্ষব এই দুটি ধাতুর উত্তরে অবথু প্রত্যয় ক'রে ক্ষবথু করা হ'য়েছে। এই ক্ষুৎ বা ক্ষব-ধাতু উত্তরে ক্ষুৎও হয়, ক্ষব ও ক্ষবথুও হয়। এটি বৈদিক শব্দ। আছে ঋক্‌বেদের ১০।২৪।১০ সূক্তে। বৈদ্যবৃন্দ ব্যাধির প্রতিটি ক্ষেত্রের শারীরক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য ক'রেছেন ক্ষবথু বা হাঁচি ক্রিয়াটি হয় নাকের গোড়ার দিকে অর্থাৎ যেখানে চোখ, কান ও জিভের মিলন স্থান অর্থাৎ চারটি ইন্দ্রিয়ের একত্র সঙ্গম। সেখানে খুব নরম ৪টি মর্মস্থান আছে, তারা তরল, সূক্ষ্ম ও কোমল।

তাদের প্রত্যেকের নাম "শৃঙ্গাটক" অর্থাৎ ঠিক পানি ফলের মত তাদের আকৃতি। সেখানে আঘাত লাগলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু দশা ঘটায়। যখন হাঁচি হয় তখন ওই জায়গা-গুলি থরথর ক'রে কাঁপে, এবং সে কাঁপুনির কারণ তীক্ষ্ম ঝাঁঝালো গন্ধ, তীক্ষ্ম ঝাঁঝালো খাদ্য, কটু দ্রব্যের নস্য, সূর্য দর্শন, কিম্বা সুতো বা কিছু দিয়ে ঘষা, এমনি

কারণ ঘটলে হাঁচি হবে। চোখে জল ঝ'রবে, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝ'রবে, কান ভোঁ ভোঁ ক'রবে, আর জিভটার গোড়াটাও উলটে যাবে। এর সঙ্গে যদি হৃদ্ রোগ জোটে তবেই হাঁচির অরিষ্ট লক্ষণ।

ক্ষব্ ধাতুর অর্থ বমন। ওই ক্ষব থেকে ক্ষবথু। বায়ুটা সরলভাবে সারা শরীরেই যাতায়াত করে, যেখানে যার দ্বারা বাধা পায়, সেখানে তাকে নিয়ে ব্যাধি ঘটায়। নাসিকার অগ্রভাগে যাকে বলে নাকের ডগায় থাকে নাসা মর্ম, আয়ুর্বেদীয় ভাষায় "শৃঙ্গাটক মর্ম"। যদি কোন কারণে ওই জায়গায় সামান্য সুড়সুড়ি (যা নাকে কাঠি দিলে হয়) লাগে, তবেই ক্ষবথু হয়; সেটা ব্যাধি নয়, শৃঙ্গাটক মর্মের সাধারণ স্বভাব। কিন্তু ওই মর্মটিতে যদি খুব পাতলা শ্লেষ্মার পর্দা পড়ে, তাহ'লে ওই স্থানে বায়ুর গতিটা সেই শৃঙ্গাটক মর্মে ধাক্কা লাগা মাত্রই শ্লেষ্মাসহ নাসার বমন রোগ হয়। নাসার বমন মাত্রেই ক্ষবথু। প্রচলিত ভাষায় হাঁচি। সংস্কৃত ভাষায় হঞ্চ্। এটি ধ্বন্যাত্মক ভাষা, অর্থাৎ শৃঙ্গাটক মর্মটি সামান্য ন'ড়লেই হচ্, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই শ্লেষ্মা বেরিয়ে আসে। একটু ঘুরিয়ে বলা হ'য়েছে নাসা পথে শ্লেষ্মার বমন।

তা যাক্, সরল কথা হ'লো, নাসিকাস্থিত বায়ু যদি কফানুগ হ'য়ে নাসিকার পথে প্রবল শব্দের সঙ্গে বার বার বের হয়, তারই নাম ক্ষবথু। অর্থাৎ হাঁচিও একটা রোগ। অনেকে মনে করেন হাঁচিটা একটা রোগই নয়, কিন্তু তা নয়, এটা রোগই। কারণ নাসিকার মর্মস্থান হ'লো "শৃঙ্গাটক"। দুটি চোখ (চক্ষু) আর নাকের সংযোগস্থলে থাকে এই মর্মস্থান। এই মর্মস্থানটি যদি বারে বারে সজোরে নড়ে ওঠে, তাহ'লে ওই মর্মস্থলের মূলটাই আলগা হ'য়ে যায়। শেষে গন্ধ গ্রহণের শক্তিটা নষ্ট হ'য়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চোখের দৃষ্টিও ক'মতে থাকে। প্রায়ই মাথা ধরে, এই হ'লো ক্ষবথু রোগের অরিষ্ট লক্ষণ।

আগন্তুক ক্ষবথু
(ALLERGIC RHINITIS)

এটিও নাসা রোগ। এই আগন্তুক ক্ষবথু রোগটি কেমন তা বলার আগেই আয়ুর্বেদের সংহিতাগ্রন্থ সুশ্রুতের সেই শ্লোকটি তুলে ধ'রছি—

> তীক্ষ্ণোপযোগাদভিজিঘ্রতো বা ভাবান্ কটূনর্ক নিরীক্ষণাদ্বা।
> সূত্রাদিভির্বা তরুণাস্থি মর্মণ্যুদ্ঘাটিতেঽন্যঃ ক্ষবথুর্নিরেতি॥

অর্থাৎ তাঁরা বোঝেন না এই অভ্যাসের পরিণামে কি হয়, অর্থাৎ কড়া নস্য নিয়ে হাঁচা কিম্বা সরু সুতো দিয়ে নাকের ছ্যাঁদায় (ছিদ্রপথে) সুড়সুড়ি দেওয়া, তারপর কয়েকটা হাঁচি সেরে বেশ আরাম পাওয়া, এমনি আচরণটা শেষে অভ্যাসে পরিণত হয়, ক্রমে সেই আচরণের দ্বারা আর হাঁচি হয় না, আবার সূর্যের দিকে মুখ ক'রে সেই রোদের (রৌদ্রের) তীক্ষ্ণতায় হাঁচার অভ্যাস, কিম্বা অন্য কোন কড়া জিনিস নাকে শুঁকে হাঁচা, এর ফলে শৃঙ্গাটক মর্মের কোমল অস্থিটি অবশ হ'য়ে যায়, আর তার ফলে শ্লেষ্মার পাতলা ঝরণাও বইতে থাকে, এইটাই আগন্তুক ক্ষবথু। এই আগন্তুক ক্ষবথুর অরিষ্ট লক্ষণ এইভাবে প্রকাশ পায়। তাই বলা হ'য়েছে—"পীড়া ললাটস্থিদেশে চ শঙ্খকে" অর্থাৎ ললাটের অস্থি ও শঙ্খদেশে মাঝে মাঝে যন্ত্রণা, শেষটায় বিরামহীন ব্যথা। তখন সেই শৃঙ্গাটকের কোমল অস্থির কাজ অসাড় হ'য়ে যায় আর স্থায়ী মাথার রোগ (শিরঃপীড়া) হয়।

নাসার্শ

(NASAL POLYPUS)

নাকের ছ্যাঁদায় (ছিদ্রপথে) অথবা ছ্যাঁদার একটু ওপরের দিকে ছোট্ট আঁচিলের মত হয়। এটির আকৃতি খুব ছোট মাকড়শা কিম্বা কাঁকড়ার বাচ্চা অথবা কচি বেলের বীচির (বীজের) মত। কিন্তু রঙটা লাল কিম্বা ফ্যাকাশে, সাদা, অথবা শুকনো মাংসের টুকরো, তবে যাঁদের রক্তপিত্ত রোগের ধাত তাঁদেরই এটা বেশী হয়।

কোন শস্ত্রচিকিৎসকের কাছে গিয়েই হোক্, আর আপনিই ফেটে রক্ত বেরিয়ে যাক্, গেলেই একটু স্বস্তি হয়। তারপর ২-৪ দিন পরেই আবার ওখানে রক্ত জমা হ'তে থাকবে। এটা কাটিয়ে নিলে কিছুদিন বাদে আবার হয়।

নাসা পাক

(ANOSMIA)

এই রোগটি ঠিক পীনস বা পূতিনস্যের মত না হ'লেও, যদি নাকের মধ্যে চুলকানি হ'তে থাকে, তারপর কিছুদিনের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট ফোঁড়া হ'তে থাকে, এবং পেকেও যায়, তখন সে নাক বাইরে থেকে একটু ফোলা আর লাল রং মাত্র দেখা যায় কিন্তু নাকের ভিতরে হাত দেওয়া যায় না, নাকের ভিতরের শ্লেষ্মা ঝাড়তে গেলে নাকে ভীষণ কষ্ট হয়। একটু কাঁচা দুধ, টাটকা গাওয়া ঘিয়ের নস্য নিলে সামান্য সময় উপশম হয় ঠিকই কিন্তু তখন নাকের অবস্থা এমন হয় যে নাকে নিঃশ্বাসটাও নিতে টান ধরে। এদিকে নাসার অভ্যন্তর শ্লেষ্মায় ভ'রেও যায়। ক্রমে সেই ছোট্ট ফোড়াগুলি পরিষ্কার করার অভাবে পেকে ফেটে পূঁজ সেই শ্লেষ্মার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে যা হয় সেটাতে মনে হবে হয়তো নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাবে। সেই ফোড়াগুলির ক্ষতটা যদি গভীর হ'তে থাকে আর তা দিয়ে পূঁজ মেশানো রক্ত আসতে থাকে, তবে তাই হবে অরিষ্ট লক্ষণ। এ অবস্থাটাকে আয়ুর্বেদীয় ভাষায় বলা হয় "কোথ"।

পূতিনস্য

পীনসের অবস্থাটা সবই থাকে, তবে পীনসের ক্ষেত্র থাকে না। গলায় তালুমূলে পচাটে গন্ধের শ্লেষ্মা, কিন্তু পূতি নস্য হ'লে ওই অবস্থা হবে, এবং সেই পচানি শ্লেষ্মাটা নাক দিয়ে বেরুতে থাকবে, আর মাঝে মাঝে জোরে নাক ঝাড়লে রক্তের ছিটে আসতে থাকবে, আবার কখনও হ'লুদ রঙের ডেলা ডেলা শ্লেষ্মা বের হবে, এরই নাম পূতিনস্য। কারো কাছে ব'সতে সঙ্কোচ হবে। এই অবস্থা চলাকালে তার সঙ্গে যদি মাঝে মাঝে জ্বর, দুটি চোখ ও কানের পাশ দুটি বেশ ব্যথা হ'তে থাকে অর্থাৎ মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা হ'তে সুরু হ'য়ে যায়, তখন সে পূতিনস্য সারানো খুবই কঠিন।

কর্ণরোগ

(DISEASES OF THE EAR)

কর্ণ এই প্রত্যঙ্গটির রোগ বর্ণনা সুশ্রুতে দেখা যায় না কিন্তু চরকে থাকলেও ৪।৫ টির বেশী নেই, যেমন পরিপোটক/উৎপাত/উন্মন্থক, দুঃখবর্ধন এবং পারলেহী।

কানের রোগে সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য রাখতে হয়, তার অভ্যন্তরে যে একটিমাত্র শব্দবহ শিরা আছে, তাকে ঘিরে আছে ১০টি শিরা। শরীরে প্রাকৃতিক নিয়মেই যেমন বায়ু, পিত্ত, কফ দেহের প্রতি শিরায় স্বচ্ছন্দচারী হ'য়ে অবস্থান করে, তেমনি আবার সেই তিনটিই যদি আমাদের নানান ত্রুটিতে বিপন্ন হয়, তবে তারাই এমন ঘটনা ঘটায় যে, তাতেই হয় আমাদের দেহে রোগ। তেমনি রোগের সংখ্যা তো কম নয়। তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, অন্ততঃ ৭০০ রকম রোগের ক্ষেত্র এই দেহে হ'তেই পারে। (এসব রোগের কিছুটা মাত্র ইঙ্গিত দেওয়া হ'য়েছে চিরঞ্জীব বনৌষধির প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডে), এতে থাকছে কেবল রোগগুলির মধ্যে যেসব রোগে অসাধ্য অবস্থা ঘটে সেগুলি। আমাদের প্রত্যঙ্গ যে কর্ণ, তারই প্রসঙ্গে চরকোক্ত নিরীক্ষায় বলা হ'য়েছে—কানের রোগের এই কয়টি বিশেষ লক্ষণ দেখা দেয়, যেগুলিকে আলাদা আলাদা ক'রলে এক এক কারণ ব'লে ধরা হবে, অর্থাৎ নানান ধরনের শব্দ, খুব যন্ত্রণা, কানের ভিতরটা শুকিয়ে যাওয়া, পাতলা স্রাব বের হওয়া, আর শোনার শক্তিটি হারানো।

এইসব লক্ষণের কোন একটি কি দুটি দেখা দিলেই জানতে হবে, বায়ুবিকারেই এটা হ'য়েছে। তবে প্রত্যেকটিরই অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো—প্রত্যহ মাথার যন্ত্রণা এবং সামান্য জ্বর, পরে সে জ্বর আর ছাড়তে চায় না।

কর্ণস্রাব

(OTORRHOEA)

এটাও বেশ পরিচিত রোগ, অর্থাৎ কান থেকে স্রাব বের হওয়া। প্রথমটা আঁশটে গন্ধ, তারপর পচা মাংসের গন্ধ। আয়ুর্বেদের সংহিতাগ্রন্থে বলা হ'য়েছে—

শিরোভিঘাতাদথবা নিমজ্জতো, জলে প্রপাকাদথবাপি বিদ্রধেঃ।
স্রবেদ্ধিপূয়ং শ্রবণোঽনিলার্দিতঃ সকর্ণস্রাব ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ মাথায় আঘাত লাগা, অথবা কানে জল ঢোকা, অথবা ডুবে স্নান করার সময় কানে জল ঢোকা, কিম্বা কানে ফোড়া হওয়ার পর পেকে ফেটে গেল—এমনি ধরনের কোন কারণে কানের স্রোতটি ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে গেলে সেখানে বায়ুর কোপটা ক্রমে বাড়তে থাকে, আর পুঁজ-রক্ত ও জলের মত দূষিত স্রাব নির্গত হ'তে থাকে। সেটার নামই "কর্ণস্রাব।" এটা অবশ্য চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় সম্ভব যদি অরিষ্ট লক্ষণ দেখা না দেয়। সেই অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো—যদি ওর সঙ্গে ক্রমশঃ শষ্কুলিটি আহত হয়, (অর্থাৎ খুব পাতলা করে বেলে নিয়ে ফুলকো লুচি ক'রলে তারও ওপরে একটা পাতলা আবরণ হয়, সেইটির নাম শষ্কুলি।) কানের ছিদ্রের সর্বত্র একটি পাতলা পর্দা তো থাকেই, বিশেষ ক'রে সেই ছিদ্রের মুখে একটি ছোট ঠুলি থাকে, সেই ঠুলিটার নামই শষ্কুলি, সেই শষ্কুলির গায়ে থাকে সূক্ষ্ম পর্দা। ওই পর্দাটিতে পুঁজ মিশে গিয়ে ক্ষত হ'লে, সে ক্ষত আর সারে না। অবশেষে সেই শষ্কুলির মূলোচ্ছেদ ঘটায়। আর তখন কোন রকমেই পুঁজ বন্ধ হয় না। ওইটাই এর অরিষ্ট লক্ষণ।

কর্ণস্রোতের রোগ

(DISEASES OF THE INTERNAL EAR)

এই স্রোতটির আধার যেটি তাকেই আমরা বলি মুণ্ড—এর অঙ্গ ৭টি—ঠোঁট ২টি,

দাঁতের পাটি, দাঁত, জিভ, তালু এবং গলা; চোখ দুটিকে কিন্তু এর মধ্যে ধরা হয়নি। পূর্বোক্ত সাতটি অঙ্গের রোগগুলিকে পৃথক ক'রে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বলা হ'য়েছে। সমগ্র মুখমন্ডলের বাইরে ভিতরে আরও ছিদ্র আছে, তারা কিন্তু মুখমন্ডলের অন্তর্গত হ'য়েও রোগক্ষেত্রে নয়, ওরা তালিকাভুক্ত হয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে। যদিও জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, তবুও শস্ত্রচিকিৎসার আয়ত্তে আসে চোখ, কান, নাক, তাছাড়া ত্বক্ ও জিহ্বা।

আয়ুর্বেদের চিন্তাধারায় ইন্দ্রিয়ের ভেদ তিন ভাগে বিভক্ত—(১) জ্ঞানেন্দ্রিয় (২) কর্মেন্দ্রিয় (৩) অন্তরিন্দ্রিয়। অন্তরিন্দ্রিয়ের চিকিৎসা অন্য রীতিতে, আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চিকিৎসা ঔষধের দ্বারাও হয়, আবার শস্ত্রের দ্বারাও হয়। ঔষধ কিন্তু উভয়েরই সহায়ক। চরক সম্প্রদায় ঔষধীয় পথই গ্রহণ করেছেন। আর সুশ্রুত উভয় পন্থাই; কিন্তু উভয়েরই অবলম্বন দেহ। সেই দেহ পরিচয় উভয়েরই জানা দরকার। চরকপন্থীগণ দেহ পরিচয় জেনেও চিকিৎসার ক্ষেত্রে পীড়ার অভিব্যক্তি কিভাবে কোথায় হ'চ্ছে, সেই লক্ষ্য ক'রেই অন্তরিন্দ্রিয়ের জ্ঞানের সাহায্যে সেটা নিরাময়ের চিন্তাই পরিস্ফুট।

এই কর্ণস্রোতের পীড়ার ক্ষেত্রে তাঁদের অভিমত, কর্ণ শব্দটির অর্থ দেহের মধ্যে যেটি শব্দজ্ঞানের জন্য আদান (গ্রহণ) স্থান, সেই শব্দ-গ্রহণ যে স্রোতের মাধ্যমে হয় তারই নাম কর্ণস্রোত। পুরুষের দেহে ছিদ্রপথ (প্রধানভাবে) ৯টি, আর নারী দেহে থাকে আরও দুটি বেশী, কিন্তু গাভীর (স্ত্রী) দেহের থাকে ১৪টি।

মানুষের কর্ণদ্বার দুটি এবং কর্ণস্রোত থাকে ভিতরে, এই স্রোত থেকে সূক্ষ্মতম স্রোত গিয়ে হৃদয়স্থিত ও মস্তকস্থিত মনের স্রোতে ও বুদ্ধিতে বা অন্তঃকরণের অথবা চিত্তের স্রোতে পৌঁছে যায় শব্দধ্বনি। এই কর্ণস্রোতের ব্যাধির সংখ্যা ২৮টি।

কর্ণশূল
(EAR ACHE)

এই কর্ণশূল রোগটির খুব সংক্ষেপে একটু ভূমিকা না দিলে আয়ুর্বেদীয় কর্ণ-স্রোতের রোগবিজ্ঞানটি পরিস্ফুট হবে না। ভোজ সংহিতায় বলা হ'য়েছে—

অবশ্যায়-জলক্রীড়া-কর্ণকণ্ডূয়নৈর্মরুৎ।
মিথ্যা যোগেন শব্দস্য কুপিতোহন্যৈশ্চ কোপনৈঃ।
প্রাপ্য কর্ণ-শিরাঃ কুর্য্যাৎ শূলং স্রোতসি বেগবৎ।
তে বৈ কর্ণগতা রোগা অষ্টাবিংশতিরিরীতা॥

অর্থাৎ অবশ্যায় মানে বরফ, হিম, কুয়াসা—এসবের মধ্যে একটি বা দুটি কারণে কানের স্রোতে ব্যাধি হয়। অথবা খুব জল ঘাঁটাঘাঁটি, সাঁতার প্রভৃতির দ্বারাও হয়, অথবা উৎকট শব্দ শুনেও হয়। এমনি নানান কারণে কানের স্রোতশিরা পীড়িত হ'য়ে বিপন্ন হয়। প্রধানতঃ বায়ুই তার কারণ। পরে অন্যান্য দোষের সঙ্গে সেই বায়ুর কোপই এসে তাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তারপর বলা হ'য়েছে—"একঃ প্রকুপিতো দোষঃ সর্বানেব প্রকোপয়েৎ"; সেই কর্ণস্রোতগত বায়ুই ওসব কারণের (অবশ্যায় প্রভৃতি) দ্বারা প্রতিলোম-ভাবে ইতস্ততঃ ও কুটিল হ'য়ে কানের স্রোতকে কাঁপিয়ে দেয় আর শরীরগত অত্যাচারও যেমন ঐ সময় এসে জোটে, তখন পিত্ত বা কফের কোন একটি সম্বন্ধ পেয়েই ঐ স্রোতের পথকে আবৃত ক'রে দেয়, আর তারপরই সেই দোষকে নিয়েই যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, এরই নাম কর্ণশূল। এই কানের যন্ত্রণার অবসান হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়, যদি

সে ব্যক্তির জ্বর, বমি এবং কাসি দেখা দেয়, সেই উপসর্গই তখন তার অরিষ্ট লক্ষণ; কারণ তাতে শিরঃপীড়া হবেই, কান চিরতরে যেতেও পারে, নচেৎ রোগের সঙ্গে উপসর্গের যন্ত্রণায় মৃত্যুও হ'তে পারে।

কর্ণনাদ

(RINGING OF THE EAR)

বায়ুবিকারে অর্থাৎ কর্ণস্রোতপথে বায়ু কুটিল গতিতে চলাফেরা ক'রলে এমন এক একটা ধ্বনি হয় যেটা ওই স্থানেই প্রতিধ্বনিত হয় আর তারও তরঙ্গধ্বনি এমনি একটারই আর একটা ধ্বনি হ'তে থাকে; তবে প্রাচীন আয়ুর্বেদীয়গণের শারীর নিরীক্ষায় উপলব্ধি হ'য়েছে যে, এইসব বস্তুর এবং প্রাণীর ডাকের শব্দ হ'তে থাকে, যেমন, ভৃঙ্গার থেকে জল ঢালার শব্দ/ঝিঁঝি পোকার ডাকের শব্দ, মশা ডাকার শব্দ/জল ঢালার শব্দ/ক্রৌঞ্চ/মন্ডূক/কাক প্রাণীর ডাকের প্রতীক শব্দ কানে যেন বাজতে থাকে, এভিন্ন আরও অনেক জিনিসের শব্দ কানে আসতে থাকে যেটা লোককে ঠিক বোঝানো যায় না। যখন এই রোগে অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়, তখন ওই কানের স্রোত-পথে অকস্মাৎ সিংহনাদ হ'তে থাকে, অর্থাৎ ঐ শব্দটা হঠাৎই হ'তে থাকে, ২।৪ দিন চুপচাপ, তারপরই হঠাৎ আবার, তবে তাতে সিংহ-নাদ শুনতে থাকলে বুঝতে হবে, এটা আরও অশুভ। এটা এলে বুঝতে হবে এইটাই অরিষ্ট লক্ষণ। কানটা নষ্ট হ'য়ে যাবে।

কর্ণক্ষ্বেড়

এই ক্ষ্বেড় মানে অব্যক্ত শব্দ। আয়ুর্বেদিকগণ এই রোগবর্ণনার আগেই একটি সদুপদেশ দিয়েছেন। শরীর রক্ষার পক্ষে সর্বদা যেমন যত্ন নিতে হয় যে, কায়াগ্নি যেন বিনষ্ট না হয়, তেমনি আরও সাবধানতা অবলম্বন ক'রতে হয়—অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য না হ'লেই যে রোগ হবে না কোন অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, তা নয়। সঞ্চিত বায়ু, সঞ্চিত পিত্ত, সঞ্চিত কফ ধীরে ধীরে এমন বিকৃতি প্রাপ্ত হয় যে, শরীরের কোন না কোন অঙ্গে তাদের বিকার দেখা দেয়, যার ফল হয়তো সারা শরীরে ছড়ায় না, কিন্তু একটা অঙ্গে দেখা দেয়। এই যে কর্ণক্ষ্বেড় নামক ব্যাধি, এটা ওই দীর্ঘদিনের সঞ্চিত দোষের বিকৃতির ফল। সেই বিকৃতি যদি কর্ণস্রোতে হয় সেইটাই হয় কর্ণক্ষ্বেড় রোগ।

> মারুতঃ কফপিত্তাভ্যাং সংসৃষ্টঃ শোণিতেন চ।
> কর্ণক্ষ্বেড়ং সংজনয়েৎ ক্ষ্বেড়নং বেণুঘোষবৎ॥

অর্থাৎ কফপিত্ত এবং রক্তবিকারের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে বায়ু যদি কর্ণস্রোতে এসে আর পথ না পায়, তবে কানে যে অবস্থা ঘটায় তাতে দিবারাত্রিই শুনতে পাচ্ছে কিসের যেন অব্যক্ত ধ্বনি হ'চ্ছে।

এমন ঝিঁ ঝিঁ ভোঁ ভোঁ শব্দ যদি জোরে হ'তে থাকে, কিংবা থেমে গিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে ভ্রম রোগ সৃষ্টি করে, অর্থাৎ ভুল হ'য়ে যাওয়াটাই সর্বদা ঘ'টতে থাকে, তবে কর্ণক্ষ্বেড় রোগের সেইটাই অরিষ্ট লক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ।

শিরোরোগ
(DISEASES OF THE HEAD)

আয়ুর্বেদীয় ভাষায় উত্তমাঙ্গ হ'লো মাথা, মধ্যাঙ্গ হ'লো হৃদয় বা বুক, আর উদর হলো নিম্নাঙ্গের শিরোভাগ। আবার তারও শিরোভাগ হৃদয়, আর হৃদয়েরও শিরোভাগ শির বা শিরঃ। সেই শির বা শিরঃ এই শব্দটি এসেছে ঋক্‌বেদের আমল থেকে (ঋক্ ২।২০।৬ সূক্ত)। এখানে শির বা শিরঃ শব্দের অর্থ সকলের যা আশ্রয় তারই সংজ্ঞা, বৃক্ষাদিও মূল থেকে রস সংগ্রহ করে কিন্তু শিরোভাগে গ্রহণ করে বায়ু,—অর্থাৎ যাবতীয় প্রাণের গতির আশ্রয়স্থান শিরোদেশ; মানব-শরীরেও প্রাণধর্ম একান্তভাবে যুক্ত থাকে মনে, মনই প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর প্রাণও মনকে সঞ্জীবিত রাখে। এই উভয় স্বরূপই দেহ সঞ্জাত দেহধাতুর সারবস্তু থেকে উৎপন্ন। আবার প্রাণবহ স্রোতও আছে, মনোবহ-স্রোতও আছে। প্রাণবহ স্রোতের প্রধান স্থান হৃদয়, আর মনোবহ স্রোতের প্রধান স্থান শিরোভাগ, এখানে যদি রোগ হয় মনের অবস্থাও পাল্টে যায়, আর প্রাণের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। অতএব শিরোভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু জানা ভাল, কারণ শিরো-ভাগের যদি অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়, তবে সমগ্র জীবনটাই অচল হ'য়ে যায়, আবার মৃত্যুও হয়।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে বলা হ'য়েছে, শিরোভাগে যত রোগ হয়, তাদের মধ্যে স্পষ্ট প্রতীয়-মান হয় ১১ প্রকারের—তবে এই ১১ প্রকারের শিরোরোগের প্রত্যেকটিতে শূলখোঁচার যন্ত্রণা থাকবে। তার অর্থ এই শিরোরোগের ক্ষেত্রে বায়ু বিকারের প্রাধান্যই বেশী।

যদি আবার বাতজ রোগ হয় অর্থাৎ শিরোভাগটি শ্লেষ্মার নিজস্ব স্থান, সেখানে যদি বায়ুর প্রাধান্য পায় তা হ'লে বিপর্যয় তো আসবেই। এই শ্লেষ্মার স্থানে রোগ হ'লে দিনের বেলায় যন্ত্রণা কখনও কখনও কম থাকবে কিন্তু রাত্রে যন্ত্রণা বাড়বে। এর সঙ্গে যদি রোগীর বহুমূত্র (ডায়েবেটিস্) থাকে তাহ'লে খুবই অসুবিধেয় পড়তে হয়।

(শিরোরোগ—দ্বিতীয় প্রকার)

কখনও মনে হয় বোধ হয় ব্লাড প্রেসারটা বেড়েছে, তাই এই মাথা ধরা। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধোওয়া এবং ফলে একটু কম বোধ হ'লো। চোখ মুখ দিয়ে যেন ধোঁয়া বেরুচ্ছিলো—চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই যেন খানিকটা উপশম। এ ধরনের মাথা ধরা রাত্রে হয় না, আর প্রেসার জনিত হ'লে প্রায়ই চোখ লাল হয়। আসলে এটা কিন্তু কুপিত পিত্তজ শিরোরোগ। এ রোগের আক্রমণে মনে হবে সারা মাথা যেন আঙ্গুরাতে পুড়ে যাচ্ছে, আর চোখ নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, কিন্তু যাঁদের রক্তপিত্ত রোগ আছে এটা তাঁদেরও ক্ষেত্রে অশুভ লক্ষণ ধ'রে নিতে পারা যায়।

(শিরোরোগ—তৃতীয় প্রকার)

আর এক ধরনের মাথার রোগ হয়, যেটাতে দেখা যায় সারা দিনে-রাতে মাথা ধরা ছাড়ছে না, আর মাথার ওপর যেন কেউ বরফ চাপিয়ে রেখেছে। কিন্তু এই মাথা ধরাটার সঙ্গে যদি—

"শূনাক্ষি কূটং বদনঞ্চ যস্য
শিরোঽভিতাপঃ স কফ প্রকোপাৎ॥"

অর্থাৎ এই ধরনের মাথা ধরার সঙ্গে যদি চোখ দুটি ফুলতে থাকে তবে বুঝতে হবে, এটা ঠান্ডা লেগেই হ'য়েছে, মাথায় শ্লেষ্মাই কুপিত হ'য়ে এ ধরনের মাথা ব্যথার সৃষ্টি ক'রছে, কিন্তু ওই ধরনের মাথাব্যথা অথবা ধরাটা যদি প্রায়শই হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বরটাও ভাঙ্গা ভাঙ্গা হ'য়ে স্বরভঙ্গ এসে যায়, তবে সেইটাই অশুভ লক্ষণ সূচিত করে।

(শিরোরোগ—চতুর্থ প্রকার)

মাঝে মাঝে নাক দিয়ে জল ঝ'রছে, মনে হয় বোধ হয় ঠান্ডা লেগেছে, সেই জল ঝরাটা থেমেও গেল কিন্তু মনে হবে মাথার ভিতরে কি যেন সড়্‌সড়্‌ করে স'রে যাচ্ছে, মাথা চুলকোলেও তৃপ্তি হয় না, মাঝে মাঝে ছুঁচ ফোটার যন্ত্রণা, কিম্বা দপ্‌ দপ্‌ করা, এসব লক্ষণ যে একসঙ্গে হবে এমন কোন কথা নেই, কিন্তু সর্দির মত ঝরাটা নিয়তই থাকবে, তবে কিছু কম কিছু বেশী। এটা হ'লো ক্রিমি জন্য শিরোরোগ। এও প্রায় অসাধ্য, তবে এর সঙ্গে নাক দিয়ে যদি রক্ত ঝরতে থাকে এবং এই সময় সর্দিটাও না থাকে, তবে এটা অশুভ লক্ষণ দেখা দিয়েছে ধরে নিতে হবে।

(শিরোরোগ—ক্ষয় জন্য)

এ শিরোরোগ বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে, এ ব্যক্তির কি হ'য়েছে? কারণ খাওয়া নাওয়া বেড়ানো হাসি-কান্না সব ঠিক থাকে, অথচ মাঝে মাঝে উঃ, কি অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়? কখনও মনে হবে মাথার ভিতরে ফোড়া হ'য়েছে (অনেক ক্ষেত্রে হয়ও), আবার কোন সময় মাথা ফেটে যেন চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে এমনি যন্ত্রণা, যদি আবার এই সময় কোন কারণে বমি হয়, কিম্বা সামান্য ধোঁয়া লাগে কিম্বা মাথায় শ্লেষ্মা বসে গিয়েছে মনে করে নস্য গ্রহণ ক'রে বসে, তাতে যে যন্ত্রণা হয়, সে যন্ত্রণা যেন আকস্মিক অবস্থায় পাথরে ধাক্কা লাগলে অজ্ঞান হ'য়ে যাবার মত।

আবার এও দেখা যায় কারোর বা যন্ত্রণা নেই, কিন্তু কেউ কাছে এলে চিনতে পারে না, স্বভাবেই কাজ ক'রতে থাকে, ডাকলে শুনতে পেয়ে চ'মকে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে।

সূর্যাবর্ত (শিরোরোগ)
(RECURRENT NEURALGIC PAIN IN THE HEAD)

এটি এক ধরনের শিরোরোগ। এটি একটি ফুলের নামও বটে। এর বৈশিষ্ট্য ভোরেই সে তৈরী থাকে ফোটার জন্য, কিন্তু বিচিত্র তার গতি-প্রকৃতি, সূর্যের অরুণ স্পর্শ লাগার সঙ্গে সঙ্গে ফুটে তো গেলই কিন্তু কেন যেন এ এক নূতন খুসীর রূপ নিল, অর্থাৎ অরুণ স্পর্শে পদ্মও ফোটে কিন্তু স্থির থাকে তা শতদলের বৃন্ত কেন্দ্রে; আর এই সূর্যাবর্তও শতদল। এই সূর্যাবর্ত নামের শতদল কুসুমটিও নতবৃন্ত থেকে উঠতে উঠতে সূর্যের যেন রশ্মিস্পর্শ ধরেই এগিয়ে চলে দিগন্তে, আবার দিনকরের কিরণের মত পশ্চিমপ্রান্তে গিয়ে আবার বিনত ম্লান হ'য়ে যায়। কবি চিকিৎসকও একটি শিরোরোগের গতি লক্ষ্য ক'রেছেন, এই রোগের গতিবেগে (যন্ত্রণায়) অতি প্রত্যূষ থেকেই ক্রমে বৃদ্ধি পেতে পেতে সন্ধ্যায়, তারপর রাত্রে স্তিমিত হয় তাই বলা হ'য়েছে—

সূর্য্যোদয়ং যা প্রতি মন্দ মন্দং অক্ষিভ্রুবং রুক্ সমুপৈতি গাঢ়ম্।
বিবর্ধতে চাংশুমতা সহৈব সূর্যাপবৃত্তৌ বিনিবর্ত্ততে চ।

আয়ুর্বেদের চিন্তাধারা হ'লো, পিত্তের বিকার যখন প্রধান আর বায়ু অপ্রধান, তখনই এটা হয়। তাই সূর্যের কিরণের মধ্যে তেজই প্রধান কিন্তু যদি দুপুরের পর থেকে আরও বেড়ে বেড়ে রাত্রে ঘুম মেরে গিয়ে যন্ত্রণাটা স্থায়ী হ'য়ে যায়, তবে বুঝতে হবে এটি শ্লেষ্মা ও বায়ুবিকার জন্য, তখন সূর্যাবর্ত নাম নয়, শুধু আবর্ত নাম। দুটি রোগই কষ্টসাধ্য, কিন্তু অরিষ্ট হ'লে তো কথাই নেই। এর অরিষ্টটি হ'লো বধিরত্ব অর্থাৎ শ্রবণশক্তিও এর সঙ্গে ক'মতে থাকে।

শঙ্খক

(ACUTE MASTODITIES)

কথায় বলে আমি মর্মাহত হলাম, আবার এও বলা হয়—উচিত বুঝে সবই ক'রো কিন্তু কারো মর্মে আঘাত ক'রো না।

এসব কথার মধ্যে নিশ্চয় এমন তথ্য নিহিত আছে যে, যেখানে আঘাত ক'রলে আর জীবনায়ু থাকে না, সেইজন্য বলা হ'য়ে থাকে "আয়ুর্মমানি রক্ষতি" অর্থাৎ আমাদের দেহের মর্মস্থানগুলিই আয়ুকে রক্ষা করে।

এই মর্ম শব্দটি বৈদিক—এটি আছে ঋক্‌বেদের ১।৬১।৬ সূক্তে। ওখানে সায়ণ ব্যাখ্যা ক'রেছেন মৃ+মন্ বা মানন্ প্রত্যয়ের যোগে এই মর্ম। অর্থাৎ মৃত্যু ঘটায় যে আধার তার নামই মর্মস্থান। দেহের মধ্যে মর্মস্থান ১০৭টি; তবুও এগুলির অস্তিত্ব প্রকাশ পায় পাঁচ প্রকারে। মাংসমর্ম; শিরামর্ম, স্নায়ুমর্ম, অস্থিমর্ম ও সন্ধিমর্ম।

মাংসমর্ম ১১টি, আবার শিরামর্ম ৪১টি, স্নায়ুর ২৭টি, অস্থির ৮ এবং সন্ধির ২০টি। এইসব মর্মের নামও পৃথক পৃথক। সব মর্মই প্রাণ বা বায়ুর রক্ষক। এদের যেকোন একটি আহত হ'লেই মৃত্যুর ঘণ্টা বাজায়। তবে এইটুকু আশ্বাস দেওয়া হ'য়েছে যে সকলেই সদ্য মারক নয়। কোন কোন মর্ম আহত হ'লে কালান্তরে মৃত্যু ঘটায়, আবার কতক মর্ম বৈকল্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ সেই মর্মস্থান আহত হ'লে সেই সেই অঙ্গটি এবং তৎসংলগ্ন প্রত্যঙ্গটি চিরতরে পঙ্গু হ'য়ে যায়। আবার কোন কোন অঙ্গমর্ম পীড়াকর খুবই। যেমন পায়ের গোড়ালির মর্ম, হাতের কনুই কব্‌জিতে যে মর্মস্থান, এইসব স্থান আহত হলে সারাজীবনই ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ এবং মাঝে মাঝে তীব্র যন্ত্রণা হবেই। আবার কোন কোন মর্ম বৈশল্য অর্থাৎ ওখানে কিছু ফুটে গেলে যতক্ষণ সেই শল্যটি থাকবে ততক্ষণ প্রাণ। যেই বের ক'রে দেওয়া হবে অমনি আয়ুশেষ। এরই নাম বৈশল্য মর্ম। আর পঞ্চম মর্ম হ'লো সদ্য প্রাণহর মর্ম। এ মর্মগুলি হ'লো শৃঙ্গাটক ৪টি, অধিপতি ১টি, শঙ্খ ২টি, কণ্ঠশিরায় ৮টি, এবং মলদ্বার, হৃদয়, বস্তি ও নাভিতে একটি করে। এরা মোট ১৯টি। এদের যেকোন একটি আহত হ'লে তিনদিন অথবা কোনরকমে ৭ দিন আয়ু থাকে, তারপর অবশ্যই শেষ।

তা যাক্, আমাদের বক্তব্য সদ্য প্রাণহারক মর্মের মধ্যে শঙ্খও একটি বিশেষ মর্মস্থান। এই শঙ্খমর্ম বোঝাতে একটু পূর্বসূত্র টানছি। কথাটা এই যে, ভ্রূ দুটির নীচে চোখ এবং সেই চোখের বাইরের প্রান্তের নাম অপাঙ্গ। অর্থাৎ দুদিকে দুটি অপাঙ্গ। ওই অপাঙ্গ আহত হ'লে চোখ দুটির দৃষ্টিই চ'লে যায়, ওগুলি সন্ধিমর্ম।

আর ওই ভ্রূ দুটির শেষ প্রান্তের রেখার উপরে কান ও ললাটের মধ্যস্থানে দুই পাশে দুটি মর্মস্থান আছে, তাদের নাম শঙ্খমর্ম (শঙ্খাস্থির অন্যতম কোমল ভাগ), ও দুটিও অস্থিমর্ম এবং এ দুটির পরিমাণ আধ আঙুল ক'রে। এই শঙ্খমর্মটি আহত হ'লে অত্যন্ত দ্রুত মরণ ঘটে।

আবার শঙ্খক নামের একটি ভয়ঙ্কর শিরোরোগ হয়। শঙ্খ প্রদেশে অর্থাৎ কানের পিছন ও উপরের ভাগে কুপিত রক্ত, পিত্ত ও বায়ু (কফেরও অনুবন্ধ থাকে) পরস্পর মিলে ভয়ঙ্কর এই রোগ উৎপন্ন করে। সমস্ত শঙ্খপ্রদেশ লাল হয়ে ফুলে ওঠে, সঙ্গে থাকে আগুনে যেন পুড়ে যাচ্ছে এই রকম জ্বালা, সূঁচ দিয়ে যেন ফোটাচ্ছে এই ধরনের বেদনা ও ব্যথা আর ক্রমশঃ দেখা দেয় তৃষ্ণা, জ্বর ও মূর্ছা। ফোলাটা বিষের মত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে মাথায় ও গলায়। রোগ হওয়ার তিন দিনের মধ্যেই এই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে জীবন নাশ করে। যদি ভাল চিকিৎসায় রোগী তিন দিন বেঁচে থাকে তাহলে বাঁচলেও বাঁচতে পারে। এই রোগের আশুকারিতা, ভয়ঙ্করতা ও মারকতার কারণ—শঙ্খপ্রদেশ হল ১০টি প্রাণায়তনের অন্যতম ও শঙ্খমর্ম নামক অস্থিমর্মের এই শঙ্খপ্রদেশের শঙ্খাস্থির এক প্রান্তে অবস্থান।

কোঠ

(ALLERGIC DARMATITIES)

সচরাচর পরিচিত শব্দ দিয়ে রোগের নামকরণটা আমরা পছন্দ করি। কিন্তু এই কোঠ নামটি তেমন পরিচিত শব্দনাম নয়। এটি কুষ্ঠ শব্দের বিবর্তনেই হ'য়েছে। আয়ুর্বেদীয় সংহিতাকারগণ ব'লেছেন—

অসম্যক্ বমনৈঃ কিংবা হ্যসম্যক্ চ বিরেচনৈঃ।
পিত্ত-শ্লেষ্ম-বিকারেণ শোণিতং কফপিত্ততঃ।
দোষ-দূষ্য-বিরুদ্ধত্বাৎ কুষ্ঠঃ "কোঠ" উদীর্য্যতে।
মণ্ডলানি সকণ্ডূনি রাগবন্তি বহূনি চ।

অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে বমি হওয়ার ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন, সেটি খাওয়ানো হ'লো, কিন্তু ভাল ক'রে বমি হ'লো না অথবা আদৌ হ'লো না, দূষ্য দ্রব্য রয়েই গেল, কিম্বা বিশেষ প্রয়োজন থাকায় বিরেচন বা জোলাপ খাওয়ানো হ'লো, তাতে হয়তো দাস্ত ভাল পরিষ্কার হ'লো না, পেটে অস্বস্তি এবং দূষিত মল র'য়েই গেল, এইসব কারণে সেইসব দূষিত খাদ্য রসের প্রতিক্রিয়া হ'য়ে সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে, আর গোল চাকা চাকা লাল দাগ হ'য়ে ঠিক যেন সর্বাঙ্গে কুষ্ঠের ফুলো হ'তে থাকে। এরই নাম কোঠ রোগ। এই রোগ কিন্তু নিরনুবন্ধ অর্থাৎ বেশী দিন থাকে না, এমনকি ২৪ ঘণ্টাও থাকে না। কিন্তু এই রোগ আবার সানুবন্ধও হয়, অর্থাৎ পাকস্থলী এবং অন্যান্য কোষ্ঠস্থান যদি ওইসব কারণে প্রায়ই দূষিত হয় তাহ'লে সানুবন্ধও হয়। যাঁদের সামান্য অম্ল অজীর্ণ হ'লেও নুন (লবণ) জল বা অন্য কিছু বমন করার ওষুধ খেয়ে বমন করার অভ্যাস ঘটে কিম্বা এক রসাভ্যাস ক'রে (এক রকম প্রকৃতির লোক আছে, এটা খাব না, ওটা ভাল লাগে না, সেটায় আমার রুচি নেই, ওসব জিনিস খেলেই আমার বমি হয়ে যাবে, এমনি ধরনের রুচি-প্রকৃতির মানুষ সাধারণতঃ এক রসাভ্যাসী হয়), তারাই কোষ্ঠকাঠিন্য কিম্বা উদর রোগে ভোগে। দেহের বল ক'মে

যায়, অথচ কেউ বা রোগা আবার কেউ বা মোটা। এ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞগণ বলেন—ওইসব দেহে ঠান্ডা বাতাস লাগলেও কোঠ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে প্রতিটি রোগের অরিষ্ট লক্ষণের মত কোঠ রোগের অরিষ্ট লক্ষণ হয়। যদি রোগের হেতুটাকে বর্জন না করেন, তাহ'লে শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হবে।

পামা

(ECZEMA)

পামা শব্দের মৌল উৎস পাওয়া যায়, কিন্তু পামা শব্দের অর্থের উৎস কোথায়? অথচ পামা মানে মূর্খ/পাপী/ইতর/খাল, এইসব অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

এখানে পামা নামটির উৎস ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।১।৮) পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানের অর্থ হ'লো, যা আবর্জনা তাই পামা। মনে হয় তাকে অবলম্বন ক'রেই 'পামর' শব্দের অত অর্থ। আর সেই অর্থেই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাগ্রন্থগুলিতেও ক্ষুদ্ররোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে কুষ্ঠের অন্যতম অবস্থাটি বর্ণনা ক'রতে পামা শব্দের উল্লেখ। সেই কুষ্ঠ রোগটির অবস্থা ভেদেও একটি নাম "দারণ", এ প্রসঙ্গটি বিস্তৃত ক'রে বলা হ'য়েছে এই গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের ৩৬৬ পৃষ্ঠায়। সেই কুষ্ঠেরই প্রকারভেদ পামা। এ সম্বন্ধে ওই বিশেষ কুষ্ঠ যে পামা তার লক্ষণ হ'লো—

সূক্ষ্ম বহ্বঃ পিড়কা স্রাববত্যঃ পামেত্যুক্তাঃ
সদাহাঃ।

অর্থাৎ যে কুষ্ঠে দেখা যাবে, সর্বদাই রস গড়ায়, খুব কন্ কন্ করে, অথবা চুলকানিও হবে, জ্বালাও থাকবে, আবার চাব্ড়া বেঁধে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ফুস্কুড়িও হবে খুব ছোট ছোট, সেইগুলির নামই পামা। এই পামাই আবার আর এক জাতের হয়, তার নাম কচ্ছু। পামা হবে খুব ছোট, আর কচ্ছু হবে বড় বড়। কিন্তু একই জাত-ভাই। অর্থাৎ দুই-ই সমান, দুইয়েরই স্বভাব হাতে, পায়ে, পাছায়, জাঙে জন্মাবে; তফাৎ এই যে, পামার আকার ছোট, আর কচ্ছু হয় বড়। আরও বৈশিষ্ট্য—কচ্ছু অনেকদিন থাকলেও চামড়ার স্পর্শশক্তির হ্রাস করে না, কিন্তু পামা তা করে। তাছাড়া পামা দেহের বর্ণের বিবর্ণতা এনে দেয়, কচ্ছুও তাই। এদিক থেকে সমান।

এবার বলি পামার অরিষ্ট লক্ষণ—পামা বেশ কিছুদিন পর পর হ'লো, আবার গেল, আবার হ'লো, এমনি ক'রে যদি ৩ বৎসর কেটে যায়, তখন ঐ স্থানের চামড়াটাই এক চর্মকীল অর্থাৎ চওড়া আঁচিলের মত হ'য়ে যায়। সেইটাই অশুভ লক্ষণ। তখন ওই স্থানটা চেঁচে দিলেও আবার হবে।

শিশুরোগ

ভারতীয় বৈদিকগ্রন্থে শিশু শব্দের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় ঋক্‌বেদের কয়েকটি সূক্তে। পরবর্তীকালের সংস্কৃত গ্রন্থে ৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত সংজ্ঞা শিশু।

আয়ুর্বেদে শিশু চিকিৎসার ব্যাপ্তি প্রায় ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত। ৬ থেকে ৮ এই দুই বৎসরকাল চিকিৎসকের পক্ষে বেশ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তবে আড়াই বৎসর বয়স পর্যন্ত তার ব্যাধিগুলির প্রকৃত যন্ত্রণা ও স্থান নিরূপণ করা খুবই কঠিন।

তালু কণ্টক

(ACUTE TONSILITIS)

তালু শব্দটি বৈদিক। তৈত্তিরীয় প্রতিশাখ্যের ২।২২ সূক্তে উল্লেখিত হ'য়েছে। তার ব্যাখ্যায় বলা হ'য়েছে, "জিহ্বায়া অধস্তনঃ" অর্থাৎ জিহ্বার অধোভাগ। অন্যান্য চিকিৎসাগ্রন্থকারগণ আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা ক'রে ব'লেছেন জিহ্বার অধিষ্ঠানই তালু; কুম্ভীরের এক নাম "তালুজিহ্ব"। আমাদের মত তার জিভ নেই, তবে তালুমূলই তার জিভ।

যাক্ সে কথা—শিশুদের তালুদেশে বেশ কঠিন কঠিন রোগ হয়; উল্লেখিত রোগটিও তাদের মধ্যে একটি। তালুর মধ্যে স্নায়ুগ্রন্থির পঞ্চম স্নায়ুর দ্বিতীয় শাখা থেকে চেতনাবহ স্রোতের সঙ্গে সর্বদা মিল হ'চ্ছে তার, তারই সঙ্গে তালু উত্তোলা পেশী—আল্‌জিভের পেশীর সঞ্চালনও সর্বদা ক্ষণে ক্ষণে হ'চ্ছে।

তালু বা জিহ্বামূল এবং নাসিকার ঝিল্লীতে এসে ওই স্নায়ুগ্রন্থিগুলি জুড়ে আছে, সেই জোড় থেকেই মুখের অন্যান্য স্থানে চেতনাসহ রসের অনুভূতি জাগে। খুব সামান্য স্পর্শেই অনুভূতি জাগায়। বিশেষ করে ওই বয়সের শিশুর।

সেই সময় যদি শিশুর কোন রকমে কফ জমে, তবে ওই স্থানের কাজ ব্যাহত করে, তখন তালুর স্থানটি নিচে নেমে যায়, মাথার ওপরটাও তপ্‌তপ্ করে, স্তনে মুখ দেয় না, পাতলা দাস্ত, গলায় ঘাড়ে খুব যন্ত্রণা আর গরম বা ঠান্ডা যে কোন তরল পানীয় দিলেও বমি হয়, ওই অবস্থার নাম দেওয়া হ'য়েছে "তালু কণ্টক"। এর অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো, মুখ দিয়ে লালা পড়ে, হিক্কা হয়, এবং বার বার মূর্ছিত হয়।

কচ্ছপ রোগ/মাংস কচ্ছপ

রোগটির নাম কচ্ছপ রোগ অথবা মাংস কচ্ছপ। কচ্ছপ নামটি সুশ্রুতের উক্তিতে র'য়েছে, তাতে বলা যায় না, এ নামটি খুব প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার। কারণ কচ্ছপ তো ভ্রষ্ট শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় "কক্ষপ" পাওয়া যায় কূর্মের প্রতিশব্দে। আর কচ্ছপ শব্দটি বেশ নবীন সংস্কৃত ভাষা। তখন এর ব্যাখ্যা কচ্ছ অর্থাৎ জলের প্রান্তদেশে নিজেকে রক্ষা করে, তাই "কচ্ছপ", আর "কক্ষপ" হ'লে ওর অর্থ কক্ষকে, নিজের উদর ও পৃষ্ঠকে যে রক্ষা করে।

তা যাক্, তালুর আশপাশে এমন ফুলো হয়, ঠিক যেন কূর্মের পৃষ্ঠের মত শক্ত; অথচ ভিতরটায় থাকে মাংসপিন্ড। এটি একদিনে হয় না, অল্প অল্প ক'রে বাড়ে। ওটি কিন্তু শল্যবিদ্‌দের হস্তক্ষেপ ছাড়া সারানো কঠিন। এটি পাকতে দেরী হয়, আর যন্ত্রণাও প্রথমে হয় না। বেশ কিছুদিন কেটে গেলে শক্ত হ'য়ে যায়, যখন মন্দ মন্দ ব্যথা হয়, তখনই অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বুঝতে হবে।

তাল্বার্বুদ

এ রোগের স্বভাবটাই এমন যে, বায়ু, পিত্ত, কফের দুষ্টির অপেক্ষা না রেখে, রক্তটাই বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন ঊর্ধ্ব, মধ্য, অধঃ পার্শ্বের মধ্যে তালুর মধ্যস্থানটাই আক্রান্ত হয় এমনভাবে, যেন একটি ফোটা পদ্মফুলের মধ্যবর্তী স্থানে যেমন বেশ সুন্দর লাল রঙের একটি কন্দ থাকে, আর তার চারপাশে থাকে কত ছোট ছোট কুঁড়ি, ঠিক তেমনই

হয় তালুর মাঝখানটায়, চারদিকে ছোট ছোট শক্ত ফুস্কুড়ি বা মাংসাঙ্কুর বেষ্টিত একটি আব (অর্বুদ)। এও বড় দুঃখপ্রদ রোগ। পাশ্চাত্যের ভাষায় ক্যান্সার বললেই হয়তো ঠিক হয়। কারণ ওই অর্বুদ বা আব্টির ভিতরে থাকে জমাট রক্ত, আর তার চারপাশেও যে ছোট ছোট অঙ্কুর সেগুলিও রক্তবিকার থেকে জন্ম নেয়। ওটার রূপ এমন হবে যে ক্রমেই তা পাকে; তারপর সেটা ফাটে এবং অসাধ্য ক্ষত হ'য়ে রক্ত আর দূষিত পচা মাংসের কুচি বের হ'তে থাকে। ভোজ সংহিতায় এর অবস্থা এইভাবে বলা হ'য়েছে—

"উপর্য্যেব ভবেৎ মধ্যে যথাপদ্মস্য কর্ণিকা।
পার্শ্বতশ্চাঙ্কুরৈ র্ব্যাপ্তৈঃ যথা চাপ্যবসীদতি॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাটা পূর্বেই বলা হ'য়েছে। এই রোগের পরিণতি হ'লো—ক্রমশঃ ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হ'য়ে যায়, তারপর নাকটি ব'সে যেতে থাকে। অর্থাৎ ভিতরটা ফাঁপা হ'তে থাকলে ওপরের মাটি যেমন নীচে ব'সতে থাকে তেমনি। কারণ রক্তদুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পিত্ত এবং শ্লেষ্মাই তখন এর সঙ্গে মিশ্রিত হ'তে হ'তে ভীষণ ক্ষত সৃষ্টি করে। রোগটার গোড়া থেকেই অশুভ লক্ষণ হ'য়ে থাকে।

তালুপাক

সুশ্রুতের দেওয়া নাম তালুপাক, কিন্তু তার যা বর্ণনা, তাতে দেখা যায় পিত্ত প্রকুপিত হ'য়ে তালুতে ভীষণ পাক উৎপন্ন করে। এই পর্যন্ত সহজ অর্থ কিন্তু এই অর্থ কি চিকিৎসকের পক্ষে সুগম হয়? পাকের পরিণতিতে পচে যায়, ক্লেদও নিঃসৃত হয়, সুশ্রুতের কি তাই বক্তব্য? আবার কতকগুলি দ্রব্যকে একত্র ক'রে তপ্ত স্নেহদ্রব্য দ্বারা উত্তম আস্বাদন পূর্ণ করার নামও পাক, তালুতে কি তেমন কিছু ঘটে?

আবার আমরস জীর্ণ করার জন্য পাচন ঔষধের দ্বারা জীর্ণ করার নামও পাক করা; নিশ্চয় এখানে তেমন ধরনের কিছু বক্তব্য নেই, অতএব পাক শব্দের বক্তব্যও এখানে ওসব অর্থে হয় না। আবার কতক ভেষজ আছে, যা পরিপক্ব হ'য়ে গেলেই বৃক্ষ বা গুল্মটির মৃত্যু হয়, যার জন্য বলা হয় ওষধী। এখানে সুশ্রুতের উক্তি হ'লো—

পিত্তং কুর্য্যাৎ পাকমত্যর্থঘোরং
তালুন্যেবং তালুপাকং বদন্তি॥

এটির অর্থ পূর্বেই বলা হ'য়েছে।

এখানকার বিচার্য বিষয় হ'লো—তালুস্থানটি পিত্তের নিবাস নয়, কিন্তু তালু-পাকের কারণ যখন পিত্তবিকার জন্য, তখন এখানে পাকের অর্থ পিত্তের শোষণ ধর্মটি বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়ে তার তীক্ষ্ণত্ব ও দ্রবত্ব স্বভাবটিই অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে তার পরিণতি ব্রণ ও ক্ষত সৃষ্টি করে, যার জন্য সুশ্রুতের উক্তি—"পিত্তং অত্যন্ত ঘোরং...", অর্থাৎ পিত্ত সর্বাঙ্গে থাকে কিন্তু সম্প্রাপ্তি বিশেষে তালুগত পিত্তটাই বিকৃত হয়। যার পরিণতিতে তালুপাক রোগ হয়। এ রোগের অরিষ্ট লক্ষণ হ'লো, ক্রমেই যদি তা বাড়তে থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত কর্ণস্তব্ধতা, কর্ণনাদ (কান ভোঁ ভোঁ করে, কট্ কট্ করে) হয়, যাকে "ক্ষ্বেড়" রোগ বলা হয়।

তালুপুপ্পুট

তালুর যেকোন স্থানে এই রোগটির উৎপত্তি হয়, পুপ্পুট শব্দটি খুব অপরিচিত সংস্কৃত ভাষা। এটিও মূল শব্দ ভ্রষ্ট হয়ে এইরূপ হয়েছে, অর্থাৎ মৌল ভাষা পুষ্প। তাই থেকে পুপ্‌পু হ'য়েছে। এ রোগটি এমনই যে, এটি একটি ছোট্ট ফুলের কুঁড়ির মত হয়, অথবা ফল ঠিক কচি অবস্থায় থাকলে তার গঠনটা যেমন না সবুজ না লাল না কালো না ফ্যাকাশে রঙের হয়, তেমনি এই তালুপুপ্পুট রোগটি। কারণ বিকৃতকফ ও বিকৃতমেদ থেকেই এর জন্ম হয়। ব্যথা থাকে না, কিন্তু ধীরে ধীরে ওই পুপ্পুটটি বেশ শক্ত হয়, মাঝে মাঝে একটু ফোলে, শেষজীবন পর্যন্ত থাকলেও ব্যথা-বেদনা থাকে না। কিন্তু ক্রমশঃ শক্ত হ'য়ে যায়, সামান্য জল খেতেও অস্বস্তি বোধ হয়। আর যদি তালুর অধোভাগে হয়, তবে অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা সরিয়ে নিতেও পারা যায়— কিন্তু এটা যদি বিসর্পজ হয়, যাকে বলে ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্ হয়, তাহ'লে সেখানে অস্ত্রোচার বিপজ্জনক।

তালুশোষ

এই রোগটির আকৃতিগত কোন পরিচয় হয় না; তাই কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে এর আকৃতির উল্লেখ নেই, অথচ রোগটির ক্রিয়াগত পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ এই তালুশোষ বললেই যদিও সুশ্রুতের আর একটি কথা মনে হয়—"সংশোষণাৎ রসাদীনাং শোষ ইত্যভিধীয়তে", অর্থাৎ রস রক্ত প্রভৃতি ধাতুগুলি ক্রমেই শুকিয়ে যায় ব'লেই তার নাম শোষ; কিন্তু এই তালুশোষ রোগে তা হয় না। সুশ্রুতের ওই শোষ বর্ণনাটি ক্ষয়-রোগে উল্লেখিত; প্রচলিত কথায় যা যক্ষ্মারোগ বলা হয়। কিন্তু এখানে তালুশোষ বললে ওই শোষ কথাতেই ভ্রম হয়, কিন্তু তা নয়। এখানে শোষ মানে জলশূন্যতা। যেমন জল শুকিয়ে গেলে পুঁটি মাছগুলির অবস্থা হয় তেমনি তালুর চারদিক থেকে সর্বদা খুব সূক্ষ্মপথে লালা ঝ'রতে থাকে। আমাদের খাদ্যগুলি মুখগহ্বরে খুব সহজে প্রবেশ করানো সহজ হয়। অজীর্ণ হ'লেও মুখের তালু শুকিয়ে যায়। রোদে (রৌদ্রে) ভয়ে, শোকে, দুশ্চিন্তাতেও তালু শুকিয়ে যায়। আবার তালুতে এক ধরনের ব্যাধি হয় তাতেও শুকিয়ে যায়। এই রোগ হয় পিত্ত সংযুক্ত বায়ুর বিকারে, কিন্তু তালুশোষ রোগের বেলায় দেখা যায় প্রচুর জল খেলেও ক'মে না, তখন তালু যেন ফেটে যাচ্ছে এই রকম যন্ত্রণা হ'তে থাকে।

এর অশুভ লক্ষণ হ'লো, পরিণতিতে শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়। অবশেষে প্রাণ রক্ষা পায় না।

রোগানুসারিণী সূচী